

UMAR IBN AL-KHATTAB
HIS LIFE & TIMES
এর অনুবাদ

উমর ইবনুল খাতাব

দ্বিতীয় খণ্ড

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী
অনুবাদ | মুহাম্মাদ আদম আলী

THIS BOOK HAS BEEN PUBLISHED WITH
DUE PERMISSION FROM THE AUTHOR
DR. ALI MOHAMMAD EL-SALLABI

সত্যের আধুনিক প্রকাশ



মাক্কাবাতুল ফুরকান

www.islamibooks.com

Umar Ibn Al-Khattab
His Life and Times -এর অনুবাদ

জীবন ও কর্ম
উমর ইবনুল খাত্তাব
রাযিয়াল্লাহু আনহু

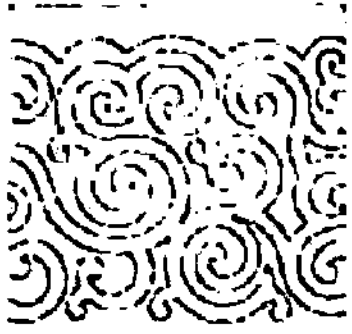


ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আদম আলী



MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ



ইসলাম ও বীমা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. (দ্বিতীয় খণ্ড)

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত

১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.islamibooks.com

maktabfurqan@gmail.com

☎ +8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৮-২০২০ মাকতাবাতুল ফুরকান

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫

চতুর্থ প্রকাশ : জমাদিউল আউয়াল ১৪৪২ / ডিসেম্বর ২০২০

তৃতীয় প্রকাশ : ফিলকদ ১৪৪১ / জুন ২০২০

দ্বিতীয় প্রকাশ : রবিউল আউয়াল ১৪৪১ / নভেম্বর ২০১৯

প্রথম প্রকাশ : রবিউল আউয়াল ১৪৪০ / ডিসেম্বর ২০১৮

অনুবাদ সহযোগী : আহসান ইলিয়াস, আব্দুল্লাহ মুআয

প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা

প্রফ সংশোধন : উমেদ; ☎ +৮৮০১৯১২০৮১৬৯৯

ISBN : 978-984-92291-8-5

মূল্য ■ ৳ ৬০০.০০ (ছয় শত টাকা মাত্র) USD 20.00

রকমারি

www.islamibooks.com; www.rokomari.com

www.wafilife.com

সূচিপত্র

পঞ্চম অধ্যায়

গভর্নরদের পরিচালনায় উমর রা.-এর কর্মপদ্ধতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : রাষ্ট্রের প্রদেশসমূহ

১.১। মক্কা	১৪
১.২। মদীনা	১৬
১.৩। তায়েফ	১৭
১.৪। ইয়ামান	১৮
১.৫। বাহরাইন	২০
১.৬। মিসর	২৩
১.৭। শাম ও তার রাজ্যসমূহ	২৫
১.৮। ইরাক ও পারস্যের রাজ্যসমূহ	২৯
১.৮.১। বসরা	৩১
১.৮.২। কুফা	৩৪
১.৮.৩। মাদাইন	৩৮
১.৮.৪। আজারবাইযান	৪০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগপদ্ধতি

২.১। প্রাদেশিক গভর্নর নির্বাচনে উমর রা.-এর মানদণ্ড	৪৩
২.১.১। শক্তি-সামর্থ্য এবং আমানতদারি ও বিশ্বস্ততা	৪৩
২.১.২। নিয়োগদানের ক্ষেত্রে ইলমের গুরুত্ব	৪৪
২.১.৩। জ্ঞানবত্তা ও অভিজ্ঞতা	৪৪
২.১.৪। গ্রাম্য ও শহুরে	৪৫
২.১.৫। জনগণের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ	৪৬
২.১.৬। নিকট-আত্মীয়দের কোনো দায়িত্ব না দেওয়া	৪৭
২.১.৭। দায়িত্ব কামনাকারীকে দায়িত্ব না দেওয়া	৪৮
২.১.৮। গভর্নরদের প্রতি ব্যবসা-বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা	৪৮
২.১.৯। কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে সম্পদের হিসাব গ্রহণ	৪৯

২.১.১০। কর্মকর্তা নিয়োগের সময় কিছু শর্ত পালন	৪৯
২.১.১১। গভর্নর নির্বাচন ও নিয়োগদানের জন্য পরামর্শ	৫০
২.১.১২। গভর্নর নিযুক্তির পূর্বে তাদের পরীক্ষা	৫১
২.১.১৩। স্থানীয় লোকদের গভর্নর নিযুক্ত করা	৫২
২.১.১৪। খেলাফতের নিয়োগপত্র	৫৩
২.১.১৫। খ্রিস্টানদের সহযোগিতা গ্রহণ না করা	৫৪
২.২। প্রাদেশিক গভর্নরদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য	৫৫
২.২.১। দুনিয়াবিমুখতা	৫৫
২.২.২। বিনয়	৫৬
২.২.৩। খোদাভীরুতা	৫৮
২.২.৪। সাবেক গভর্নরদের সম্মান	৫৮
২.৩। গভর্নরদের অধিকার	৫৯
২.৩.১। গোনাহমুক্ত কাজে গভর্নরদের আনুগত্য	৬০
২.৩.২। গভর্নরদের জন্য কল্যাণকামনা	৬১
২.৩.৩। গভর্নরদের নিকট সত্য সংবাদ পৌঁছানো	৬১
২.৩.৪। গভর্নরের অবস্থানের প্রতি সমর্থন দান	৬১
২.৩.৫। আমিরকে ইজতিহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান	৬২
২.৩.৬। অপসারণের পর গভর্নরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন	৬২
২.৩.৭। গভর্নরদের বৈষয়িক অধিকার	৬৩
২.৩.৮। আমলা ও গভর্নরদের অসুস্থতার সময় চিকিৎসা	৬৭
২.৪। গভর্নরদের দায়িত্ব	৬৮
২.৪.১। দীন প্রতিষ্ঠা	৬৮
২.৪.২। জনসাধারণের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা	৭৩
২.৪.৩। আল্লাহর পথে জিহাদ	৭৩
২.৪.৪। জনগণের ভাতাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে কঠোর পরিশ্রম	৭৬
২.৪.৫। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ	৭৮
২.৪.৬। যিম্মিদের নিরাপত্তা	৭৯
২.৪.৭। বিজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করা	৭৯
২.৪.৮। প্রদেশের উন্নতিতে অবদান	৮০
২.৪.৯। প্রদেশের সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রতি গুরুত্বারোপ	৮১
২.৪.১০। আরব-অনারবের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ	৮১
২.৫। দোভাষীর প্রয়োজনীয়তা এবং গভর্নরদের কর্মঘণ্টা	৮২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : গভর্নরদের পর্যবেক্ষণ উমর রা.-এর পদ্ধতি

৩.১। গভর্নরদের পর্যবেক্ষণ	৮৪
৩.১.১। মদীনায় দিনের বেলায় প্রবেশ করতে নির্দেশ	৮৫
৩.১.২। গভর্নরদের প্রতিনিধি প্রেরণ করার নির্দেশ	৮৫
৩.১.৩। চিঠি-পত্র আদান-প্রদান	৮৬

৩.১.৪। পরিদর্শক (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ)	৮৭
৩.১.৫। হজের মৌসুম	৮৭
৩.১.৬। প্রতিনিয়ত আঞ্চলিক পরিদর্শন	৮৮
৩.১.৭। আর্কাইভ বা রাষ্ট্রীয় নথিপত্র	৯০
৩.২। জনগণের পক্ষ থেকে গভর্নরদের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ	৯০
৩.২.১। সাদ রা.-এর বিরুদ্ধে কুফার লোকদের অভিযোগ	৯১
৩.২.২। মিসরের গভর্নর আমর রা.-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ	৯৫
৩.২.৩। বসরার গভর্নর মুসা রা.-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ	৯৮
৩.২.৪। সাইদ রা.-এর বিরুদ্ধে হিমসবাসীর অভিযোগ	১০০
৩.২.৫। হাসি-ঠাট্টা করায় একজন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত	১০২
৩.৩। উমর রা.-এর শাসনামলে গভর্নরদের শাস্তি প্রদান	১০৩
৩.৩.১। শাস্তি প্রদানে ভুল হলে তার প্রতিশোধ গ্রহণ	১০৩
৩.৩.২। ভুলের কারণে গভর্নরকে বরখাস্ত করা	১০৪
৩.৩.৩। গভর্নরের বাড়ির কিছু অংশ ধ্বংস করা	১০৪
৩.৩.৪। বেত্রাঘাত করে সতর্ককরণ	১০৬
৩.৩.৫। গভর্নর থেকে ছাগলের রাখাল—পদাবনতি	১০৭
৩.৩.৬। গভর্নরের কিছু সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ	১০৮
৩.৩.৭। মৌখিক ও লিখিত তিরস্কার	১০৯
৩.৪। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-এর অপসারণ	১১১
৩.৪.১। প্রথম অপসারণ	১১১
৩.৪.২। দ্বিতীয় অপসারণ	১১৮
৩.৪.৩। অপসারণের কারণসমূহের সারসংক্ষেপ এবং এর সুফল তাওহীদের সুরক্ষা	১২০

ষষ্ঠ অধ্যায়

উমর রা.-এর খেলাফতকালে ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়ে দ্বিতীয় ধাপ

১.১। ইরাক যুদ্ধের নেতৃত্বে আবু উবাইদ রহ.-এর নিয়োগ	১২৮
১.২। নামারিকের যুদ্ধ, সাকাতিয়ার যুদ্ধ, এবং বারুসমার যুদ্ধ	১৩১
১.২.১। নামারিকের যুদ্ধ (১৩ হি.)	১৩১
১.২.২। কাসকারে সাকাতিয়ার যুদ্ধ	১৩৩
১.২.৩। বারুসমার যুদ্ধ	১৩৫
১.৩। আবু উবাইদ-এর সেতু যুদ্ধ (১৩ হি.)	১৩৬
সেতুযুদ্ধ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা	১৩৯
১.৩.১। সত্য স্বপ্ন	১৩৯

১.৩.২। দুটি ভুল, যা পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে	১৩৯
১.৩.৩। শক্তিশালী নেতৃত্বের বিকল্প নেই	১৪১
১.৩.৪। আল-মুসান্না সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করেন	১৪১
১.৩.৫। আল্লাহ মুসলমানদের সাহায্য করেন	১৪২
১.৪। বুওয়াব-এর যুদ্ধ (১৩ হি.)	১৪২
১.৪.১। যুদ্ধ-পরবর্তী আলোচনা	১৪৬
১.৪.২। পশ্চাদপসরণের পথ রুদ্ধ করে দেওয়ায় দুঃখ	১৪৭
১.৪.৩। মুসান্নার সামরিক মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান	১৪৮
১.৪.৪। মহিলা মুহাজিদদের ভূমিকা	১৫০
১.৪.৫। পালিয়ে যাওয়া শত্রুদের ধাওয়া	১৫১
১.৪.৬। পারসিকদের প্রতিক্রিয়া	১৫১
১.৪.৭। মুসান্নার প্রতি উমর রা.-এর নির্দেশ	১৫৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কাদেসিয়ার যুদ্ধ ১৫৫

২.১। ইরাকের সেনাপতি হিসাবে সাদ রা.-কে নিয়োগ	১৫৭
২.১.১। সাদ রা.-এর প্রতি খলীফার উপদেশ	১৫৮
২.১.২। অন্যান্য উপদেশ	১৬০
২.১.৩। উমর রা.-এর খুতবা	১৬২
২.১.৪। ইরাকে সাদ রা.-এর উপস্থিতি এবং মুসান্নার ইত্তেকাল	১৬৩
২.১.৫। সাদ.-এর অভিযান এবং উমর রা.-এর উপদেশ	১৬৫
২.১.৬। তওবাকারী ধর্মত্যাগীদের সাহায্য নেওয়া	১৭০
২.১.৭। খলীফার পক্ষ থেকে সাদ রা.-এর প্রতি চিঠি	১৭১
২.১.৮। উমর রা.-এর দৃষ্টিতে বিজয়ের আধ্যাত্মিক মাধ্যম	১৭৩
২.১.৯। রণক্ষেত্র কাদেসিয়ার বিবরণ-সম্বলিত সাদ রা.-এর চিঠি এবং উমর রা.-এর প্রত্যুত্তর	১৭৪
২.২। পারস্যের স্রষ্টার নিকট প্রতিনিধিদল	১৭৬
২.৩। রুস্তমকে ইসলামের দাওয়াত	১৮১
২.৪। যুদ্ধের প্রস্তুতি	১৮৪
২.৪.১। আরমাস দিবস	১৯২
২.৪.২। আগওয়াস দিবস	১৯৮
২.৪.৩। ইমাস দিবস	২০৭
২.৪.৪। কাদেসিয়া দিবস	২১৩
২.৫। শিক্ষা ও ফায়দা	২২০
২.৫.১। যুদ্ধের তারিখ এবং বিজয়ের ক্ষেত্রে এর প্রভাব	২২০
২.৫.২। কাদেসিয়া যুদ্ধে বিজয়ের পর উমর রা.-এর ভাষণ	২২০
২.৫.৩। মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং ন্যায়বিচার	২২১
২.৫.৪। কাদেসিয়া যুদ্ধে যোদ্ধাদের খুমস প্রদান	২২৪
২.৫.৫। যুহরা ইবনে হাবিয়ার সম্মান পুনরুদ্ধার	২২৫

২.৫.৬। শহীদ মুজাহিদ এবং মুসলমানদের মধ্যে আযানের প্রতিযোগিতা	২২৬
২.৫.৭। যুদ্ধে ইসলামী সামরিক কৌশল	২২৬
২.৬। মাদাইন বিজয়	২৩০
২.৬.১। আল্লাহ তার নিকটতম বান্দাদের সাহায্য করেন	২৩২
২.৬.২। সাদ রা. কর্তৃক কুরআন তিলাওয়াত	২৩৩
২.৬.৩। নদীর পার হওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ	২৩৪
২.৬.৪। নদী পার হয়ে শত্রুর ওপর আক্রমণ পরিচালনা	২৩৬
২.৬.৫। মুসলিম সেনাবাহিনীর নদী অতিক্রম	২৩৭
২.৬.৬। মুসলমানদের সততার দৃষ্টান্ত	২৪০
২.৭। জালুলার যুদ্ধ	২৪৪
২.৮। রামহরমুয বিজয়	২৪৮
২.৯। তাসতার বিজয়	২৪৯
২.১০। যুন্দাইসাবুর বিজয়	২৫৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নাহাওয়ান্দ যুদ্ধ (চতুর্থ পর্যায়), ২১ হি. ২৫৭

৩.১। যুদ্ধে সেনাপতি মৃত্যুবরণ করলে তার স্থলাভিষিক্ত	২৬১
৩.১.১। যুদ্ধ শুরু করার আগেই অগ্রগামী দল প্রেরণ	২৬২
৩.১.২। শত্রুদের ধোঁকা দেওয়ার কৌশল	২৬২
৩.১.৩। আক্রমণের সময় নির্ধারণ	২৬৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : পারস্যের অভ্যন্তরে অভিযান (পঞ্চম পর্যায়)

৪.১। দ্বিতীয়বারের মতো হামাযান শহর জয় (২২ হি.)	২৬৫
৪.২। আর-রয়্যি বিজয় (২২ হি.)	২৬৭
৪.৩। কুমীস ও যুরযান বিজয় (২২ হি.)	২৬৭
৪.৪। আজারবাইযান বিজয় (২২ হি.)	২৬৭
৪.৫। আল-বাব বিজয় (২২ হি.)	২৬৮
৪.৬। তুর্কীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু	২৬৯
৪.৭। খোরাসান অভিযান (২২ হি.)	২৭০
৪.৮। ইসতাখার বিজয় (২৩ হি.)	২৭৫
৪.৯। ফাসাউদারা বায়রুদ বিজয় (২৩ হি.)	২৭৫
৪.১০। কারমান এবং সাজিস্তান বিজয় (২৩ হি.)	২৭৬
৪.১১। মুকরান বিজয় (২৩ হি.)	২৭৬
৪.১২। কুর্দীদের বিরুদ্ধে অভিযান	২৭৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়ে শিক্ষাসমূহ

৫.১। মুজাহিদদের ওপর কুরআন ও হাদীসের প্রভাব	২৭৯
৫.২। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদের বিভিন্ন ফলপ্রসূ দিক	২৮৪
৫.৩। ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়ে আল্লাহর বিধানের বাস্তব	২৮৫
৫.৩.১। উপায়-উপকরণ ব্যবহারে নিয়ম-নীতি	২৮৫
৫.৩.২। একজনের মাধ্যমে অন্যকে দমন করার নীতি	২৮৬
৫.৩.৩। বিপদ-আপদের মাধ্যমে পরীক্ষার নীতি	২৮৬
৫.৩.৪। অত্যাচারী ও অত্যাচারিতদের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি	২৮৭
৫.৩.৫। বিত্তশালীদের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি	২৮৮
৫.৩.৬। স্বেচ্ছাচারী শাসকদের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি	২৮৯
৫.৩.৭। ক্রমাগত উন্নতির নীতি	২৯০
৫.৩.৮। নিজেকে পরিবর্তন করার নীতি	২৯১
৫.৩.৯। গোনাহ ও মন্দকর্মের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি	২৯১
৫.৪। আল-আহনাফ ইবনে কাইস—ইতিহাস পরিবর্তনকারী	২৯২

সপ্তম অধ্যায়

সিরিয়া, মিসর ও লিবিয়া বিজয়

প্রথম পরিচ্ছেদ : সিরিয়া বিজয়	২৯৫
১.১। দামেস্ক বিজয়	২৯৬
১.২। ফিহলের যুদ্ধ	৩০৯
১.৩। বাইসান এবং তাবারিয়া বিজয়	৩১১
১.৪। হিমসের যুদ্ধ (১৫ হি.)	৩১২
১.৫। কিন্নাসরীনের যুদ্ধ	৩১৩
১.৬। কায়সারিয়ার যুদ্ধ (১৫ হি.)	৩১৪
১.৭। জেরুযালেম বিজয় (১৬ হি.)	৩১৫
১.৭.১। শত্রুকে ধোঁকা দেওয়া	৩১৬
১.৭.২। আত্মসমর্পণ	৩১৮
১.৭.৩। জেরুযালেম অবরোধ সম্পর্কে বিভিন্ন মত	৩১৯
১.৭.৪। চুক্তির বক্তব্য	৩২২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মিসর ও লিবিয়া বিজয়	৩৪০
২.১। মিসরে ইসলামের বিজয়	৩৪২
২.১.১। ফারমা বিজয়	৩৪২

২.১.২। বালবিস বিজয়	৩৪৫
২.১.৩। উম্মে দানিনের যুদ্ধ	৩৪৭
২.১.৪। ব্যবলিয়ন দুর্গের যুদ্ধ	৩৪৮
২.২। আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়	৩৪৯
২.৩। বারকাহ এবং ত্রিপলী বিজয়	৩৫৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মিসর বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

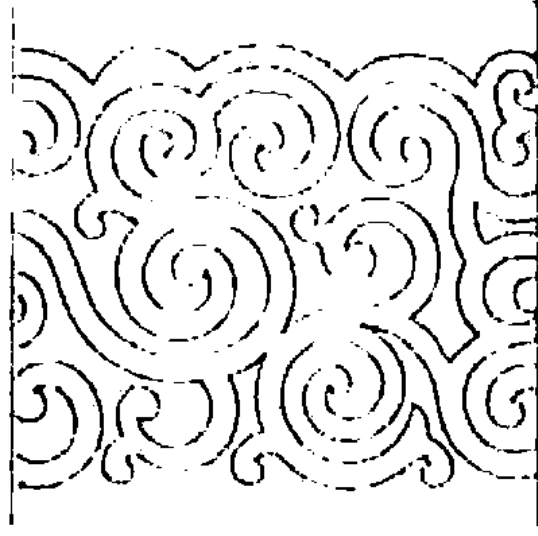
৩.১। আল-মুকাওকিসের বিরুদ্ধে অভিযান	৩৫৭
৩.২। মিসর বিজয়ে কিছু রণকৌশল	৩৬৫
৩.২.১। মনস্তাত্ত্বিক লড়াই	৩৬৫
৩.২.২। এমবুশ এবং সারপ্রাইজ এট্যাক	৩৬৫
৩.২.৩। অবরোধের সময় এমবুশ	৩৬৬
৩.২.৪। অবরোধের সময় ধৈর্যধারণ	৩৬৬
৩.৩। খলীফার নিকট বিজয়ের সংবাদ প্রেরণ	৩৬৭
৩.৪। প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে উমর রা.-এর সর্বাত্মক চেষ্টা	৩৬৯
৩.৫। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.	৩৭১
৩.৬। মিসরে খলীফার জন্য একটি বিশ্রামাগার নির্মাণ	৩৭২
৩.৭। আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি পুড়িয়ে ফেলা	৩৭২
৩.৮। আমর ইবনুল আস রা. এবং পাদরি বিন ইয়ামিন	৩৭৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বিজয় অভিযানসমূহ থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

৪.১। ইসলামী বিজয়ের প্রকৃতি	৩৭৭
৪.২। সেনাপতি নির্ধারণে উমর রা.-এর কর্মপন্থা	৩৮০
৪.২.১। ইসলামী বিধি-বিধানে অভিজ্ঞ, ধার্মিক ও নেককার	৩৮০
৪.২.২। ধীরস্থিরতা ও সতর্কতা অবলম্বন	৩৮০
৪.২.৩। সাহসী ও বীর এবং দক্ষ তিরন্দাজ	৩৮০
৪.২.৪। জ্ঞানী ও বিনয়ী হওয়া	৩৮১
৪.২.৫। সেনাপতিকে বিচক্ষণ ও বাগ্মী হতে হবে	৩৮২
৪.২.৬। দায়িত্ব পালনে আন্তরিকতা	
৪.৩। উমর রা.-এর প্রেরিত চিঠি	৩৮৩
৪.৩.১। আল্লাহর হুকুম	৩৮৩
৪.৩.২। সেনাপতিদের অধিকার	৩৮৬
৪.৩.৩। সৈন্যদের অধিকার	৩৮৯
৪.৪। সীমান্ত রক্ষায় গুরুত্বারোপ	৪০০
৪.৫। উমর রা. এবং রাজা-বাদশাদের মধ্যে সম্পর্ক	৪০৭
৪.৬। উমর রা.-এর বিজয়ের প্রভাব	৪০৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : উমর রা.-এর জীবনের শেষ দিনগুলো ৪১১

৫.১। ফেতনা ও এর ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনা	৪১২
৫.১.১। শেষ হজে উমর রা.-এর দুআ (২৩ হি.)	৪১৩
৫.১.২। উমর রা.-এর শাহাদাত কামনা	৪১৪
৫.১.৩। আউফ ইবনে মালিক আল-আশায়ির স্বপ্ন	৪১৪
৫.১.৪। আবু মূসা আশআরী রা.-এর স্বপ্ন	৪১৫
৫.১.৫। মদীনায় উমর রা.-এর শেষ খুতবা	৪১৬
৫.১.৬। ছুরিকাহত হওয়ার পূর্বে হুয়াইফাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ	৪১৬
৫.১.৭। বন্দীদের মদীনায় বসবাসের নিষেধাজ্ঞা	৪১৭
৫.২। উমর রা.-এর হত্যাকাণ্ড এবং শূরা কমিটি গঠন	৪১৮
৫.২.১। উমর রা.-এর হত্যাকাণ্ড	৪১৮
৫.২.২। পরবর্তী খলীফা নির্বাচনে অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন	৪২৩
৫.৩। পরবর্তী খলীফার প্রতি উমর রা.-এর উপদেশ	৪২৯
৫.৩.১। ধর্মীয় দিক	৪৩১
৫.৩.২। রাজনৈতিক দিক	৪৩২
৫.৩.৩। সামরিক দিক	৪৩৩
৫.৩.৪। অর্থনৈতিক দিক	৪৩৩
৫.৩.৫। সামাজিক দিক	৪৩৪
৫.৪। শেষ মুহূর্তগুলো	৪৩৬
৫.৪.১। মৃত্যু-তারিখ ও বয়স	৪৩৭
৫.৪.২। গোসল ও জানাযার নামায	৪৩৮
৫.৪.৩। জানাযার ইমাম কে ছিলেন?	৪৩৯
৫.৪.৪। দাফন	৪৩৯
৫.৪.৫। আলী রা.-এর অভিব্যক্তি	৪৪০
৫.৪.৬। উমর রা.-এর ইনতেকালে প্রভাব	৪৪১
৫.৫। গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা	৪৪২
৫.৫.১। মুসলমানদের প্রতি কাফেরদের গোপন বিদ্বেষ	৪৪২
৫.৫.২। আল্লাহর ভয়—উমর রা.-এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য	৪৪৪
৫.৫.৩। উমর রা.-এর বিন্দ্রতা	৪৪৫
৫.৫.৪। মৃত্যুসজ্জায় সং কাজে আদেশ ও অসং কাজে নিষেধ	৪৪৬
৫.৫.৫। ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে ব্যক্তির প্রশংসা	৪৪৮
৫.৫.৬। হত্যাকাণ্ডে কাব রা.-এর ভূমিকার আসল ঘটনা	৪৪৯
৫.৫.৭। সাহাবী ও তাবেয়ীদের প্রশংসাবাদী	৪৫৪
৫.৫.৮। সমসাময়িক পণ্ডিত ও লেখকদের মন্তব্য	৪৫৮
৫.৫.৯। উমর রা. সম্পর্কে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মন্তব্য	৪৬১



পঞ্চম অধ্যায়



গভর্নরদের পরিচালনায় উমর রা.-এর কর্মপদ্ধতি

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। এ জন্য সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা ও এর সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি পুরো রাষ্ট্রকে প্রশাসনিকভাবে কয়েকটি বড় প্রদেশে বিভক্ত করেন। নতুন নতুন বিজিত অঞ্চল রাষ্ট্রের অবকাঠামোতে যুক্ত হওয়াতে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতি সাধন করেন। ফলে প্রাদেশিক গভর্নরদের অবকাঠামোও নতুন রূপ লাভ করে।



প্রথম পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রের প্রদেশসমূহ

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন প্রদেশকে বিভক্ত করার বিষয়টি ছিল মূলত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে বিভক্ত ও বণ্টিত প্রদেশসমূহের মধ্যে কয়েক অঞ্চলের সম্প্রসারণ। পাশাপাশি তিনি অধিকাংশ সময় সেসব প্রদেশের সর্বোচ্চ পদে সমাসীন ব্যক্তিদের মধ্যে রদবদলও করেন। এ অধ্যায়ে আমরা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগের প্রদেশসমূহ ও তার গভর্নরদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করব।

১.১। মক্কা

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের অধীনে মক্কার প্রথম গভর্নর ছিলেন মুহরিয ইবনে হারিসা ইবনে রাবিয়া ইবনে আবদে শামস রাযিয়াল্লাহু আনহু। তারই খেলাফতকালে মক্কার পরবর্তী গভর্নর নিযুক্ত হন কুনফুজ ইবনে উমাইর ইবনে জুদআন তামিমী রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি তার পূর্ববর্তী গভর্নরদের মতোই ছিলেন।

মুহরিয ইবনে হারিসা ও কুনফুজ ইবনে উমাইরের মক্কার গভর্নর থাকাকালীন অবস্থা সম্পর্কে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। এবং এ-ব্যাপারেও কোনো তথ্য পাওয়া যায় না যে এ পদে তারা কতদিন বহাল ছিলেন। অতঃপর নাফে ইবনে হারিস আলখুজায়ী রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে মক্কার গভর্নর নিযুক্ত হন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ পদে নিয়োজিত ছিলেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলিতে তার গভর্নর থাকাকালে সংঘটিত দু-একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন : তারই সময়কালে জেলখানা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু

সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িটি ক্রয় করে নিয়েছিলেন।^১

তার সময়কার আরেকটি ঘটনা। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন, তখন উসফান নামক স্থানে নাফে রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘মক্কায় কাকে তোমার নায়েব নিযুক্ত করে এসেছ?’ নাফে রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘ইবনে আবযাকে।’ তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কে এই ইবনে আবযা?’ নাফে রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমাদেরই একজন ক্রীতদাসের নাম ইবনে আবযা।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘মক্কাবাসীদের জন্য একজন ক্রীতদাসকে হাকিম নিযুক্ত করেছ?’ নাফে রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, ‘ইবনে আবযা একজন হাফিয়ুল কুরআন এবং আমিল। তা ছাড়া তিনি ফারায়েয বিষয়ে বেশ অভিজ্ঞ।’ তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

শোনো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ

নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা এই কিতাব-এর মাধ্যমে বহু সম্প্রদায়কে মর্যাদাশালী বানিয়েছেন। আবার বহু সম্প্রদায়কে করেছেন অপদস্থ।^২

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে মক্কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো হারাম শরিফ সম্প্রসারণ করা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি কাবার চারপাশের বাড়িগুলো ক্রয় করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেন। তারপর সেগুলো হারাম শরিফে অন্তর্ভুক্ত করে চারদিক থেকে সামান্য উঁচু দেয়াল নির্মাণ করে দেন। হজের মৌসুমে মক্কা মুকাররমায় বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রদেশ থেকে আগত গভর্নর ও আমিরগণ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এক জায়গায় সমবেত হতেন। এভাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ হিসাবে মক্কা মুকাররমা বিশাল ভূমিকা রাখে।

^১ সহীহ বুখারী (৩/২৫); মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২৩২; আলমাওসুআতুল হাদিসিয়াহ। এ হাদিসের সনদ সহীস। আর সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েতে ঘটনাটি এভাবেই বর্ণিত আছে।

^২ আল-বিলায়াতু আলল বুলদান, আবদুল আযিয আল-উমারী, (১/৬৭)।

১.২। মদীনা

ইসলামী রাষ্ট্রের যিনি খলিফা মনোনীত হতেন, তিনি মদীনার গভর্নরের দায়িত্বও পালন করতেন। কেননা, খলিফা মদীনাতেই অবস্থান করতেন। তিনিই এখানকার সার্বিক ব্যবস্থাপনা দেখভাল করতেন। প্রয়োজনমত দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন। খলিফা থাকাকালে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন মদীনায় উপস্থিত না থাকতেন, উপযুক্ত কাউকে তার নায়েব নিযুক্ত করে যেতেন। নবনিযুক্ত নায়েবই মদীনার বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতি দেখাশোনা করতেন। হজ কিংবা অন্যান্য সফরে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনার ভারপ্রাপ্ত হাকিম নিযুক্ত করতেন।^৭ এমনভাবে কখনো তিনি তার অনুপস্থিতিতে আলি ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনায় নিজের নায়েব নিযুক্ত করে যেতেন।^৮

এভাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় তার অনুপস্থিতিতে অন্যদের নায়েব নিযুক্ত করার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আদর্শের অনুকরণ করেছেন। সেকালে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কারণে অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে মদীনার এক বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থান ছিল। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হলো, মদীনা ছিল খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাসস্থান। বিভিন্ন ইসলামী অঞ্চলের বিধিবিধান এখান থেকে জারি করা হতো এবং এখান থেকেই ইসলামের মুজাহিদদের কাফেলা রওনা হতো। অধিকন্তু মদীনা ছিল বহু প্রবীণ ও বিখ্যাত সাহাবীর বাসস্থান, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যাদের অন্যত্র নিবাস গ্রহণ করতে নিষেধ করতেন।^৯ আর এই কারণেই বড় বড় সাহাবীদের থেকে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর ইলম অর্জন করতে তালিবানে ইলমে নবুওয়াতের কাফেলা মদীনায় আসতে একপ্রকার বাধ্য হতো।^{১০}

^৭ আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/৬৮।

^৮ তারিখ আল-ইয়াকুবি, ২/১৪৭।

^৯ প্রাগুক্ত, ২/১৫৭।

^{১০} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/৬৮।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তায়েফ গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী শহর হিসাবে গণ্য হতো। এখান থেকে জিহাদী কর্মকাণ্ডে শক্তিশালী মুজাহিদদের প্রেরণ করা হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে উসমান ইবনে আবুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু এখানকার ওয়ালি (গভর্নর) ছিলেন। আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু তার খেলাফতকালে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে একই পদে বহাল রাখেন। উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালেও তিনি দুই বছর পর্যন্ত এখানকার গভর্নর ছিলেন। কিন্তু সব সময় তার অন্তর জিহাদের জজবায় ব্যাকুল থাকত। এ-সময় তিনি জিহাদে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চেয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পত্র লিখলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এই পদ থেকে আমি আপনাকে অব্যাহতি দিতে পারি না। তাই আপনি তায়েফবাসীদের মধ্য থেকে আপনার পছন্দসই একজনকে নায়েব বা সহকারী নিযুক্ত করুন। পরবর্তী সময়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু উসমান ইবনে আবুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আশ্মান ও বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন।^৭

ঐতিহাসিক বর্ণনায় এই তথ্য পাওয়া যায় যে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন ইনতিকাল করেন, তখন তায়েফের গভর্নর ছিলেন সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ সাকাফি রাযিয়াল্লাহু আনহু।^৮ এ-সময় তার ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাঝে মধু, ফল, সবজি ইত্যাদির যাকাত আদায়প্রসঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা চলছিল।^৯ আর এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তায়েফ ছিল কৃষিকাজে সমৃদ্ধ ও উর্বর শহর। তার খেলাফতের সময়ে তায়েফ এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকজন বেশ সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করত। মক্কার লোকেরা গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য তায়েফের সুন্দর মনোরোম পরিবেশে আসত।^{১০} এভাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তায়েফ হয়ে ওঠে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী শহর।^{১১}

^৭ তারিখু খালিফাতি ইবনি খাইয়াত, ১৩৪।

^৮ তারিখ আত-তাবারি, ৫/২৩৯।

^৯ নাদিয়া হুসাইন সাকারকৃত আততায়িফ ফিল আসরিল জাহিলি ওয়াসাদরিল ইসলাম, ১৯।

^{১০} নাদিয়া হুসাইন সাকারকৃত আততায়িফ ফিল আসরিল জাহিলি ওয়াসাদরিল ইসলাম, ১৯।

^{১১} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১:৬৯।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হন, তখন ইয়ামান অত্যন্ত নিরাপদ ও স্থিতিশীল অবস্থায় ছিল। ইয়ামান ও তার আশপাশ এলাকার আমির, অফিসার ও দায়িত্বশীলদের উন্নত নৈতিকতার কারণে সেখানকার সার্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থাপনা বেশ ভালো ছিল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার খেলাফতকালে ইয়ামানেও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজ নিজ পদে বহাল রাখেন।^{১২}

ইয়ালা ইবনে উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিয়োগকৃত ইয়ামানের গভর্নর। তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালেও ইয়ামানের গভর্নর ছিলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে তিনি ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছিলেন। ইতিহাসবিদরা লেখেন, ইয়ালা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সুনাম-সুখ্যাতির কারণে লোকজনের মাঝে এমনও ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে ইয়ামানের গভর্নরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির পর তিনিই হবেন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নায়েব। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইনতিকাল পর্যন্ত বিষয়টি মানুষের মাঝে এভাবেই চর্চিত হয়ে আসছিল।^{১৩}

ঐতিহাসিকসূত্রে ইয়ামানের গভর্নর ইয়ালা ইবনে উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এমন কিছু ঘটনা পাওয়া যায়, যার দ্বারা প্রতীয়মান হয়, কোনো কোনো ইয়ামানির সঙ্গে কিছু বিষয়ে তার মতানৈক্যও ছিল। এমনকি কিছু কিছু বিষয়ে কোনো কোনো ইয়ামানি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট হাজির হতো। তাদের দায়েরকৃত অভিযোগ যাচাই-বাছাই এবং বিবাদ মীমাংসার জন্য উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কয়েকবারই ইয়ালা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনায তলব করেন। ফলে তাকে বাধ্য হয়ে মদীনায আসতে হতো।^{১৪}

^{১২} ইয়াহয়া আলহুসাইনকৃত গায়াতুল আমানি ফি আখবারিল কাতরিল ইয়ামানি, ১:৮৩

^{১৩} তারিখ আত-তাবারি, ২/১৫৭।

^{১৪} গায়াতুল আমানি, ১/৮৩।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়ালা রাযিয়াল্লাহু আনহুর অনুপস্থিতিতে কখনো কখনো অন্যকাউকে তার নায়েব নিযুক্ত করতেন। যাকাতসংক্রান্ত কিছু বিষয়ে ইয়ালা রাযিয়াল্লাহু আনহু ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাঝে চিঠিপত্রের মাধ্যমে মতোবিনিময়ও হয়েছিল।^{১৫}

ইয়ালা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি সেসব গভর্নরের একজন, যাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বাভাবিক আয়-রোজগারের চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের শেষ দিনগুলোতে লোকজনের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন।^{১৬}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালীন ইয়ামানের গভর্নরদের নামের তালিকায় আবদুল্লাহ ইবনে রাবিয়া মাখযুমি রাযিয়াল্লাহু আনহুকেও পাওয়া যায়। তবে সম্ভবত তিনি ইয়ামানের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের হাকিম ছিলেন। সেই অঞ্চলটির নাম জুনদ। ইমাম তাবারি উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগের শেষ সময়কার গভর্নরদের নাম উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি ইয়ালা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামানের গভর্নর লিখেছেন। সেখানে তিনি এ কথাও স্পষ্ট করেছেন যে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ ইবনে রাবিয়া মাখযুমি রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামানের জুনদ অঞ্চলের হাকিম নিযুক্ত হয়েছিলেন।^{১৭}

উমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে ইসলামী বিজয়সমূহে ইয়ামানের অধিবাসীদের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তারা শাম, ইরাক ও মিসর বিজয়ের ক্ষেত্রে বরাবর অংশগ্রহণ করেন।^{১৮} এবং তারপর যখন ইরাকের বিভিন্ন এলাকা বাসযোগ্য করে কুফা ও বসরার মতো নতুন নতুন শহরের গোড়াপত্তন করা হয়, তখন বহু ইয়ামানি কবিলা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কবিলার নাম ছিল কিনদা। তারা ব্যাপকভাবে কুফায় নিবাস স্থাপন করেছিল।^{১৯} এমনভাবে বহু ইয়ামানি কবিলা শামে বসবাস শুরু

^{১৫} কাসেম ইবনে সালামকৃত আলআমওয়াল, ৪৩৬।

^{১৬} তারিখ আল-ইয়াকুবি, ৯/৮৩।

^{১৭} তারিখ আত-তাবারি, ৫/২৩৯।

^{১৮} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/৭১।

^{১৯} ড. ইসামুদ্দীনকৃত আলইয়ামান ফি যিলগিল ইসলাম, ৪৯।

করে। তা ছাড়া শাম বিজয়ে তাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। যখন মিসরের রাজধানী ফুসতাত আবাদ করার হয়, তখনো সেখানে কিছু ইয়ামানি কবিলা স্থানান্তরিত হয়ে যায়।

মোটকথা, উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে হিজরতের জন্য কিছু কিছু ইয়ামানি কবিলার তালিকা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। কোন শহরে কোন কবিলা যাবে, তার তালিকা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে ইয়ামানের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এভাবেই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে ইয়ামান হয়ে উঠতে পেরেছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী প্রদেশ। এবং দেশীয় রাজনীতিতে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় ইয়ামানের প্রভাব এবং রাজনৈতিকভাবে এখানকার সরকারি কর্মকর্তাদের অবদান বেশ গুরুত্বের দাবি রাখে।

১.৫। বাহরাইন

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিয়োগকৃত বাহরাইনের গভর্নর ছিলেন আলা ইবনে হাযরামি রাযিয়াল্লাহু আনহু। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের প্রথম দিনগুলোতে আলা ইবনে হাযরামি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে স্বপদে বহাল রাখেন। আর গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী, এর সময়কাল ছিল ১৪ হিজরি পর্যন্ত।^{২০}

আলা ইবনে হাযরামি রাযিয়াল্লাহু আনহু পারস্যের বিভিন্ন এলাকায় সংঘটিত প্রাথমিক যুদ্ধগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। সেসব যুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। আলা ইবনে হাযরামির গভর্নর থাকার শেষদিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বাহরাইন থেকে অপসারণ করে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেন। আলা ইবনে হাযরামি রাযিয়াল্লাহু আনহু পরিবর্তনের বিষয়টি খুব অপছন্দ করেছিলেন। কিন্তু বসরায় পৌঁছার পূর্বেই তার ইনতিকাল হয়ে যায়। বাহরাইনেই তাকে দাফন করা হয়। বাহরাইন থেকে তার অপসারণের কারণ হিসাবে বলা হয়, তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অবগতি ও অনুমতি ছাড়াই নৌপথে পারস্যের ওপর

^{২০} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/৭৫।

আক্রমণ করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম সেনাদের নৌপথে সমুদ্র অতিক্রম করার ব্যাপারটি একদম পছন্দ করতেন না।

আলা ইবনে হাযরামি রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইনতিকালের পর বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত হন উসমান ইবনে আবুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বাহরাইনের পার্শ্ববর্তী পারস্যের বিভিন্ন এলাকায় দফায় দফায় হামলা করেন। ধীরে ধীরে তার বিজিত এলাকা সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে আদেশ করেছিলেন বিজয় ও সামরিক কর্মকাণ্ডে বসরার গভর্নর আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাহায্য গ্রহণ করবে। তার পর থেকে বসরার পথ ধরে পারস্যের বিভিন্ন রণাঙ্গনে উভয় প্রদেশের সেনাবাহিনী পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আক্রমণ অব্যাহত রাখেন।^{২১}

উসমান ইবনে আবুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অত্যন্ত আল্লাহওয়ালা, উত্তম ও সুন্দর স্বভাবের অধিকারী। তিনি সব সময় হারাম কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকতেন।^{২২} উসমান ইবনে আবুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে ভিন্ন দুই সময়ে দুইবার বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রথমবার ১৫ হিজরি-সনে তাকে গভর্নর বানানো হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বসরার কিছু এলাকায় ইসলামী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব এবং বিজয়ের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য তার প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাই বাহরাইন থেকে তাকে ডেকে পাঠানো হয়। বাহরাইনের পরবর্তী গভর্নর নিযুক্ত করা হয় আইয়াশ ইবনে আবু সাওর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে।^{২৩} আইয়াশ রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামল ছিল খুবই কম সময়ের জন্য। তার পর কুদামা ইবনে মাযউন রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। কুদামা রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে থাকতেন। ইতিপূর্বে তিনি বাহরাইনের বিচারপতি ছিলেন। প্রাদেশিক অন্যান্য দায়িত্বও তার কাঁধে ছিল। তিনি যতদিন বাহরাইনের গভর্নর ছিলেন, মানুষ তার খুব প্রশংসা করেছে। কিন্তু গভর্নর থাকার শেষ দিনগুলোতে তার প্রতি এই অপবাদ আরোপ করা হয় যে তিনি মদ পান করেন। যাচাই-

^{২১} আল-বিলায়াতু আল্লাল বুলদান, ১/৭৩।

^{২২} সিয়রু আলামিন নুবালা, ২/৩৭৪।

^{২৩} আল-বিলায়াতু আল্লাল বুলদান, ১/৭৩।

বাছাইয়ের পর অপবাদের বিষয়টা সত্য প্রমাণিত হয়। ফলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ওপর মদ্যপানের শরয়ি দণ্ডবিধি হদ প্রয়োগ করেন। কুদামা ইবনে মাযউন রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সন্তান আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উম্মুল মুমিনীন হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহার মামা।^{২৪}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই সংশোধনমূলক আচরণে কুদামা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু আমীরুল মুমিনীন তাকে বুঝাবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করতে থাকেন। তিনি তাকে বলেছিলেন, ‘দেখো, আমি স্বপ্নে দেখলাম এক ব্যক্তি এসে আমাকে বলল, ‘কুদামাকে সংশোধন করে নাও। সে তোমার ভাই।’^{২৫} এক বর্ণনা অনুযায়ী কুদামা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ২০ হিজরি-সনে বাহরাইনের গভর্নর পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়।^{২৬}

কুদামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর পর বাহরাইনের গভর্নরের দায়িত্ব আসে বিখ্যাত সাহাবী আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে। বিগত কুদামা ইবনে মাযউন রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামল থেকে আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রাদেশিক বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তিনি ছিলেন সেসব সাক্ষীর একজন, যারা মদ্যপানের ব্যাপারে কুদামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। মোটকথা, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কুদামা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বরখাস্ত করার পর আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত করেন।^{২৭}

তারপর আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুর পর উসমান ইবনে আবুল আস সাকাফি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পুনরায় বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইনতিকাল পর্যন্ত তিনি সেখানকার গভর্নর ছিলেন।^{২৮} বহু ঐতিহাসিক বর্ণনায় আম্মানকে বাহরাইন প্রদেশের একটি অঞ্চল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে কিছু কিছু বর্ণনায় যেখানে

^{২৪} আত-তাবাকাত, ৫/৫৬০; তারিখ আল-মাদিনা, ৩/৮৪৩; আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/৭৩।

^{২৫} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/৭৪।

^{২৬} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৭/১০১।

^{২৭} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/৭৫।

^{২৮} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/৭৫।

উসমান ইবনে আবুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে গভর্নর হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে এ কথাও বলা হয়েছে যে তিনি বাহরাইন ও ইয়ামামার গভর্নর ছিলেন।^{২৯}

শেষোক্ত উভয় বর্ণনা দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে বাহরাইনের সঙ্গে আম্মান ও ইয়ামামার একরকম গভীর সম্পর্ক ছিল। আর এটাও সম্ভব যে উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে এই এলাকা দুটি বাহরাইনের অংশ হিসাবেই গণ্য হতো। আর এ কথাও বিস্মৃত হলে চলবে না যে ভৌগোলিক বিবেচনায় এবং মানুষের অত্যধিক যাতায়াতের কারণে আম্মান ও ইয়ামামার সঙ্গে বাহরাইনের গড়ে উঠেছিল নিবিড় সম্পর্ক।

এ ছাড়াও বহু ইতিহাসবিদ বরাবরই ‘বাহরাইন ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল’ এমনভাবে ‘বাহরাইনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অঞ্চল’ বলে সম্ভবত আম্মান ও ইয়ামামার কথা বোঝাতেন। বাহরাইন ছিল জিযিয়া ও খারাজ আদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এর দ্বারা বোঝা যায় সেকালে বাহরাইন ছিল সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী প্রদেশ। বাহরাইনের বহু মুসলিম কবিলা এবং সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকজন পারস্য এবং প্রাচ্যদেশীয় বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। সেসব জায়গার বিজয়সমূহে তাদের বেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল।^{৩০}

১.৬। মিসর

আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু মিসর বিজয় করেন (ইনশাআল্লাহ, মিসরবিজয়ের বিস্তারিত আলোচনা ‘বিজয় অভিযান’ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হবে)। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তার পরেও তিনি কিছু কিছু বিষয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। যার ফলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সাথে সংশোধনী আচরণ করেন। এর বাইরে তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের পুরো সময়ব্যাপী মিসরের গভর্নর ছিলেন। আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন মিসরের গভর্নর জেনারেল। তার

^{২৯} তারিখ আত-তাবারি, ৫/২৩৯।

^{৩০} আল-বিলায়াতু আল্লাল বুদদান, ১/৭৬।

অধীনে মিসরের ছোট ছোট বিভিন্ন এলাকায় স্বতন্ত্র আমীর ও ওয়ালি (গভর্নর) নিযুক্ত ছিলেন। যেমন : আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু আসরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলা হয়, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইনতিকালের সময় তিনি মিসরের ‘সায়িদ’ এলাকার নির্ধারিত ওয়ালি বা গভর্নর ছিলেন।^{৩১}

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর মিসরের গভর্নর থাকাকালে অধিকাংশ সময় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিভিন্ন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন।^{৩২}

আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু গভর্নর থাকাকালে খারাজ ও জিযিয়ার ব্যাপারে কিবতিদের যোগ্যতা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে উপকৃত হতেন। এভাবে তাকে নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছিল।^{৩৩} তার ব্যাপারে এ কথা প্রসিদ্ধ ছিল যে তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আদেশে সৈনিকদের চাষাবাদ ও কৃষিকাজে ব্যস্ত হতে এবং এর দ্বারা সরাসরি উপকৃত হতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। আর যারা এই আদেশের বিরোধিতা করত, তাদের শাস্তি প্রদান করতেন।^{৩৪}

এই নিষেধাজ্ঞার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো মুসলিম সৈনিকদের সব সময় কঠিন পরিশ্রমধর্মী কাজের জন্য প্রস্তুত থাকতে হতো, যাতে তারা অলস ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে না পড়ে এবং শুধু কৃষি ও চাষাবাদ নিয়েই ব্যস্ত না থাকে। আর এ জন্যই তাদের সরকারি কোষাগার থেকে পর্যাপ্ত বেতন-ভাতা দেওয়া হতো। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিয়মিত তদারকি ও নজরদারির কারণে আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু কয়েক বছরের মধ্যে প্রদেশ ও তার যাবতীয় বিষয় সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে মিসর উন্নীত হতে পেরেছিল মুসলিম জাহানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে। রাজ্যের সর্বত্র নিরাপত্তা ও শান্তি বিরাজ করার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়। তা সত্ত্বেও চারদিক থেকে রোমানদের প্রতিশোধমূলক আক্রমণের আশঙ্কা তাকে অস্থির করে

^{৩১} ফুতুহু মিসর, ১৭৩।

^{৩২} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/৭৯।

^{৩৩} ফুতুহু মিসর ওয়া আখবারিহা, ১৫২।

^{৩৪} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/৮২।

তুলেছিল। তারা বারবার নৌপথে আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করে পুনরায় মিসরে আধিপত্য বিস্তার করতে চাচ্ছিল।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে ইসলামের প্রচার-প্রসারে এই অঞ্চলটি বেশ উর্বর এবং অনুকূল প্রমাণিত হয়েছিল। কেননা, এখানকার অধিবাসীরা ন্যায় ও ইনসাফ, দয়া ও অনুগ্রহের এমন বাণী ও আচরণের মুখোমুখি হয়, যা তারা কখনোই দেখেনি। তাই তারা ইসলামের সত্যতা এবং তার সহজ ও স্পষ্ট শিক্ষায় আশ্বস্ত হতে পেরেছিল। ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে নিয়মতান্ত্রিক মুসলিম সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। মিসরে সরকারি এবং বিভিন্ন অফিসিয়াল কার্যক্রম অত্যন্ত সহজ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হতো। আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন মিসরে গভর্নর জেনারেল। তিনিই খারাজ গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন। যদিও তিনি ছিলেন গভর্নর জেনারেল এবং প্রাদেশিক কর্মকাণ্ডের প্রধান নির্বাহী; তারপরেও তিনি মিসরের বিভিন্ন এলাকায় অধীন গভর্নর ও কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছিলেন। প্রাদেশিক কর্মকাণ্ডে তিনি তাদের থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করতেন। তবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামনে একটি বিশাল প্রদেশের গভর্নর জেনারেল ও প্রধান নির্বাহী হিসাবে সকল বিষয়ে আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকেই জবাবদিহি করতে হতো। খারাজসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয়ে তিনি রাজ্যের দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকদের কাজে লাগাতেন।^{৩৫}

১.৭। শাম ও তার রাজ্যসমূহ

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইনতিকালের সময় ইসলামী ফৌজের শামদেশীয় শাখার প্রধান এবং রাজ্যের সার্বিক শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল ছিলেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন খেলাফতের দায়িত্ব বুঝে নিলেন, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তখন শামের গভর্নরের দায়িত্ব ও পদ থেকে বরখাস্ত করলেন। তদস্থলে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়োগ প্রদান করলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে সেখানকার গভর্নর জেনারেল ও প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব অর্পণ করলেন।^{৩৬}

^{৩৫} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/৮৩।

^{৩৬} তাহযিব তারিখ দিমাশক, ১/২৫২।

আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু সেখানকার সমস্ত ব্যবস্থাপনা একদম নতুনভাবে সজ্জিত করতে শুরু করলেন। শামের নতুন এলাকাগুলোতে তিনি নতুন প্রশাসক নিয়োগদানের মতো সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তবে কিছু কিছু এলাকায় পূর্বের গভর্নরদের স্বপদে বহাল রাখলেন। আবার কিছু এলাকার গভর্নরদের তাদের দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করলেন।

ইতিহাসবিদ খলিফা ইবনে খাইয়াত লেখেন, বিস্তীর্ণ শামের সম্পূর্ণ এলাকা যখন ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে চলে এল, তখন আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার গভর্নর থাকাকালীন ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ফিলিস্তিন ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। শুরাহবিল ইবনে হাসানা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিযুক্ত করলেন জর্ডানের প্রশাসক। দামেশকের প্রশাসক নিযুক্ত করলেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। হিমসে নিযুক্ত করলেন হাবিব ইবনে মাসলাম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। পরবর্তী কিছুদিনের মধ্যেই শেষোক্ত ব্যক্তিকে বরখাস্ত করে তদস্থলে আবদুল্লাহ ইবন কুরত সুমালি^{৩৭} রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। এমনভাবে তিনি উবাদাহ ইবনে সামেত রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সহকারী গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। তবে কিছুদিন পরেই তিনি তাকে বরখাস্ত করে তার জায়গায় আবদুল্লাহ ইবনে কুরত রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়োগ দেন।

কখনো কখনো তিনি তার সহযোগীদের নির্ধারিত সময়ের জন্য শামের বিভিন্ন অঞ্চলের হাকিম নিযুক্ত করতেন। যেমন : মুয়ায ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জর্ডানের জন্য এ-ধরনের হাকিম নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন।^{৩৮} এমনভাবে তিনি যখন কোনো জিহাদ অভিযানে বের হতেন, কাউকে নায়েব বানিয়ে যেতেন। যেমন : বায়তুল মুকাদ্দাস যাওয়ার সময় তিনি সাযিদ ইবনে যাইদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দামেশকে নিজের নায়েব নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন।^{৩৯}

^{৩৭} আবদুল্লাহ ইবন কুরত সুমালি আজদি একজন সাহাবী ছিলেন। রাযিয়াল্লাহু আনহু। তার থেকে হাদিসও বর্ণিত হয়েছে। শাম বিজয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

^{৩৮} ফুতুহুশ শাম, ২৪৮।

^{৩৯} ইবনু আসাম কুফিকৃত আলফুতুহ, ২৮৯; আল-বিলায়াতু আল্লাল বুলদান, ১/৯০।

আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু যতদিন পর্যন্ত শামের গভর্নর ছিলেন, ততদিন তিনি তার অধীন আমির, দায়িত্বশীল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সাধারণ জনগণের মাঝে নেককার ও দয়ালু মানুষের প্রতিচ্ছবি হয়েই ছিলেন। আমওয়্যাসের প্লেগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইনতিকাল করেন। তার পর মুয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহু এখানকার গভর্নর নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তিনিও ইনতিকাল করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন আবু উবাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং মুয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইনতিকালের সংবাদ শুনলেন, তখন ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শামের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেন। আরও কয়েকজনকে প্রাদেশিক দায়িত্ব দিয়ে শামের বিভিন্ন এলাকায় পাঠান। তাদের ওপর নির্ধারিত এলাকার সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। ইয়াযিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সেনাবাহিনী পরিচালনা ও তাদের নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিলেন। কারণ, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু শামের যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, তার একটির নেতৃত্ব তিনি দিয়েছিলেন। এমনভাবে আবু উবাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু জিহাদ-অভিযানে বের হওয়ার সময় কয়েকবারই ইয়াযিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নায়েব নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন।^{৪০}

ইতিহাসবিদগণ লেখেন, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন ইয়াযিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শামের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেন, তখন অন্যান্য আমির ও জেনারেলদের তার অধীনে সেখানকার বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেন। তবে ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ফিলিস্তিন ও জর্ডানের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারণ করে দেন।^{৪১}

যেহেতু শামদেশে ইয়াযিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনকাল খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ছিল, তাই ইতিহাসের উৎসগ্রন্থসমূহে তার ব্যাপারে তেমন তথ্য পাওয়া যায় না। ১৮ হিজরি-সনে ইয়াযিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের কিছুদিন পূর্বে তিনি তার ভাই মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে গভর্নরের দায়িত্ব পালনের জন্য

^{৪০} ফুতুহুল বুলদান, ১৩৭।

^{৪১} ফুতুহুল বুলদান, ১৪৫, ১৪৬।

নায়েব নিযুক্ত নির্ধারণ করে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বিষয়টি অবগত করেছিলেন। ইয়াযিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনকাল ছিল এক বছরের মতো।^{৪২}

মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর গভর্নর নিযুক্তির বিষয়টি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু গ্রহণ করলেন। পাশাপাশি তিনি সরকারি কর্মকর্তাদের মাঝে কিছু রদবদল আনলেন। যেমন : মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দামেশকের মুসলিম সেনাবাহিনী এবং সেখানকার খারাজ আদায়সংক্রান্ত পূর্ণ দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত করা হয়। নামাযের ইমামত এবং বিচারিক দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তদস্থলে দুই জন নির্বাচিত আলেম সাহাবীকে সেখানে পাঠানো হয়।^{৪৩}

এখানে গুরুত্বপূর্ণ রদবদল হলো, মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষমতা ও স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করা। ইতিপূর্বে নামাযের ইমামতি তিনিই করতেন, যিনি প্রদেশের ওয়ালি বা আমির নিযুক্ত হতেন। এখন সেটা অন্যের দায়িত্বে চলে গেল। সম্ভবত এখানে এমন কোনো কারণ পরিলক্ষিত হয়েছে, যার কারণে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এই নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। তারপর এই একই পদ্ধতি অন্যান্য প্রদেশেও কার্যকর করা হয়। মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুও এই পদ্ধতি অনুসারে কাজ করে যান (অধীন গভর্নরদের নামাযের ইমামতি ও বিচারিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন)। মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর উদরতা ও দানশীলতার বেশ প্রসিদ্ধি ছিল। যার কারণে ইরাক প্রভৃতি অঞ্চলের বহু লোক এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।^{৪৪}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কোনো কোনো দায়িত্বশীলকে শামের বিভিন্ন এলাকার জন্য নিযুক্ত করে পাঠান এবং তাদের মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর অধীন করে দেন। মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু গভর্নর থাকাকালে কখনো কখনো শামের উত্তরাঞ্চলে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। এগুলোকে ‘খ্রীষ্টকালীন যুদ্ধাভিযান’ বলা হতো।^{৪৫}

^{৪২} আল-ওয়াসাইকুস সিয়াসাতি দিল আসরিন নাববি ওয়াল খিলাফাতির রাশিদাহ, ৪৯৩।

^{৪৩} আল-বিলায়াতু আলল বুলদান, ১/৯২।

^{৪৪} তারিখ আত-তাবারি, ৫/২৩৯।

^{৪৫} আল-বিলায়াতু আলল বুলদান, ১/৯২।

মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইনতিকাল পর্যন্ত শামের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে আনজাম দেন। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য এলাকার সঙ্গেও তিনি সম্পর্ক বজায় রাখতেন। অন্যান্য গভর্নর এবং মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাঝে পার্থক্য হলো তিনি সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কারণ, তিনি একই সাথে বালকা, জর্ডান, ফিলিস্তিন, আনতাকিয়া, কালকিলিয়া, মাআররাহ আল-মাসাররিনসহ শামের অন্যান্য শহরের গভর্নর ছিলেন।^{৪৬}

কোনো কোনো ইতিহাসবিদ মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এককভাবে সমগ্র শামের গভর্নর হিসাবে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে কোনো কোনো ইতিহাসবিদ এ ব্যাপারে শর্ত যুক্ত করে থাকেন। যেখানেই তারা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গভর্নরদের নামের তালিকা উল্লেখ করেন, সেখানে তারা লেখেন, ‘মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু শামের কিছু এলাকার গভর্নর ছিলেন।’ তবে কোনো কোনো ইতিহাসবিদ মনে করেন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইনতিকালের পূর্বে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে গোটা শামের গভর্নর নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন।^{৪৭}

যা-ই হোক, এ কথা মনে রাখা দরকার যে সেকালে রাষ্ট্রের পরিবেশ-পরিস্থিতি বিশেষভাবে সৈনিকদের অবস্থাদির প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন প্রদেশের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও রদবদল হতে থাকত। এ জন্য জর্ডান কখনো কখনো স্বতন্ত্র প্রদেশের রূপ পরিগ্রহ করত। আবার কখনো তার সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশও অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হতো। কখনো এমনও হতো যে কিছু কিছু এলাকা জর্ডান থেকে বের করে শাম বা ফিলিস্তিনের অন্তর্ভুক্ত করা হতো। এ ছাড়াও বহু উদাহরণ দেওয়া যাবে। এখানে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া উদ্দেশ্য নয়।

১.৮। ইরাক ও পারস্যের রাজ্যসমূহ

ইরাক বিজয়ের ধারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলেই শুরু হয়েছিল। প্রথম দিকে মুসান্না ইবনে হারিসা শাইবানি রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ইরাকের গভর্নর। কিন্তু যখন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু

^{৪৬} আল-বিলায়াতু আল্লাল বুলদান, ১/৯৩।

^{৪৭} তারিখু খালিফাতিবনি খাইয়াত, ১৫৫; সিয়াকু আলামিন নুবালা, ৪/৮৮।

আনহু ইরাক পৌঁছলেন, তখন সেখানকার প্রশাসনিক সকল দায়িত্ব তার হাতে তুলে দেওয়া হলো। তারপর যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেখান থেকে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার বাহিনী নিয়ে শামদেশের উদ্দেশে যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন, তখন মুসান্না ইবনে হারিসা শাইবানি রাযিয়াল্লাহু আনহু পুনরায় ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত হলেন।

তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকাল শুরু হলো। তিনি মুসান্না ইবনে হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বরখাস্ত করলেন। তার বদলে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করলেন আবু উবাইদ ইবনে মাসউদ সাকাফি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। মুসান্না ইবনে হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি একই সময়ে বরখাস্ত করেছিলেন। উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ-ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মানুষ অস্থির পেরেশান হয়ে পড়ল। কেউ বুঝতেই পারছিল না কেন তিনি এই রদবদল করছেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মানুষের দ্বিধা-সংশয় নিরসন করার জন্য বললেন, ‘কোনো সন্দেহ বা অপবাদের কারণে আমি তাদের বরখাস্ত করিনি; বরং মানুষ তাদের সীমাহীন সম্মান করতে শুরু করেছে। আমার আশঙ্কা হয়, কখনো মানুষ তাদের ওপর সম্পূর্ণই ভরসা করে বসে কিনা।^{৪৮}

যদিও মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, তার পরেও তিনি একজন নির্ণাবান সৈনিকের মতো বেঁচে ছিলেন এবং আবু উবাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে অধিকাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেসব যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেছিলেন।^{৪৯}

আবু উবাইদ সাকাফি রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহু পুনরায় নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তার পর ইরাকি বাহিনীর নেতৃত্ব আসে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে। জিসর-এর যুদ্ধে মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহুর দেহে যেই ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল, তা থেকে তিনি আর নিস্তার পাননি। যার কারণে তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইরাক পৌঁছার পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেন।^{৫০}

^{৪৮} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/১০৮।

^{৪৯} আল-বিদায়া ওয়াননিহায়া, ৭/২৮।

^{৫০} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/১১১।

কাদিসিয়া যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার কারণে স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসাবে বসরার আত্মপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু কাদিসিয়ার বিজয় এবং মুসলিমদের হাতে মাদাইন পতনের মধ্য দিয়ে ইরাকের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় নতুন দিগন্তের সূচনা হয়; এখানকার রাজ্যসমূহকে নতুন ও সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করা হয়। এই নতুন বিন্যাসের পর রাজ্যগুলো আলাদাভাবে দৃশ্যমান এবং সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে; হোক সেই প্রদেশ বসরা কিংবা কুফা কিংবা হোক এই দুই প্রদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত ইরাক ও পারস্যের অন্যান্য অঞ্চল অথবা এই দুই এলাকার বাইরে পারস্যের অন্য কোনো প্রদেশ। যেকোনো প্রদেশকে আলাদাভাবে শনাক্ত করা যেত।^{৫১}

১.৮.১। বসরা

উমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বসরা আবাদ ও আবাসযোগ্য হওয়ার পূর্বে সেখানে কুতাবা ইবনে কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাহায্যে সাদ ইবনে বকর গোত্রের শুরাইহ ইবনে আমের রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠিয়েছিলেন। তারপর তাকেই বসরা ও তার আশপাশের গভর্নর নিযুক্ত করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কোনো এক জিহাদে শহিদ হয়েছিলেন।^{৫২}

শুরাইহ ইবনে আমের রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু উতবা ইবনে গাজওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে একটি সেনাদলের সঙ্গে সেখানকার আমির নিযুক্ত করে পাঠালেন। এই ঘটনা ১৬ হিজরির নয়; বরং ১৪ হিজরি-সনের। সালেহ আহমদ আলি ১৪ হিজরির মতটি গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেন, ‘কোনো কোনো ইতিহাসবিদের ধারণা উতবা ইবনে গাজওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কাদিসিয়া বা জালুলার যুদ্ধের পরে ১৬ হিজরি-সনে বসরা ও তার আশপাশের এলাকার গভর্নর বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ ইতিহাসবিদের বক্তব্য হলো, তাকে ১৪ হিজরি-সনে পাঠানো হয়েছিল। আর আমরা এ কারণেই অধিকাংশ ইতিহাসবিদের বক্তব্যটিই প্রাধান্য দিয়েছি।’^{৫৩}

^{৫১} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/১১৩।

^{৫২} তারিখু খালিফা ইবনে খাইয়াত, ১৫৫।

^{৫৩} আততানযিমাতুল আজতিমাইয়াহ ওয়াল ইকতিসাদিয়াহ ফিল বাসরাহ, ৩৬।

বসরার জন্য উতবা ইবনে গাজওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুর গভর্নর নিযুক্তি ও তার শাসনকালটি ছিল প্রকৃতপক্ষে বসরার প্রতিষ্ঠা এবং তার জীবনে নতুন প্রাণ সম্ভারিত করা। সেখানে তাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও কাজের মুখোমুখি হতে হয়। তার শাসনামলে দজলা-ফুরাতের উপকূলে পারস্যের কিছু এলাকার বিজয়লাভ ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা।^{৫৪}

একবার হজের সময় উতবা রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব থেকে পদত্যাগপত্র জমা দিলেন। কিন্তু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন না। তিনি বরং বললেন, ‘আপনি এখন ফিরে যান। আর দায়িত্ব পালন করতে থাকুন।’ তারপর উতবা রাযিয়াল্লাহু আনহু ফিরে গেলেন ঠিক; কিন্তু বসরায় পৌঁছার পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট যখন তার ইনতিকালের সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি বললেন, মৃত্যুর যদি নির্ধারিত সময় না থাকত (তবে আমি মনে করতাম), আমিই তাকে মেরে ফেলেছি। তারপর তিনি তার ব্যাপারে ভালো ভালো কথা বললেন। ১৭ হিজরি-সনে উতবা রাযিয়াল্লাহু আনহু ইনতিকাল করেন।^{৫৫}

উতবা রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরে মুগিরা ইবনে শুবা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করা হলো। দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সর্বপ্রথম তিনি দিওয়ান বা রেজিস্টার চালু করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করে যান। কিন্তু ১৭ হিজরি-সনে একবার তার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়। তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে গভর্নরের পদ থেকে বরখাস্ত করেন। তারপর অপবাদের সত্যাসত্য তদন্ত করতে থাকেন। তদন্ত ও অনুসন্ধানের পর মুগিরা রাযিয়াল্লাহু আনহু নিরপরাধ প্রমাণিত হন। বিরুদ্ধবাদী তিন সাক্ষীর ওপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সংশোধন ও সতর্কতামূলকভাবে মুগিরা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার পদ থেকে অপসারণ করেছিলেন ঠিকই তবে পরবর্তী সময়ে তাকে অন্যত্র গভর্নর ও সেনাপ্রধানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান।^{৫৬}

^{৫৪} তারিখু খালিফা ইবনে খাইয়াত, ১২৭, ১২৮।

^{৫৫} আল-বিলায়াতু আল্লাল বুলাদান, ১/১১৫।

^{৫৬} আল-বিলায়াতু আল্লাল বুলাদান, ১/১১৫।

মুগিরা ইবনে শুবা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বসরা থেকে সরিয়ে আনার পরে আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠান। উল্লেখ্য, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে যাদের বসরার গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছিল, আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তার শাসনামলে পারস্যের বহু এলাকা মুসলিমদের হাতে বিজিত হয়। অনেক সময় তিনি সরাসরি জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন আঞ্চলিক অভিযানে তিনি বসরা থেকে সেনা-অফিসারদের পাঠাতেন। তার শাসনামলে আহওয়ায এবং তার আশপাশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বসরার মুজাহিদদের হাতে বিজিত হয়। তার আমলে মুসলিমরা জিহাদি চেতনায় উজ্জীবিত ছিল। বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি তার পার্শ্ববর্তী গভর্নরদের সহযোগিতা গ্রহণ করতেন। বিজিত এলাকার শৃঙ্খলাবিধান, গভর্নর নিয়োগ, বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড ও ব্যবস্থাপনা এবং সেখানকার লোকদের নিরাপত্তা প্রদানের ব্যাপারে তিনি অনেক পরিশ্রম করতেন। বহু বিষয়ে তার ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাঝে চিঠিপত্র আদানপ্রদান হতো। কোনো কোনো চিঠিতে তিনি আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এই নির্দেশনা প্রদান করেন যে আমিরদের মজলিসে তাদের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করতে হবে, কীভাবে তাদের খুশি রাখতে হবে। কোনো কোনো চিঠিতে তিনি তাকওয়া অবলম্বন এবং জনগণকে খুশি রাখার ব্যাপারে দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন। তার প্রতিটি নির্দেশনাই ছিল অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ।

এক চিঠিতে তিনি লেখেন : ‘হামদ ও সালাতের পর। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যার প্রতি তার প্রজারা সন্তুষ্ট ও আস্থাশীল থাকে। আর সবচেয়ে হতভাগা সেই ব্যক্তি, যার প্রতি তার প্রজারা বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট। তুমি নিজেকে ক্ষমতার মোহ থেকে দূরে রাখবে। অন্যথায় তোমার অধীন কর্মকর্তারা তোমার মতোই ক্ষমতার পেছনে দৌড়াতে থাকবে। তারপর তোমার দৃষ্টান্ত হয়ে যাবে এমন চতুষ্পদ প্রাণীর মতো, যেগুলো শ্যামল-সবুজ ঘাস-পাতা দেখলেই খেতে নেমে পড়ে। এভাবেই ওগুলো মোটাতাজা হয়ে ওঠে। অথচ এই দৃষ্টপুষ্টিতাই তাদের মৃত্যু ডেকে আনে।’^{৫৭}

^{৫৭} ইবনুল জাওযিকৃত মানাকিরু উমর, ১৩০।

উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাঝে এ-ধরনের আরও কিছু চিঠি আদানপ্রদান হয়েছিল। তাতে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেওয়া হতো। সে সকল চিঠি ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ তার আলওয়াসাইকুস সিয়াসিয়াহ গ্রন্থে একত্র করেছেন।^{৫৮}

বসরায় আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলকে সবচেয়ে উত্তম বিবেচনা করা হতো। তার কালের উন্নয়নের বর্ণনা দিতে গিয়ে হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ স্পষ্টত বলেন, বসরাবাসীদের জন্য আবু মুসা রাযিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে বড় কল্যাণকামী কোনো আমির হতে পারে না।^{৫৯}

আবু মুসা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সততা ও কর্মনিষ্ঠার এই স্বীকৃতি সম্পূর্ণই সত্য। কেননা, আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বসরার প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পন্ন করার পাশাপাশি তিনি সেখানকার লোকদের কুরআন এবং দীন শিক্ষা দিতেন।^{৬০}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে পারস্যের কয়েকটি বিজিত অঞ্চল বসরার অধীন ছিল। বসরার গভর্নরই সেসব স্থানে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিতেন। তারা সবাই বসরার আইন ও প্রশাসনের অনুগামী হয়ে থাকতেন। এভাবে আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বিবেচিত হন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গভর্নর হিসাবে। এসব চিঠির মাধ্যমে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের বিভিন্ন দিক এবং গভর্নরদের সঙ্গে তার আচরণ কীরূপ ছিল তা জানা যায়।^{৬১}

১.৮.২। কুফা

কুফা নগরী সম্পূর্ণ আবাদ ও বসবাসের উপযোগী হওয়ার পর সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু সেখানকার প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন।

^{৫৮} গ্রন্থটির পূর্ণ নাম আলওয়াসাইকুস সিয়াসতি লিল আসরিন নাববি ওয়াল খিলাফাতির রাশিদাহ। উর্দু ভাষায় মাওলানা তাকি আমিনি হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু কে সারকারি খুতুত নামে সংকলন করেন।

^{৫৯} সিয়াকু আলামিন নুবালা, ২/৩৮৯।

^{৬০} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/১২০।

^{৬১} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/১২০।

মূলত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রথম তিনিই কুফা নগরীর গোড়াপত্তন করেন। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু কুফা আবাদ করার পূর্ব থেকেই কুফা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর গভর্নর ছিলেন। অত্যন্ত সুন্দর সুচারুরূপে তিনি তার দায়িত্ব পালন করেন। গভর্নর হিসাবে তিনি কুফাকেই নিজের আবাসরূপে গ্রহণ করেন। তার পর থেকেই পারস্যের দিকে তার গুরুত্বপূর্ণ বিজয়ের ধারা শুরু হয়।^{৬২}

তিনি তার প্রাদেশিক অঞ্চলসমূহে কৃষি ও চাষাবাদের ক্ষেত্রে কিছু সংস্কার-কার্যক্রম গ্রহণ করেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো, একবার একদল ভূমি-মালিক তাদের এলাকার কৃষকদের জন্য খাল খননের দাবি জানায়। তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের খাল খননের নির্দেশ প্রদান করেন। তারপর এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র একত্র করা হয়। এবং তারপর খাল-খনন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। কুফার অধীন অঞ্চলসমূহে সামগ্রিক কার্যক্রম ও নিয়ম-শৃঙ্খলা তিনিই দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতেন। উমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিনিধি পাঠাতেন। কুফার জ্ঞানী ও বিচক্ষণ লোকেরা সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। তারা তার সংস্কারধর্মী কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করতেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার কুফার একজন বিখ্যাত ও বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সেই ব্যক্তি জবাব দিয়েছিলেন, ‘খারাজ ইত্যাদি আদায়ের বেলায় তিনি বেশ বিনয়ী। বীরত্ব ও সাহসিকতার বেলায় তিনি একজন খালেস আরব। ভাব-গাঙ্গীর্যের ক্ষেত্রে তিনি বাঘের মতো। বিবাদ-মীমাংসার ক্ষেত্রে তিনি ন্যায়-নিষ্ঠা বজায় রাখেন। বণ্টনের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করেন। বিভিন্ন অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ করেন। এবং তাদের সঙ্গে মহানুভব মায়ের মতো আচরণ করেন। আর আমাদের জন্য পিপীলিকার ন্যায় খাদ্য আহরণ করেন।’^{৬৩}

এমনিভাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জারির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর দায়িত্ব পালন

^{৬২} ফুতুহুল বুলদান, ১৩৯; তারিখুল ইয়াকুবি, ২/১৫১।

^{৬৩} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/১২৩।

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। জারির রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, ‘আমি তাকে তার রাজ্যে এই অবস্থায় দেখে এসেছি যে তিনি যোগ্যতা ও শক্তিমন্ডায় সবার ওপরে। জনগণের প্রতি তিনি সবচেয়ে কম কঠোরতা দেখান। তাদের সঙ্গে মমতাবান মায়ের মতো আচরণ করেন। পিপীলিকার ন্যায় খাবার সংগ্রহ করেন। শত্রুর মোকাবিলায় তিনি ভীষণ কঠোর। আর সাধারণ মানুষের চোখে তিনি কুরাইশের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি।’^{৬৪}

কুফার বিচক্ষণ ও বিশিষ্ট লোকদের নিকট তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও প্রশংসিত। এর পরেও কিছুলোক তার বিরুদ্ধে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট অভিযোগ দায়ের করে। যার ফলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বরখাস্ত করেন। ইনশাআল্লাহ সামনে ‘গভর্নরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ’ শিরোনামে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

কুফা থেকে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বরখাস্ত করার পর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেখানকার ইমামতির দায়িত্ব পালন করার জন্য আম্মার ইবনে ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিযুক্ত করেন। উল্লেখ্য, আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অধীন কুফার অন্যতম সামরিক কর্মকর্তা। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তার দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন বিষয়ে তার সহযোগিতা গ্রহণ করতেন। এ জন্য তিনি গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেই রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে বেশ দক্ষ ও অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

এখানে এ কথাও উল্লেখ করা দরকার যে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহুর রাজ্য পরিচালনা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য ছিল। যেমন : উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করার ‘পাশাপাশি আরও কিছুলোককে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োগ দান করেন। আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নামাযের ইমামতির দায়িত্ব প্রদান করেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রদান করেন সরকারি কোষাগারের দায়িত্ব। উসমান ইবনে হুনাইফ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ভূমি-ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রদান করেন (অথচ সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে এই বিভাগগুলো

^{৬৪} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/১২৩।

মোটাই এভাবে ছিল না)। এ জন্য তাদের উভয়ের রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ করা যায়। অন্য কোনো প্রদেশে রাজ্য পরিচালনার এই নতুন ধারা আমরা দেখতে পাই না।

দায়িত্ব বণ্টন হওয়ার পর সকলেই যার যার দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু নামাযের ইমামতি শুরু করলেন। পাশাপাশি তিনি প্রাদেশিক ব্যবস্থাপনা এবং সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন। বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করতেন। তার সময়ে কুফাবাসীরা কয়েকবার পারসিক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এবং প্রতিবারই তারা জয়লাভ করে। এভাবেই আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহযোগিতায় তিনি রাজ্যের অন্যান্য দায়িত্বও সুন্দর সুচারুরূপে আনজাম দিতে থাকলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু অর্থ-ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মানুষকে কুরআন ও ইসলামের শিক্ষাও প্রদান করতেন।^{৬৫}

কুফায় আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহুর গভর্নরের দায়িত্বকাল ছিল প্রায় এক বছর নয় মাস। তারপর আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে কুফাবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে গভর্নরের দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করেন। এ-ব্যাপারে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘গভর্নরের পদ থেকে বরখাস্তের কারণে কি তোমার মন খারাপ হয়েছে?’ আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, ‘আপনি যখন আমাকে গভর্নর নিয়োগ দিয়েছিলেন, তখন আমার কোনো খুশি লাগেনি। তবে যখন আমাকে বরখাস্ত করা হয়, তখন একটু খারাপ লেগেছিল।’

অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি এভাবে জবাব দিয়েছিলেন, ‘যখন আপনি আমাকে গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন, তখন যেমন আমার খুশি লাগেনি, তারপর যখন আমাকে বরখাস্ত করলেন তখনো আমার কোনো দুঃখ লাগেনি।’

কোনো কোনো ইতিহাসগ্রন্থে আছে, আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন বুঝতে পারলেন কুফার লোকজন তার শাসন পছন্দ করছে না তখন তিনি নিজে থেকেই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পদত্যাগপত্র জমা দিলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুও তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন। তিনি তাকে বরখাস্ত করেননি।^{৬৬}

আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জুবাইর ইবনে মুতয়িম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। কিন্তু তার কুফায় পৌঁছার পূর্বেই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার এই আদেশ প্রত্যাহার করে নিলেন। কারণ, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেছিলেন গভর্নর নিযুক্তির বিষয়টি আপনি এখনই কাউকে বলবেন না। কিন্তু তিনি এটা ফাঁস করে দিলেন। লোকজনের মাঝে যখন এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। এবং এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিলেন। তারপর মুগিরা ইবনে শুবা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনিই সেখানকার গভর্নর ছিলেন।^{৬৭}

১.৮.৩। মাদাইন

মাদাইন ছিল কিসরার রাজধানী। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এলাকাটি জয় করেছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি সেখানে অবস্থান করেছিলেন। তারপর যখন কুফা নগরী প্রতিষ্ঠা লাভ করল, তিনি সেখানে চলে গেলেন। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে একটি মুজাহিদ বাহিনী ছিল। তাদের সঙ্গে সালমান ফারেসি রাযিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। তিনি পারসিকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি যুদ্ধে বরাবর অংশগ্রহণ করেছিলেন। পারসিকদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরুর পূর্বে তাদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কাজে সালমান ফারেসি রাযিয়াল্লাহু আনহুর বেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। উমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে মাদাইনের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি সেখানে শান্তি-সুখে জীবনযাপন করতে থাকলেন। ইসলামের শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক জীবন্ত নমুনা।

^{৬৬} নিহায়াতুল আরিব, ১৯/৩৬৮।

^{৬৭} তারিখু খালিফা, ১৫৫; তারিখ আত-তাবারি, ৫/২৩৯।

বর্ণিত আছে, সালমান ফারেসি রাযিয়াল্লাহু আনহু গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য রাজি ছিলেন না। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে এই দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে একরকম বাধ্য করেন। তার পরেও তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট অব্যাহতি দেওয়ার জন্য বারবার আবেদন জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার কোনো আবেদন গ্রহণ করেননি। সালমান ফারেসি রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অত্যন্ত দুনিয়াবিমুখ, আল্লাহওয়ালা মানুষ। তিনি সব সময় উলের পোশাক পরতেন। গাধার পিঠে আসন ছাড়াই বসতেন। যবের মোটা রুটি খেতেন। অনেক ইবাদত করতেন। হারাম থেকে বেঁচে থাকতেন।^{৬৮}

সালমান ফারেসি রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন গভর্নর হিসাবে মাদাইনে জীবনযাপন করতে থাকলেন। গ্রহণযোগ্য অভিমত অনুযায়ী ৩২ হিজরিসনে উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তিনি ইনতিকাল করেন। সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের শেষ দিন পর্যন্ত গভর্নর-পদে বহাল থাকেননি। কেননা, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু শেষ দিকে হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মাদাইনের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসবিদরা এ কথা কোথাও লেখেননি যে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সালমান ফারেসি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বরখাস্ত করেছিলেন। তার সম্ভাব্য কারণ হলো, সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু যেভাবে বারবার অব্যাহতি চাচ্ছিলেন, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কয়েকবার তার প্রত্যাখ্যান করার পর হয়তো একপর্যায়ে তার অব্যাহতিপত্র গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তার পর হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সেখানকার গভর্নর বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

মাদাইনে হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসন সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। তার একটি হলো, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মাদাইনের অধিবাসীদের নামে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে একটি পত্র পাঠিয়ে তাদের অবগত করেছিলেন যে হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের গভর্নর বানিয়ে পাঠানো হলো। মাদাইনবাসীদের উচিত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহুর আনুগত্য ও অনুসরণ করা। তার পর থেকে হুযাইফা

^{৬৮} মুরাওয়াজুয-যাহাব, ২/২০৬; আল-বিলায়াতু আল্লাল বুলদান, ১/১৩১।

রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এবং উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর পূর্ণ খেলাফতকাল পর্যন্ত সেখানকার গভর্নর-পদে বহাল ছিলেন।^{৬৯}

১.৮.৪। আজারবাইযান

আজারবাইযানের প্রথম গভর্নর ছিলেন হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু। তারপর যখন তাকে মাদাইনে বদলি করা হলো, তখন তার স্থলে উতবা ইবনে ফারকাদ সুলামি রাযিয়াল্লাহু আনহু গভর্নর নিযুক্ত হলেন। উতবা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাঝে কয়েকবার পত্রমারফত মতবিনিময় হয়।

একবারের ঘটনা। উতবা ইবনে ফারকাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু গভর্নর হয়ে আজারবাইযান পৌঁছলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন সেখানকার লোকজন একধরনের উন্নত ও সুস্বাদু হালুয়া প্রস্তুত করে। স্থানীয় লোকেরা তাকে হুবাইস বলত। তিনি চিন্তা করলেন এই হালুয়া বানিয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পাঠানো উচিত। তারপর তিনি হালুয়া প্রস্তুত করালেন। এবং তারপর সেগুলোকে বাক্সবদ্ধ করে চামড়া দিয়ে মুখ আটকে দিয়ে মদীনায় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেগুলো গ্রহণ করলেন এবং তার স্বাদও চেখে দেখলেন। এই হালুয়া তিনি অত্যন্ত পছন্দ করলেন। তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হালুয়া বহনকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘সেখানকার মুহাজিররা কি তৃপ্তিসহকারে এ-ধরনের হালুয়া খেতে পায়?’ বাক্স বহনকারী নেতিবাচক জবাব দিলেন। আর বললেন, ‘এগুলো কেবল আপনার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে।’

এ কথা শোনার পর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আজারবাইযানে উতবা ইবনে ফারকাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট হালুয়াগুলো ফেরত পাঠালেন। তারপর উতবা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সম্বোধন করে পত্র লিখলেন :

উতবা, তোমার পাঠানো উপহার তোমার আর তোমার বাবার কামাই না। সফরকালে তুমি যেই খাদ্য গ্রহণ করবে, সকল

^{৬৯} সিয়াকু আলামিন নুবাল্লা, ২/৩৬৪।

মুসলমানের জন্য সেই খাদ্যের বন্দোবস্ত করবে। আরাম-আয়েশ পরিহার করে চলবে। মুশরিকদের পোশাক পরবে না। রেশমি কাপড় থেকে দূরে থাকবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রেশমি কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।^{৭০}

ঘটনাটি বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। সেগুলো একটি অপরটির সমার্থক।

তার পর থেকে উতবা রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের বাকি দিনগুলো এবং উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের প্রথম দিকে আজারবাইজানের গভর্নর ছিলেন। এ ছাড়াও ইরাক ও পারস্যের বিভিন্ন অঞ্চলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিয়োগকৃত আরও একাধিক গভর্নর ছিল। কিছু গভর্নর এমনও ছিল, যারা নিজ নিজ প্রদেশে অনেকটা স্বাধীন ছিলেন। কিছু অঞ্চল ইরাকের দুই বড় শহর কুফা ও বসরার অধীন ছিল। কেননা, এই দুই প্রদেশ ছিল ইরাক ও পারস্যের আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার প্রধান কেন্দ্র। এই আলোচনায় উল্লেখিত প্রদেশগুলো ছাড়াও ছোট ছোট আরও কিছু প্রদেশ ছিল, যার জন্য আলাদা গভর্নর ছিল। যেমন : মসুল, হালওয়ান, কাসকার ইত্যাদি।

^{৭০} আল-বিলায়াতু আল্লাল বুলদান, ১/১৩৩।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উমর রা.-এর যুগে প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগপদ্ধতি

উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রাদেশিক গভর্নর নির্বাচন ও নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মপদ্ধতির অনুসরণ করতেন। তিনি তাদেরই এই দায়িত্ব প্রদান করতেন, যারা সবচেয়ে যোগ্য, আমানতদার এবং দায়িত্বসচেতন হতেন। কাউকে নিয়োগদান বা অপসারণ, উভয় ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত যাচাই-বাছাই ও চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতেন। যারা পদপদবি কামনা করত, তিনি তাদের কখনোই দায়িত্ব প্রদান করতেন না। গভর্নর নিয়োগদানের বিষয়টিকে তিনি আমানত মনে করতেন, যার দাবি হলো, এমন ব্যক্তিই এই পদের সবচেয়ে উপযুক্ত, যিনি সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন। যদি যৌক্তিক কারণ ছাড়া কোনো যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে অযোগ্য লোককে দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে সেটা হবে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং মুমিনদের সঙ্গে খেয়ানত ও প্রতারণার শামিল।^{৭১}

এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান উক্তি পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন,

আমি আমার আমানত ও অঙ্গীকারের ব্যাপারে দায়িত্ববান। আমার অন্তরে যেই চিন্তাভাবনা জাগরুক হয়, ইনশাআল্লাহ সে ব্যাপারে আমি অবগত। এই দায়িত্ব আমি অন্য কাউকে সোপর্দ করব না। আর যেসব বিষয় আমার থেকে দূরে রয়েছে, সেগুলো আমি আমানতদার ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণকামী লোকদের মাধ্যমেই জানতে পারি। এসব আমানতদার ও কল্যাণকামী মানুষ ছাড়া অন্য কাউকে আমি এই আমানত অর্পণ করব না।^{৭২}

^{৭১} ওয়াকায়িউ নাদওয়াতিন নাযমিল ইসলামিয়াহ, ১/২৯৫, ২৯৬।

^{৭২} দাওরুল হিজাযি ফিল হায়াতিস সিয়াসিয়াতি, ২৫৫।

তিনি আরও বলেন, ‘যদি কেউ কাউকে কোনো দলের দায়িত্বশীল নিযুক্ত করে, অথচ সেই দলে তার চেয়ে উত্তম ও আল্লাহওয়ালা মানুষ রয়েছে, তাহলে সেই লোক আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং মুমিনদের সঙ্গে খেয়ানত ও প্রতারণা করল।’^{৭৩}

এ ছাড়াও তিনি বলেন, ‘যাকে মুসলিমদের শাসক নিযুক্ত করা হয়, সে যদি আত্মীয়তা বা স্বজনপ্রীতির কারণে কাউকে কোনো দায়িত্ব প্রদান করে, তাহলে সে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং মুমিনদের সঙ্গে খেয়ানত ও প্রতারণা করল।’^{৭৪}

২.১। প্রাদেশিক গভর্নর নির্বাচনে উমর রা.-এর মানদণ্ড এবং আবশ্যিক শর্তসমূহ

২.১.১। শক্তি-সামর্থ্য এবং আমানতদারি ও বিশ্বস্ততা

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেছেন। শক্তিশালী ব্যক্তির ওপর তিনি অধিক শক্তিশালীকে অগ্রাধিকার দিতেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন শুরাহবিল ইবনে হাসানা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অপসারণ করে তার জায়গায় মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়োগ দিলেন, তখন শুরাহবিল ইবনে হাসানা রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি কি অসন্তুষ্ট হয়ে আমাকে বরখাস্ত করলেন? উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন জবাব দিয়েছিলেন, না, আমি বরং যেমনটি চেয়েছিলাম, তুমি ঠিক তেমনই। কিন্তু আমি এই পদের জন্য আরও শক্তিশালী মানুষ চাচ্ছিলাম।^{৭৫} এ-ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সুন্দর একটি উক্তি করেছিলেন, আয় আল্লাহ, তোমার নিকট আমার কাকুতি, তুমি কোনো পাপিষ্ঠকে শক্তিশালী বানিয়ে না। আর বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে দুর্বল কোরো না।^{৭৬}

^{৭৩} আল-ফাতাওয়া, ২৮/২৪।

^{৭৪} আল-ফাতাওয়া, ২৮/১৩৮।

^{৭৫} তারিখ আত-তারারি, ৫/৩৯।

^{৭৬} আল-ফাতাওয়া, ২৮/৪২।

২.১.২। নিয়োগদানের ক্ষেত্রে ইলমের গুরুত্ব

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সকল পদে, বিশেষ করে ইসলামী সেনাবাহিনীর দায়িত্বশীল নিয়োগের ক্ষেত্রে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর অনুসরণ করতেন। ইমাম তাবারি বলেন, মুসলিম সেনাবাহিনী যখন উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামনে সমবেত হতো, তখন তিনি শরিয়তের জ্ঞানসম্পন্ন একজন আলেম ব্যক্তিকে তাদের প্রধান নিযুক্ত করতেন।^{৭৭}

২.১.৩। জ্ঞানবৃত্তা ও অভিজ্ঞতা

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ লোকদের বাদ দিয়ে অভিজ্ঞ লোকদের অগ্রাধিকার দিতেন।^{৭৮} বিজ্ঞ লোকের পরিবর্তে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার অর্থ হলো, যেই ব্যক্তি দীনদারি, তাকওয়া, পবিত্রতা ও সচ্চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম ও অগ্রগণ্য কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে অন্যান্যের তুলনায় তার দক্ষতা কম। কেননা, এটা জরুরি নয় যে একই ব্যক্তির মাঝে (তাকওয়া-পবিত্রতা এবং রাজনৈতিক দক্ষতা) এই দুটো বিষয় পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যাবে।

কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গৃহীত নীতি ও মানদণ্ড উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে এখনো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। আর এটাও সত্য যে দীনদার, যুগ্মাকি, চরিত্রবান ব্যক্তির মাঝে যদি রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা না থাকে, তাহলে তারা খুব সহজেই স্বার্থপর পথভ্রষ্ট লোকদের প্রতারণার শিকার হবে। কিন্তু রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার অধিকারী ব্যক্তিটি দূরদৃষ্টির মাধ্যমে অনুধাবন করতে পারবে কুচক্রীর কূটকচাল এবং তার পরিণতি। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার এক ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি তার এই ইচ্ছা শুধু এ-কারণে পরিবর্তন করেছিলেন যে কাজক্ষিত লোকটি অপরাধ সম্পর্কে মোটেই ধারণা রাখে না। ঘটনার

^{৭৭} নিযামুল হিকাম ফিশ শারিয়াতি ওয়াত-তারিখিল ইসলামী, ১/৪৭৯।

^{৭৮} আল-মাদিনাতুন নাবাবিয়াতু ফাজরুল ইসলাম, ২/৫৬।

বিবরণে বলা হয়েছে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে একটি কাজের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। তারপর তিনি এই লোক সম্পর্কে মানুষদের থেকে খোঁজখবর নিলেন। তখন তাকে বলা হয়েছিল, আমীরুল মুমিনীন, এই লোক অপরাধ কী জিনিস (অর্থাৎ তার সংজ্ঞা ও পরিচয়) জানেই না। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই উক্তিকারীকে বললেন, ‘আফসোস তার জন্য, শীঘ্রই সে এর মধ্যে পতিত হবে।’^{৭৯}

মোটকথা, এই ঘটনার উদ্দেশ্য কখনোই এটা নয় যে কোনো বিভাগের কর্মকর্তা নিয়োগদানের ক্ষেত্রে তাকে শক্তি-সামর্থ্য, বিশৃঙ্খতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, যোগ্যতা ও উপযুক্ততার ন্যায় উত্তম বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির অধিকারী হতে হবে, যা কোনো উন্নত রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক বিষয়; বরং এ কথার উদ্দেশ্য হলো, এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিদের মাঝে তফাত ও তারতম্য পাওয়া যেতে পারে। অতএব এমন অবস্থা ও পরিস্থিতিতে দায়িত্বদানের ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি অগ্রাধিকার পাবে, যিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথামতো অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ।^{৮০}

২.১.৪। গ্রাম্য ও শহুরে

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্মকর্তা নিয়োগের সময় তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য, তাদের স্বভাব ও অভ্যাস, রেওয়াজ ও প্রচলিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখতেন। তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার এই দিকটি বেশ প্রসিদ্ধি পেয়েছিল যে তিনি গ্রাম্য লোকদের শহরের মানুষের জন্য হাকিম বানাতে নিষেধ করতেন।^{৮১} আর বাস্তবতা হলো গ্রাম ও শহরের লোকদের স্বভাব ও অভ্যাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং জীবনধারণের পদ্ধতিতে ছিল কিছুটা স্বাতন্ত্র্য ও ভিন্নতা। অতএব মানুষের স্বভাবগত চাহিদা হলো হাকিম সাধারণ জনগণের স্বভাবপ্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত থাকবে। এমন কারও হাতে সাধারণ মানুষের দায়িত্ব তুলে দেওয়া সত্যিই অন্যায়, যে তাদের ব্যাপারে কিছুই জানে না। কেননা, পরিবেশ ও পরিভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে কখনো কখনো উপকারী ও কল্যাণকর

^{৭৯} নিযামুল হিকাম ফিশ শারিয়াতি ওয়াত-তারিখিল ইসলামী, ১/৪৮২।

^{৮০} নিযামুল হিকাম ফিশ শারিয়াতি ওয়াত-তারিখিল ইসলামী, ১/৪৮২।

^{৮১} নিযামুল হিকাম ফিশ শারিয়াতি ওয়াত-তারিখিল ইসলামী, ১/৪৮২।

বিষয়ও অস্বীকার করে বসতে পারে। এমনভাবে স্বভাবগত কোনো বিষয় ও সভ্যতাকেও অদ্ভুত মনে হতে পারে। তারপর তার পরিণতি সমাজের কাজীকৃত বিষয় ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয়ে যাবে।^{৮২}

২.১.৫। জনগণের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার অধীন দায়িত্বশীল ও গভর্নরদের থেকে সব সময় কামনা করতেন তারা যেন জনগণের সঙ্গে দয়ার আচরণ করেন। তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বহুবার মুসলিম বাহিনীর প্রধানদের আদেশ করেন, তারা যাতে মুজাহিদদের ভয় ও শঙ্কার প্রতীক না বানায়। মুজাহিদদের যেন ধ্বংসের দিকে ঠেলে না দেয়। একবার উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বনু আসলামের এক ব্যক্তির মাধ্যমে একটি কাজ নিতে চাইলেন। সেই লোককে চিঠিমাফত খবর দিয়ে পাঠালেন। লোকটি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এলেন। এ-সময় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে ছিলেন। শিশুটিকে তিনি আদর করছিলেন। ভালোবেসে চুমু খাচ্ছিলেন। এই দৃশ্য দেখে লোকটি খুব অবাক হলো। বলল, ‘আমীরুল মুমিনীন, আপনি শিশুদের এত ভালোবাসেন! আল্লাহর কসম, আজ পর্যন্ত আমি আমার কোনো সন্তানকে চুমু খাইনি।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তাহলে আল্লাহর কসম, তোমার অন্তরে মানুষের প্রতি এতটুকু দয়া ও অনুগ্রহের মনোভাব নেই। চলে যাও তুমি। তোমাকে দিয়ে আমার কোনো কাজ হবে না।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকটিকে ফিরিয়ে দিলেন। তাকে কোনো দায়িত্ব অর্পণ করেননি।^{৮৩}

এমনভাবে একবার কিছু সৈনিক পারস্যের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করে। একের পর এক অঞ্চল জয় করতে করতে তারা একটি নদীর তীরে পৌঁছে যায়। সেই নদীর ওপর কোনো পুল ছিল না। সেনাবাহিনীর প্রধান একজন সৈনিককে পানিতে নেমে নদীর গভীরতা অনুমান করতে বললেন, যাতে সেখান দিয়ে সেনাবাহিনী নদী পার হয়ে যেতে পারে। সেটা ছিল কনকনে শীতের মৌসুম। সেই মুজাহিদ বললেন, ‘আমার খুব ভয় হচ্ছে; নদীতে নামলে আমি হয়তো ডুবে মারাই যাব!’

^{৮২} নিয়ামুল হিকাম ফিশ শারিয়াতি ওয়াত-তারিখিল ইসলামী, ১/৪৮৩।

^{৮৩} মাহযুস সাওয়াব, ২/৫১৯।

কিন্তু সেনাপ্রধান তাকে নদীতে নামতে বাধ্য করলেন। সেই মুজাহিদ চিৎকার করে ‘হে উমর’ ‘হে উমর’ বলতে বলতে নিরুপায় হয়ে নদীতে নেমে পড়ল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু হলো। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন এই ঘটনার সংবাদ পেলেন, তখন তিনি মদীনার বাজারে ছিলেন। ঘটনার বিবরণ শুনতেই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, ‘ওহে.. আমি হাজির। ওহে.. আমি হাজির।’

তারপর তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেনাপ্রধানকে তলব করলেন। তাকে রাষ্ট্রের সকল দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে বললেন, ‘যদি আমিরের আনুগত্যের শরয়ি নির্দেশনা না থাকত, তবে আজ আমি তোমার থেকে অবশ্যই বদলা নিতাম। আজ থেকে তুমি আমার কোনো কাজের উপযুক্ত নও।’^{৮৪}

একবার উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু গভর্নরদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন,

আল্লাহ তা‘আলার নিকট ইমাম ও হাকিমদের বিনয় ও নম্রতার চেয়ে উত্তম ও প্রিয় কিছু নেই। এমনভাবে হাকিম ও ইমামদের অজ্ঞতা ও বোকামির চেয়ে অপছন্দনীয় কিছু নেই। মনে রেখো, যে ব্যক্তি তার অধীন লোকদের অপরাধ ক্ষমা করবে, তাদের সঙ্গে সদয় আচরণ করবে, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবে, সে তার ওপরওয়ালার পক্ষ থেকেও ক্ষমা ও দয়ার আচরণ লক্ষ্য করবে।^{৮৫}

২.১.৬। নিকট-আত্মীয়দের কোনো দায়িত্ব না দেওয়া

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিকট-আত্মীয়দের গভর্নর বানাবার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতেন। তিনি তার চাচাতো ভাই সায়িদ ইবনে যাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে কোথাও গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠাননি। অথচ তারা ছিলেন অগ্রগামী মুসলিম। আর তাদের মাঝে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ণ যোগ্যতাও ছিল।

একবার এক ব্যক্তি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কুফার গভর্নরদের সঙ্গে সেখানকার লোকদের অসহযোগিতামূলক আচরণের ব্যাপারে অভিযোগ

^{৮৪} ইবনুল জাওযিকৃত মানাকিরু আমিরিল মুমিনীন, ১৫০।

^{৮৫} আদদাওলাতুল ইসলামিয়াহ ফি আসরিল খুলাফায়ির রাশিদীন, ৩৩৪।

করতে শুনলেন। এ-সময় তিনি এও বললেন, যদি কোনো যোগ্য বিশুদ্ধ মুসলমানকে পেয়ে যেতাম, তবে তাকে সেখানকার গভর্নর বানিয়ে পাঠাতাম। সেই ব্যক্তি তার কথা শুনে বললেন, ‘আল্লাহর কসম, এ-ব্যাপারে আমি এক ব্যক্তির সন্ধান দিতে পারব। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা।’

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। আল্লাহর কসম, তুমি তোমার এই কথার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেনি।’^{৮৬}

তিনি আরও বলতেন, ‘যে ব্যক্তি স্বজনপ্রীতি ও আত্মীয়তার ভিত্তিতে হাকিম নিযুক্ত করবে, অথচ তাকে প্রাধান্য দেওয়ার এ ছাড়া কোনো কারণও নেই, তাহলে সেই ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসুলের সঙ্গে খেয়ানত ও প্রতারণা করল।’^{৮৭}

২.১.৭। দায়িত্ব কামনাকারীকে দায়িত্ব না দেওয়া

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কখনোই এমন ব্যক্তিকে গভর্নর নিযুক্ত করতেন না এবং অন্য কোনো দায়িত্বও দিতেন না, যারা সেই পদ কামনা করত। এ-ব্যাপারে বলা হয়, ‘যে-ব্যক্তি দায়িত্ব কামনা করল, সে আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত রইল’। কাউকে দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর অনুসরণ করতেন।

২.১.৮। গভর্নরদের প্রতি ব্যবসা-বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু গভর্নর এবং অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য করতে নিষেধ করতেন। তিনি তাদের সাধারণ কেনাকাটা করতেও নিষেধ করতেন।^{৮৮} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিয়োগকৃত একজন কর্মকর্তার নাম হারিস ইবনে কাব ইবনে ওহাব রাযিয়াল্লাহু আনহু। তার ব্যাপারে বর্ণিত আছে, অতি দ্রুত তার ধনসম্পদ বৃদ্ধি পেতে থাকল।

^{৮৬} ইবনুল জাওযিকৃত মানাকিবু উমর ইবনুল খাত্তাব, ১০৮; আল-বিলায়াতু আল্লাল বুলদান, ১/১২৮।

^{৮৭} আল-ফাতাওয়া, ২৮/১৩৮।

^{৮৮} আল-ইদারাতুল ইসলামিয়াহ ফি আসরি উমর ইবনুল খাত্তাব, ২১৩।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে তার সম্পদ বৃদ্ধির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি জবাব দিলেন, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে আমি কিছু মাল ক্রয় করেছিলাম। তারপর সেগুলো বিক্রি করেছি। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, শুনে নাও। আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে আদৌ ব্যবসা করার জন্য পাঠাইনি। তারপর তিনি তার থেকে ব্যবসায়ের মুনাফার সমস্ত অর্থ নিয়ে নিলেন।^{৮৯}

২.১.৯। কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে সম্পদের হিসাব গ্রহণ

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু গভর্নর ও কর্মকর্তা নিয়োগের পূর্বে তাদের সম্পদের হিসাব নিতেন, যাতে দায়িত্বপরবর্তী সময়ে তাদের নিকট অতিরিক্ত সম্পদ পাওয়া গেলে সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। জিজ্ঞাসাবাদের সময় যদি তারা বলতেন যে এই সম্পদ আমি ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জন করেছি, তাহলে তিনি তাদের কথা গ্রহণ করতেন না। তখন তিনি তাদের বলতেন, আমি তোমাকে গভর্নর বানিয়ে পাঠিয়েছি, ব্যবসায়ী বানিয়ে পাঠাইনি।^{৯০}

২.১.১০। কর্মকর্তা নিয়োগের সময় কিছু শর্ত পালনের অঙ্গীকার

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন কাউকে কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দিতেন, তখন তিনি কয়েকটি বিষয়ে তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন। অঙ্গীকার গ্রহণের সময় একদল আনসারি সাহাবীকে সেখানে উপস্থিত রাখতেন। তারা সাক্ষী থাকতেন। সেই শর্তগুলো হলো, কোনো অনারব ঘোড়ায় চড়বে না। ময়দার রুটি খাবে। পাতলা পোশাক পরবে না। মুসলিমদের প্রয়োজনের সময় নিজের ঘরের দরোজা বন্ধ রাখবে না। সবশেষে বলতেন, আয় আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থেকে।^{৯১}

তাদের থেকে তিনি এ জন্য অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন, যাতে কর্মকর্তারা দুনিয়াবিমুখ, ইবাদতগুজার, বিনয়ী ও বিনম্র হয়ে জীবনযাপন করতে

^{৮৯} আল-ইদারাতুল ইসলামিয়াহ ফি আসরি উমর ইবনুল খাত্তাব, ২১৩।

^{৯০} আল-ইদারাতুল ইসলামিয়াহ ফি আসরি উমর ইবনুল খাত্তাব, ২১৫।

^{৯১} মাহযুস সাওয়াব, ১/৫১০।

পারে। উম্মাহর সংশোধন ও উন্নয়নের প্রথম ধাপ হলো খাওয়াদাওয়া, পোশাকআশাক ও চালচলনে মিতব্যয়িতা শিক্ষা দেওয়া। জীবনযাপনের ক্ষেত্রে যে-ব্যক্তি মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে পারবে, তার সকল কর্মকাণ্ড সঠিক ও স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

আসলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এসব শর্ত ছিল অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ। তার পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না উম্মাহর প্রত্যেক সদস্যকে পরহেযগার-মুত্তাকি, বিনয়ী-বিনম্র বানিয়ে ফেলা। তবে তার পক্ষে এটা অবশ্যই সম্ভব ছিল যে তিনি তার অধীন গভর্নর, সরকারি কর্মকর্তা ও সেনাবাহিনীর অফিসারদের অনুগত বানিয়ে নেবেন। যখন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিনয় অবলম্বন করবে, দুনিয়াবিমুখ জীবনযাপন করবে এবং যখন তাদের চারিত্রিক সৌন্দর্য প্রকাশ পাবে, তখন তাদের সকল কর্মকাণ্ড ও গতিবিধি সাধারণ লোকদের জন্য অনুসরণীয় হয়ে উঠবে। প্রকৃতপক্ষে সমাজের সংস্কার ও সংশোধন এবং সামগ্রিক অধঃপতন থেকে তাকে দূরে রাখার জন্য এটি একটি সফল মূলনীতি।^{৯২}

২.১.১১। প্রাদেশিক গভর্নর নির্বাচন ও নিয়োগদানের জন্য পরামর্শ

প্রবীণ ও বিশিষ্ট সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করার পর গভর্নর নির্বাচন ও নিয়োগ প্রদান করা হতো।^{৯৩} একবার উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সঙ্গী-সাথি সাহাবীদের বলেছিলেন, তোমরা আমাকে এমন একজন লোক সম্পর্কে বলো, যাকে তার কওমের আমির বা হাকিম নিযুক্ত করা হলে তার মনেই হবে না যে সে আমির। আর যখন সে আমির না হবে তখন তাকে দেখলে মনে হবে যে সে একজন আমির।^{৯৪} এ-ধরনের লোকের সন্ধান দিতে গিয়ে তারা রাবি ইবনে জিয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা বললেন।^{৯৫}

একবার উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাহাবীদের থেকে এই মর্মে পরামর্শ চাইলেন যে কুফাবাসীদের জন্য কাকে গভর্নর নিযুক্ত করা যায়। উমর

^{৯২} আততারিখুল ইসলামী, ১৯, ২০/২৬৮

^{৯৩} আসরুল খিলাফাতির রাশিদা, ১১৪।

^{৯৪} ফারাইদুল কালাম, ১৬৫।

^{৯৫} ফারাইদুল কালাম, ১৬৫।

রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতে চাচ্ছিলেন, কুফাবাসী এবং সেখানকার গভর্নরদের বিরুদ্ধে তাদের অসহযোগিতা ও অসদাচরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ বাতলে দেবে কে? আমি যদি তাদের জন্য বিনয়ী বিনম্র পবিত্র স্বভাবের কাউকে গভর্নর নিযুক্ত করি, তারা তাকে দুর্বল ভাবে। তার অবমূল্যায়ন করে। আর যদি শক্ত ও শক্তিশালী কাউকে গভর্নর নিযুক্ত করি, তারা তার বিরুদ্ধে বাজে মন্তব্য করতে থাকে। তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হে লোকসকল, এই দুই শ্রেণির লোক সম্পর্কে তোমাদের কী অভিমত, যাদের একজন দুর্বল কিন্তু মুতাকি মুসলমান আর দ্বিতীয় জন শক্তিশালী ও কঠিন স্বভাবের অধিকারী? এই দুই শ্রেণির মধ্যে কে গভর্নর হওয়ার অধিক উপযুক্ত?’

মুগিরা ইবনে শুবা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমীরুল মুমিনীন, দুর্বল ব্যক্তির ইসলাম তার একার জন্য উপকারী। কিন্তু তার এই দুর্বলতার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আপনার এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ওপর পড়বে। অন্যদিকে কঠিন ও শক্তিশালী ব্যক্তির কঠোরতা কেবল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর তার এই কঠোরতা ও শক্তিমত্তার দ্বারা সমগ্র উম্মাহ উপকৃত হবে। এবার আপনি যা ভালো মনে করেন, সিদ্ধান্ত নিন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘মুগিরা, তুমি ঠিক বলেছ।’

তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করলেন। তিনি তাকে নসিহত করতে গিয়ে বললেন, ‘একটা কথা মনে রাখবে, তুমি এমন লোক হওয়ার চেষ্টা করবে, যার আশ্রয়ে নেককার লোকেরা নিরাপত্তা অনুভব করে। আর বদকার লোকগুলো সন্ত্রস্ত থাকে।’ মুগিরা রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, ‘আমীরুল মুমিনীন, আমি এমনটাই করব।’

২.১.১২। গভর্নর নিযুক্তির পূর্বে তাদের পরীক্ষা

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু গভর্নর নিযুক্ত করার পূর্বে তাদের থেকে পরীক্ষা নিতেন। কখনো কখনো এই পরীক্ষা হতো দীর্ঘ সময়ব্যাপী। আহনাফ ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি উমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এলাম। আমাকে তিনি প্রায় এক বছরের জন্য নিজের কাছে রেখে দিলেন। শেষদিকে তিনি আমাকে বললেন, ‘আহনাফ,

এতদিন আমি তোমাকে পরীক্ষা করলাম। তোমাকে যাচাই করে নিলাম। আমি লক্ষ করেছি তোমার বাইরের কর্মকাণ্ড অত্যন্ত সুন্দর। আমি আশা করব তোমার ভেতরটাও অমন সুন্দর হবে।’

একদিন আমরা পরস্পর কথা বলছিলাম। এ-সময় তিনি বললেন, ‘চতুর ধূর্ত মুনাফিক লোকগুলো এই উম্মাহকে ধ্বংস করে ফেলবে।’ তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, ‘তুমি কি জানো আমি কেন তোমাকে এখানে রেখে দিয়েছি? তারপর তিনি নিজেই জবাব দিলেন, আসলে তোমার পরীক্ষা নেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। অবশেষে তিনি তাকে গভর্নর নিযুক্ত করলেন।^{৯৬}

একদিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আহনাফ ইবনে কায়েস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কিছু উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন,

আহনাফ, যে বেশি হাসাহাসি করে, তার প্রভাব ও মর্যাদা হ্রাস পায়। যে উপহাস করে, সে হাসির পাত্র হয়। কেউ কোনো কাজ বেশি বেশি করলে, সে সেই কাজে দক্ষ ও বিখ্যাত হয়ে ওঠে। যে বেশি কথা বলে, তার ভুল বেশি হয়। যে বেশি ভুল করে সে নির্লজ্জ হয়ে যায়। যার লজ্জা-শরম কমে যায়, তার তাকওয়া ও খোদাভীতি নিঃশেষ হয়ে যায়। আর খোদাভীতি দূর হয়ে যায়, তার অন্তর মরে যায়।^{৯৭}

২.১.১৩। স্থানীয় লোকদের গভর্নর নিযুক্ত করা

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তিনি সাধারণত স্থানীয় লোকদেরই জনগণের গভর্নর নিযুক্ত করতেন। তবে তাদের মধ্যে গভর্নর হওয়ার যোগ্যতা ও উপযুক্ততা থাকতে হতো। যেমন : জারির ইবনে আবদুল্লাহ বাজালি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বাজিলা সম্প্রদায়ের হাকিম নিযুক্ত করেছিলেন, যখন তারা ইরাক সফর করছিলেন।^{৯৮} এমনিভাবে সালমান ফারসি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মাদাইন, নাফে ইবনে হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কা এবং

^{৯৬} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/১৪২; মানাকিবু আমিরিল মুমিনীন, ১১৭।

^{৯৭} সিকাতুস সাফওয়া, ১/২৮৭।

^{৯৮} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/১৪২।

উসমান ইবনে আবুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তায়েফবাসীদের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। সম্ভবত এই রাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে বিশেষ কিছু লক্ষ্য অর্জন করার ছিল, যা কেবল স্থানীয় লোকেদের মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারত।^{৯৯}

২.১.১৪। খেলাফতের নিয়োগপত্র

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এ কথা প্রসিদ্ধ আছে যে তিনি গভর্নর মনোনয়নের ক্ষেত্রে উপদেষ্টাদের পরামর্শ গ্রহণ এবং গভর্নরদের নাম ঘোষণার পর একটি নিয়োগপত্র প্রস্তুত করতেন। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ একে অঙ্গীকারপত্র বলেছেন। তবে আমরা একে ভিন্ন অর্থে সরকারি নিয়োগপত্র হিসাবেই উল্লেখ করছি। গভর্নর ও কর্মকর্তা নিয়োগের সময় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর তৈরিকৃত অঙ্গীকারনামার বহু প্রতিলিপি ইতিহাসগ্রন্থে পাওয়া যায়।^{১০০}

একটি বিষয়ে প্রায় সকল ইতিহাসবিদ একমত—উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন কাউকে সরকারি কর্মকর্তা বা গভর্নর নিযুক্ত করতেন, তখন একদল মুহাজির ও আনসার সাহাবীকে তাদের সাক্ষী বানাতেন। তাদের থেকে নিয়োগপত্রে উল্লেখকৃত শর্তাবলি পূর্ণরূপে মেনে চলার অঙ্গীকার নিতেন।^{১০১}

অনেক সময় গভর্নরের জন্য নিয়োগকৃত ব্যক্তিটি মজলিসে উপস্থিত নাও থাকতে পারেন। তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার নামে অঙ্গীকারপত্র তৈরি করে তার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতেন। পত্রমারফত তাকে আদেশ করতেন, তুমি অমুক প্রদেশে চলে যাও। সেখানকার জন্য তোমাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যেমন : আলা ইবনে হায়রামি রাযিয়াল্লাহু আনহুর নামে অঙ্গীকারপত্র পাঠিয়ে বলা হয়েছিল, তুমি বসরায় চলে যাও। উতবার পরে তোমাকে সেখানকার গভর্নর বানানো হয়েছে। এমনিভাবে তিনি যখন কোনো আমিরকে তার পদ থেকে বরখাস্ত করতেন, তখন সেই শূন্যপদের জন্য আরেকজনকে নিয়োগ দিয়ে পাঠাতেন। নতুন আমির তার

^{৯৯} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/১৪২।

^{১০০} আলওয়াসাইকুস সিয়াসাতি লিল আসরিন নাববি ওয়াল খিলাফাতির রাশিদাহ, ৪০৭।

^{১০১} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/১৪৪।

নিয়োগপত্র নিয়ে সেই এলাকায় উপস্থিত হতেন, যেখান থেকে আগেরজনকে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং নতুনভাবে তাকে সেখানে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যেমন : বসরার গভর্নরের পদ থেকে মুগিরা ইবনে শুবা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং তার সেই শূন্যপদে আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল। এ-সময় আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এভাবেই বিষয়টি পত্রমারফত জানানো হয়েছিল।^{১০২}

২.১.১৫। মুসলিমদের প্রয়োজনে খ্রিস্টানদের সহযোগিতা গ্রহণ না করা

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট শাম বিজয়ের সংবাদসংবলিত চিঠি এল। এ-সময় তিনি আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আদেশ দিলেন, ‘তোমার কাতেবকে ডাকো। সে মসজিদে গিয়ে লোকজনকে এই চিঠি পড়ে শোনাবে।’ আবু মুসা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘সে মসজিদে প্রবেশ করবে না।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কেন? সে কি নাপাক?’ আবু মুসা রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, ‘না। সে একজন খ্রিস্টান।’

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার কথা শুনে আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মৃদ ভৎসনা করে বললেন, ‘তাদের কাছে টানবে না। আল্লাহ তাদের দূরে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের বেশি সম্মান দিতে যাবে না। আল্লাহ তা‘আলাই তাদের লাঞ্ছিত করেছেন। তাদের বিশ্বস্ত মনে করবে না। আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতারক বলেছেন। আমি তোমাদের আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিস্টানদের থেকে সাহায্য নিতে নিষেধ করছি। কারণ, তারা ঘুষ আদান-প্রদানকে বৈধ মনে করে।’^{১০৩}

উশশিক^{১০৪} বর্ণনা করেন, আমি ছিলাম উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর একজন খ্রিস্টান গোলাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করে নাও, মুসলিমদের বিভিন্ন কাজে আমরা যেন তোমার সহযোগিতা নিতে পারি। কেননা যে-ব্যক্তি মুসলমান না হয়, মুসলিমদের কাজেকর্মে

^{১০২} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/৪৯।

^{১০৩} . বাদায়িউস সালিক, ২/২৭।

^{১০৪} . হাফেয ইবনে হাজার তার আল-ইসাবাহ গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন।

আমরা তার সাহায্য নেওয়া পছন্দ করি না। তারপর যখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইনতিকালের সময় ঘনিয়ে এল। তিনি আমাকে মুক্ত করে দিলেন। আর বললেন, ‘এবার তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পার।’^{১০৫}

২.২। উমর রা.-এর প্রাদেশিক গভর্নরদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য

বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস, ইসলামী শরীয়তের সঠিক ইলম, আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা, উত্তম আদর্শ, সততা, যোগ্যতা, বীরত্ব ও সাহসিকতা, তাকওয়া ও দুনিয়াবিমুখতা, আত্মোৎসর্গের প্রেরণা, বিনয়, উপদেশ গ্রহণ, উদারতা, ধৈর্যশীলতা, অনুপ্রেরণা, সুউচ্চ মনোবল, দূরদর্শিতা, ন্যায়নিষ্ঠা, সুবিচার, আসন্ন বিপদ-আপদ থেকে মুক্তিলাভে পূর্ণ যোগ্যতা ও সক্ষমতার মতো উত্তম, উন্নত ও প্রশংসনীয় গুণাবলি ছিল উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গভর্নরদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যে তারা স্বতন্ত্র ও অনন্য মর্যাদা অর্জন করেছিলেন, আমরা এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা করব।

২.২.১। দুনিয়াবিমুখতা

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গভর্নরদের মধ্যে যারা তাকওয়া ও দুনিয়াবিমুখতার ক্ষেত্রে সিদ্ধি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সায়িদ ইবনে আমের ইবনে হুযাইম রাযিয়াল্লাহু আনহু, উমাইর ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু, সালমান ফারসি রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু। এমনকি কোনো কোনো গভর্নরের স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের দরিদ্রতা ও দুনিয়াবিমুখতার অভিযোগ নিয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট উপস্থিত হতেন। যেমন : মুয়ায ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী তার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গিয়েছিলেন। ঘটনার বিবরণ হলো, যাকাত বাবদ তিনি যা-কিছু উসুল করতেন, সেগুলো গরিব-মিসকিনদের মাঝে ভাগ করে দিতেন। নিজের জন্য কিছুই রাখতেন না। বসার জন্য যেই মাদুরটি তিনি কাঁধে করে নিয়ে

^{১০৫}. মাহযুস সাওয়াব, ২/৫১৪; আত-তাবাকাত, ৬/১৫৮।

যেতেন, সেটা নিয়েই ফিরে আসতেন। একবার তার স্ত্রী বললেন, ‘গভর্নররা বিভিন্ন সফর থেকে ফেরার সময় তাদের স্ত্রীদের জন্য কিছু-না-কিছু নিয়ে আসেন। আপনার আনা জিনিসগুলো কোথায়?’ মুয়ায ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, ‘আমার জন্য একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়েছিল।’ স্ত্রী বললেন, ‘আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বিশুদ্ধ ও আমানতদার ছিলেন। তবে কি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আপনার জন্য পাহারাদার নিযুক্ত করেছেন?’

তারপর তিনি তার প্রতিবেশীদের মাঝে বিষয়টি ছড়িয়ে দিতে থাকলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ করতে লাগলেন। একপর্যায়ে এই সংবাদ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকটও পৌঁছে গেল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুয়ায ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তলব করলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘মুয়ায, তোমার জন্য কি কোনো পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়েছিল?’ মুয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, ‘এটা বলা ছাড়া আমার স্ত্রীর হাত থেকে বাঁচার কোনো উপায় ছিল না আমার।’

ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন, তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হাসতে লাগলেন। আর মুয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কিছু মাল-সামানা দিয়ে বললেন, ‘এগুলো নিয়ে যাও। তাকে দিয়ে খুশি করে দাও।’^{১০৬}

২.২.২। বিনয়

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে প্রাদেশিক গভর্নরদের বিনয় ও বিনম্রতার কথা বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। এমনকি তারা যখন নিজ নিজ এলাকায় যেতেন, তখন সাধারণ জনগণ এবং তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যেত না। তাদের পোশাক, বাসস্থান, যানবাহন, সফর ইত্যাদি একেবারে সাধারণ মানুষের মতো থাকত। কোনো ব্যাপারেই তারা নিজেদের আলাদা করে রাখতেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতে আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একবার রোমান সম্রাট

^{১০৬} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/৫৩।

রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার জন্য আবু উবাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট একজন দূত পাঠালেন। সেই দূত মুসলিম-এলাকায় এলেন। এবং আবু উবাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গেলেন। কিন্তু তিনি আবু উবাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা করতে পারছিলেন না। আর তার এটাও জানা ছিল না যে তাদের মধ্যে আবু উবাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু আদৌ আছেন কি না। এ জন্য রাজদরবারের সাধারণ ভীতি ও আতঙ্ক তিনি অনুভব করছিলেন না। তাই তিনি মুসলিমদের সম্বোধন করে বললেন, ‘হে আরবের অধিবাসীগণ, তোমাদের আমির কোথায়?’ মুসলিমরা জবাব দিলেন, ‘এই তো, তিনিই আমাদের আমির।’

রোমান দূত লক্ষ্য করলেন তিনি ধনুকে ভর করে বসে আছেন। তার হাতে একটি তির। সেটা উলটে-পালটে দেখছিলেন। দূত আবু উবাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘আপনি কি তাদের আমির?’ আবু উবাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হ্যাঁ।’ দূত বললেন, ‘তাহলে আপনি জমিনে বসে আছেন কেন? আপনি যদি মসনদে বসতেন, তাহলে কি সেটা আল্লাহর সামনে আপনার অপদস্থতার কারণ হতো নাকি এটা আপনাকে ইহসান ও অনুগ্রহ থেকে ফিরিয়ে রাখত?’ আবু উবাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

আল্লাহ তা‘আলা সত্য বলতে লজ্জা করেন না। আমি তোমার কথা স্বীকার করছি। আমি দিনার-দিরহামের মালিক না। অন্যথায় আমার নিকট ঘোড়া, তির-তলোয়ার ছাড়া আরও কিছু থাকত। আজ সন্ধ্যায় আমার কিছু টাকার প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমার নিকট কিছুই ছিল না। এমন করুণ কঠিন সময়ে আমি আমার ভাই তথা মুয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট ঋণ চাই। তিনি আমাকে ঋণ প্রদান করেন। আমার নিকট যদি দামি মসনদ থাকত, উন্নত গালিচা থাকত তবু আমি আমার মুসলিম ভাই এবং বন্ধুদের রেখে তাতে বসতাম না। আমি বরং আমার মুসলিম ভাইদের তাতে বসাতাম। কারণ, তিনি হয়তো আল্লাহর নিকট আমার চেয়ে উত্তম। আমরা সবাই আল্লাহর বান্দা। আমরা জমিনে চলাফেরা করি। মাটির ওপর বসি। মাটিতেই পানাহার করি। মাটির ওপর ঘুমাই। এতে আল্লাহর নিকট আমাদের মর্যাদা এতটুকু হ্রাস পায় না। তিনি বরং এই

বিনয়ের কারণে আমাদের সাওয়াব বাড়িয়ে দেন। আমাদের মর্যাদা ও সম্মান বাড়িয়ে দেন। আর এই আমলের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তা'আলার সামনে বিনয় ও বিনম্রতা প্রদর্শন করি।^{১০৭}

২.২.৩। খোদাভীরুতা

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে অধিকাংশ গভর্নর চেষ্টা করতেন যেকোনো উপায়ে তিনি যেন প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে দূরে থাকতে পারেন। উতবা ইবনে গাযওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বসরার গভর্নরের পদ থেকে অব্যাহতি কামনা করেন। কিন্তু তিনি তার আবেদন মন্যুর করেননি।^{১০৮} এমনভাবে কাসকারের গভর্নর নুমান ইবনে বাশির রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গভর্নরের পদ থেকে অব্যাহতি কামনা করেন। এবং শাহাদাতের আশায় জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেন।^{১০৯} এভাবে আরও অনেক সাহাবীকে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু গভর্নর হওয়ার জন্য প্রস্তাব করেন কিন্তু তারা সকলেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন যুবাইর ইবনে আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করতে চাইলেন তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু আবদুল্লাহ, আপনি কি মিসরের গভর্নর হতে চান না? যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, মোটেই আমার এর প্রয়োজন নেই। আমি একজন সাধারণ মুজাহিদ এবং মুসলিমদের সাহায্যকারী হয়েই থাকতে চাই।^{১১০} একইভাবে তিনি যখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হিমসের গভর্নরের মৃত্যুর পর সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করতে চাইলেন, তখন তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন।^{১১১}

২.২.৪। সাবেক গভর্নরদের সম্মান

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগের গভর্নরদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা সাবেক গভর্নরদের সম্মান করতেন। কেবল উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর

^{১০৭} ফুতুহুশ শাম, আল-আজদি, ১২২, ১২৩।

^{১০৮} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/৫৪।

^{১০৯} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/৫৪।

^{১১০} ফুতুহুল বুলদান, বালায়ুরি, ২১৪।

^{১১১} আবু ইউসুফকৃত আলখারাজ, ২২, ২৩।

যুগেই না; বরং খুলাফায়ে রাশেদার সময়কার অধিকাংশ গভর্নরের মধ্যে এই গুণটি পাওয়া যেত। যেমন : খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখের ওপর শামের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসেন তখন তিনি এটা মোটেই চাচ্ছিলেন না যে আবু উবাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পেছনে রেখে নিজে নামাযের ইমামতি করবেন। এমনিভাবে যখন বৃহত্তর শামের মুসলিম সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ থেকে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বরখাস্ত করে তার জায়গায় আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়োগ করলেন, তখন আবু উবাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সম্মানে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিয়োগপত্রের বিষয়টি গোপন রাখেন। এবং এ-ব্যাপারে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কোনো কিছু অবগত করেননি। তারপর খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নামে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দ্বিতীয় পত্রটি আসে। তখনই তিনি বিষয়টি জানতে পারেন। এই ঘটনাটি তাকে না জানাবার কারণে আবু উবাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু অসন্তোষ প্রকাশ করেন।^{১১২}

ড. আবদুল আযিয আলউমারি লেখেন :

অনেক পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান সত্ত্বেও আমি প্রাদেশিক গভর্নরদের ব্যাপারে এমন কোনো ঘটনা পাইনি, যাতে কোনো গভর্নর তার সাবেক গভর্নরকে অসম্মান করেছেন। কিংবা তার বিরুদ্ধে কটু কথা বলেছেন; বরং তারা অধিকাংশ সময় দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পর সর্বপ্রথম যে ভাষণ দিতেন, তাতে সাবেক গভর্নরের প্রশংসা করতেন।^{১১৩}

২.৩। গভর্নরদের অধিকার

নিশ্চয় গভর্নরদের জন্য বিভিন্ন হক ও অধিকার রয়েছে, যার মধ্যে কিছুর সম্পর্ক জনগণের সঙ্গে আর কিছুর সম্পর্ক খলিফার সঙ্গে। এর বাইরে আরও কিছু অধিকার রয়েছে, যার সম্পর্ক বায়তুল মাল বা কোষাগারের

^{১১২} তারিখুল ইয়াকুবি, ২/১৩৯, ১৪০।

^{১১৩} আল-বিলায়াতু আল্লাল বুলদান, ২/৫৫।

সঙ্গে। আর এসব বস্তুগত ও ব্যক্তিগত অধিকারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য গভর্নরদের সহযোগিতা করা, যাতে তারা উত্তররূপে ইসলামের সেবা করতে পারেন এবং নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপে আনজাম দিতে পারেন। তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার নিয়ে আমরা এখানে আলোকপাত করব।

২.৩.১। গোনাহমুক্ত কাজে গভর্নরদের আনুগত্য

ইসলামী শরিয়ত সাধারণ মানুষের জন্য শাসক ও গভর্নরদের আনুগত্য আবশ্যিক সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٨﴾

হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করো তবে তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসুলের এবং সেসব লোকের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; তারপর যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হয়, তা উপস্থাপন করো আল্লাহ ও রাসুলের নিকট। এটাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।^{১১৪}

এই আয়াতে উলুল আমর এর আনুগত্যকে আবশ্যিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে সকল হাকিম ও গভর্নর আল্লাহর আহকাম ও বিধান কার্যকর করবে, তারা উলিল আমর বলে গণ্য হবে।^{১১৫} নিঃসন্দেহে আমির, হাকিম ও খলিফার আনুগত্য করা ওয়াজিব ও আবশ্যিক। তবে এই আনুগত্য হতে হবে আল্লাহর আনুগত্যের অনুকূলে। আর তারা যদি আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্যতার আদেশ করেন, তাহলে এ ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা জায়েয হবে না।^{১১৬}

^{১১৪} সূরা আন-নিসা, ৪:৫৯।

^{১১৫} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/৫৬।

^{১১৬} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/৫৬।

২.৩.২। গভর্নরদের জন্য কল্যাণকামনা

এক ব্যক্তি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এসে বলল, ‘আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহর ব্যাপারে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের প্রতি ক্রক্ষেপ না করা উত্তম নাকি নিজেকে নিরাপদ রাখা উত্তম?’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘যে-ব্যক্তি মুমিনদের কোনো কাজের দায়িত্বশীল হবে, তার জন্য উচিত হলো আল্লাহর (অধিকারের) ব্যাপারে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের প্রতি ক্রক্ষেপ না করা। আর যার এমন শক্তি না থাকবে, সে নিজেকে নিরাপদ রাখার চেষ্টা করবে এবং নিজের হাকিম ও গভর্নরদের কল্যাণ কামনা করবে।’^{১১৭}

২.৩.৩। গভর্নরদের নিকট সত্য সংবাদ পৌঁছানো

সাধারণ জনগণের জন্য আবশ্যিক হলো হাকিম ও গভর্নরদের নিকট সত্য ও সঠিক সংবাদ পৌঁছানো, হোক তার সম্পর্ক কোনো সাধারণ বিষয়ের সাথে কিংবা কোনো শত্রুরাষ্ট্রের সাথে অথবা হোক তার সম্পর্ক প্রাদেশিক গভর্নরদের অধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে। পাশাপাশি এসব সংবাদ যথাসম্ভব দ্রুত পৌঁছানো উচিত। বিশেষভাবে ঘটনার সম্পর্ক যদি হয় যুদ্ধের অবস্থা কিংবা শত্রুরাষ্ট্রের সাথে অথবা অধীন কর্মকর্তার প্রতারণা ও দুর্নীতি এবং এ-ধরনের যেসব বিষয়ের সম্পর্ক সরাসরি শাসকবর্গের সঙ্গে, সেসব বিষয় যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ে দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে অবহিত করা আবশ্যিক। কারণ, এটি মুসলিম উম্মাহর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়।^{১১৮}

২.৩.৪। গভর্নরের অবস্থানের প্রতি সমর্থন দান

গভর্নরের অবস্থান যদি জনগণের অনুকূলে এবং খলিফার সমর্থনে হয়, তাহলে গভর্নরকে সমর্থন দেওয়া এবং তাকে সাহায্য করা আবশ্যিক। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ-ব্যাপারে যথেষ্ট তাগিদ প্রদান করতেন। এ-ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে লক্ষ রাখতেন যাতে সাধারণ মানুষ গভর্নরদের

^{১১৭} আবু ইউসুফকৃত আলখারাজ, ১৫; আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/৫৭

^{১১৮} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/৫৭।

সম্মানিত মনে করে এবং তাদের যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি বিভিন্ন কর্মপন্থা অবলম্বন করতেন। এ জন্য তিনি কখনো কখনো গভর্নরদের সঙ্গে কঠোরতা প্রদর্শন করতেন। কিন্তু তিনি যখন উপলব্ধি করতেন সাধারণ মানুষের পক্ষ হতে কোনো গভর্নর বাড়াবাড়ির শিকার হচ্ছেন, কিংবা তিনি যদি এ-ধরনের কোনো বাড়াবাড়ির আশঙ্কা করতেন, তখন তিনি জালেম ও অপরাধীকে কঠিনভাবে পাকড়াও করতেন, যাতে মানুষের অন্তরে গভর্নরদের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং ইতর-বিশেষ সকলের লাগাম টেনে ধরা যায়।^{১১৯}

২.৩.৫। আমিরকে ইজতিহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান

আমীর ও গভর্নরদের এই অধিকার ছিল যে তারা ইজতিহাদি বিষয় ও মাসআলায় ইজতিহাদ করবেন, বিশেষ করে ওইসব বিষয়ে যেখানে ইসলামে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি অথবা এমন কোনো বিষয়, যে ব্যাপারে খলীফার পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনা বা গাইডলাইন নেই। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর একজন গভর্নর সৈন্যদল ও সৈনিকদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মাল বণ্টনে একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেটির অনুমোদন দেন। এটি খুবই প্রসিদ্ধ যে, ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু গভর্নর থাকাকালীন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিজস্ব ইজতিহাদী বিষয়সমূহের মধ্যে এক শতেরও বেশি বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন।^{১২০}

২.৩.৬। অপসারণের পর গভর্নরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

জনসাধারণের ওপর গভর্নরদের আরেকটি অধিকার হলো, তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির পরেও তাদের প্রতি সম্মান ও সমীহ করবে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন গভর্নরের পদ থেকে শুরাহবিল ইবনে হাসানা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বরখাস্ত করলেন, তখন তার বরখাস্ত করার কারণও বলে দিলেন। তারপর খোদ শুরাহবিল রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন জিজ্ঞাসা

^{১১৯} আল-বিলায়াতু আল্লাল বুলদান, ১/১৫২

^{১২০} ইলামুল মুআক্কিয়ীন, ২/২১৮

করলেন, আমীরুল মুমিনীন, আমার প্রতি অসন্তুষ্টির কারণে কি আমাকে এই পদ থেকে বরখাস্ত করলেন, তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, না, আমি বরং যেমনটি চেয়েছিলাম, তুমি ঠিক তেমনটিই। তবে এই পদের জন্য আমি আরও শক্তিশালী কাউকে খুঁজছিলাম।^{১২১}

এমনিভাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কুফার গভর্নরের পদ থেকে বরখাস্ত করলেন এবং তিনি মনে করলেন, সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা ও সম্মান রক্ষায় তার নামাযের ব্যাপারে অভিযোগকারীদের থেকে তাকে দূরে রাখাই শ্রেয়। অথচ সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন এবং সুন্নাহ অনুসরণ করেই তিনি নামাযের ইমামতি করতেন। মোটকথা, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সম্মান বজায় রাখার জন্যই তিনি তাকে নামাযের ইমামতি করতে বারণ করেন, যাতে তাকে জাহেলদের বেআদবি ও ধৃষ্টতার শিকার হতে না হয়।

২.৩.৭। গভর্নরদের বৈষয়িক অধিকার

গভর্নরদের কিছু বৈষয়িক বা বস্তুগত অধিকারও রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বেতন-ভাতা, যার মাধ্যমে তারা জীবনধারণ করবেন। সাহাবায়ে কেরাম বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদীন গভর্নরদের বেতন-ভাতার প্রতি বেশ গুরুত্ব প্রদান করতেন। তারা তাদের পূর্ণ অধিকার আদায় করতেন। পাশাপাশি আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের সাধারণ মানুষের প্রতি অমুখাপেক্ষী করে তুলতেন, যাতে তারা গভর্নরদের ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করতে না পারে এবং কেউ যেন তাদের ঘুষের চাকায় পিষ্ট করতে না পারে।^{১২২}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সব সময় চেষ্টা করতেন যাতে আমাদের গভর্নররা সাধারণ মানুষের সম্পদের প্রতি নির্লোভ ও অমুখাপেক্ষী থেকে জীবনযাপন করতে পারে। এবং তাদের সকলের নিকট এতটুকু সম্পদ

^{১২১} তারিখ আত-তাবারি, ৫/৩৯।

^{১২২} আল-বিলায়াতু আল্লাল বুদদান, ২/৬০।

থাকবে, যাতে সাধারণ মানুষের নিকট তাদের কখনো ধরনা দিতে না হয়। এ-বিষয়কার সম্ভাব্য শঙ্কা ও জটিলতার বিষয়টি তিনি ভালোভাবেই অনুভব করতে পেরেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, গভর্নরদের পবিত্র ও পঙ্কিলতামুক্ত রাখতে চাইলে, সাধারণ মানুষদের থেকে তাদের অমুখাপেক্ষী রাখতে চাইলে তাদের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। একবার আবু উবাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাঝে এই বিষয়ে কথা হয়েছিল। আবু উবাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমীরুল মুমিনীন, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের গভর্নর নিযুক্ত করে অসম্মানিত করছেন।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, ‘আবু উবাইদাহ, দ্বীনের নিরাপত্তার জন্য দ্বীনদারদের সাহায্য নেব না, তবে কাদের সাহায্য নেব বলো!’ আবু উবাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘যদি তা-ই করতে চান, তাহলে তাদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করে তাদের খেয়ানত ও প্রতারণা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।’^{১২৩}

আবু উবাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ-কথার উদ্দেশ্য হলো, সাহাবীদের যদি কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে তাদের জন্য যেন উপযুক্ত বেতন-ভাতাও নির্ধারণ করা হয়, যাতে তাদের মধ্যে প্রতারণা এবং সাধারণ মানুষদের থেকে অর্থ গ্রহণের চিন্তা-ভাবনাও না আসে।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার, এলাকার আমির ও হাকিম এবং সকল গভর্নর ও কর্মকর্তার জন্য তাদের কাজের ধরন অনুযায়ী বেতন-ভাতা প্রদান করতেন, যাতে তারা তাদের দায়িত্ব সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারেন।^{১২৪} এইমাত্র আলোচনা করা হয়েছে যে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার গভর্নরদের সাধারণ মানুষদের সম্পদ থেকে অমুখাপেক্ষী দেখতে চাইতেন। এ জন্য তিনি তাদের বলতেন, আমি আমাকে এবং তোমাদের বায়তুল মাল তথা সরকারি কোষাগারের জন্য এতিমের অভিভাবকের মতো মনে করি। তাই তোমাদের মধ্যে যারা ধনী ও বিত্তবান, তারা নিজেদের পবিত্র রাখবে আর যারা দরিদ্র ও বিত্তহীন, তারা যৌক্তিক উপায়ে সেখান থেকে সম্পদ গ্রহণ করবে।^{১২৫}

^{১২৩} আবু ইউসুফকৃত আলখারাজ, ১২২।

^{১২৪} আল-বিলায়াতু আল্লাল বুলদান, ১/১৪৯।

^{১২৫} তারিখুল মাদিনা, ২/৬৯৪; আল-বিলায়াতু আল্লাল বুলদান, ১/১৪৯।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রায় গভর্নর, সরকারি আমলা ও কর্মচারীদের জন্য গুরুত্বের সাথে বেতন-ভাতা নির্ধারণ করেন। সেই বেতন-ভাতা কখনো দৈনিক হিসাবে হতো, কখনো মাসিক হারে হতো আবার কখনো হতো বাৎসরিক হিসাবে। ইতিহাসের মৌলিক গ্রন্থাদিতে কিছু কিছু বেতন-ভাতার উল্লেখ পাওয়া যায়। তার মধ্যে কিছু ছিল রেশন আকারে আর কিছু ছিল নগদ মুদ্রা বা ক্যাশ টাকায়।^{১২৬}

বিভিন্ন বর্ণনার আলোকে প্রমাণিত হয়, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বিচার ও বায়তুল মালের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। উসমান ইবনে হানিফ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়েছিলেন ফুরাতের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহের ভূমির মাপজোখ ও পরিমাপ করার দায়িত্ব। আম্মার ইবনে ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নামাযের ইমামতি এবং সেনাবাহিনীর দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের সবাইকে দৈনিক একটি বকরি দেওয়া হতো। বকরির পা ও বাহুর অংশ পেতেন আম্মার ইবনে ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহু। কারণ, তিনি ছিলেন নামায ও সেনাবাহিনীর দায়িত্বশীল। এক-চতুর্থাংশ পেতেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। আর এক-চতুর্থাংশ পেতেন উসমান ইবনে হানিফ রাযিয়াল্লাহু আনহু। এমনিভাবে বিভিন্ন বর্ণনার আলোকে জানা যায় যে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য মিসরের গভর্নর থাকাকালে ২০০ দিনার বেতন ধার্য করেছিলেন।^{১২৭}

সালমান ফারসি রাযিয়াল্লাহু আনহু ৩০ হাজার লোকের শহর মাদাইনের গভর্নর ছিলেন। তার বেতন ধার্য করা হয়েছিল ৫ হাজার দিরহাম। কিন্তু তার যুহদ ও তাকওয়ার অবস্থা এই ছিল যে তিনি তার হাতের সামান্য রোজগার দিয়েই জীবনযাপন করতেন। আর বেতনের সম্পূর্ণ টাকা তিনি গরিব-দুঃখীদের সাদকা করে দিতেন।^{১২৮}

এ ছাড়াও বহু বর্ণনা রয়েছে, যাতে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গভর্নরদের মধ্যে বেতন-ভাতার বেশকম ও পার্থক্যের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। তবে

^{১২৬} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/১৫০।

^{১২৭} আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৪/২৬১।

^{১২৮} সিয়াকু আলামিন নুবালা, ১/৫৪৭।

এটা স্পষ্ট যে এই পার্থক্য নির্ভর করত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলের বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির উন্নয়ন ও পরিবর্তনের ওপর। তবে এই দাবি অযৌক্তিক যে তার শাসনামলের প্রথম দিন আমলা ও গভর্নরদের যেই বেতন ধার্য করা হয়েছিল, খেলাফতের শেষ দিন পর্যন্ত সেই বেতনই বহাল ছিল। কেননা, বিজিত অঞ্চলের সীমানা ও পরিধি এবং বায়তুল মালের সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতার কারণে তার অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্যে পরিবর্তন এসেছে এবং মানুষের প্রয়োজনাতিও বৃদ্ধি পেয়েছে।^{১২৯}

বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য শামের গভর্নর হিসাবে বার্ষিক ১০ হাজার দিনার বেতন ধার্য করেছিলেন। একই সাথে তিনি মুসলিম বাহিনীর বিভিন্ন দায়িত্বশীল এবং আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের উৎপাদিত ফসলের রাজস্ব হিসাবে ৯ হাজার, ৮ হাজার, ৭ হাজার দিনারের মতো করে বেতন দিতেন।^{১৩০}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কোনো কোনো গভর্নর তাদের পদপদবি ও দায়দায়িত্বের বিনিময় হিসাবে বেতন-ভাতা গ্রহণ করতে চাইতেন না। কিন্তু তিনি তাদের বরাবরই বেতন-ভাতা গ্রহণের পরামর্শ দিতেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে একবার তিনি তার এক গভর্নরকে বললেন, ‘কী ব্যাপার, তুমি তো মুসলিমদের একাধিক কাজের দায়িত্বশীল; কিন্তু যখনই তোমাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তুমি তা গ্রহণ করতে চাও না। এর দ্বারা তোমার কী উদ্দেশ্য?’

সেই গভর্নর বললেন, ‘আমার নিকট ঘোড়া আছে। গোলাম আছে। আমি বেশ প্রাচুর্য ও সচ্ছলতার মাঝেই আছি। এ জন্য আমি চাই আমরা পারিশ্রমিক মুসলিমদের মাঝে সাদকা করে দেওয়া হোক।’

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, ‘এমন করবে না। তুমি যা চাচ্ছ, আমার ইচ্ছা এমনই ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিভিন্ন সময় বকশিশ দিতেন। আমি বলতাম, এই অর্থ আমার

^{১২৯} আল-বিলায়াতু আল্লাল বুদদান, ২/৬৩।

^{১৩০} আবু ইউসুফকৃত আলখারাজ, ৫০; আল-বিলায়াতু আল্লাল বুদদান, ২/৬৩।

চেয়েও বেশি অভাবী মুসলমানকে দেওয়া হোক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি এগুলো গ্রহণ করো। আগে নিজের সম্পদ বানিয়ে নাও। তারপর তা সাদকা করে দাও। কোনোরূপ আশা-আকাঙ্ক্ষা ছাড়া এ রকম যে-সম্পদ পাবে, তা গ্রহণ করবে। এভাবে না এলে গ্রহণ করবে না।^{১৩১}

মোটকথা, গভর্নর, সরকারি আমলা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও বকশিশ দ্বারা খুশি রাখা এবং তাদের সাধারণ লোকদের সম্পদ থেকে অমুখাপেক্ষী রাখা ইসলামের অন্যতম মৌলিক নীতি, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কার্যকর করেছিলেন। রাসূলুল্লাহর পর খুলাফায়ে রাশেদীন এর ওপর আমল করেন। তারা সরকারি কর্মকর্তাদের সাধারণ লোকদের ধনসম্পদ থেকে দূরে রাখেন। তাদের সরকারি কর্মকাণ্ড এবং ইসলামী রাষ্ট্রের কল্যাণে কাজ করার সুযোগ দেন।^{১৩২}

২.৩.৮। আমলা ও গভর্নরদের অসুস্থতার সময় চিকিৎসা করানো

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে মুয়াইকিব রাযিয়াল্লাহু আনহু বায়তুল মালের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। একবার তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যার ব্যাপারেই শুনতেন যে তার নিকট এই রোগের চিকিৎসা আছে, তিনি তাকেই খুঁজে আনতেন এবং তার থেকে ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করতেন। ঘটনাক্রমে একবার ইয়ামান থেকে দুজন লোক এল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমাদের নিকট কি এই ভালো মানুষটির জন্য কোনো চিকিৎসা আছে? তার কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে।’

ইয়ামানিরা বলল, ‘এই রোগ একেবারে নির্মূল করে ফেলবে, এমন শক্তি-সামর্থ্য আমাদের নেই। তবে একটি ওষুধের মাধ্যমে আমরা তার চিকিৎসা করতে পারি, যার কারণে তার রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পাবে না এবং তিনি কিছুটা আরাম বোধ করবেন।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘রোগযন্ত্রণা যদি আর না-বাড়ে এবং ব্যথা-বেদনা যদি এখানেই থেমে

^{১৩১} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/৬৪; মুহাম্মদ কুরদকৃত আলইদারাতুল ইসলামিয়াহ, ৪৮।

^{১৩২} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/৬৪।

থাকে তবে এটা হবে অনেক বড় চিকিৎসা।’ ইয়ামানি লোক দুটো বলল, ‘এখানকার ভূমিতে কি মাকাল ফল উৎপন্ন হয়?’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হ্যাঁ, হয়।’ তারা বলল, ‘কিছু মাকাল ফল আনিয়ে নিন।’

তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কিছু লোককে মাকাল ফল আনতে বললেন। বড় দুই টুকরি মাকাল ফল আনা হলো। তারা মাকাল ফলগুলোকে কেটে দুই ভাগ করেন। তারপর মুয়াইকিব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে চিত করে শোয়ানো হলো। তারা দুজনে তার দুই পা শক্ত করে ধরেন এবং পায়ের তালুতে মাকাল ফল ঘষা শুরু করেন; একটি ফল ঘষা শেষ হলে আরেকটি নিয়ে ঘষতে থাকেন। একসময় মাকাল ফল ঘষা শেষ হলে তারা তাকে ছেড়ে দেয়। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের এই চিকিৎসা দেখে বিস্ময়ের সাথে বললেন, ‘সত্যিই এতে মুয়াইকিব-এর অসুখ আর বাড়বে না?’ বর্ণনাকারী বলেন, ‘আল্লাহর কসম, তারপর মুয়াইকিব রাযিয়াল্লাহু আনহু পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেন। বাকি জীবনে তার এ ব্যথা আর বাড়েনি।’^{১৩৩}

২.৪। গভর্নরদের দায়িত্ব

আল্লাহ তা‘আলা যেভাবে তাদের মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছিলেন, একই ভাবে তাদের কাঁধে অর্পণ করেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ অনেক দায়িত্ব। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের গুরুত্বপূর্ণ যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখতেন, তার বিবরণ এখানে উল্লেখ করা হলো।

২.৪.১। দীন প্রতিষ্ঠা

ইসলামের প্রচার-প্রসার, নামায কায়েম, দীন এবং তার মূলনীতি ও তার শাখাপ্রশাখা রক্ষণাবেক্ষণ, মসজিদ নির্মাণ, হজ-ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ, শরিয়ি দণ্ডবিধি কার্যকর করার মতো বিষয়গুলো দীন প্রতিষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত। এর প্রত্যেকটির ব্যাপারে এখানে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে।

ইসলামের প্রচার-প্রসার : উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকাল ছিল মহাবিজয়ের যুগ। এ জন্য অবস্থা ও সময়ের দাবি ছিল তার নিয়োগকৃত

^{১৩৩} আখবার উমর, আত-তানতাবিয়াত, ৩৪১।

গভর্নরগণ বিজিত অঞ্চলে অন্যান্য সাহাবীর সহযোগিতা নিয়ে ইসলামের প্রচার-প্রসারে অবদান রাখবেন।^{১৩৪}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে শামের গভর্নর ছিলেন ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি একবার এক পত্রে লেখেন :

শামের আবাদ অঞ্চল যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। শহরে লোকজনের উপস্থিতি বেড়ে গেছে। তাদের জন্য এমন ব্যক্তির প্রয়োজন, যিনি তাদের কুরআন শিক্ষা দেবেন। দ্বীনের ফিকহ ও ইলম শিক্ষা দেবেন। আপনি এমন একজন শিক্ষক পাঠিয়ে আমাদের সাহায্য করুন।

এই চিঠি পাওয়ার পর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু পাঁচ জন বিশিষ্ট আলেম সাহাবীকে সেখানে পাঠালেন।^{১৩৫}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে এ-কথা বেশ প্রসিদ্ধ যে তিনি গভর্নরদের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাবার সময় সাধারণ লোকদের বলতেন, হে লোকসকল, শুনে নাও। আল্লাহর কসম, আমি তাদের এ জন্য গভর্নর পাঠাচ্ছি না যে তারা তোমাদের চামড়া তুলে ফেলবে। আর তোমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেবে। তাদের বরং এ জন্য পাঠানো হচ্ছে, যাতে তারা তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে পারে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ সম্পর্কে অবগত করতে পারে।^{১৩৬}

আর তিনি গভর্নরদের সন্ধান করে বলতেন,

আমি তোমাদের মুসলিমদের ওপর যুলুম করতে, তাদের চামড়া তুলে ফেলতে গভর্নর বানিয়ে পাঠাচ্ছি না; বরং আমি তোমাদের এ জন্য এই দায়িত্ব অর্পণ করেছি, যাতে তোমরা মানুষকে নামায পড়াতে পার। কুরআন শিক্ষা দিতে পার।^{১৩৭}

^{১৩৪} ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন, ২/২৪৮।

^{১৩৫} সিয়াকু আলামিন নুবালা, ২/২৪৭।

^{১৩৬} আসসিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ, ১৫০।

^{১৩৭} আলমাওয়ারদিকৃত নাসিহাতুল মুলুক, ৭২; আল-বিলায়াতু আল্লাল বুলদান, ২/৬৫।

মোটকথা, তিনি বিভিন্ন ইসলামী শহর-নগরে বহু শিক্ষক ও মুবাল্লিগ পাঠিয়েছিলেন। তারা সেখানে গিয়ে বিখ্যাত-সব মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে।

নামায কায়েম : উমর ইবনুল খাতাব রাযিয়াল্লাহু আনহু তার গভর্নরদের উদ্দেশে পাঠানো পত্রে লিখতেন,

আমার নিকট তোমাদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, নামায প্রতিষ্ঠা করা। যে-ব্যক্তি নামাযের পাবন্দি করবে এবং অন্যদেরও করাবে, সে তার দীন হেফাজত করল। আর যে লোক নামায ছেড়ে দিল, সে অন্যান্য দ্বীনী ব্যাপারে অনীহা ও উদাসীনতা দেখাবে।^{১৩৮}

এমনিভাবে তিনি গভর্নরদের সাধারণ মানুষের ইমামতি করার তাগিদ দিতেন। তাদের বলতেন,

আমি তোমাকে এ জন্য গভর্নর বানাচ্ছি, যাতে তুমি মানুষদের নামায পড়াও এবং তাদের শরিয়তের ইলম ও কুরআন শিক্ষা দাও।^{১৩৯}

পাশাপাশি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু গভর্নর নিয়োগের ক্ষেত্রে যেসব নির্দেশনা প্রদান করতেন, তার মধ্যে এটাও ছিল যে অমুকে নামাযের ইমামতি করবে আর অমুকে যুদ্ধের নেতৃত্ব দেবে। এই নির্দেশনার আলোকে আম্মার ইবনে ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহুর দায়িত্ব ছিল নামাযের ইমামতি আর যুদ্ধের নেতৃত্ব প্রদান। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বিচার ও বায়তুল মালের প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছিল।^{১৪০}

যে-সকল ফকিহ ইসলামী রাজনীতি বিষয়ে কিতাব রচনা করেছেন, তারা আমিরদের নামাযের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। নামাযের পাবন্দির দ্বীন-দুনিয়ার সুফল ও উপকারিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।^{১৪১}

^{১৩৮} আততারিকাতুল হাকামিয়া, ২৪০; আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/৬৭।

^{১৩৯} নাসিহাতুল মুলুক, ৭২।

^{১৪০} আলআহকামুস সুলতানিয়া, ৩৩।

^{১৪১} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/৬৭।

দীন এবং তার মৌলিক বিষয়াবলির হেফাজত : উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের মূল বিষয়সমূহ যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, ঠিক সেভাবে তার হেফাজত ও সংরক্ষণের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ও যত্নবান ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনাত পুনরুজ্জীবিতকরণ ও এর ওপর আমল এবং বিদআতের মূলোৎপাটন ও আল্লাহর দীনের সম্মান ও মর্যাদা সমুন্নত রাখতে পূর্ণরূপে চেষ্টা-মেহনত করতেন। একবার একলোক কুরআন মাজীদে অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক আয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় প্রকাশ করত। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে দেশান্তর করার নির্দেশ দেন।^{১৪২} ইতিপূর্বে এ-ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শরীয়তের মৌলিক নীতিমালা রক্ষা করার জন্য উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্র রমযান মাসে জামাতের সঙ্গে তারাবির নামায পড়ার সাধারণ ঘোষণা জারি করেন।^{১৪৩}

একবার আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুর নামে এক পত্রে তিনি লেখেন :

শুনলাম তোমার ওখানকার কিছু লোক ‘ইয়া আলে যাক্বা’ তথা যাক্বার দোহাই দিয়ে জাহিলি যুগের লোকেদের মতো ডাকাডাকি করে। আমার চিঠি পাওয়ার পর তাদের বড়ধরনের আর্থিক জরিমানা করবে। কঠিন দৈহিক শাস্তি দেবে। এতে তারা সহীহ বুঝ না-পেলেও অন্তত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এ-ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে।^{১৪৪}

মসজিদ নির্মাণ : বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে কেবল আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন শহরে প্রায় ৪ হাজার মসজিদ নির্মাণ করা হয়। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গভর্নররাও তাদের শাসনাধীন বিভিন্ন এলাকায় মসজিদ নির্মাণ করেন। যেমন : ইয়াজ ইবনে গানাম রাযিয়াল্লাহু আনহু আলজাজিরার বিভিন্ন এলাকায় বহুসংখ্যক মসজিদ নির্মাণ করেন।

^{১৪২} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/৬৮।

^{১৪৩} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/৬৮।

^{১৪৪} মাওসুআতু ফিকহি উমর ইবনুল খাত্তাব, ১২৩।

হজ পালনের ব্যবস্থাপনা সহজ-সাধ্য করা : খেলাফতে রাশেদার যুগের সকল গভর্নর নিজ নিজ প্রদেশে এ-বিষয়ের দায়িত্বশীল ছিলেন যে তারা হাজি সাহেবদের জন্য হজের ব্যবস্থাপনা সহজ করবেন এবং তাদের জন্য হজের সমস্ত কাজ পরিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। তাই তারা হজ-কাফেলাগুলোর জন্য আমির নিযুক্ত করতেন। তাদের সফরের সময় নির্দিষ্ট করে দিতেন। যার ফলে হাজি সাহেবগণ গভর্নরদের অনুমোদনের পরেই কেবল শহর থেকে বের হতে পারতেন। পরবর্তী সময়ে ফকিহগণ গভর্নরদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের মধ্যে এ-বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করেছেন যে তাদের জন্য হাজি সাহেবদের গমনাগমনসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা আবশ্যিক। আল্লামা মাওয়ারদির উক্তি হলো, হাজি সাহেবদের নিজ নিজ তত্ত্বাবধানে রওনা করানো এবং তাদের দেখাশোনা করা গভর্নরদের দায়িত্বের আওতায় পড়ে। কারণ, এটা জনকল্যাণের একটি অংশ।^{১৪৫}

শরয়ি হদ বা দণ্ডবিধি কার্যকর : মিসরের গভর্নর আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু মিসরে উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর এক ছেলের ওপর শরয়ি দণ্ড কার্যকর করেন। তারপর খোদ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুও তাকে দোররা মেরে শাস্তি প্রদান করেন। বর্ণিত আছে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই শাস্তির কিছুদিন পরে তার সেই ছেলের মৃত্যু হয়।^{১৪৬}

খেলাফতের প্রথম দিকে গভর্নরদের এই অধিকার ছিল যে তারা খলিফার অনুমতি ছাড়াই কেসাস কার্যকর করতে পারতেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু গভর্নরদের জন্য এই মর্মে আদেশ জারি করেন যে আমার অনুমতি ছাড়া কারও ওপর কেসাসের হদ কার্যকর করবে না।^{১৪৭} এর পর থেকে গভর্নরগণ কেসাস কার্যকর করার পূর্বে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অনুমতি গ্রহণ করতেন। কেননা, শরয়ি দণ্ডবিধি প্রয়োগ দুনিয়া ও আখেরাত—উভয়ের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। এ-কারণে তারা দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ের প্রতি যেভাবে গুরুত্ব প্রদান করতেন, এ ক্ষেত্রেও তারা সমান গুরুত্ব প্রদান করতেন।^{১৪৮}

^{১৪৫} আলআহকামুস সুলতানিয়া, ৩৩।

^{১৪৬} ইবনুল জাওযিকৃত মানাকিবু উমর ইবনুল খাত্তাব, ২৪০, ২৪২।

^{১৪৭} আলওয়াসাইকুস সিয়াসিয়াতি লিল আহদিন নাববি ওয়াল খিলাফাতির রাশিদা, ৫২১।

^{১৪৮} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/৭০।

২.৪.২। জনসাধারণের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

প্রদেশজুড়ে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা গভর্নরদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তারা একে সুদৃঢ় ও নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যম অবলম্বন করবেন। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো অপরাধী, ফাসেক ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের ওপর তাদের কৃতকর্মের জন্য শরিয়ি দণ্ডবিধি কার্যকর করা, যাতে সাধারণ মানুষের জীবনমান ও ধনসম্পদ বিনষ্টকারী অপরাধের মূল উপড়ে ফেলা যায়।^{১৪৯}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এক পত্রে লেখেন :

ফাসেক ও অপরাধীদের ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে রাখবে। তাদের এক হাত এক পা কেটে শাস্তি দেবে।^{১৫০}

এ কথা স্পষ্ট যে ইসলামী রাষ্ট্র ও শহর-নগরে শান্তি ও নিরাপত্তা বহাল রাখার ক্ষেত্রে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফরয বিধান অব্যাহত রাখার অনেক বড় প্রভাব ও অবদান রয়েছে।^{১৫১}

২.৪.৩। আল্লাহর পথে জিহাদ

আমরা যদি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালের সূচনাকাল থেকে নিয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকাল পর্যন্ত সময়কার আমির ও গভর্নরদের প্রতি হালকাভাবে দৃষ্টি বুলাই, তাহলে বিভিন্ন অঞ্চল বিজয়ের ক্ষেত্রে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কীর্তি ও অবদান সুস্পষ্টরূপে দেখতে পাব। অধিকন্তু যেসব অঞ্চল সে-সময় পর্যন্ত বিজিত হয়নি, সেখানকার লোকেরা তাদের বাহিনীর কমান্ডারদের সেই দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করত। তারাও সেদিকে ছুটে যেতেন। এবং সেসব অঞ্চল জয় করতেন। তারপর তারা সেখানকার শৃঙ্খলা ও পুনর্গঠনে

^{১৪৯} আল-বিলায়াতু আলাল বুদদান, ২/৭০।

^{১৫০} উয়ুনুল আখবার, ১/১১।

^{১৫১} আল-বিলায়াতু আলাল বুদদান, ২/৭১।

মনোযোগ দিতেন। এ ক্ষেত্রে শামদেশীয় মুসলিম বাহিনীর প্রধান আবু উবাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু, আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু, ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং শুরাহবিল ইবনে হাসানা রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে ছিলেন ইরাক অঞ্চলীয় বাহিনীর প্রধান মুসান্না ইবনে হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহু, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু, ইয়াজ ইবনে গানাম রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ।^{১৫২}

খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়কার গভর্নরদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, তারা তাদের রাজ্যের পুনর্গঠন ও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানেও একজন বাহাদুর মুজাহিদের ন্যায় অংশগ্রহণ করতেন। প্রাদেশিক অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য তাদের যুদ্ধযাত্রার পথে মোটেই অন্তরায় হতো না। মুজাহিদদের তৎপরতা ও কার্যক্রম আরও বেগবান করার জন্য গভর্নরদের যেসব কীর্তি ও অবদান ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে, সেরকম কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিচে উল্লেখ করা হলো।

যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্যকারী বাহিনী পাঠানো : এই সাহায্যকারী বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ যেসব কাজ আনজাম দিয়ে থাকে, তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

রাজ্যের পক্ষ হতে শত্রুদের প্রতিহত করা : উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার দায়িত্ব হলো তোমাদের সীমান্ত নিরাপদ রাখা।

শহর-নগরে দুর্গ নির্মাণ করা : উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মিসরের জিজা নগরীতে আগমনকারী বিজয়ীদের সেখানে দুর্গ নির্মাণ করার আদেশ দিয়েছিলেন, যাতে শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়।^{১৫৩}

শত্রুর গতিবিধির প্রতি লক্ষ রাখা : আবু উবাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে, শামের বিভিন্ন শহরে রোমান বাহিনীর গোপন সৈন্যসমাবেশ ঘটাবার ব্যাপারে তিনি সতর্ক থাকতেন। সব সময় তিনি তাদের গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। গোপন খবরের ভিত্তিতে তিনি

^{১৫২} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/৭১।

^{১৫৩} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/৭৭।

শত্রুসেনাদের চমকে দেওয়ার জন্য পরকল্পিতভাবে সেনাদলকে পশ্চাৎপদ হতে বলতেন।^{১৫৪}

ইসলামী শহরগুলোতে জঙ্গি ঘোড়া সরবরাহ করা : ইসলামী শহরগুলোতে জিহাদের জন্য তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী জঙ্গি ঘোড়ার সরবরাহ-ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে সমগ্র রাজ্যে একটি সাধারণ রীতি জারি ছিল। এই নীতি বাস্তবায়ন করার জন্য উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বসরার কিছু লোকের জন্য জমিজমার ব্যবস্থা করে দেন, যাতে তারা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ঘোড়া লালনপালন করতে পারে এবং সেগুলোকে যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষিত করে তুলতে পারে।^{১৫৫}

শিশুদের শিক্ষা এবং তাদের জিহাদের জন্য তৈরি করা : উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকদের নিকট চিঠি প্রেরণ করেন। তাতে তাদের ছেলেমেয়েদের অশ্ব পরিচালনা, সাতার এবং তির নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ দিতে নির্দেশ জারি করেন। সিরিয়াতে এক বালক প্রশিক্ষণের সময় তীরের আঘাতে আহত হয় এবং মৃত্যুবরণ করে। লোকেরা এ বিষয়ে খলীফাকে অবহিত করলেও তার এই নির্দেশের কোনো পরিবর্তন হয়নি।^{১৫৬}

সৈনিকদের নথিপত্র পর্যবেক্ষণ : উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সৈনিকদের জিহাদে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত নথিপত্র সংরক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মনে করতেন, শত্রুসীমানার নিকটবর্তী এলাকায় এই নথিপত্র সংরক্ষণ খুবই জরুরি। কারণ, এসব এলাকার সৈনিকদের প্রতিনিয়ত জিহাদে শরীক হতে হতো।^{১৫৭}

সামরিক নথিপত্র সংরক্ষণে ব্যক্তিগতভাবে গভর্নরগণ সরাসরি দায়বদ্ধ ছিলেন, যদিও এ বিষয় দেখভাল করার জন্য আলাদা লোক নিযুক্ত ছিল। গভর্নরগণ যেহেতু একই সাথে সামরিক কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করতেন, এ জন্য তারা খলীফার প্রতিনিধি হিসাবে এসব নথিপত্র সংরক্ষণে দায়ী ছিলেন।^{১৫৮}

^{১৫৪} ইবনে আসাম, আলফুতুহ, ২১০।

^{১৫৫} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/৭৪।

^{১৫৬} আল-ওয়াসাইকুস সিয়াসিয়া লিল আহদিন নববী ওয়াল খিলাফাতির রাশিদাহ, পৃ. ৪৮৬।

^{১৫৭} আন-নাযমুল ইসলামিয়া, সুবহি আস-সালিহ, পৃ. ৪৮৮, ৪৯১।

^{১৫৮} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/৭৭।

চুক্তি সম্পাদন : সিরিয়ার কিছু অঞ্চলের সঙ্গে আবু উবাইদা ইবনুল জাররা রাযিয়াল্লাহু আনহুর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়; একই ঘটনা ইরাকের গভর্নরদের বেলায়ও সংঘটিত হয়, যেমন : সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবু মূসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আরও অনেকে। এতৎসঙ্গে গভর্নরগণ যিম্মিদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অধিকার রক্ষা এবং শরীয়ত অনুযায়ী চুক্তি বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রেও দায়বদ্ধ ছিলেন।^{১৫৯} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যিম্মিদের অধিকার সঠিকভাবে সংরক্ষণ করেন এবং বলেন, ‘আমি তোমাদের ওইসব লোকদের যত্ন নিতে বলি, যারা আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিরাপত্তায় রয়েছে। তাদের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা তোমাদের নৈতিক দায়িত্ব এবং তাদের ওপর সাধ্যের অতীত বোঝা আরোপ করবে না।’^{১৬০}

২.৪.৪। জনগণের ভাতাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে কঠোর পরিশ্রম

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘যদি আমি হায়াত পাই, তাহলে আমার মৃত্যুর পর ইরাকের বিধবাদের কারও নিকট মুখাপেক্ষী করে যাব না।’ রমাদাহর বছরে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আচরণ ভুলে গেলে চলবে না যখন চারিদিকে দুর্ভিক্ষ প্রকট আকার ধারণ করেছিল। তিনি রাষ্ট্রের সকল সম্পদ যথাযথভাবে বণ্টন করে দুর্ভিক্ষ কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করেন এবং ক্ষুধার্তদের অন্ন সরবরাহ করেন। বাইহাকী তার সুনান কিতাবে বর্ণনা করেন, আর-রামাদাহর দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের পেছনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খরচ করতে থাকেন যতদিন না বৃষ্টি হয় এবং তারা মদীনা থেকে স্বদেশে ফিরে যেতে থাকে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের সঙ্গে বের হন। এ-সময় তিনি ঘোড়ায় চড়ে তাদের চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। বনু মুহারিব ইবনে খাসফাহ গোত্রের একজন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসা করে বলে উঠল, ‘আমি সাক্ষী দিচ্ছি, আপনি এখন দায়ভার মুক্ত এবং আপনি কোনো কৃতদাসীর সন্তান নন।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে জবাবে বলেন, ‘তোমার জন্য দুর্ভোগ, আমি তোমার এই প্রশংসা গ্রহণ করতাম যদি আমি এ কাজে আমার নিজের অথবা আল-খাতাবের সম্পদ ব্যয় করতাম। কিন্তু আমি তো আল্লাহর

^{১৫৯} প্রাগুক্ত, ২/৭৭।

^{১৬০} মাওসুআতু ফিকহি উমর ইবনুল খাতাব, পৃ. ১৩৩।

সম্পদ ব্যয় করেছি।”^{১৬১} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আরও বলেন, ‘আমার ওপর তোমাদের এই অধিকার যে, আমি তোমাদের নিকট থেকে কোনো টাক্স আদায় করব না এবং সঠিক পদ্ধতির বাইরে আল্লাহ তোমাদের যে যুদ্ধলব্ধ গনীমত (ফায়) দিয়েছেন তা থেকে কিছুই নেব না। আমার ওপর তোমাদের এই অধিকার যে, আমি যদি তোমাদের নিকট থেকে কিছু আদায় করি, তাহলে সঠিক পদ্ধতি ছাড়া সেগুলো ব্যয় করব না। আমার ওপর তোমাদের এই অধিকার যে, আমি তোমাদের ভাতা এবং রসদ সরবরাহ ইনশাআল্লাহ বৃদ্ধি করেই যাব।’^{১৬২}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে সাংগঠনিকভাবেই প্রতিনিয়ত জনগণের ভাতা বণ্টন করা হতো। এটি কেবল লোকালয়ের বসতিদের জন্যই প্রযোজ্য ছিল না; বরং তিনি দূর মরুভূমিতে বসবাসরত বিভিন্ন গোত্রের লোকদেরও ভাতা প্রদান করতেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনার নিকটবর্তী গোত্রের নিকট গমন করতেন এবং নিজেই তাদের ভাতা বণ্টন করে দিতেন। আবার তিনি তার গভর্নরদের কয়েকজনকে চিঠি লিখে ভাতা ও রসদ বণ্টনের নির্দেশ দিতেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু চিঠিতে উল্লেখ করতেন যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য নির্ধারিত গনীমতের সম্পদ; এগুলো উমর কিংবা তার পরিবারের জন্য নয়। সুতরাং এগুলো লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দাও।^{১৬৩}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকদের প্রাপ্য বণ্টন করেই ক্ষান্ত হতেন না; বরং তিনি নিশ্চিত হতেন যে, তারা যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য-দ্রব্য লাভ করেছে। সিরিয়া সফরের সময় তার নিকট বিলাল ইবনে রাবাহ এসে বলেন, ‘হে আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহর কসম, সিরিয়ায় সামরিক বাহিনীর কমান্ডারগণ পাখির গোশত আর মসৃণ রুটি ছাড়া অন্য কিছু ভক্ষণ করে না। অথচ সাধারণ জনগণ এসব কিছুই পায় না।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করেন, ‘বিলাল যা বলছে তা কি সত্য?’ ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান বলেন, ‘হে আমীরুল মুমিনীন, এ দেশে খাদ্য-দ্রব্যের দাম কম এবং বিলাল যেসব খাদ্যেও কথা বলেছে, সেগুলো আমাদের পরিবারের খরচ নির্বাহের জন্য যা দেওয়া হয়, তা দিয়ে সেগুলো কেনা সম্ভব।’ উমর

^{১৬১} সুনান, বায়হাকি, ৬/৩৫৭; মাওসুআতু ফিকহি উমর ইবনুল খাত্তাব, পৃ. ১৩৫।

^{১৬২} মাওসুআতু ফিকহি উমর ইবনুল খাত্তাব, পৃ. ১৩৭।

^{১৬৩} আল-বিলায়াতু আল্লাল বুলদান, ২/৭৭।

রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহর কসম, প্রতিমাসে মুসলমানদের রসদ সরবরাহের নিশ্চয়তা না দেওয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে যাব না।’ তারপর তিনি বললেন, ‘দেখো তো তার পছন্দের খাদ্য-দ্রব্য কিনতে কত প্রয়োজন।’ তারা বলল, ‘প্রতিমাসের শুরুতে দুই সা পরিমাণে গম এবং এর সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে যয়তুন ও সিরকা।’ সুতরাং তারা খলীফাকে এ পরিমাণ ভাতা ও রসদ প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে। তারপর তিনি বলেন, ‘হে মুসলিম লোকসকল, এটি তোমাদের প্রাপ্ত ভাতার অতিরিক্ত। আমি যা বরাদ্দ দিয়েছি, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা যদি প্রতিমাসে তা তোমাদের প্রদান করে, তাহলে ভালো এবং আমি তা-ই চাই। আর যদি তারা তা না করে, তাহলে আমাকে অবহিত করবে। আমি তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে দায়িত্বে নিয়োজিত করব।’^{১৬৪}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যেক প্রদেশে খাদ্য-দ্রব্যের সরবরাহও নিশ্চিত করতেন। বাজার-দর পর্যবেক্ষণ ও শস্য মজুদ করে রাখতে নিষেধ করতেন। তার গভর্নরগণও নিয়মিত বাজার-দর পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন দেশ সফর করে মুসলমানদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি স্থানীয় বাজারে সহজলভ্য করার তাগিদ দিতেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার গভর্নরগণ নিশ্চিত খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহ এবং বাজার-দর পর্যবেক্ষণ করেই ক্ষান্ত হতেন না; বরং বসবাসের জন্য বাড়ি-ঘর নির্মাণ ও তা বণ্টনের দায়িত্ব প্রতিটি শহর ও লোকালয়ে গভর্নরদের ওপরই ন্যস্ত ছিল। যখনই কোনো নতুন শহরের গোড়াপত্তন করা হতো, তিনি সেখানে লোকদের বসবাসের জন্য ভূমি বণ্টন করে দিতেন। কুফা, বসরা এবং ফুস্তাতে এমনই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। হিমস, দামেস্ক, আলেকজান্দ্রিয়া ইত্যাদি বিজিত এলাকায় অধিকৃত বাড়ি-ঘর বণ্টনেও গভর্নরগণ দেখভাল করতেন।^{১৬৫}

২.৪.৫। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ

গভর্নরদের আরেকটি অন্যতম দায়িত্ব ছিল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ দায়িত্ব তাদের ওপরই অর্পণ করা হতো।

^{১৬৪} ফুতুহুশ শাম, আল-আজদি, পৃ. ২৫৭; আল-বিলায়াতু আল্লাল বুলদান, ২/৭৮;

^{১৬৫} ফুতুহুল বুলদান, বালায়ুরি, পৃ. ১৪৩, ২২৪।

একটি প্রদেশ সাধারণত একটি রাজধানী, অন্যান্য শহর ও এলাকা নিয়ে গঠিত হতো। এ জন্য প্রদেশজুড়ে সরকারি কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করা জরুরি ছিল। এ জন্য গভর্নরগণ তাদের প্রতিনিধি হিসাবে সেসব এলাকায় সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিযুক্ত করতেন। তারা স্থানীয় নেতা কিংবা রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে কাজ করত। এ ধরনের নিয়োগ সাধারণত খলীফা ও গভর্নরদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতেই সম্পন্ন হতো।^{১৬৬}

২.৪.৬। যিম্মিদের নিরাপত্তা

যিম্মিদের দেখভাল করা, তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন, শরীয়ত অনুযায়ী তাদের অধিকার নিশ্চিত করা, মুসলমানদের প্রতি যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করা, তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ, তাদের ওপর অন্যায়-অবিচার সংঘটিত হলে শরীয়ত অনুযায়ী এর প্রতিকার করা—এসবই ছিল গভর্নরদের দায়িত্ব। খলীফাগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যিম্মিদের সঙ্গে কোনো চুক্তি করার আগে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু শর্তারোপ করতেন। তারপর তারা তার নিশ্চয়তা দিতেন এবং তাদের সেগুলো অনুসরণ করার নির্দেশ দিতেন।^{১৬৭}

২.৪.৭। বিজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করা এবং সমাজের প্রসিদ্ধ লোকদের সম্মান করা

ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত বিজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। গভর্নরগণ এ মূলনীতি মেনে চলতেন এবং যখনই কোনো পরামর্শের প্রয়োজন হতো, তখন বিজ্ঞদের ডেকে পরামর্শ-সভার আয়োজন করতেন। তিনি তার গভর্নরদের প্রতিনিয়ত বিজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ^{১৬৮} এবং তাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতেও নির্দেশ দিতেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এক চিঠিতে মূসা আল-আশআরী

^{১৬৬} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/৭৯;

^{১৬৭} প্রাগুক্ত, ২/৮০;

^{১৬৮} প্রাগুক্ত।

রাযিয়াল্লাহু আনহুকে লেখেন, ‘আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি সকল শ্রেণির লোকদের তোমার কাছে আসার অনুমতি দাও। এই চিঠি তোমার হস্তগত হওয়ার পর থেকে কেবল সমাজের বিজ্ঞ লোক, কুরআনে পারদর্শী, ধার্মিক ও একনিষ্ঠ লোকদেরই প্রথমে আসতে দেবে। তারা তাদের নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করার পর সাধারণ জনগণকে আসার নির্দেশ দেবে।’ তিনি আরও লেখেন, ‘লোকজন সাধারণ তাদের সমস্যা-সমাজের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নিকট উপস্থাপন করে থাকে। সুতরাং এসব ব্যক্তিদের সম্মান করবে। এতে সমাজের দুর্বল মুসলমানদের সঙ্গে ন্যায়সংগত আচরণ ও সম্পদ বণ্টন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে।’^{১৬৯}

২.৪.৮। প্রদেশের উন্নতিতে অবদান

গভর্নর থাকাকালীন সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু কয়েকজন পার্সিয়ান নেতার অনুরোধে কৃষকদের সুবিধার্থে একটি খাল খনন করেন।^{১৭০} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বসরার লোকদের জন্য অনুরূপ একটি খাল খনন করার জন্য আবু মূসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দেন। আবু মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু বসরার অধিবাসীদের পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে চার ফারসাখ^{১৭১} দীর্ঘ একটি খাল খনন করেন।^{১৭২} কুফা, বসরা ও ফুস্তাতে শহরের গোড়াপত্তনের আগে গভর্নরগণ শহরের রাস্তা-ঘাট, ভূমির সঠিক বণ্টন, মসজিদ নির্মাণ, পানির সরবরাহ এবং অন্যান্য সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণের ব্যাপারে গুরুত্ব দেন। শত্রুর নিকটবর্তী অঞ্চল কিংবা অন্য কোনো কারণে এসব এলাকায় বসতি তোলার ক্ষেত্রে লোকজনের তেমন আগ্রহ ছিল না। গভর্নরগণ লোকদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতে থাকেন। এ জন্য তাদের ভাতা ও জমি বরাদ্দ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু আনতাকিয়া ও মেসোপটমিয়ার কিছু অঞ্চলে লোকজনের আবাস গড়ে তুলতে অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দেন।

^{১৬৯} নাসিহাতুল মুলুক, আল-মাওয়ারদি, পৃ. ২০৭; মাওসুআতু ফিকহি উমর, পৃ. ১৩৪।

^{১৭০} ফুতুহুল বুলদান, বালায়ুরি, পৃ. ২৭৩; আল-বিলায়াতু আল্লাল বুলদান, ২/৮৭।

^{১৭১} এক ফারসাখ = তিন মাইল।

^{১৭২} ফুতুহুল বুলদান, বালায়ুরি, পৃ. ৩৫১, ৩৫২।

২.৪.৯। প্রদেশের সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রতি গুরুত্বারোপ

প্রদেশ থেকে কোনো প্রতিনিধিদল মদীনায়ে এলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের গভর্নরও সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন এবং তারা তাদের ভালো ছাড়া মন্দ কিছু বলত না। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন সুনির্দিষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করতেন, তিনি কি অসুস্থদের দেখতে যান? তারা বলত, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করতেন, কোনো দাস-দাসী অসুস্থ হলে তিনি কি তাদের দেখতে যান? এবং তারা জবাবে হ্যাঁ বলত। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবার জিজ্ঞাসা করতেন, তিনি দুর্বলদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেন? তারা কি তার বাড়িতে প্রবেশের অনুমতির জন্য অপেক্ষায় থাকে? এসব প্রশ্নের কোনো একটিতে তারা না-বোধক জবাব দিলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওই গভর্নরকে বরখাস্ত করতেন।^{১৭৩} যদি কোনো গভর্নর অসুস্থদের দেখতে না যান কিংবা দুর্বলদের গুরুত্ব না দেন—এটা জানতে পারলেই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ওইসব গভর্নরকে পদচ্যুত করতেন।^{১৭৪} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এটাও চাইতেন যে, তার নিযুক্ত গভর্নরগণ জনগণের প্রতি বিনয়ী হবে যাতে লোকজন তাকে তাদের মতোই একজন মনে করে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আশা করতেন, তার গভর্নরগণ দেশের সাধারণ জনগণের মতোই বাহন ব্যবহার করবে এবং একই পোশাক পরিধান করবে। তিনি তাদের বাড়িতে দারোয়ান কিংবা প্রহরী নিযুক্ত করতে নিষেধ করতেন।^{১৭৫}

২.৪.১০। আরব-অনারবের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ

গভর্নরগণ তাদের অধীন সব শ্রেণির মানুষের সঙ্গে ন্যায়সংগত আচরণ করতে বাধ্য ছিলেন। আরব এবং অনারব মুসলমানদের মধ্যে বৈষম্যমূলক কোনো আচরণ করার সুযোগ ছিল না। একবার কিছু লোক উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এক গভর্নরের নিকট এলে গভর্নরও আরব মুসলমানদের হাদিয়া-তোহফা প্রদান করেন। কিন্তু অনারব মুসলমানদের কিছুই দেননি। এ সংবাদ পেয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে লিখে

^{১৭৩} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/৮২।

^{১৭৪} প্রাগুক্ত।

^{১৭৫} প্রাগুক্ত।

পাঠান, ‘এটা খুবই ঘৃণিত কাজ যে, কেউ তার মুসলিম ভাইদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে।’ আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি লেখেন, ‘তুমি কেন তাদের সাথে একই আচরণ করোনি?’^{১৭৬}

ইসলামে এমন আরও অনেক মানবিক দায়িত্ব রয়েছে। যেমন : চুক্তি বাস্তবায়ন করা, দায়িত্বসচেতন হওয়া, প্রতিমুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ রাখা যে, তিনি সবকিছু দেখছেন, ভালো ও ন্যায়সংগত কাজে অন্যকে সহায়তা করা, আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলিম ও সমাজের নেতৃবৃন্দের প্রতি অনুগত ও নিষ্ঠাবান থাকা—এগুলোতে সবার জন্যই উপকার নিহিত রয়েছে।^{১৭৭} ব্যক্তিগতভাবে এসব অনুসরণ করার পরেও গভর্নরগণ নিজ নিজ প্রদেশে খুতবা, লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে তা প্রচার-প্রসার করার দায়িত্বও পালন করতেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে গভর্নরগণ এসব মানবিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সকলের নমুনা ও আদর্শ ছিলেন—ব্যক্তিগতভাবেও এবং পারস্পরিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রেও।^{১৭৮}

২.৫। প্রদেশে দোভাষীর প্রয়োজনীয়তা এবং গভর্নরদের কর্মঘণ্টা

২.৫.১। প্রদেশে দোভাষীর প্রয়োজনীয়তা

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে গভর্নরদের সাহায্য করার একটি প্রক্রিয়া ছিল তাদের জন্য দোভাষী নিযুক্ত করা। অনেক ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থেই এটি খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ত। একবার উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইরাকের গভর্নরকে কয়েকজন পার্সিয়ান গোত্রপ্রধানকে মদীনা পাঠাতে বলেন, যাতে তাদের সঙ্গে খারাবের ব্যাপারে আলোচনা করা সম্ভব হয়। ইরাক থেকে এসব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একজন দোভাষীও প্রেরণ করা হয়।^{১৭৯} বর্ণিত আছে, আল-মুগিরা ইবনে শুবাহ সামান্য একটু পার্সিয়ান ভাষা রপ্ত করেছিলেন এবং তিনিই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হরমুযের মধ্যে কথোপকথন ভাষান্তরে সাহায্য করেন।^{১৮০}

^{১৭৬} আল-ওয়াসাইকুস সিয়াসিয়া লিল আহদিন নববী ওয়াল খিলাফাতির রাশিদাহ, পৃ. ৫২৩।

^{১৭৭} আন-নাজরিয়াতুস সিয়াসিয়াতুল ইসলামিয়া, মুহাম্মাদ দিয়ার রিস, পৃ. ৩০৭-৩০৮।

^{১৭৮} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/৮৫।

^{১৭৯} আল-খারায়, আবু ইউসুফ, পৃ. ৪০-৪১; আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/১০৫।

^{১৮০} প্রাপ্ত।

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এবং এর পূর্বেও অনুবাদক ও দোভাষীদের খুব কদর ছিল। স্মৃতব্য যে, খারায়ের নথিপত্রসমূহ আরবি ভাষায় লেখা হতো না। এ থেকে বোঝা যায়, অনুবাদ সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা ছিল ব্যাপক। আর প্রশাসনে খারায়ের বেশিরভাগ কর্মকর্তা ছিলেন পারসিক অথবা অনারব। ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে নওমুসলিমদের বিস্তৃতির কারণে বিচারকার্য ও অন্যান্য বিষয়ে দোভাষীদের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে মুসলিম সেনাপতিদের—যারা বেশিরভাগ গভর্নর ছিলেন—বিজিত অঞ্চলে লোকজনের সঙ্গে কথোপকথনে দোভাষী ছিল প্রধান মাধ্যম।^{১৮১}

২.৫.২। গভর্নরদের কর্মঘণ্টা

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কোনো কর্মঘণ্টা নির্ধারিত ছিল না। খলীফা এবং গভর্নরগণ দিন-রাত কাজ করতেন এবং তাদের বাড়ির দরজায় কোনো প্রহরী নিযুক্ত ছিল না। তাদের কেউ রাতে শহরে টহল দিতেন এবং এ ব্যাপারে তাদের জন্য নমুনা ছিলেন স্বয়ং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেই। তিনি মদীনায় রাতে হেঁটে হেঁটে টহল দেওয়ার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। লোকেরা বিভিন্ন সময় গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে আসত, তাকে তাদের প্রয়োজন মেটাতে অনুরোধ করত এবং অসময়েও তারা এ কাজে কোনো বাধার সম্মুখীন হতো না। গভর্নররা যেকোনো কাজ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে খুবই পরিচিত ছিলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ ব্যাপারে আবু মূসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এক চিঠিতে লেখেন, ‘আজকের কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে রেখো না। এতে কাজ জমে যাবে এবং তুমি তোমার লক্ষ্যে উপনীত হতে ব্যর্থ হবে।’^{১৮২}

^{১৮১} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/১০৪।

^{১৮২} মানাকিবু আমীরুল মুমিনিন, ইবনে আল-জাওযি, পৃ. ১২৯।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গভর্নরদের পর্যবেক্ষণে উমর রা.-এর পদ্ধতি

৩.১। গভর্নরদের পর্যবেক্ষণ

সঠিক এবং যোগ্য লোককে সরকারি কর্মকর্তা এবং গভর্নর হিসাবে নিয়োগ দিয়েই আমীরুল মুমিনীন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ক্ষান্ত হতেন না; বরং তিনি তাদের কর্মকাণ্ড দেখভাল করার জন্য কঠিন পরিশ্রম করতেন। নিশ্চিত হতেন যে, তার নিয়োগকৃত ব্যক্তিবর্গ সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে এবং কোনো কারণে যেন তাদের পদস্থলন বা বিচ্যুতি না ঘটে। তার বিখ্যাত স্লোগান ছিল : কোনো অপকর্মকারীকে স্বপদে এক মিনিটও বহাল রাখার চেয়ে প্রতিদিন একজন করে গভর্নর পদচ্যুত করাকে আমি ভালো মনে করি।^{১৮৩} তিনি বলেন : ‘যদি কোনো গভর্নর কারও প্রতি অবিচার করে এবং এটি আমার কানে আসে, তারপর যদি আমি তাকে পদচ্যুত না করি, তাহলে এটি তার প্রতি অবিচার করা হবে।’^{১৮৪} একদিন তিনি লোকদের উদ্দেশে বললেন, ‘যদি আমি সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে তোমাদের শাসক হিসাবে নিয়োগ দিই এবং তাকে ন্যায়-পরায়ণতার সঙ্গে শাসন করতে বলি, তাহলে তোমরা কি মনে করো, আমি আমার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছি?’ তারা বলল, ‘হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, ‘না। যতক্ষণ না আমি তার আচরণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছি এবং তাকে যা করার নির্দেশ দিয়েছি, তা সে যথাযথভাবে পালন করেছে—ততক্ষণ আমার দায়িত্ব পরিপূর্ণ হবে না।’^{১৮৫}

^{১৮৩} আন-নাজমুল ইসলামিয়া, সুবহি আস-সালিহ, পৃ. ৮৯।

^{১৮৪} মানাকিবু আমীরুল মুমিনিন, ইবনে আল-জাওযি, পৃ. ১২৯।

^{১৮৫} আল-ইদারাতুল ইসলামিয়া, পৃ. ২১৫।

গভর্নর এবং অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুবই কঠোর নীতি অবলম্বন করতেন। তার শাসনপদ্ধতি ছিল, তিনি গভর্নরদের লোকাল বিষয়াদিতে পূর্ণ ক্ষমতা দিতেন এবং সাধারণ জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতেন। তারপর তিনি এসব ব্যাপারে তাদের কর্মপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করতেন। আর এ কাজের জন্য তিনি গোয়েন্দা নিয়োগ করতেন। ঐতিহাসিক সূত্রসমূহ থেকে এটি নিশ্চিতভাবেই জানা যায় যে, আধুনিক গোয়েন্দা সংস্থার মতো যাবতীয় কার্যক্রমই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে কার্যকরী ছিল। তিনি দূরবর্তী অঞ্চলে কর্মরত গভর্নরদের এমনভাবে জানতেন, যেমন জানতেন একই রুমে তার পাশে ঘুমন্ত ব্যক্তি সম্পর্কে। এমন কোনো এলাকা বা প্রদেশ ছিল না যেখানে কোনো গভর্নর বা সামরিক কমান্ডার নিয়োজিত আছে, অথচ তার কর্মকাণ্ড অনবরত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে না এবং পূর্ব-পশ্চিমে যে কেউ যা কিছু উচ্চারণ করুক না কেন, তা সকাল-সন্ধ্যায় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পেশ করা হতো। গভর্নর এবং প্রশাসকদের প্রতি তার লিখিত চিঠি-পত্র থেকে এ বিষয়টি পরিস্কারভাবে বোঝা যায়। তথ্য সংগ্রহে তিনি এতটাই দক্ষ ছিলেন যে, প্রশাসকগণ তাদের সবচেয়ে কাছের মানুষদের থেকেও নিরাপদ ছিলেন না।^{১৮৬} গভর্নরদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু অনেকগুলো পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। নিচে তার কয়েকটি বর্ণনা করা হলো :

৩.১.১। মদীনায় দিনের বেলায় প্রবেশ করতে গভর্নরদের নির্দেশ

যখন কোনো গভর্নর মদীনায় আসতে চাইত, তখন তিনি তাদের রাতের পরিবর্তে দিনের আলোয় মদীনায় প্রবেশ করতে বলতেন যাতে তারা যে সম্পদ এবং গনীমতের মাল সঙ্গে নিয়ে আসতেন, তা সবাই দেখতে পায়। ফলে তাদের এ বিষয়ে প্রশ্ন করা এবং হিসাব নেওয়া সহজ হতো।^{১৮৭}

৩.১.২। গভর্নরদের প্রতিনিধি প্রেরণ করার নির্দেশ

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু গভর্নরদের সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করার নির্দেশ দিতেন যাতে তিনি তাদের জমি এবং

^{১৮৬} আত-তায় ফি আখলাকিল মুলুক, পৃ. ১৬৮।

^{১৮৭} ফান্ন আল-হুকম, পৃ. ১৭৪।

খারায়—যা তাদের ওপর আরোপ করা হয়েছে—সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। এ থেকে তাদের ওপর অন্যায় করা হয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা করতেন। তিনি তাদের অঞ্চলের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সাক্ষী পেশ করতে বলতেন। কুফা অঞ্চলের খারায় সেখানকার দশ জন বহন করে আনে এবং একই সংখ্যক বসরাবাসী বসরার খারায় নিয়ে আসে। তারা তার সম্মুখে এসব হাজির করে আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, এগুলো হালাল সম্পদ এবং এতে কোনো মুসলমান কিংবা যিম্মির প্রতি অবিচার করা হয়নি।^{১৮৮} জনগণের প্রতি অন্যায় আচরণ প্রতিরোধে এটিই যথেষ্ট ছিল। আর যদি সে রকম কিছু ঘটত, তাহলে সেখানকার অধিবাসীরা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট অভিযোগ পেশ করে তা অবহিত করত। সাধারণ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং তাদের গভর্নর, তার আচরণ ও অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন।^{১৮৯}

৩.১.৩। চিঠি-পত্র আদান-প্রদান

ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে গভর্নরদের নিকট উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু চিঠি-পত্র প্রেরণ করতেন। পত্রবাহক মদীনায় ফিরে আসতে চাইলে তিনি তাকে সেখানকার জনগণের মধ্যে একটি সাধারণ ঘোষণা দেওয়ার জন্য বলতেন। এ ঘোষণায় খলীফার প্রতি কারও কোনো চিঠি থাকলে তা তাকে দেওয়ার জন্য বলা হতো। এতে সাধারণ জনগণ তাদের গভর্নরের কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ ছাড়াই তার মাধ্যমে সরাসরি খলীফার নিকট পত্র প্রেরণ করতে পারতেন। পত্রবাহক এসব চিঠি বা এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। সুতরাং এভাবে রাজ্যে কোনো অবিচার বা অন্যায় সংঘটিত হলে সাধারণ জনগণ গভর্নর বা তার নিয়োজিত লোকজনের অজ্ঞাতসারেই খলীফার নিকট অভিযোগ করতে পারতেন। পত্রবাহক মদীনায় ফিরে এসেই এসব চিঠি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে দিতেন এবং একান্ত ব্যক্তিগতভাবেই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হতেন।^{১৯০}

^{১৮৮} আল-খারায়, আবু ইউসুফ, পৃ. ১২৪; আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/১৫৭।

^{১৮৯} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/১০৫।

^{১৯০} তারিখুল মদীনা, ২/৭৬১।

৩.১.৪। পরিদর্শক (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ)

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আনসার সাহাবী মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে গভর্নরদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণের জন্য পরিদর্শক হিসাবে নিযুক্ত করেন। তিনি গভর্নরদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা যাচাই করতেন। ইসলামী শাসনব্যবস্থায় মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভূমিকা ছিল সাধারণ পরিদর্শকের মতোই। তিনি গভর্নরদের কর্মকাণ্ড গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন এবং দায়িত্ব পালনে কারও মধ্যে কোনো দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে তাকে জবাবদিহি করতেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে সিনিয়র গভর্নরদের যাচাই^{১৯১}, অভিযোগ তদন্ত করা, সাধারণ জনগণের সঙ্গে দেখা করা ও তাদের মতামত জানা এবং গভর্নরদের ব্যাপারে তাদের মতামত সরাসরি খলীফাকে অবহিত করার জন্য প্রেরণ করতেন। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অধীনেও কিছু লোক কাজ করতেন।

৩.১.৫। হজের মৌসুম

বিভিন্ন প্রদেশের লোকজন ও গভর্নরদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার ক্ষেত্রে হজের মৌসুম ছিল উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ। তিনি এ মৌসুমকে ইসলামী রাষ্ট্রের সকল অঞ্চল থেকে তথ্য সংগ্রহ, যাচাই এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। এ-সময় অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীরা একত্র হতো এবং বিভিন্ন প্রদেশ ও এলাকায় তার নিয়োজিত সকল পরিদর্শকরা সরকারি কর্মকর্তা ও গভর্নরদের ব্যাপারে তাকে রিপোর্ট প্রদান করতেন। কর্মকর্তারাও স্বয়ং হাজির হয়ে তাদের গৃহীত পদক্ষেপ ও যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে খলীফাকে অবহিত করতেন। হজের মৌসুম অনেকটা আধুনিককালের সংসদীয় এসেম্বলির আকার ধারণ করত।^{১৯২}

হজের মৌসুমে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকজনের প্রতি গভর্নরদের দায়িত্ব সম্পর্কে বক্তব্য দিতেন। তারপর তিনি বলতেন, ‘যার প্রতি অন্যায়

^{১৯১} আল-আনসার ফিল আসরির রাশিদি, পৃ. ১২৩-১২৬।

^{১৯২} আবকারিতু উমর, আল-আক্বাদ, পৃ. ৮২।

করা হয়েছে, সে যেন উঠে দাঁড়ায়।' উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে একজন ছাড়া আর কেউই উঠে দাঁড়ায়নি। এ থেকে গভর্নরদের ন্যায়-পরায়ণতা ও জনপ্রিয়তা বোঝা যায়। ওই লোকটি দাঁড়িয়ে বলে, 'আপনার অমুক গভর্নর অন্যায়ভাবে আমাকে এক শ বেত্রাঘাত করেছে।' উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন সংশ্লিষ্ট গভর্নরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে সমুচিত জবাব না পেয়ে লোকটিকে বললেন, 'দাঁড়াও এবং এর প্রতিশোধ (কিসাস) নাও।' তখন আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি যদি এমন করেন, তাহলে এ সংখ্যা বাড়তেই থাকবে এবং আপনার তিরোধানের পরে এটি সাধারণ রসমে পরিণত হবে।' উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন, 'আমি কেমন করে এ কাজ করব না যেটি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের বেলায় করে গেছেন?' আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'বিষয়টি আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। আমরা তার সঙ্গে ফায়সালা করে নিই।' তিনি বললেন, 'এই যে সেই লোক। তার সঙ্গে মীমাংসা করো।' এভাবে এজেন্ট কর্তৃক লোকটিকে প্রতিটি বেত্রাঘাতের জন্য দুই দিনার করে তাকে মোট দু'শ দিনার দেওয়া হয়।^{১৯৩}

৩.১.৬। প্রতিনিয়ত আঞ্চলিক পরিদর্শন

নিহত হওয়ার আগে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেই ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশ পরিদর্শন করার চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। এতে উম্মতের অবস্থা ও গভর্নরদের পর্যবেক্ষণ এবং এত বড় রাষ্ট্রে সবকিছু শরীয়ত অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—তা স্বচক্ষে দেখা সম্ভব হতো। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'ইনশাআল্লাহ যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে পুরো এক বছর লোকজনের মধ্যে ঘুরে বেড়াব যেন আমি তাদের এমন-সব প্রয়োজনের কথা জানতে পারি, যা আমার কাছে পৌঁছে না। তাদের এজেন্টরা আমার নিকট সে তথ্য প্রেরণ করে না এবং তারাও আমার নিকট পৌঁছতে পারে না। সুতরাং আমি সিরিয়া গমন করব এবং সেখানে দুই মাস অবস্থান করব, কুফাতে দুই মাস থাকব। তারপর আমি বসরায় গিয়ে দুই মাস থাকব। আল্লাহর কসম, এটা কতই-না সুন্দর একটি বছর হবে!'^{১৯৪}

^{১৯৩} আত-তাবাকাত, ইবনে সাদ, ৩/২২২।

^{১৯৪} তারিখ আত-তাবারি, ৫/১৮; আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/১৬১।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পরিকল্পনার কিছু অংশ বাস্তবায়ন করতে পেরেছিলেন; বিশেষভাবে সিরিয়ার ক্ষেত্রে। তিনি সিরিয়ায় বেশ কয়েকবার গমন করেছেন। সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং গভর্নর ও এজেন্টদের বাড়িতেও গিয়েছেন যাতে তাদের অবস্থা নিবিড়ভাবে জানা সম্ভব হয়।^{১৯৫} তিনি আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে যান এবং তার সন্ন্যাসী জীবন-যাপন দেখে অবাক হন। তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট সন্ন্যাসব্রতের এই কঠিন জীবন-যাপন সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করেন। তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতেও গমন করেন এবং তিনি সেখানে আকর্ষণীয় কিছু দেখতে পাননি। তার সম্বল বলতে কেবল তার অস্ত্রটিই ছিল, যা তিনি মেরামতের কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

তিনি যখন রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ লোকদের বাড়িতে যেতেন, তা কাউকে না জানিয়েই ঝটিকা সফর করতেন। তিনি সঙ্গে একজনকে রাখতেন, যে কিনা নির্দিষ্ট বাড়ির দরজায় নক করতেন এবং তার ও সঙ্গীর জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতেন। কিন্তু কিছুতেই সঙ্গীটি যে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, তা প্রকাশ করতেন না। এভাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু গৃহে প্রবেশ করে সেখানকার বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হতেন।^{১৯৬}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু শুনতে পেলেন, ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান বিভিন্ন রকমের খাবার খেয়ে থাকেন। এ জন্য তিনি দিনার পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর তিনি অনুমতি নিয়ে তার গৃহে গমন করেন। তার খাদ্যের বাহার দেখে তিনি তাকে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বিলাসিতা পরিহার করতে নির্দেশ দেন।^{১৯৭} এ ধরনের ঝটিকা সফরের মাধ্যমেই তার পর্যবেক্ষণ সীমিত ছিল না। তিনি আরও একটি পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। তিনি গভর্নরের নিকট কিছু সম্পদ পাঠাতেন। তারপর লোকজন পাঠিয়ে এ সম্পদের বণ্টনপদ্ধতি জানতেন। একবার তিনি আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট ৫০০ দিনার পাঠালেন এবং আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু সবগুলো দিনারই লোকজনের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

^{১৯৫} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/১৬১।

^{১৯৬} তারিখুল মদীনা, ৩/৮৩৭।

^{১৯৭} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/১৬১২।

তার স্ত্রী তাকে বলত, ‘আল্লাহর কসম, এসব দিনার আমাদের উপকার করার চেয়ে ক্ষতিই বেশি করত।’ আর উবাইদা নিজের ছেঁড়া জামা—যা পরে তিনি নামায আদায় করতেন—কেটে টুকরো টুকরো করতেন। দিনারগুলো টুকরো কাপড়ে বেঁধে গরিবদের নিকট পাঠাতেন যতক্ষণ না দিনার বণ্টন শেষ হতো।^{১৯৮}

সিরিয়ার ওই সফরে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্যান্য গভর্নরদের সঙ্গেও একই আচরণ করেন। তিনি এ-সময় গভর্নরদের কেবল পরীক্ষাই করেননি; বরং সঙ্গে করে তাদের মদীনাযও নিয়ে এসেছেন। তারপর তারা মদীনায কী খায় ও পান করে, কী ধরনের পোশাক পরিধান করে—এগুলো দেখার জন্য লোক নিযুক্ত করেন। পাশাপাশি তিনি নিজেও তাদের পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন।^{১৯৯}

৩.১.৭। আর্কাইভ বা রাষ্ট্রীয় নথিপত্র

রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড এবং গভর্নরদের ব্যাপারে তথ্য সংরক্ষণে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুবই যত্নবান ছিলেন। তিনি বিজিত অঞ্চলসমূহের সঙ্গে গভর্নরদের চুক্তিপত্র সংরক্ষণে সবচেয়ে বেশি নয়র দিতেন, যাতে কারও ওপর যুলুম করা না হয়। বর্ণিত আছে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিজের কাছে একটি বাক্স বা ফাইল সংরক্ষিত থাকত, যাতে তিনি তার সঙ্গে অন্যদের করা চুক্তিসমূহ রাখতেন। এটাকে আমরা আর্কাইভ বা রাষ্ট্রীয় নথিপত্র বলতে পারি। গভর্নরদের নিকটও এ রকম একটি বাক্স বা ফাইল থাকত যেখানে তারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র মজুদ রাখতেন। ফলে প্রয়োজনে তা বের করা সম্ভব হতো এবং যেকোনো প্রকার সন্দেহ এড়িয়ে চলা সম্ভব হতো।^{২০০}

৩.২। জনগণের পক্ষ থেকে গভর্নরদের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ

জনগণের পক্ষ থেকে গভর্নরদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং সেটি তদন্ত করতেন। তিনি এ ব্যাপারে

^{১৯৮} তারিখুল মদীনা, ৩/৮৩৭।

^{১৯৯} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/১৬১।

^{২০০} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/১৬৩।

খুবই পারদর্শী ছিলেন এবং রাষ্ট্রের জ্ঞানী ও বিজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শও করতেন। তারপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য পুরস্কার বা শাস্তির ঘোষণা দিতেন। এতে ব্যক্তি সাধারণ না উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, তা গণ্য করা হতো না।^{২০১} নিচে এ রকম কিছু অভিযোগ ও সমাধান বর্ণনা করা হলো।

৩.২.১। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.-এর বিরুদ্ধে কুফার লোকদের অভিযোগ

আল-জাররাহ ইবনে সিনান আল-আসাদীর নেতৃত্বে কুফার কতিপয় লোক একত্র হয়ে তাদের গভর্নর সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে আমীরুল মুমিনীন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট অভিযোগ উত্থাপন করে। এটা এমন এক সময় সংঘটিত হয় যখন পারসিক অগ্নিপূজকরা নিহাওয়ান্দে মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য জমা হচ্ছিল। কিন্তু এসব লোকজন মুসলমানদের সম্মুখ বিপদ দেখেও তাদের হীন উদ্দেশ্য থেকে বিরত থাকেনি।

সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার অধীন লোকজনের প্রতি ন্যায়-পরায়ণ ও সহনশীল ছিলেন; তিনি সমাজের মিথ্যাবাদী ও ত্রাস সৃষ্টিকারীদের প্রতি কঠোর ছিলেন এবং সত্যবাদী ও একনিষ্ঠ লোকদের প্রতি দয়ালু ছিলেন। এতৎসত্ত্বেও যারা তার সত্য ও ন্যায় শাসন মেনে নিতে পারছিল না, তারা সমস্যা সৃষ্টির চক্রান্ত করে এবং তারা তাদের হীন স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। তারা অভিযোগ পেশ করার জন্য এমন এক সময় নির্ধারণ করে যখন খলীফার তা না শুনে উপায় ছিল না। কারণ, তখন মুসলমানরা জিহাদের প্রস্তুতি নিচ্ছিল যেখানে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বজায় রাখা ছিল জরুরি। তারা জানত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সর্বদা মুসলমানদের ঐক্য সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন; বিশেষ করে এ রকম যুদ্ধাবস্থায়। সুতরাং তারা আশা করে, তারা তাদের উদ্দেশ্যে সফল হবে। খলীফা তাদের অভিযোগ শোনে এবং এটি তদন্ত করেন, যদিও তিনি নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে, অভিযোগকারীরা দুষ্ট লোক, যারা তাদের নফসের অনুসরণ করে। তিনি তাদের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতেন, তা তিনি গোপন রাখেননি; বরং তিনি তা প্রকাশ্যে এবং দৃঢ়ভাবেই ব্যক্ত

^{২০১} আল-ইদারাতুল ইসলামিয়া, পৃ. ২১৫।

করেন। তিনি বলেন, এটা জানা থাকা সত্ত্বেও যে তারা তাদের গভর্নরের প্রতি অবিচার করছে এবং মিথ্যা অভিযোগ পেশ করছে তাকে এ অভিযোগ তদন্ত করতে তিনি পিছপা হবেন না। তিনি তাদের হীন উদ্দেশ্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ‘এমন এক সময় তোমরা এ অভিযোগ উত্থাপন করেছ যা থেকে তোমাদের হীন উদ্দেশ্যই প্রমাণিত হয়। কারণ, এ মুহূর্তে শত্রুরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আল্লাহর কসম, এ জটিল পরিস্থিতি সত্ত্বেও আমি এ অভিযোগ তদন্তে পিছপা হব না; এমনকি শত্রুরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করলেও।’^{২০২}

পার্সিয়ানদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ অভিযোগ তদন্ত করতে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন। উল্লেখ্য, তখন পার্সিয়ানরাও মুসলমানদের আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে সরকারি কর্মকর্তা ও গভর্নরদের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু নিযুক্ত ছিলেন। মুহাম্মাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু কূফায় এসে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সঙ্গে নিয়ে কূফার বিভিন্ন জায়গায় যান এবং মুসলমান সৈনিকরা নিহাওয়ানদের দিকে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে কূফার মসজিদে নিয়ে যান এবং তিনি কাউকে তার সম্পর্কে গোপনে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি। কারণ, তখন প্রকাশ্যেই তদন্তের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হতো।^{২০৩} এ থেকে কর্মকর্তা ও অধীনদের বিরোধ তদন্তে সাহাবীদের কর্মপন্থা সম্পর্কে জানা যায়। শাসক ও অধীনদের উপস্থিতিতেই এ তদন্ত পরিচালিত হতো। তিনি কোনো মসজিদেই থামেননি এবং কাউকে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাও করেননি। তারপরেও লোকেরা বলল, ‘আমরা তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া ভিন্ন কিছু জানি না এবং তার পরিবর্তে আমরা অন্য কাউকে (গভর্নর হিসেবে) চাইও না। আমরা তার বিরুদ্ধে কিছু বলব না এবং আমরা তার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করব না।’

^{২০২} তারিখ আত-তাবারি, ৫/১০৩।

^{২০৩} প্রাগুক্ত।

তবে আল জাররাহ ইবনে সিনান এবং তার পক্ষের লোকেরা এর ব্যতিক্রম আচরণ করল; তার নীরবতা অবলম্বন করল এবং মন্দ কিছুই বলতে পারল না; কারণ, তাদের সেটি করার যুক্তিসংগত কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু তারা ইচ্ছা করেই তার কোনো প্রশংসা করল না।

তারপর তারা বনু আবস গোত্রের নিকট এল। মুহাম্মাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহর কসম, যদি কেউ সত্য জেনে থাকে, সে যেন তা বলে।’ উসামা ইবনে কাতাদাহ বললেন, ‘আল্লাহর কসম, আপনি যদি অভয় দেন তাহলে বলতে পারি। তিনি বণ্টনে সমতা রক্ষা করেন না এবং লোকদের সঙ্গে ন্যায়সংগত আচরণ করেন না এবং তিনি আমাদের জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করেন না।’ সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহর কসম, সে যদি লোক-দেখানোর জন্য মিথ্যা বলে, তাহলে আল্লাহ যেন তাকে অন্ধ করে দেন, তার পরিবারের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করে দেন এবং তাকে ফিতনায় নিপতিত করেন।’ এ বদদুআর ফলে সে অন্ধ হয়ে যায়, আল্লাহ তাকে দশটি কন্যাসন্তান দিয়ে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত করেন এবং যখনই সে কোনো মহিলার সংবাদ পেত, সে তাকে পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠত। এ জন্য যখন তাকে পাকড়াও করা হতো, তখন সে বলত, ‘এটি সেই পবিত্র আত্মা সাদের দুআর পরিণতি।’

তারপর সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে বদদুআ করেন, ‘হে আল্লাহ, যদি তারা ঔদ্ধত্য ও অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে, তাহলে তাদের ওপর তোমার আযাব দিয়ে পাকড়াও করো।’ সুতরাং এ দুআও আল্লাহ তা‘আলা কবুল করে নেন। তাদের ওপর বিপদ নেমে আসে। আল-হাসান ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তাকে হত্যার চেষ্টা করলে আল-জাররাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করা হয়। কাবিসা পাথরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করে। আরবাদ তরবারির খাপের আঘাতে নিহত হয়। এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের কীভাবে সাহায্য করে থাকেন। এখানে তিনি সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর দুআ ওইসব লোকদের ব্যাপারে কবুল করেছেন যারা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল এবং এ দুআর পরিণতি হিসাবে তারা সকলেই নির্মমভাবে নিহত হয়েছিল। এখান থেকে এটাও জানা যায় যে, আল্লাহ কীভাবে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর দুআ কবুল করতেন এবং তার মতো অন্যদেরও। এসবই আল্লাহর নিকটতম বান্দাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের প্রকাশ।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যেসব লোকদের বিরুদ্ধে বদদুআ করেছিলেন, তাদের অন্তরে শয়তান বদ্ধমূল জায়গা করে নিয়েছিল। এ জন্য তারা খারাপ পরিণতির শিকার হয়েছে। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন, ‘আমিই প্রথম মুশরিকদের রক্ত ঝরিয়েছি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ব্যাপারে তার পিতা-মাতার কুরবানির কথা উল্লেখ করেছেন এবং এটি তিনি আমার পূর্বে আর কারও জন্য করেননি যখন উহুদের রণাঙ্গনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘আমার মা-বাবা তোমার প্রতি উৎসর্গিত হোক, তুমি যথাসাধ্য তির ছুড়তে থাক।’ আমি ইসলামে প্রথম পাঁচ জনের একজন এবং বনু আসাদ দাবি করে, আমি ঠিকমতো নামায আদায় করি না অথবা শিকারি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছে।’

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট হাজির হন এবং তাকে পুরো ঘটনা খুলে বলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ‘তুমি কীভাবে নামায পড়ো?’ সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমি প্রথম দুই রাকাত লম্বা করি এবং শেষ দুই রাকাত ছোট করি।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমিও তা-ই ভেবেছিলাম।’ তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘যদি সতর্কতা অবলম্বন করা না হতো তাহলে তাদের (চক্রান্তের) পথ পরিষ্কার হয়ে যেত।’ তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ‘হে সাদ, তোমার অনুপস্থিতিতে কুফার গভর্নর হিসাবে তুমি কার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে আসো?’ তিনি বললেন, ‘আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকেই কুফার গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত করেন।^{২০৪}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা—‘যদি সতর্কতা অবলম্বন করা না হতো তাহলে তাদের (চক্রান্তের) পথ পরিষ্কার হয়ে যেত—’মানে তারা ছিল অজ্ঞ দুষ্কৃতিকারী। এটা নিশ্চিত যে তারা সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছে, তা থেকে তিনি মুক্ত। কিন্তু উম্মতের জন্য এটি জরুরি ছিল ফেতনা দূর করা এবং এর মূলোৎপাটন করা, যা ব্যাপক আকার ধারণ করে মুসলমানদের মধ্যে ত্রাস, বিভক্তি এবং মারামারি সৃষ্টি

করতে পারে। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে তিনি যদি নিরপরাধ হন, তাহলে অভিযোগ তদন্ত করলেও তার কোনো ক্ষতি নেই। তারা গভর্নর পদকে কঠিন বোঝা হিসাবেই দেখতেন, কখনো এটাকে সুযোগ মনে করতেন না; এটাকে তারা এমন এক দায়িত্ব মনে করতেন যে জন্য তারা আল্লাহর নিকট পুরস্কারের আশা করতেন। কারও ওপর উম্মতের কোনো দায়িত্ব অর্পিত হলে এটি তার জন্যই নেক আমল, যে কিনা আল্লাহকে ভয় পান, তার সন্তুষ্টি এবং আখেরাতে সফলতা কামনা করেন। আর যদি এটি ফেতনার কারণ হয়, তাহলে হেকমত হচ্ছে এ দায়িত্বে বহাল না থাকা, যা এখানে সংঘটিত হয়েছে। এ জন্য উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে গভর্নরের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পছন্দের ব্যক্তিকে ওই পদে নিযুক্ত করেছেন।^{২০৫} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনায় রেখে তারই মনোনীত ব্যক্তিকে কুফার গভর্নর হিসাবে নিয়োগ দিয়েছেন। এভাবে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শক হিসাবে কাজ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।^{২০৬} তারপর যখন তিনি ছুরির আঘাতে জখম হন, তখন তিনি পরবর্তী খলীফা নির্বাচনে যে ছয় সদস্য-বিশিষ্ট শূরা-কমিটি গঠন করেন, সেখানে তিনি সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অন্তর্ভুক্ত করেন। আর পরবর্তী খলীফার প্রতি তাকে গভর্নর নিযুক্ত করারও আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ‘আমি কোনো মন্দ অভিযোগের ভিত্তিতে সাদকে গভর্নর পদ থেকে বরখাস্ত করিনি; বরং উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে তার সুনামের ক্ষতির আশঙ্কা করেছি মাত্র।’^{২০৭}

৩.২.২। মিসরের গভর্নর আমর ইবনুল আস রা.-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর কর্মকাণ্ডের ওপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুবই সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন এবং বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তার প্রদেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন। আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার নিজের জন্য একটি মিন্বর নির্মাণ করেন। এ খবর পেয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু

^{২০৫} তারখিল ইসলামি, আল-হুমাইদি, ১১/২২২।

^{২০৬} দাওরুল হিজাজ ফিল হায়াতিস সিয়াসিয়া, পৃ. ২৫৭।

^{২০৭} তারিখ আত-তাবারি, ৫/২২৫।

আনহু তাকে লিখে পাঠান, ‘আমি শুনেছি তুমি নিজের জন্য একটি মিস্বর তৈরি করেছ, যাতে তুমি নিজের অবস্থান মুসলমানদের থেকে ওপরে তুলে ধরতে পার। এটা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয় যে, তুমি তাদের সঙ্গে নিজের পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াবে? আমি সেটি ভেঙে ফেলার জন্য তাগিদ দিচ্ছি।’^{২০৮}

আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই কথায় ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি জানতেন, মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠায় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কত কঠোর এবং শরীয়তই এর সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে, যা তিনি প্রাণপণ অনুসরণ করে থাকেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অসন্তুষ্টিমূলক কোনো খবর যেন তার নিকট না পৌঁছে এ জন্য তিনি সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। একবার আব্দুর রহমান ইবনে উমর ইবনে আল-খাত্তাব এবং আরেকজন না জেনেই মদ পান করে এবং নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারপর তারা এসে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের ওপর হৃদ শাস্তি প্রয়োগ করতে বলেন। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের তিরস্কার করেন এবং তাদের বের করে দেন। আব্দুর রহমান তাকে বলেন, ‘আপনি যদি এটি না করেন, তাহলে আমি আমার পিতাকে বলে দেব।’ আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমি উপলব্ধি করি যে যদি আমি তাদের ওপর হৃদ প্রয়োগ না করি, তাহলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রেগে যাবেন এবং আমাকে পদচ্যুত করবেন।’ আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের জনসম্মুখে চাবুক দিয়ে নির্দিষ্ট-সংখ্যক প্রহার করেন, কিন্তু তার ঘরে নিয়ে তাদের মাথার চুল কামিয়ে দেন। তবে সাধারণ নিয়ম ছিল, কেউ মদ পান করলে শাস্তিস্বরূপ জনসম্মুখেই তার মাথার চুল কামিয়ে দেওয়া হতো, আবার চাবুক দিয়ে নির্দিষ্ট-সংখ্যক প্রহারও করা হতো। পরে তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে পত্র লাভ করেন যেখানে তাকে জনসম্মুখে মাথার চুল না কামানোর জন্য তিরস্কার করা হয়। চিঠিতে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘তুমি আব্দুর রহমানকে জনসম্মুখে বেত্রাঘাত করেছ, আর নিজের ঘরে নিয়ে তার মাথার চুল কামিয়েছ—যদিও তুমি জানো যে, এটি আমার ইচ্ছার বিপরীত। আব্দুর রহমান তোমার অধীনদের একজন এবং তাকে তোমার অন্যান্য মুসলমানদের মতোই দেখা উচিত। কিন্তু তুমি মনে করেছ, সে খলীফার সন্তান। যদিও তুমি জানো যে আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে আমি কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করি না।’^{২০৯}

^{২০৮} ফুতুহু মিসর ওয়া আখবারুহা, পৃ. ৯২।

^{২০৯} তারখিল মদীনা, ৩/৮৪১।

গভর্নর থাকাকালীন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে আরও কিছু অভিযোগ উত্থাপিত হয়; এর মধ্যে কিছু অভিযোগ মুসলিম সৈনিকদের পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয় এবং কিছু মিসরীয়দের পক্ষ থেকে। এ জন্য উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বেশ কয়েকবার ডেকে পাঠান, তাকে তিরস্কার করেন এবং অনেক সময় তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তিও প্রয়োগ করেন। উদাহরণস্বরূপ, একবার মিসরের এক ব্যক্তি অভিযোগ পেশ করেন, আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করেছে। এতে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার ছেলে তলব করেন। তারপর তিনি মিসরীয় ব্যক্তিকে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ছেলের ওপর প্রতিশোধ নিতে বললেন। তিনি তাকে বললেন, ‘যদি তুমি তার পিতা আমরকে মারতে, তাহলেও আমরা তোমাকে থামাতাম না।’ তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর দিকে ফিরে বললেন, ‘তোমরা কখন লোকদের দাস বানালে? অথচ তাদের মায়েরা তো তাদের স্বাধীন হিসেবে জন্ম দিয়েছে।’^{২১০}

এ ব্যাপারে আরেকটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। একবার এক সৈনিক আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে মুনাফিক বলে অপবাদ দেওয়ার অভিযোগ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু চিঠিতে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি নির্দেশ জারি করেন যে, তিনি জনসম্মুখে হাজির হবেন এবং সৈনিকটি তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করবে, যদি সাক্ষী কর্তৃক তার অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়। সৈনিকটির অভিযোগ সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে মুনাফিক বলেছেন। লোকেরা সৈনিকটিকে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে চাবুক দিয়ে আঘাত করা থেকে বিরত থাকতে এবং এর পরিবর্তে অর্থ নেওয়ার অনুরোধ করে। কিন্তু সে এতে রাজি হয়নি। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আঘাত করার জন্য সৈনিকটি যখন তার সামনে দাঁড়ায়, তখন তাকে বলে, ‘এমন কেউ আছে যে আপনাকে আঘাত করা থেকে আমাকে ফেরাবে?’ আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘না। তোমাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা করো।’ সৈনিকটি বলল, ‘আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম।’^{২১১}

^{২১০} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/৮১।

^{২১১} তারিখুল মদীনা, ৩/৮০৭; এর সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

৩.২.৩। বসরার গভর্নর মুসা আল-আশআরী রা.-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ

জারির ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাযালি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার তেজস্বী কঠোর অধিকারী ও শত্রুর বিরুদ্ধে খুবই কঠোর এক ব্যক্তি মুসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ছিল। তারা কিছু গনীমতের সম্পদ লাভ করল এবং মুসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকটিকে তার পাওনার কিছু অংশ প্রদান করেন। কিন্তু সে তার অংশের পুরোটাই দাবি করছিল। এতে মুসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বিশটি বেত্রাঘাত করেন এবং তার মাথার চুল কামিয়ে দেন। লোকটি তার মাথার চুলগুলো জমা করে এবং সেগুলো নিয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে গিয়ে হাজির হয়। জারির বলেন, আমি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খুব কাছাকাছি ছিলাম। লোকটি তার চুলগুলো উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কোলের ওপর ছুড়ে মারে এবং বলে, ‘যদি জাহান্নাম না থাকত...।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘তা ঠিক। যদি জাহান্নাম না থাকত...।’ লোকটি বলল, ‘হে আমীরুল মুমিনীন, আমার কণ্ঠ খুব তেজস্বী এবং যুদ্ধে আমি শত্রুর বিরুদ্ধে খুবই কঠোর।’ তারপর সে তার পুরো ঘটনা তুলে ধরল। সে বলল, ‘মুসা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বিশটি বেত্রাঘাত করেছেন এবং তার মাথার চুল কামিয়ে দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, কেউ তার বিরুদ্ধে এর প্রতিশোধ নিতে পারবে না।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘যদি সবাই এই লোকটির মতো দৃঢ় হতো, তাহলে আল্লাহ আমাদের যে গনীমতের সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে আমি বেশি খুশি হতাম।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে চিঠিতে লেখলেন, ‘আসসালামু আলাইকুম। অমুক ব্যক্তি আমাকে এই এই ঘটনা বলেছে। তুমি যদি তা লোকদের সম্মুখে করে থাক, তাহলে আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি, তুমিও লোকদের সম্মুখে হাজির হয়ে তাকে এর প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ করে দাও। আর যদি তাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে শাস্তি দিয়ে থাক, তাহলে তাকে নিয়ে এমন জায়গায় বসো যেখানে কোনো লোকজন নেই এবং তাকে তার প্রতিশোধ নিতে দাও।’ লোকটি ফিরে এল এবং সবাই তাকে গভর্নরকে ক্ষমা করে দিতে বলল। সে বলল, ‘আল্লাহর কসম, আমি কারও জন্য তাকে ক্ষমা করব না।’ যখন মুসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকটির সঙ্গে ফায়সালা করার

জন্য বসল, তখন লোকটি তার মাথা উঁচু করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘হে আল্লাহ, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।’^{২১২}

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা এক সফরে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এই লোকটি সম্ভবত আমাদের খোঁজ করছে। লোকটি কাছে এসে কাঁদতে লাগল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও কাঁদতে লাগলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কী ব্যাপার?’ সে বলল, ‘হে আমীরুল মুমিনীন, আমি মদ পান করেছিলাম। আবু মূসা আমাকে চাবুক দিয়ে মেরেছেন। তারপর আমার চেহারা কালি মেখে লোকদের মধ্যে হাঁটিয়েছেন। আর সবাইকে বলে দিয়েছেন যেন কেউ আমার সঙ্গে না বসে। আমি আমার তরবারি দিয়ে আবু মূসাকে আঘাত করতে চেয়েছিলাম অথবা আপনার নিকট ছুটে যেতে চেয়েছি যেন আপনি আমাকে এমন ভূখণ্ডে প্রেরণ করেন যেখানে আমাকে কেউ চেনে না, অথবা মুশরিকদের কোনো দেশে গিয়ে বসবাস করার কথাও ভেবেছি।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কাঁদলেন এবং বললেন, ‘আমি মুশরিকদের ভূখণ্ডে বসবাস পছন্দ করি না যদিও আমি এই এই অবস্থার মুখোমুখি হই।’ তারপর তিনি বললেন, ‘যদি মদ পান করাই তোমার একমাত্র অপরাধ হয়, তাহলে তা অনেকে জাহেলি যুগে মদ পান করেছে।’ তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পত্র প্রেরণ করেন। তিনি তাতে লেখেন, ‘অমুক ব্যক্তি আমার নিকট এই এই ঘটনা বর্ণনা করেছে। আমার এই চিঠি যখন তোমার নিকট পৌঁছবে, তখন তুমি লোকদের ডেকে তার সঙ্গে মেলামেশা করতে বলবে। যদি সে অনুতপ্ত হয়, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেবে।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে কিছু কাপড়-চোপড় হাদিয়া দেন এবং তাকে আরও ২০০ দিরহাম দেওয়া নির্দেশ দেন।^{২১৩}

আরেক বর্ণনামতে, তিনি বলেন, ‘বনু তামিম গোত্রের অমুক ব্যক্তির ছেলে অমুক আমাকে এই এই ঘটনা বলেছে। আল্লাহর কসম, তুমি যদি আবার এ রকম করো, তাহলে আমি তোমার চেহারা কালি মেখে

^{২১২} মাহজুস সাওয়াব, ২/৪৬৭; এর সনদ হাসান।

^{২১৩} মাহজুস সাওয়াব, ২/৫৫৩।

লোকদের মধ্যে ঘোরাব। আমি যা বলেছি তা যদি তোমার পরখ করার ইচ্ছা হয়, তাহলে আবার সেটি করে দেখো। আর লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও, তারা যেন তার সঙ্গে বসে ও মেলামেশা করে। আর যদি সে অনুতপ্ত হয়, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দাও।। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে কিছু কাপড় ও বাহন দান করেন এবং তাকে দু শ দিরহাম দেওয়ার নির্দেশ দেন।^{২১৪} এ থেকে বোঝা যায়, তিনি গভর্নরদের প্রতি কত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন এবং অপরাধীকে শরীয়ত অনুযায়ী শাস্তি দিতে গিয়ে কেউ সামান্য পরিমাণও বাড়াবাড়ি করতে পারত না।^{২১৫}

৩.২.৪। সাইদ ইবনে আমির রা.-এর বিরুদ্ধে হিমসবাসীর অভিযোগ

খালিদ ইবনে মাদান বলেন, ‘উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হিমসের গভর্নর হিসাবে সাইদ ইবনে আমির রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিযুক্ত করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হিমস সফরে এসে লোকদের জিজ্ঞাসা করেন, ‘হে হিমসবাসী, তোমাদের গভর্নরের অবস্থা কী?’ লোকেরা তখন গভর্নরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে। গভর্নরের বিরুদ্ধে অনবরত অভিযোগ করায় হিমসবাসীরা ‘ছোট কুফা’ নামে পরিচিত ছিল। তারা বলল, ‘তার বিরুদ্ধে আমাদের চারটি অভিযোগ রয়েছে। তিনি অনেক বেলা করে ঘর থেকে বের হন।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘এটি খুবই গুরুতর অভিযোগ। আর কী অভিযোগ?’ তারা বলল, ‘তিনি রাতে কারও ডাকে সাড়া দেন না।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘এটি খুবই গুরুতর অভিযোগ। আর কী অভিযোগ?’ তারা বলল, ‘মাসে একদিন তিনি আমাদের কারও সঙ্গে দেখা করেন না।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘এটি খুবই খুবই গুরুতর অভিযোগ। আর কী অভিযোগ?’ তারা বলল, ‘কখনো কখনো তিনি অজ্ঞান হয়ে যান।’

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকজন জমা করে গভর্নরকে নিয়ে সালিসে বসলেন। তিনি বলে ওঠেন, ‘হে আল্লাহ, আমি তার সম্পর্কে যা ধারণা রাখি আজ যেন তা মিথ্যা না হয়।’ তারপর গভর্নরের সামনে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘তার বিরুদ্ধে তোমাদের কী অভিযোগ?’ তারা বলল,

^{২১৪} সহিহুত তাওসিকি সিরাতি ওয়া হায়াতিল ফারুক, পৃ. ১৩৪; এর সনদ হাসান।

^{২১৫} প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩।

‘তিনি অনেক বেলা করে ঘর থেকে বের হন।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাইদ ইবনে আমির রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এ প্রশ্নের জবাবে তোমার বক্তব্য কী?’ সাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহর কসম, আমি এটি বলতে চাইনি। আমার বাড়িতে কোনো কাজের লোক নেই। এ জন্য আমি নিজেই রুটির খামির তৈরি করি এবং ফুলে ওঠার জন্য অপেক্ষা করি। তারপর আমি রুটি তৈরি করি। তারপর অয়ু করে তাদের নিকট আসি।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তার বিরুদ্ধে তোমাদের আর কী অভিযোগ?’ তারা বলল, ‘তিনি রাতে কারও ডাকে সাড়া দেন না।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাইদ ইবনে আমির রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এ প্রশ্নের জবাবে তোমার বক্তব্য কী?’ সাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহর কসম, আমি এটি বলতে চাইনি। আমি তাদের জন্য দিনকে নির্দিষ্ট করেছি এবং রাত কেবল আল্লাহর জন্য রেখেছি।’

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তার বিরুদ্ধে তোমাদের আর কী অভিযোগ?’ তারা বলল, ‘মাসে একদিন তিনি আমাদের কারও সঙ্গে দেখা করেন না।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাইদ ইবনে আমির রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এ প্রশ্নের জবাবে তোমার বক্তব্য কী?’ সাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমার কোনো কাজের লোক নেই যে আমার কাপড়-চোপড়গুলো ধুয়ে দেবে এবং এই একটি জামা ছাড়া আমার আর অন্য কোনো জামাও নেই। সুতরাং এটি শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করি। তারপর এটি পরে দিন শেষে ঘর থেকে বের হই।’

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তার বিরুদ্ধে তোমাদের আর কী অভিযোগ?’ তারা বলল, ‘কখনো কখনো তিনি অজ্ঞান হয়ে যান।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাইদ ইবনে আমির রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এ প্রশ্নের জবাবে তোমার বক্তব্য কী?’ সাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমি মক্কায় খুবাইব আল-আনসারিকে নির্মমভাবে হত্যার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছি। কুরাইশরা তার শরীরের গোশত কেটে একটা গাছের গুঁড়ির সাথে ঝুলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করছে, ‘তুমি কি তোমার জায়গায় মুহাম্মাদকে শাস্তি দিলে খুশি হবে?’ তিনি বললেন,

‘আল্লাহর কসম, আমি চাই না আমার পরিবার-পরিজনের সঙ্গে থাকার পরিবর্তে মুহাম্মাদের গায়ে একটা কাঁটাও বিদ্ধ হোক।’ তারপর তিনি জোরে চিৎকার দিয়ে বলে ওঠেন, ‘হে মুহাম্মাদ!’ যখনই আমার ওইদিনের কথা মনে পড়ে যে, আমি কীভাবেই-না তাকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম—আমি ওইসময় মুশরিক ছিলাম ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর ঈমান আনতে পারিনি এবং আমার মনে হয়, এ জন্য আল্লাহ আমাকে কখনোই ক্ষমা করবেন না—তখনই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।’

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘মহান আল্লাহ তা‘আলার জন্য সকল প্রশংসা। তিনি আমার ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত করেননি।’ তিনি তার জন্য এক হাজার দিনার পাঠান এবং বলেন, ‘এগুলো নিজের জন্য ব্যবহার করো।’ সাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সবগুলো দিনার লোকদের মধ্যে বিলি করে দেন।^{২১৬}

৩.২.৫। হাসি-ঠাট্টা করায় একজন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত

কাইস ইবনে আবি হাযিম রহ. বর্ণনা করেন : উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আনসারদের এক ব্যক্তিকে কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দেন যে হিরাবাসীদের নেতা আমর ইবনে হাইয়ান ইবনে বাকিলার সঙ্গে অবস্থান করে। তিনি আনসারি কর্মকর্তার ইচ্ছানুযায়ী ভালো খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করেন। তারপর ওই কর্মকর্তা হাসি-ঠাট্টা শুরু করে। একপর্যায়ে সে তাকে কাছে ডেকে তার দাড়িতে হাত মোছে। তারপর আমর ইবনে হাইয়ান উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গমন করে এবং বলে, ‘হে আমীরুল মুমিনীন, আমি কায়সার ও কিসরার সেবা করেছি। আমি আপনার রাজ্যের মতো কখনো এমন অপমানবোধ করিনি।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘কী হয়েছে?’ সে বলল, ‘আপনার কর্মকর্তা আমার দাড়িতে অবস্থান করেছে। আমি তার পছন্দানুযায়ী খাবার পরিবেশন করেছি। তারপর তিনি হাসি-ঠাট্টা শুরু করেন। একপর্যায়ে তিনি আমাকে কাছে ডেকে আমার দাড়িতে তার হাত মোছেন।’

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ওই আনসারি ব্যক্তিকে ডেকে পাঠান। তাকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘ব্যাপার কী? সে তোমাকে তোমার ইচ্ছামতো খাবার-

^{২১৬} হিলয়াতুল আউলিয়া, ১/২৪৫; আখবারু উমর, ১৫২।

পানীয় দিয়েছে। আর তুমি তার দাড়িতে হাত মুছেছ? আল্লাহর কসম, যদি এটা রীতি হয়ে যাওয়ার ভয় না থাকত তাহলে আমি তোমার প্রতিটি দাড়ি টেনে টেনে উপড়ে ফেলতাম। যাও, ভাগো। তোমাকে আর আমার কোনো কাজ করতে হবে না।”^{২১৭}

৩.৩। উমর রা.-এর শাসনামলে গভর্নরদের শাস্তি প্রদান

গভর্নরদের প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখার ফলে তাদের কিছু ভুল-ভ্রান্তি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গোচরীভূত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি শরীয়ত অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের যথাযথ শাস্তি প্রদান করেন। পরিস্থিতি সাপেক্ষে তার শাস্তি প্রয়োগের ধরনও ছিল ভিন্ন। কারণ, এটি ছিল খলীফার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার—তিনি যা ভালো মনে করেছেন, সে পদ্ধতিই প্রয়োগ করেছেন। নিচে তার প্রয়োগকৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদ্ধতি তুলে ধরা হলো।

৩.৩.১। শাস্তি প্রদানে ভুল হলে তার প্রতিশোধ গ্রহণ

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, ‘আমি আমার গভর্নরদের এ জন্য প্রেরণ করি নাই যে, সে তোমাদের বেত্রাঘাত করবে অথবা তোমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেবে; বরং আমি তোমাদের দীন ও সুন্নাহ শেখানোর জন্যই তাদের প্রেরণ করেছি। যে কেউ এর ব্যতিক্রম আচরণ করবে, তা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে অবহিত করবে। তাঁর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি অবশ্যই এর ফায়সালা করব।’^{২১৮} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কেবল রাষ্ট্রীয়ভাবে সতর্কবার্তা প্রেরণ করেই থেমে থাকেননি যা তাদের জনগণের প্রতি আক্রমণাত্মক আচরণে ভীতি প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট ছিল; বরং তিনি তা বাস্তবে করেও দেখিয়েছেন। ওপরের উদাহরণগুলোই এর প্রমাণ; আবু মূসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আমর ইবনে আল-আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে খলীফার আচরণ উল্লেখ্য।^{২১৯}

^{২১৭} তারিখুল মদীনা, ৩/৮১৩; বর্ণনাটি সহীহ; আল-ফারুক আল-হাকিম আল-আদিল, পৃ. ১১।

^{২১৮} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/১২৭।

^{২১৯} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ১/১২৬-১২৭।

৩.৩.২। ভুলের কারণে গভর্নরকে বরখাস্ত করা

ভুলে পতিত হওয়ার কারণে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার গভর্নরদের পদচ্যুত করেছেন। তিনি তাদের এসব ভুলের অনুমোদন দেননি। একবার এক গভর্নর তার অধীন সৈনিকদের এমন ব্যাপারে নাক গলান যেখানে তার কোনো অধিকার ছিল না। এ পরিপ্রেক্ষিতে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ওই গভর্নরকে পদচ্যুত করেন। তাকে একটি সেনাবাহিনী পরিচালনা করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তিনি তাদের নিকট পৌঁছে বলেন, ‘আমি তোমাদের আদেশ করছি, তোমরা যেসব গোনাহ করেছ, তা আমাকে বলো।’ সুতরাং সৈনিকরা তাদের গোনাহ তার নিকট ব্যক্ত করতে থাকল। এ খবর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কানে পৌঁছলে তিনি বলেন, ‘তার সমস্যাটা কী? সে বধির হয়ে যাক, আল্লাহ যা গোপন করেছেন তা সে কেন প্রকাশ করতে চাচ্ছে? আল্লাহর কসম, সে আবার কখনোই আমার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে পারবে না।’^{২২০}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আরেক গভর্নর নিজের কবিতায় শরাবের উল্লেখ করেছিলেন। এ খবর পেয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ওই গভর্নরের প্রতি ভীষণ রেগে যান এবং তাকে বরখাস্ত করেন।^{২২১}

৩.৩.৩। গভর্নরের বাড়ির কিছু ধ্বংস করা

কোথাও বাড়াবাড়ি দৃষ্টিগোচর হলে এটি করা হতো। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ ব্যাপারে খুব কঠোর ছিলেন যে, গভর্নরদের বাড়িতে কোনো গেইট থাকবে না এবং বাড়িতে কোনো প্রহরীও থাকবে না। যখনই তিনি শুনলেন যে, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বাড়িতে একটি গেইট তৈরি করেছেন, তখনই তিনি মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাকে তার নিকট প্রেরণ করেন এবং তাকে গেইটটি জ্বালিয়ে দিতে বলেন।^{২২২} সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ির নিকটেই বাজার ছিল। বাজারের উচ্চ আওয়াজ তাকে বিরক্ত করত। এ জন্য তিনি গেইটটি তৈরি করেছিলেন যাতে বাজারের আওয়াজ কম আসে। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ি এবং

^{২২০} তারিখুল মদীনা, ৩/৮১৮।

^{২২১} আস-সিয়াসিয়াতুশ শারইয়া, ইবনে তাইমিয়া, পৃ. ১০৫।

^{২২২} ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৭৭; নিহায়াতুল আরিব, ১৯/৮

তার নির্মাণকৃত গেইটের খবর খলীফার কানে আসে এবং তিনি জানতে পারেন যে, লোকজন তার বাড়িকে ‘সাদ প্যালেস’ নামে অভিহিত করছে। এ জন্য তিনি মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাকে কুফায় প্রেরণ করেন। তাকে বলেন, ‘ওই প্যালেসে গমন করো এবং তার গেইট জ্বালিয়ে দাও। তারপর সরাসরি ফিরে আসো।’ সুতরাং তিনি কুফায় গমন করেন। কিছু লোকড়ি জোগাড় করে প্যালেসে যান এবং গেইটটিতে আগুন ধরিয়ে দেন।^{২২৩}

ইবনে শিবহ বর্ণনা করেন, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুজাসা ইবনে মাসউদকে কিছু কাজের ইনচার্জ হিসাবে নিয়োগ দেন। তিনি জানতে পারেন যে, তার স্ত্রী প্রতিনিয়ত গৃহসজ্জার জন্য নতুন নতুন জিনিস (কার্পেট ও পর্দা) ক্রয় করছে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে লিখে পাঠান : আল্লাহর দাস আমীরুল মুমিনীন থেকে মুজাসা ইবনে মাসউদের প্রতি; আসসালামু আলাইকুম। আমি জানতে পেরেছি, আল-খুন্দাইরা প্রতিনিয়ত গৃহসজ্জার জিনিস ক্রয় করছে। আমার এই চিঠি তোমার নিকট পৌঁছার পর তা রাখার আগেই যেন তুমি তার দেয়ালের সব পর্দা ছিঁড়ে ফেলবে।’

চিঠিটি এমন এক সময় তার নিকট পৌঁছে যখন তার সম্মুখে কিছু ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিল। তিনি চিঠির দিকে তাকালেন এবং উপস্থিত লোকজন টের পেল যে, গুরুতর কোনো সংবাদ এসেছে। তিনি চিঠিটি হাতে নিয়ে লোকজনকে বললেন, ‘উঠে দাঁড়াও।’ তারা উঠে দাঁড়াল। আল্লাহর কসম, তারা বুঝতে পারল না যে, কেন তাদের উঠে দাঁড়াতে বলা হলো। তিনি লোকদের বাড়ির দরজার কাছে পৌঁছে দিয়ে ভেতরে গেলেন এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন, যে কিনা স্বামীর চেহারা খারাপ কিছুর ইঙ্গিত পাচ্ছিলেন। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনার কী হয়েছে?’ তিনি বললেন, ‘সরে যাও। আমি তোমার আচরণে খুবই রাগান্বিত।’ তারপর তিনি লোকদের ঘরে ডেকে আনলেন এবং তাদের বললেন, ‘আপনারা প্রত্যেকে হাতের কাছে যা পাবেন, ছিঁড়ে ফেলুন।’ লোকেরা সব পর্দা ছিঁড়ে ফেলল এবং সেসব ঘরের মেঝেতে ফেলে রাখল। চিঠিটি তখনো তার হাতে ধরা ছিল; তিনি সেটি তখনো হাত থেকে কোথাও রাখেননি।

সিরিয়া সফর করার সময় ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার বাড়িতে দাওয়াত দেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ঘরে প্রবেশ করে দেয়ালে কিছু পর্দা দেখতে পান। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেসব ছিঁড়তে আরম্ভ করেন এবং বলেন, ‘তোমার জন্য আফসোস, তুমি কি এমন কিছু দিয়ে দেয়াল সজ্জিত করেছ যা মানুষকে দিলে তারা সেগুলো পরিধান করে নিজেদের গরম-ঠান্ডা থেকে রক্ষা করতে পারত?’^{২২৪}

৩.৩.৪। বেত্রাঘাত করে সতর্ককরণ

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ পদ্ধতি বেশি প্রয়োগ করতেন। তিনি হাতে একটি লাঠি বা চাবুক নিয়ে হাঁটার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। এটি দিয়ে তিনি প্রয়োজনে লোকদের বেত্রাঘাত করতেন। কিছু ব্যতিক্রম কাজের জন্য তিনি কয়েকজন গভর্নরকে বেত্রাঘাত করেছেন। সিরিয়া সফরের সময় তিনি এক গভর্নরের বাড়িতে প্রবেশ করেন এবং তিনি সেখানে অনেক বেশি আসবাবপত্র দেখতে পান। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রেগে যান এবং তিনি তাদের বেত্রাঘাত করতে থাকেন।^{২২৫} ওই সফরে কয়েকজন গভর্নর তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। প্রথমে ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান ও আবু উবাইদা এবং পরে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আসেন। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘোড়ায় চড়ে সুন্দর চাকচিক্যময় পোশাক পড়ে আসেন, যা একজন মুজাহিদের জন্য শোভনীয় নয়। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বাহন থেকে নেমে কিছু পাথর কুড়িয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করতে থাকেন এবং বলেন, ‘কত দ্রুত তোমরা বদলে গেলে? তোমরা কি আমাকে এ অবস্থায় সম্ভাষণ জানাতে এসেছ? মাত্র দু-বছর আগ থেকে তোমরা নিজেদের উদরপূর্তি করার সুযোগ পাচ্ছ। যদি তোমরা দু শ বছর পরেও এ আচরণ করতে, তাহলে আমি তোমাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে দায়িত্ব দিতাম।’ তারা বললেন, ‘হে আমীরুল মুমিনীন, এটি কেবল আমাদের বাইরের দিক, আমাদের সঙ্গে এখনো অস্ত্র আগের মতোই আছে।’ তিনি বললেন, ‘তাহলে ঠিক আছে।’^{২২৬}

^{২২৪} তারিখুল মদীনা, ৩/৮৩২; আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/১২৮।

^{২২৫} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/১২৯।

^{২২৬} প্রাগুক্ত।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন গভর্নরের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন। ইবনে শিবহ বর্ণনা করেন, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ার গভর্নর হিসাবে আইয়ায ইবনে গানামকে নিযুক্ত করেন। তারপর তার নিকট সংবাদ এল যে, আইয়ায একটি গোসলখানা বানিয়েছেন এবং নিজের কিছু লোককে বিশেষভাবে সাক্ষাতের সুযোগ দেন। তিনি তাকে ডেকে পাঠান। পরে আইয়ায খলীফার নিকট দেখা করতে এলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তিন দিন পর্যন্ত তার সঙ্গে দেখা করা থেকে বিরত থাকলেন। তারপর তাকে অনুমতি দিলেন। তখন তিনি একটি পশমী কাপড়ের জুকা আনতে বললেন। এটা আনা হলে তাকে বললেন, ‘এটা পরিধান করো।’ তাকে একটি রাখালের ব্যাগ দিয়ে তিন শ ছাগলের রাখাল নিযুক্ত করেন। আইয়ায কিছু দূর অগ্রসর হলে তাকে বলেন, ‘ফিরে আসো।’ আইয়ায দৌড়ে খলীফার নিকট ফিরে আসেন। তিনি বলেন, ‘এই এই কাজ করবে। যাও।’ তারপর আইয়ায অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হন। খলীফা তাকে আবার ডেকে পাঠান। এভাবে তাকে যাওয়া-আসার মধ্যে রাখলেন যতক্ষণ না তার জুকাটি ঘামে ভিজে চপচপে হয়ে গেল। তিনি বললেন, ‘ছাগলগুলো অমুক দিন আমার নিকট নিয়ে আসবে।’

সময়মতো ছাগল নিয়ে হাজির হলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘এগুলোকে পানি পান করাও।’ সুতরাং আইয়ায পানি সংগ্রহ করে পাত্রে ভরে ছাগলগুলোর সামনে রাখেন। তারপর বললেন, ‘এগুলো নিয়ে আমার সঙ্গে অমুক অমুক দিন দেখা করবে।’ এভাবে তিন মাস পর্যন্ত খলীফা এ রকম করলেন। তারপর তাকে ডেকে বললেন, ‘সুতরাং তুমি একটি গোসলখানা বানিয়ে সেখানে আড্ডার আসর বসিয়েছ! আবার কি এ ধরনের কোনো কাজ করবে?’ আইয়ায বললেন, ‘না।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘যাও, কাজে ফিরে যাও।’^{২২৭} এ ঘটনায় তার ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ল। পরবর্তীকালে আইয়ায উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গভর্নরদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম গভর্নরে পরিণত হন।^{২২৮}

^{২২৭} তারিখুল মদীনা, ৩/৮১৭; আল-বিলায়াতু আলাল বুদদান, ২/১৩০।

^{২২৮} আল-বিলায়াতু আলাল বুদদান, ২/১৩০।

৩.৩.৬। গভর্নরের কিছু সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে এ পদ্ধতিটি সংশোধনের নিমিত্তে প্রয়োগ করা হতো। গভর্নরের সম্পদ বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তার মনে এই ভয় হয় যে, পদমর্যাদার কারণেই গভর্নররা এসব সম্পদ লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে। এ ব্যাপারে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পদক্ষেপ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, ‘ক্রয়, ভাড়া, বিনিয়োগ, জলসেচ, চাষাবাদ এবং এ রকম আরও অনেক কাজে গভর্নরদের ছাড় দেওয়া হলে সেটা ঘুষের পর্যায়ভুক্ত। যদিও গভর্নরদের সৎ গুণাবলি এবং ঐকান্তিক ধর্মানুরাগের কারণে তাদের মধ্যে অসদাচরণের কোনো সন্দেহ কিংবা আশঙ্কা ছিল না, তবু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এসব গভর্নর থেকে কিছু সম্পদ জব্দ করেন। মূলত এসব সম্পদ লাভের পেছনে তাদের পদমর্যাদার প্রভাব ছিল। পরিস্থিতি সাপেক্ষে খলীফা সঠিক পদক্ষেপই গ্রহণ করেছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন এবং সবসময়ই সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করতেন।’^{২২৯}

যেসব গভর্নর থেকে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এভাবে সম্পদ জব্দ করেছিলেন, তারা হলেন : সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু। নিয়োগের সময়ই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু গভর্নরদের সম্পদের হিসাব রেকর্ড করে রাখতেন। সম্পদ বৃদ্ধি হলে তিনি বর্ধিত সম্পদের অর্ধেক অথবা অনেক সময় সম্পূর্ণ অংশ জব্দ করতেন।^{২৩০}

ন্যায়সংগত কারণে তিনি কয়েকজন গভর্নরের আত্মীয়ের সম্পদও জব্দ করেছিলেন। তিনি একবার আবু বাকরার অর্ধেক সম্পদ জব্দ করলেন। এতে আবু বাকরা বাধা দিয়ে বললেন, ‘আমি তো আপনার হয়ে কোনো কাজ করিনি।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘কিন্তু তোমার ভাই বাইতুল মালের ইনচার্জ এবং তিনি তোমাকে টাকা ধার দেয়, যা তুমি তোমার ব্যবসায় বিনিয়োগ করো।’^{২৩১}

^{২২৯} আল-ফাতওয়া, ২৮/১৫৭।

^{২৩০} ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ২২০-২১; আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/১৩১।

^{২৩১} শহিদুল মিহরাব, পৃ. ২৫০।

৩.৩.৭। মৌখিক ও লিখিত তিরস্কার

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসা কয়েকজন গভর্নরকে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মৌখিকভাবে তিরস্কার করেছেন। তিনি আমার ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বেশ কয়েকবার তিরস্কার করেছেন। আইয়ায ইবনে গানাম, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, আবু মূসা আল-আশআরী এবং অন্যান্য গভর্নরকে তিনি তিরস্কার করেন।^{২৩২}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে অনেক গভর্নরকে লিখিতভাবে তিরস্কার করতেও দেখা যায়। উদহরণস্বরূপ, আরব-অনারবের মধ্যে সম্পদ বণ্টনে পক্ষপাতিত্ব করায় লোকেরা অভিযোগ করলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের গভর্নরকে চিঠি লিখে সতর্ক করেন। তিনি লেখেন, ‘এটা খুবই ঘৃণিত কাজ যে, কেউ তার মুসলিম ভাইদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে।’^{২৩৩}

ওপরের আলোচনা থেকে এটি পরিস্কার যে, গভর্নরগণ যেকোনো মুহূর্তে তাদের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা ও বিভিন্নভাবে আইনের মুখোমুখি হওয়া থেকে নিরাপদ ছিলেন না। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এমন সাহস ও দৃষ্টান্ত পৃথিবীবাসী কখনো দেখেনি। এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে খলফায়ে রাশেদীনের যুগ ছিল ইসলামী সভ্যতার সর্বোত্তম যুগ।^{২৩৪}

খলীফা ও গভর্নরের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শ ও আলোচনার স্বাধীনতা নতুন মাত্রা লাভ করেছিল। গভর্নরগণ খলীফার ক্ষমতাকে ভয় পেতেন না। এ ব্যাপারে কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা হলো :

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ায় এলে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু অনেক লোকজন নিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দূর থেকে দেখে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘোড়া থেকে নেমে তার দিকে হেঁটে যান এবং সালাম দেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সালামের জবাব না দিয়েই সামনের দিকে যাচ্ছিলেন। মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তার উটের

^{২৩২} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/১৩১।

^{২৩৩} ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪৪৩।

^{২৩৪} আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান, ২/১৩৩।

পেছনে পেছনে দৌড়াতে শুরু করলেন। তার দেহ ভারী হওয়াতে অল্পতেই হাঁপাতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি তো লোকটিকে অজ্ঞান করে ফেলবেন। আপনি তার সঙ্গে কথা বলছেন না কেন?’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবার মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এসব সভাসদ কি তোমার?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ।’ উমর বললেন, ‘তুমি লোকদের থেকে দূরে থাকো এবং লোকেরা প্রয়োজনে দেখা করতে এলে তোমার দরজায় বসিয়ে রাখো?’ মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হ্যাঁ, হে আমীরুল মুমিনীন।’ তিনি বললেন, ‘তোমার জন্য আফসোস, কেন তুমি এমন করো?’ মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, ‘আমরা এমন এক ভূখণ্ডে আছি যেখানে শত্রুপক্ষের অনেক গোয়েন্দারা সক্রিয়। যদি আমরা সতর্কতা অবলম্বন না করি তাহলে শত্রুরা আমাদের ভয় করবে না এবং তারা আমাদের আক্রমণ করে বসবে। আর দাররক্ষী নিয়োগের কারণ হলো, আমরা আশঙ্কা করি যে, আমাদের মান-সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে এবং লোকজন হট্টগোল শুরু করবে। আমি এখনো আপনার অনুগত গভর্নর। আপনি যদি এ রকম করতে নিষেধ করেন, তাহলে আমি তা মেনে চলব, হে আমীরুল মুমিনীন।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমি তোমাকে যা-ই জিজ্ঞাসা করি, তোমার নিকট জবাব মজুদ থাকে। যদি তুমি সত্য বলে থাক, তাহলে এটি অবশ্যই ভালো যুক্তি। আর যদি তা মিথ্যা হয়ে থাকে, তাহলে এটি ভালো ট্রিকস। আমি তোমাকে তা করার জন্য হুকুম করছি না, আবার নিষেধও করছি না।’ তারপর তিনি স্থান ত্যাগ করেন।^{২৩৫}

গভর্নরদের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি ও সতর্ক পর্যবেক্ষণ, সন্দেহজনক কোনো কর্মকাণ্ড কিংবা অন্য কোনো অভিযোগে যখন-তখন তাদের পদচ্যুতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও খলীফার সঙ্গে গভর্নরদের সম্পর্ক ছিল গভীর ভালোবাসার ও আনুগত্যের। খলীফার নিষ্ঠা, সদিচ্ছা, নীতি ও ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে তাদের সম্পূর্ণ আস্থা ছিল। যদি কখনো রণক্ষেত্রে কোনো প্রশাসকের সঙ্গে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতো, তাহলে কষ্ট ও অস্থিরতা তাকে মৃতবত করে ফেলত। তিনি তাদের দুর্যোগ ও ভয়াবহ পরিণতির আশঙ্কায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠতেন। একবার এক বড়

^{২৩৫} আল-ফারুক উমর ইবনুল খাত্তাব, আশ-শারকাবি, পৃ. ২৮৭।

ধরনের লড়াইয়ের সংবাদ সংগ্রহের জন্য নিজেই ছুটে যান, যাতে তার মন শান্ত হয়। অন্য সময় তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করতেন এবং তখন তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসার নিদর্শন ফুটে উঠত। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন জেরুযালেম বিজয় করতে যান, আল-জাবিয়া পৌঁছে তিনি সেনাপতি আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং শুরাহবিল ইবনে হাসানাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে দেখা করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বাহনে থাকা অবস্থায় তাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তারা তার পায়ে চুম্বন করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে কোলাকুলি করেন।^{২৩৬}

৩.৪। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-এর অপসারণ

ইসলামের শত্রুরা অবাস্তব কল্পনা ও গভীর আক্রোশের বশবর্তী হয়ে এমন-সব বর্ণনার সন্ধান লাভ করে যাতে সাহাবায়ে কেরামে চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করা সম্ভব হয়। যদি তারা তাদের পরিকল্পনা ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী বর্ণনা খুঁজে না পেত, তাহলে বানোয়াট বর্ণনার আশ্রয় নিত। আর এতে তারা আশা করে, লোকেরা এসব গ্রহণ করবে এবং তারাই এর বর্ণনাকারী ও উৎসে পরিণত হবে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু—উভয়েই এসব বানোয়াট গল্পের শিকার হয়েছেন যেখানে ইসলামের শত্রুরা ঐতিহাসিক বর্ণনাকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পদচ্যুত করলেন এ বিষয়ে তারা সবচেয়ে বেশি নয়র দিয়েছে। আর তারা এই দুই মহান ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে এবং এমন-সব বর্ণনা জুড়ে দিয়েছে যা কোনোভাবেই সত্যের ধারেকাছেও নেই।^{২৩৭} নিচে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পদচ্যুতির সত্য ঘটনা তুলে ধরা হলো যা মূলত দুটি স্তরে সম্পন্ন হয়েছিল এবং এ জন্য মহান উদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিল।

৩.৪.১। প্রথম অপসারণ

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রথমে সিরিয়ার গভর্নর ও সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করেন। এটি

^{২৩৬} আবাতিল ইয়াজিব আন তুমহা মিনাত তারিখ, ইবরাহিম শাউত, পৃ. ১২৩।

^{২৩৭} আদ-দাওলাহ আল-ইসলামিয়া ফি আসর আল-খুলাফা আর-রাশিদিন, পৃ. ১৫১।

সংঘটিত হয় ১৩ হিজরীতে যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পরে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। এই অপসারণের মূলে ছিল গভর্নরদের নিয়ন্ত্রণে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, যা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মতো ছিল না। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু গভর্নরদের ইসলামী রাষ্ট্রের সাধারণ নীতির মধ্যে পুরোপুরি স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এতে শর্ত ছিল, ব্যক্তি এবং দলের সঙ্গে তাদের সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত ও নিরপেক্ষ আচরণ করতে হবে। তিনি নিজেই রাষ্ট্রে সুবিচার নিশ্চিত করতেন। তবে তার গভর্নরগণ ন্যায়সংগতভাবে বিচারকার্য করলেও তিনি কিছু মনে করতেন না। খলীফার অনুমতিক্রমে গভর্নরগণ তাদের নিজ নিজ প্রদেশের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। ছোট ছোট বিষয়ে খলীফার দ্বারস্থ হতে হতো না। প্রদেশে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পদ কিংবা অন্য কোনো কারণে গভর্নরদের ক্ষমতাকে খর্ব করার প্রয়োজন মনে করতেন না।^{২৩৮} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পরামর্শ দেন, তিনি যেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার অনুমতি ব্যতীত কাউকে ছাগল কিংবা উট প্রদান না করে। এই পরামর্শ অনুযায়ী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে চিঠি প্রেরণ করেন এবং এর উত্তরে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ লিখে পাঠান : আমাকে আমার মতো কাজ করার সুযোগ দিন, নতুবা আপনাকেই তা করতে হবে।’ তখন খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পদচ্যুত করার জন্য উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পরামর্শ দেন।^{২৩৯} তবে খলীফাতুর রাসূল আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে স্বপদে বহাল রাখেন।^{২৪০}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন খলীফা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তিনি মনে করেন, গভর্নর ও প্রশাসকদের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যা প্রদেশের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে অনুসরণ করা হবে। তিনি প্রদেশে সংঘটিত ছোট-বড় সবকিছুই খলীফাকে জানানো বাধ্যতামূলক করে দেন যাতে তিনি বিষয়গুলো তদন্ত করতে পারেন এবং সে অনুযায়ী

^{২৩৮} খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, সাদিক আরজুন, পৃ. ৩২১-৩৩১।

^{২৩৯} আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/১১৫।

^{২৪০} তারিখুল ইসলামি, ১১/৪৬।

নির্দেশ জারি করতে সক্ষম হন। আর গভর্নরগণ তার নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবে। কারণ, তিনি মনে করতেন, ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা স্বয়ং যা করেন, এ জন্য তিনি যেমনভাবে দায়ী, তেমনি তার গভর্নরগণ যা কিছু করবে, তার জন্যও খলীফা দায়ী হবেন। আর এ দায়-দায়িত্ব থেকে সবচেয়ে উত্তম গভর্নর নির্বাচন করেও ছাড় পাওয়া যাবে না। তিনি খলীফা নির্বাচিত হয়ে জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি বলেন : ‘আমার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করছেন এবং তোমাদের মাধ্যমে আমাকে পরীক্ষা করছেন। আর আমার দুজন সাথি আল্লাহ তা‘আলার কাছে চলে গেছেন এবং আল্লাহ আমাকে এখনো জীবিত রেখেছেন। আল্লাহর কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি নিজে তোমাদের দায়িত্ব সরাসরি পালন করতে পারব ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কারও হাতে তোমাদের ছেড়ে দেব না। আর যেসব কাজ সরাসরি করতে পারব না সেসবের দায়িত্ব আমি যোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য লোকের হাতে দেব। আল্লাহর কসম, তারা (গভর্নররা) যদি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করে, তবে আমি তাদের পুরস্কৃত করব, আর অন্যায় করলে কঠিন শাস্তি দেব।’^{২৪১}

তিনি আরও বলতেন, ‘যদি আমি সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে তোমাদের শাসক হিসাবে নিয়োগ দিই এবং তাকে ন্যায়-পরায়ণতার সঙ্গে শাসন করতে বলি, তাহলে তোমরা কি মনে করো যে, আমি আমার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছি?’ তারা বলল, ‘হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, ‘না। যতক্ষণ না আমি তার আচরণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছি এবং তাকে যা করার নির্দেশ দিয়েছি, তা সে যথাযথভাবে পালন করেছে, ততক্ষণ আমার দায়িত্ব পরিপূর্ণ হবে না।’^{২৪২}

খলীফা হওয়ার পর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই প্রত্যাশা করলেন যে, প্রাদেশিক গভর্নরগণ তার পদ্ধতিকে অনুসরণ করবে। তাদের কেউ কেউ সেটি মেনে নিল এবং অন্যরা দ্বিমত পোষণ করল। যারা তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন, তাদের একজন ছিলেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু।^{২৪৩} মালিক ইবনে আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, খলীফা হওয়ার পর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু

^{২৪১} খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, সাদিক আরজুন, পৃ. ৩৩১।

^{২৪২} প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২।

^{২৪৩} প্রাগুক্ত।

আনহুকে লিখে পাঠান : ‘আমার অনুমতি ছাড়া কাউকে একটি ছাগল কিংবা উটও দেবে না।’ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এই চিঠির জবাবে লেখেন : হয় আপনি আমাকে আমার মতো কাজ করার সুযোগ দেবেন, নতুবা আপনাকেই এর দায়িত্ব নিতে হবে।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহর প্রতি আমার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাবে যদি আমি যা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলাম, আমি নিজেই (সেই সুযোগ পেয়ে) তা না করি।’ সুতরাং তিনি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বরখাস্ত করলেন।^{২৪৪} অধিকন্তু তিনি তাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দায়িত্ব দিতে চেয়েছেন, কিন্তু তিনি স্বাধীনভাবে ওই দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছেন, যার অনুমতি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু দেননি।^{২৪৫}

অতএব, রাষ্ট্র পরিচালনায় গৃহীত নীতির ওপর ভিত্তি করেই তিনি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বরখাস্ত করেছিলেন। আর শাসকগণ রাষ্ট্র পরিচালনায় নতুন দিকনির্দেশনা দিতেই পারেন (শরীয়তের সীমার মধ্যে)। এ রকম ঘটনা আমাদের জীবন অহরহ ঘটছে। বিভিন্ন বর্ণনা, মতামত, নিজস্ব বিজ্ঞোচিত দর্শন ও প্রভাব বিবেচনা করে এর পেছনে জটিল কোনো কারণ খুঁজে বের করার প্রয়োজন নেই। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এমন এক সময় ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন যখন লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের খুব নিকটবর্তী ছিল। মৌলিকভাবেই রাষ্ট্রের প্রাদেশিক গভর্নর ও সেনাপতি নির্বাচন খলীফার অন্যতম দায়িত্ব। স্বভাবতই তারা এমন ব্যক্তি হবেন যারা খলীফার চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করবে এবং তার অনুসৃত নীতি ও পথকে মেনে চলবে। উল্লেখ্য, তখন উম্মতের মধ্যে যোগ্য ও বিশ্বস্ত লোকের কোনো কমতি ছিল না। গভর্নর ও সেনাপতিরা চিরকাল তাদের পদে অধিষ্ঠিত থাকার অধিকার রাখেন না। আর যখন রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে গভর্নরের মতের অমিল হয়, তখন গভর্নরদের আর দায়িত্ব পালনের সুযোগ থাকে না যেখানে আরও অনেকেই রাষ্ট্রনায়কের মতকে অনুসরণ করে দায়িত্ব পালনে আগ্রহী ব্যক্তি-বর্গ রয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ ব্যাপারে খুবই সফল ছিলেন এবং তার গৃহীত নীতিসমূহ অকল্পনীয় সফলতা অর্জন করে। তিনি কয়েকজনকে বরখাস্ত

^{২৪৪} আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/১১৫।

^{২৪৫} খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, সাদিক আরজুন, পৃ. ৩৩২।

করেন এবং তাদের পরিবর্তে অন্যদের নিয়োগ দেন। নতুন যাদের নিয়োগ দেন, তারা কোনো অংশেই পূর্ববর্তী গভর্নরদের চেয়ে যোগ্যতায় কম ছিলেন না। কারণ, তখন এ রকম দায়িত্ব পালন করার জন্য যোগ্য ও সাহসী লোকের সংখ্যা ছিল অনেক।^{২৪৬}

কোনো রকমের প্রতিবাদ ছাড়াই খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পদচ্যুতিকে গ্রহণ করেন এবং তিনি আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্ব মেনে চলেন। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তা‘আলা তাকে কিন্নিসিরিন বিজয়ের সুযোগ দিলে আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি খলীফাকে এই বিজয় সম্পর্কে অবহিত করেন এবং সেখানে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অবদান তুলে ধরেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন তার বিখ্যাত উক্তিটি করেন : খালিদ নিজেই নিজেকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেছে। আল্লাহ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওপর রহম করুন, মানুষ সম্পর্কে আমার চেয়ে তার বেশি জ্ঞান ছিল।^{২৪৭} এ কথা বলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হলো, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সাহসী ও বীরোচিত কাজের জন্য নিজেকে এমন এক উচ্চতায় আসীন করেছিলেন, যা করতেই তিনি অভ্যস্ত—বিপজ্জনক, সাহসী ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে পারদর্শী। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যেন বোঝাতে চেয়েছেন, তার পরামর্শ সত্ত্বেও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যোগ্যতা ও সামরিক দক্ষতার কথা বিবেচনা করে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বরখাস্ত করেননি। এর মানে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ কয়েকজন বীর ছাড়া অন্য কারও পক্ষে তার স্থান পূরণ করার মতো লোক ছিল না।^{২৪৮}

এ-সময় খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রায় চার বছর আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে কাজ করেন এবং তিনি মুহূর্তের জন্যও তার অবাধ্য হননি। আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মহান গুণাবলিকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তিনি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থাকে সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং সেভাবেই তিনি তার সঙ্গে সম্মান ও দয়ার আচরণ করেছেন। তিনি তাকে নিজের কাছাকাছি

^{২৪৬} খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, সাদিক আরজুন, পৃ. ৩৩২-৩৩৩।

^{২৪৭} প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১।

^{২৪৮} প্রাগুক্ত।

রাখতেন, যখন-তখন তার সঙ্গে পরামর্শ করতেন, তার মতামতকে গুরুত্ব দিতেন এবং কখনো কখনো তাকে নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে দিতেন। এসব কারণেই খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মনে কোনো ধরনের আক্রোশ বাসা বাঁধতে পারেনি এবং ফলে তার পক্ষে সামরিক ক্ষেত্রেও এত বীরোচিত ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়েছে। দামেস্ক, কিনিসিরিন এবং অহল বিজয় তার ঐশী মনোবলের সাক্ষী যা পদচ্যুতির ঘোষণা শোনার পর তার আচরণে ফুটে উঠেছিল। উভয় ক্ষেত্রেই (বরখাস্ত হওয়ার আগে এবং পরে) তিনি ছিলেন আল্লাহর তরবারি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু।^{২৪৯}

ইতিহাস বিস্মৃত হয়নি সেই কথা, যা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বরখাস্তের সময় আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন : ‘এটি দুনিয়ার কোনো ক্ষমতা নয় যা আমি চাই এবং আমি যা কিছু করি তা এই দুনিয়ার জন্য নয়। তুমি যা কিছু দেখছ, তা শীঘ্রই নিঃশেষ হয়ে যাবে। অথচ আমরা পরস্পর ভাই, যারা আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি এবং এটি কোনো ব্যাপার নয় যে, ভাইদের একজন অপরজনের ধর্মীয় ও দুনিয়ার বিষয়াদিতে নেতৃত্ব দেবে; বরং যার ওপর নেতৃত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হলো সে-ই বেশি অস্থিরতা ও গোনাহের ঝুঁকিতে রয়েছে—তারা ব্যতীত যাদের আল্লাহ হেফাজত করেন এবং তাদের সংখ্যা খুবই কম।’^{২৫০}

যখন আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সামরিক অভিযান পরিচালনা করার নির্দেশ দিতেন, তিনি তা সানন্দেই গ্রহণ করেন এবং বলেন, ‘ইনশাআল্লাহ আমি তা করব। আমি কেবল আপনার নির্দেশের অপেক্ষায়ই ছিলাম।’ আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘তোমাকে কিছু বলতে আমার খুব লজ্জা লাগে, হে আবু সুলাইমান।’ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘যদি কোনো ছোট শিশুকেও আমার ওপর নিয়োগ করা হয়, আমি তাকে মেনে চলব। আমি কেমন করে আপনার বিরুদ্ধে যাব যেখানে আপনি আমার আগে ইসলামে দাখিল হয়েছেন এবং আপনি তাদের সাথেই ঈমান এনেছেন যারা দ্রুত ইসলামে

^{২৪৯} খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, সাদিক আরজুন, পৃ. ৩৪৬।

^{২৫০} প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩।

দাখিল হওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। আর স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে ‘আল-আমীন’ বলে সম্বোধন করেছেন। আমি কেমন করে আপনার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হব? এখন আপনাকে আমি সাক্ষী বানাচ্ছি যে, আমি পুরোপুরিভাবে নিজেকে আল্লাহর জন্য সোপর্দ করলাম এবং আমি কখনোই আপনার অবাধ্য হব না এবং এরপরে আর কখনো গভর্নরের পদ গ্রহণ করব না।’ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এখানেই থেমে যাননি; বরং তিনি তা বাস্তবে করে দেখিয়েছেন এবং তাকে যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তিনি তা দ্রুত বাস্তবায়নে বেরিয়ে পড়েন।^{২৫১}

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা ও কাজ থেকে এটি পরিস্কার যে, ধর্মীয় ও মানবিক অনুভূতিই তাদের মধ্যে পারস্পরিক সদাচরণে মূল ভূমিকা রাখে। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা ও গভর্নরের প্রতি আনুগত্যের নীতি বজায় রেখেছেন যদিও পদচ্যুতির কারণে তার ব্যক্তিগত অবস্থান ও মর্যাদা পরিবর্তিত হয়েছে—সেনাপতি থেকে সাধারণ সৈনিকে পরিণত হয়েছে।^{২৫২} গভর্নরের পদ থেকে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অপসারণের মূলে তার বিরুদ্ধে কোনো বিদ্বেষ, সন্দেহ কিংবা শরীয়তের সীমালঙ্ঘন বা তার ইসলামী মূল্যবোধ ও ন্যায়পরায়ণতায় কোনো কলঙ্ক দায়ী ছিল না; বরং এখানে ইসলামের দুই মহান ব্যক্তির দুটি ভিন্ন পদ্ধতির বাস্তবায়ন প্রতিফলিত হয়েছে যেখানে উভয়ে মনে করেছেন, তাদের নিজস্ব পদ্ধতিই প্রয়োগ করা উচিত। যদি তাদের একজনকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তাহলে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি খলীফার জন্যই এই ত্যাগ স্বীকার করবেন—কোনো হীনম্মন্যতা কিংবা কোনো ক্রোধ বা আক্রোশ ছাড়াই।^{২৫৩}

আল্লাহর অনুগ্রহে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি হিসাবে আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়োগ দেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর ওই এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল যাতে মানুষের মধ্যে শত্রুতা চিরতরে শেষ হয়ে যায়, আহতরা সুস্থ হয়ে ওঠে এবং তাদের অন্তরগুলো বিবাদ-বিসংবাদ ভুলে আবার এক হয়ে ওঠে। সুযোগ পাওয়ামাত্রই আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু শান্তি প্রতিষ্ঠায়

^{২৫১} নিয়ামুল হিকামি ফি আহদিদ খুলাফাইর রাশিমিন, পৃ. ৮৪।

^{২৫২} প্রাগুক্ত।

^{২৫৩} আবাতিল ইয়াজিব আন তুমহা মিনাত তারিখ, পৃ. ১৩২।

এগিয়ে যান, কিন্তু প্রয়োজনে লড়তে তিনি পিছপা হননি। সিরিয়ার বিভিন্ন শহরের লোকেরা আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহনশীলতার পরিচয় পেয়ে দলে দলে এসে তার নিকট শান্তিচুক্তি করে; তারা অন্য কারও থেকে তার সঙ্গেই চুক্তি করতে পছন্দ করে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশেই আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং প্রদেশের সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষায় সিরিয়ার গভর্নর হিসাবে তার এই নিয়োগ ছিল যথোপযুক্ত।^{২৫৪}

৩.৪.২। দ্বিতীয় অপসারণ

কিনিসিরিনের গভর্নর পদ থেকে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আবার (দ্বিতীয়বার) পদচ্যুত করা হয়। আর এটি সংঘটিত হয় ১৭ হিজরীতে।^{২৫৫} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট খবর পৌঁছে যে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আইয়ায ইবনে গানাম রাযিয়াল্লাহু আনহু বাইজেন্টাইন বর্ডার ভেদ করে অভিযান পরিচালন করেন এবং বিপুল-পরিমাণ গনীমতের মাল নিয়ে আসেন। অনেক দূর থেকে তার নিকট একজন লোক সাহায্যের আশায় আসে। তার সঙ্গে আল-আশাস ইবনে কাইসও ছিলেন, যাকে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু দশ হাজার দিরহাম প্রদান করেন। তিনি যা কিছু করেছেন, তার সব খবরই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কানে আসে।^{২৫৬}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সেনাপতি আবু উবাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর চিঠি প্রেরণ করেন যাতে তিনি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই বিপুল-পরিমাণ অর্থের উৎস সন্ধান করতে বলেন এবং তাকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যেকোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে বলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনায় ডেকে আনেন এবং আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সম্মুখে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পরিশেষে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু গনীমতের মাল থেকে দশ হাজার দিরহাম নেওয়ার অভিযোগের ব্যাপারে পুরোপুরি নির্দোষ সাব্যস্ত হন।^{২৫৭}

^{২৫৪} আবকারিয়াত খালিদ, আল-আকাদ, পৃ. ১৫৪-১৫৬।

^{২৫৫} তারিখ আত-তাবারি, ৫/৪১।

^{২৫৬} প্রাগুক্ত।

^{২৫৭} খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, সাদিক আরজুন, পৃ. ৩২৪।

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পদচ্যুতির ব্যাপারে জানানো হলে তিনি সিরিয়াবাসীদের বিদায় সম্ভাষণ জানান। তার কথায় সেনাপতি ও সৈন্যদের মধ্যে চিরায়ত বিচ্ছেদের কষ্ট ফুটে ওঠে : আমীরুল মুমিনীন আমাকে সিরিয়ার গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত করেন। যখন সব গোলযোগ শেষ হয়ে পরিস্থিতি শান্ত এবং স্থির হতে থাকে, তখন তিনি আমাকে অপসারণ করেন।’ এক লোক দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, ‘হে মহান সেনাপতি, ধৈর্যধারণ করুন। এখন ফিতনার সময় ধৈর্যে আসছে।’ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘যতদিন উমর ইবনুল খাত্তাব জীবিত থাকবেন, ততদিন কোনো ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না।’^{২৫৮} এটি খুবই শক্তিশালী এবং একনিষ্ঠ ঈমানের প্রকাশ, যা আল্লাহর রাসূলের ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের মধ্যে নির্বাচিত বান্দাদের ছাড়া অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। এক চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে কি এক পরম ঐশ্বরিক শক্তি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল, যা তাকে এ রকম উত্তর দিতে সমর্থ করেছিল?^{২৫৯} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের সমর্থনে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভাষ্য শুনে লোকজন শান্ত হয়ে যায়। তারা অনুধাবন করে, তাদের বহিষ্কৃত সেনাপতি এমন কোনো সাধারণ ব্যক্তি নন, যে কিনা বিদ্রোহ ও ফিতনা ছড়িয়ে খলীফার বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের গৌরব প্রকাশ করবেন; বরং তিনি ছিলেন এমন ব্যক্তিত্ব যাদের গঠনমূলক কাজ করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং পরিস্থিতি যদি তাদের কীর্তিকে স্মান করে দিতে চায়, তাহলে তারা আরও উঁচুতে উন্নীত হন।^{২৬০}

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনাতে ফিরে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি খলীফাকে বলেন, ‘আমি আপনার ব্যাপারে মুসলিমদের নিকট অভিযোগ করেছি যে, আপনি আমার সঙ্গে ন্যায়সংগত আচরণ করেননি, হে উমর।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কোথা থেকে এ সম্পদ লাভ করেছ?’ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, ‘আমার গনীমতের অংশ থেকে। আর সেখানে ষাট হাজারের অধিক আপনার অংশ।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু গনীমতের সম্পদ হিসাব করে দেখলেন যে, তা বিশ হাজার, যা তিনি বাইতুল মালে জমা করেন।

^{২৫৮} প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭।

^{২৫৯} খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, সাদিক আরজুন, পৃ. ৩৪৭।

^{২৬০} প্রাগুক্ত।

তারপর বলেন, ‘হে খালিদ, আল্লাহর কসম, তুমি আমার নিকট অনেক প্রিয় এবং আজকের পরে তুমি আমার প্রতি আর অসন্তুষ্ট থাকবে না।’^{২৬১}

তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়াবাসীদের প্রতি এক চিঠিতে লেখেন, ‘আমি খালিদকে এ জন্য অপসারণ করিনি যে, আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট কিংবা সে কোনো মন্দ আচরণ করেছে; বরং মানুষজন তার ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আমার আশঙ্কা হয়েছে, আল্লাহ হয়তো লোকজনকে তার দিকে ধাবিত করবেন এবং তার মাধ্যমে তারা পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। আমি এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছি, আল্লাহই একমাত্র সত্তা যিনি বিজয় দান করেন এবং এ ব্যাপারে যাতে লোকজনের মনে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি না হয়।’

৩.৪.৩। অপসারণের কারণসমূহের সারসংক্ষেপ এবং এর সুফল

রাষ্ট্র পরিচালনায় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যে আদর্শ বা নীতি অনুসরণ করতেন, এর ভিত্তিতে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অপসারণের কারণসমূহ নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো :

তাওহীদের সুরক্ষা : উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা—‘বরং মানুষজন তার ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আমার আশঙ্কা হয়েছে, আল্লাহ হয়তো লোকজনকে তার দিকে ধাবিত করবেন এবং তার মাধ্যমে তারা পরীক্ষার সম্মুখীন হবে’—থেকে এটি পরীক্ষার যে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আশঙ্কা করেছেন, লোকজন খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য সন্দেহে পতিত হবে এবং তারা ধারণা করবে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যেখানেই যাবেন সেখানেই বিজয় অর্জিত হবে, যা তাদের মূল বিশ্বাসকে দুর্বল করে তুলবে। কারণ, বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে—যুদ্ধে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু অংশগ্রহণ করুন বা না করুন। কোনো একজন সেনাপতি—খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু—এর প্রতি লোকজনের অতিভক্তি থেকে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেও তার ভক্তদের অনুরক্ত হয়ে যেতে পারেন; তিনি নিজেকে এমন ক্ষমতাবান মনে করতে পারেন, যা অপ্রতিরোধ্য। কারণ, তিনি ছিলেন রণকৌশলে অসম্ভব পারদর্শী এবং দান-

সদকায় উদার। এটি রাষ্ট্র এবং তার নিজের জন্যও খারাপ পরিণতি ডেকে আনত। যদিও এ রকম হওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুবই ক্ষীণ। বস্তুত লোকজন তাদের খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি নিবদ্ধ ছিল এবং তাকে তারা খুব শ্রদ্ধা করত। আর অন্যদিকে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন মহান সামরিক ব্যক্তিত্ব এবং ধর্মভীরু মানুষ। তারপরেও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর পরে হয়তো খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো নেতার সঙ্গেও একই ঘটনা ঘটতে পারত। এ জন্য ওই সময় এসব মহান ব্যক্তিদের জন্য একটি দিকনির্দেশনা প্রয়োজন ছিল।^{২৬২} এ রকম পরিস্থিতিতে কম যোগ্যতাসম্পন্ন সেনাপতি—যার পরিচিতিও তেমন ব্যাপক নয়—থেকে সুদক্ষ সেনাপতিকে নিয়ে ফেতনার আশঙ্কা ছিল বেশি।^{২৬৩}

অর্থ ব্যয়ে পন্থতিগত মতপার্থক্য : উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মনে করতেন, অর্থ ও উপহারসামগ্রী দিয়ে ইসলামের দিকে মানুষের মনকে আকৃষ্ট করার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে; ইসলামে এমন লোকজনের আর প্রয়োজন নেই এবং লোকজনকে তাদের নিজস্ব বিশ্বাস ও আদর্শের ওপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। অন্যদিকে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মনে করতেন, তার সঙ্গে এমন কিছু সাহসী মানুষ ও মুজাহিদ লড়াই করছে যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর পুরস্কারের আশায় লড়াই করছে না। তাদের ঈমান বৃদ্ধি ও ইসলামের দিকে আরও নিবেদিত করে তোলার জন্য তাদের পেছনে কিছু ব্যয় করার সুযোগ রয়েছে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মনে করতেন, অন্যদের চেয়ে দরিদ্র মুজাহিদরা এ সম্পদ লাভের বেশি যোগ্য। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন জাবিয়ার লোকজনকে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অপসারণের কারণ ব্যক্ত করছিলেন, তখন বলেন, ‘আমি তাকে এসব অর্থ মুজাহিদদের মধ্যে দুর্বলদের জন্য খরচ করতে বলেছিলাম, কিন্তু তিনি তা শক্তিশালী ও সামর্থ্যবানদের পেছনে খরচ করেছে।’^{২৬৪} অবশ্যই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু—প্রত্যেকের মতের পক্ষে অনেক যুক্তি রয়েছে, কিন্তু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এমন কিছুর আঁচ করতে পেরেছিলেন যা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পারেননি।^{২৬৫}

^{২৬২} আদ-দাওলাহ আল-ইসলামিয়া ফি আসর আল-খুলাফা আর-রাশিদিন, হামদি শাহীন, পৃ. ১৪৯।

^{২৬৩} আবকারিয়াত উমর, পৃ. ১৫৮।

^{২৬৪} আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/১১৫।

^{২৬৫} তারিখুল ইসলামি, ১১/১৪৭।

প্রশাসনিক কাজে উমর রা. এবং খালিদ রা.-এর মতপার্থক্য : উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু গভর্নরদের এই মর্মে চাপ প্রয়োগ করেন যে, তারা তাকে প্রত্যেক বিষয়েই অবহিত করবে—সেটা বড় কিংবা ছোট হোক। কিন্তু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মনে করতেন, যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ ক্ষেত্রে তার জন্য কারও নিকট জবাবদিহিতার প্রয়োজন নেই; তিনি মনে করতেন, যখন যা কিছু করা প্রয়োজন, এ ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত, কারণ, বাস্তব প্রেক্ষাপটে যে উপস্থিত, সে অনুপস্থিত ব্যক্তি অপেক্ষা পরিস্থিতি বেশি পর্যবেক্ষণ ও বিবেচনা করার সুযোগ লাভ করেন।^{২৬৬}

সম্ভবত আরেকটি কারণ এই ছিল, নতুন নেতাদের নেতৃত্ব লাভের সুযোগ করে দেওয়া যাতে মুসলিম উম্মাহ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু, আল-মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো আরও বীর তৈরি করতে সক্ষম হয়। আরেকটি কারণ, লোকজনের বোঝা উচিত, বিজয় কোনো একক ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষয় নয়; ^{২৬৭} বরং ব্যক্তি এখানে কোনো ব্যাপারই নয়।

খালিদ রা.-এর অপসারণে মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া : মুসলিম সমাজ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই অপসারণকে মেনে নেয়। কারণ, তারা মনে করে, যে কাউকে গভর্নর নিয়োগ ও বহিস্কারে খলীফার অধিকার রয়েছে। কারও পক্ষেই ইসলামী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অথবা গভর্নর নিয়োগ ও বহিস্কারে খলীফার অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার ছিল না।

বর্ণিত আছে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু একদিন মধ্যরাত্রে আলকামা ইবনে উলাসা আল-কিলাবির সঙ্গে দেখা করলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে অনেকটাই খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো মনে হতো এবং আলকামা ভাবলেন, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই এসেছেন। তিনি বলে উঠলেন, ‘হে খালিদ, খলীফা তোমাকে পদচ্যুত করেছেন এবং এখন এর স্বপক্ষে যুক্তি দেখাচ্ছেন। আমি আমার এক চাচাত ভাইকে নিয়ে

^{২৬৬} আল-খিলাফা ওয়াল-খুলাফা আর-রাশেদুন, সালিম আল-বাহনাসাবি, পৃ. ১৯৬।

^{২৬৭} আবাতিল ইয়াজিব আন তুমহা মিনাত তারিখ, পৃ. ১৩৪।

তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে চাই। কিন্তু তিনি যা করার করেছেন। আমি তাকে কখনো কিছু জিজ্ঞাসা করব না।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু— আরও বিস্তারিত জানার আগ্রহে যা তিনি লুকাচ্ছিলেন—বললেন, ‘ঠিক আছে, এ ব্যাপারে আরও কিছু বলো।’ তখন আলকামা বললেন, ‘আমাদের ওপর এসব মানুষের অধিকার রয়েছে এবং আমাদের উচিত তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। নিশ্চয়ই আল্লাহ এতে আমাদের পুরস্কৃত করবেন।’ পরের দিন সকালে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে—যখন আলকামা তাদের দুজনের দিকে তাকালেন—জিজ্ঞাসা করলেন, ‘গতরাতে আলকামা তোমাকে কী বলেছে?’ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহর কসম, তিনি আমাকে কিছুই বলেননি।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তুমি এ জন্য কসম করছ?’

ঘটনার আকস্মিকতায় আলকামা খুব মর্মান্বিত হন এবং মনে মনে বলতে থাকেন, গতরাতে তিনি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলেননি। তারপর তিনি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, ‘হে খালিদ, তোমার কী হলো?’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আলকামার প্রতি খুব দরদি ছিলেন এবং তিনি তার প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। তিনি বললেন, ‘এখানে যদি এমন আরও লোকেরা থাকত যারা তোমার মতো চিন্তা করে—(মতের অমিল সত্ত্বেও যারা শাসকের প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় রাখে)—তাহলে তারা অমুক অমুক থেকে আমার নিকট বেশি পছন্দনীয় হতো।’^{২৬৮}

যাই হোক, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর চাচাত ভাই আবু আমর ইবনে হাফস ইবনে আল-মুগিরা এ ব্যাপারে জাবিয়ায় প্রতিবাদ করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন লোকদের বললেন, ‘আমি তাকে এসব অর্থ মুজাহিদদের মধ্যে দুর্বলদের জন্য খরচ করতে বলেছিলাম, কিন্তু তিনি তা শক্তিশালী ও সামর্থ্যবানদের পেছনে খরচ করেছে। এ জন্য আমি তাকে অপসারণ করেছি এবং তার পরিবর্তে আবু উবাইদা ইবনে জাররা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে গভর্নর নিয়োগ করেছি।’ তখন আবু আমর ইবনে হাফস ইবনে আল-মুগিরা বলে ওঠেন, ‘আল্লাহর কসম, আপনি

^{২৬৮} আদ-দাওলাহ আল-ইসলামিয়া ফি আসর আল-খুলাফা আর-রাশিদিন, হামদি শাহীন, পৃ. ১৫১।

তার ব্যাপারে ন্যায়বিচার করেননি। হে উমর ইবনুল খাত্তাব, আপনি এমন একজন সেনাপতিকে পদচ্যুত করেছেন, যাকে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেনাপতি নিয়োগ করেছিলেন; আপনি এমন এক তরবারিকে কোষবদ্ধ করেছেন, যা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উন্মুক্ত করেছিলেন; আপনি এমন এক পতাকাকে অবনমিত করেছেন, যা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তোলন করেছিলেন। আপনি আত্মীয়ের প্রতি দয়া করেছেন এবং আপনার চাচাত ভাইয়ের প্রতি হিংসা পোষণ করেছেন।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, ‘তুমি তার খুবই নিকটাত্মীয়। তুমি বয়সে ছোট এবং চাচাত ভাইয়ের অপসারণে রেগেও আছ।’^{২৬৯}

এভাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর চাচাত ভাইয়ের কথায় ধৈর্যধারণ করেন, যে কিনা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে এত বেশি বাড়াবাড়ি করছিল যে, তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হিংসুক বলে দাবি করেছে। এতৎসত্ত্বেও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সবর করেন।^{২৭০}

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-এর মৃত্যু এবং মৃত্যুসজ্জায় উমর রা. সম্পর্কে তার মন্তব্য : আবু আদ-দরদা রাযিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে গেলেন। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, ‘হে আবু দরদা, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পরে তুমি যা অপছন্দ করো তা-ই দেখতে পাবে।’ আবু দরদা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, ‘আল্লাহর কসম, আমি তোমার সঙ্গে একমত।’ খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমি তার সঙ্গে একটি ব্যাপারে শুধু দ্বিমত পোষণ করেছিলাম। আমি যখন অসুস্থ হলাম, তখন এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি। আমি এখন মৃত্যুসজ্জায়। আমি বিশ্বাস করি, উমর যা কিছু করে, তাতে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টিই তালাশ করেন। আমি মর্মান্বিত হই যখন তিনি আমার অর্ধেক সম্পদ জব্দ করার জন্য লোক পাঠালেন। এমনকি লোকটি আমার জুতা জোড়ার একটি নিয়ে নেয় এবং অন্যটি আমার কাছে রেখে যায়। কিন্তু তিনি এটি

^{২৬৯} সুনান, নাসাঈ, হাদীস নং ৮২৮৩; সুনান আল-কুবরা, মাহদুস সাওয়াব, ২/৪৯৬; এর সনদ সহীহ।

^{২৭০} সহীহ আত-তাওসিক ফি সিরাতি ওয়া হায়াতিল ফারুক, পৃ. ২১৯।

অন্যদের সঙ্গেও করেছেন, যারা আমার আগে ইসলামে দাখিল হয়েছিলেন এবং যারা বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি আমার প্রতি রুঢ় আচরণ করেছেন, কিন্তু তিনি একই রকম রুঢ় আচরণ অন্যদের সঙ্গেও করেছেন। আমি আশা করেছিলাম, তিনি আমার সঙ্গে ভালো আচরণ করবেন। কারণ, আমরা গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিলাম। আমি দেখলাম, তিনি সেসব আমলে নেননি এবং সত্য প্রতিষ্ঠায় তিনি কারও পক্ষ থেকে বদনামের পরোয়া করেননি। এই একটি কারণে আমার অন্তর থেকে তার ব্যাপারে সব গ্লানি দূর হয়ে গিয়েছে। তিনিও আমার ব্যাপারে হতাশ হয়েছেন, কারণ, আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। আমি ছিলাম রণক্ষেত্রে, প্রচণ্ড শক্তিতে যুদ্ধে নিমগ্ন। আমিই সেখানে ছিলাম এবং তিনি ছিলেন না। আমি পরিস্থিতি সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতাম এবং তিনি তা পছন্দ করেননি।^{২৭১} যখন মৃত্যু আসন্ন এবং তিনি তা বুঝতে পারলেন, তখন বললেন,

আমার এমন কোনো কাজ নেই যা আমাকে ওই কাজ অপেক্ষা বেশি আশান্বিত করতে পারে—কলেমা পড়ার পর—তা হলো, প্রচণ্ড শীতের রাতে বৃষ্টিতে ভিজে একটি মুজাহিদ দলের সঙ্গে প্রত্যুষে মুশরিকদের ওপর আক্রমণ চালানো। আপনাকে অবশ্যই জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে। আমি অমুক অমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং আমার দেহের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে তরবারি, তির বা বর্ষার দু-একটি আঘাত নেই। আর আমি এখন জ্বরাগ্রস্ত উটের মতো বিছানায় মৃত্যুবরণ করছি। কাপুরুষ কখনো বিজয়ী হতে পারে না। আমি জিহাদের ময়দানেই মৃত্যু কামনা করেছিলাম। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন যে, আমি আমার বিছানাতেই মৃত্যুবরণ করব।^{২৭২}

মৃত্যুর পূর্বে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বরাবর অসীয়াত করে যান, যেখানে তিনি বলেন, ‘আমি আমার যাবতীয় কিছু, সকল সম্পদ এবং অসীয়াতলিপি পূর্ণ করার দায়িত্ব উমর-এর নিকট সোপর্দ করে যাচ্ছি।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত হন এবং ভীষণ কান্না করেন। তার চাচাত বোনেরাও খুব কাঁদেন।

^{২৭১} খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, সাদিক আরজুন, পৃ. ৩৪৯; আল-খিলাফা ওয়াল খুলাফা, পৃ. ১৯৮।

^{২৭২} সিয়রু আলামিন নুবালা, ১/৩৮২; আত-তারিখ ইলাল মাদায়িন, পৃ. ৩৬৭।

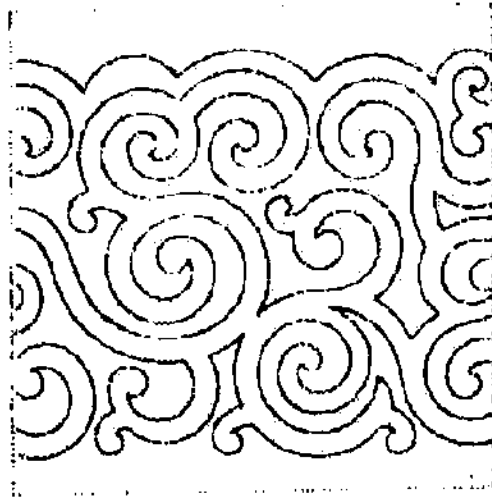
লোকেরা তাদের থামাতে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট অনুরোধ করলে তিনি বলেন, ‘আবু সুলাইমানের জন্য তাদের কাঁদতে দিন যতক্ষণ না তারা বিলাপ করে। আবু সুলাইমানের মতো ব্যক্তির জন্য কান্নাকারীদের কাঁদতে দাও।’^{২৭৩}

তিনি তার সম্পর্কে আরও বলেন, ‘ইসলামের আবরণে একটি ছিদ্র তৈরি হয়েছে।’ বনু মাখযুম গোত্রের কিছু লোককে নিয়ে কবি হিশাম ইবনে আল-বাখতারি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট আসেন। তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হিশামকে বলেন, ‘খালিদের ব্যাপারে তুমি তোমার কবিতা আবৃত্তি করে শোনাও।’ আবৃত্তি শুনে তিনি বলেন, ‘আবু সুলাইমানের প্রশংসা ঠিকমতো করতে পারোনি। আল্লাহ তার ওপর রহম করুন। তিনি মুশরিকদের অপদস্থ ও পরাজিত করতে পছন্দ করতেন।’ তারপর তিনি বলেন, ‘আল্লাহ আবু সুলাইমানের ওপর রহম করুন। আল্লাহ তার জন্য যা রেখেছেন, সেটি তার কাছে যা ছিল (দুনিয়ায়), তা থেকে অনেক বেশি উত্তম। মৃত্যুর পরও তিনি স্মৃতিতে উজ্জ্বল এবং জীবিত থাকতেও তিনি ছিলেন প্রশংসিত।’^{২৭৪} কেউই চিরকাল বেঁচে থাকবে না।^{২৭৫} তিনি ২১ হিজরীতে সিরিয়ার হিমসে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তা‘আলার তার ওপর অশেষ রহমত নাযিল করুন এবং সালেহীনদের সঙ্গে তাকে জান্নাতে দাখিল করুন।

^{২৭৩} আত-তারিখ ইলাল মাদায়িন, পৃ. ৩৬৬।

^{২৭৪} তাহযিব তারিখে দিমাশক, ৫/১১৬।

^{২৭৫} খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, সাদিক আরজুন, পৃ. ৩৪৮।



ষষ্ঠ অধ্যায়



উমর রা.-এর খেলাফতকালে
ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়

❀ প্রথম পরিচ্ছেদ

ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়ে দ্বিতীয় ধাপ

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ইরাক বিজয়ের ঘটনা মদীনার পূর্ব দিকে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণে প্রথম ধাপ হিসাবে গণ্য করা হয়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু শাখসিয়াতুহু ওয়া আসরুহু কিতাবে এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত লিখেছি। আর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে আরও বিস্তৃতি লাভ করে।

১.১। ইরাক যুদ্ধের নেতৃত্বে আবু উবাইদ আস-সাকাফি রহ.-এর নিয়োগ

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মঙ্গলবার, ২২ জমাদুল আখিরা ১৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন এবং ওইদিন রাতেই তাকে দাফন করা হয়। পরের দিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে ইরাকে জিহাদ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন এবং তিনি এর পুরস্কারের কথাও মনে করিয়ে দেন। কিন্তু তাতে কেউ সাড়া দেয়নি। কারণ, তারা পার্সিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আগ্রহী ছিল না। এর মূল কারণ ছিল রণক্ষেত্রে পার্সিয়ানদের শক্তি ও দুর্ধর্ষতা। তিনি জনগণকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনও যুদ্ধের দিকে আহ্বান করতে থাকেন। কিন্তু কেউই সাড়া দিল না। মুসান্না ইবনে হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব ভালো বক্তব্য দিলেন। তিনি জানালেন যে, ইরাকের বেশির ভাগ অঞ্চল আল্লাহ তা'আলা খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বিজয় দান করেছেন এবং প্রচুর গনীমতের সম্পদ লাভ করেছেন। তারপরেও তৃতীয় দিনও কেউ সাড়া দিল না। চতুর্থ দিন প্রথম

যে ব্যক্তি জিহাদের ডাকে সাড়া দিলেন তিনি ছিলেন আবু উবাইদ ইবনে মাসউদ আস-সাকাফি। তারপর একে একে অন্যরাও জিহাদে নাম লেখাতে শুরু করেন।^{২৭৬} আবু উবাইদের পরেই সালিত ইবনে কাইস আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু জিহাদের ডাকে সাড়া দেন এবং বলেন, ‘হে আমীরুল মুমিনীন, আমি আল্লাহর জন্য নিজেকে সোপর্দ করলাম যেমনটি করেছে আমার অন্যান্য চাচাত ভাইয়েরা—যারা আসতে রাজি হয়েছে এবং অন্যদের মধ্যে যারা আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।’^{২৭৭} সালিত রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই কথায় সকলের মধ্যে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করল, লোকজনকে উৎসাহিত করল, তাদের মনোবল বৃদ্ধি ও পার্সিয়ানদের বিরুদ্ধে জিহাদে তাদের অংশগ্রহণের ইচ্ছাকে বাড়িয়ে দিল। তারা খলীফাকে একজন মুহাজির অথবা আনসার সাহাবীকে তাদের সেনাপতি নিয়োগ করে দেওয়ার অনুরোধ করল। তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহর কসম, আমি তাকেই এ কাজে সবচেয়ে বেশি যোগ্য মনে করছি যে সর্বাত্মক লোকজনকে এ জিহাদে সাহস জুগিয়েছে। সালিত যদি যুদ্ধক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করত, তাহলে তাকেই আমি সেনাপতি নিয়োগ করতাম। যাই হোক, আবু উবাইদকে আমি সেনাপতি এবং সালিতকে তার পরামর্শক নিয়োগ করলাম।’ লোকেরা বলল, ‘আমরা তাদের মেনে চলব।’^{২৭৮}

আরেক বর্ণনামতে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু উবাইদকে সেনাপতি নিয়োগ করেন যদিও তিনি সাহাবী ছিলেন না। তখন তাকে বলা হলো, ‘আপনি কেন সাহাবাদের একজনকে তাদের নেতা নির্বাচন করেননি?’ তিনি বলেন, ‘বরং আমি ওই ব্যক্তিকে সেনাপতি বানিয়েছি যে কিনা সর্বপ্রথম জিহাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে। ইসলামের জন্য কুরবানির জন্য তুমি অন্যদের থেকে অগ্রগামী হতে পার, কিন্তু সে-ই তোমার আগে সাড়া দিয়েছে।’ তারপর তিনি আবু উবাইদকে কাছে ডাকেন এবং তাকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন ও অধীন মুসলিম সৈন্যদের সঙ্গে সদাচরণ করার উপদেশ দেন। তিনি তাকে সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করার নির্দেশ দিলেন। সালিত ইবনে কাইসের সঙ্গেও পরামর্শ করতে

^{২৭৬} আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/২৬।

^{২৭৭} আল-ফুতুহু, ইবনে আসাম, ১/১৬৪; আল-আনসার ফিল আসরির রাশিদি, পৃ. ২১৬।

^{২৭৮} আল-আনসার ফিল আসরির রাশিদি, পৃ. ২১৬।

বলেন। কারণ, সালিত ইবনে কাইসের ছিল যুদ্ধ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা।^{২৭৯}

আবু উবাইদকে উপদেশ দেওয়ার সময় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করবে এবং তাদের সব ব্যাপারে কথা বলার সুযোগ দেবে। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধীরস্থির হয় না, তার পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনা করা কঠিন। শত্রুপক্ষের ওপর আক্রমণের উপযুক্ত সময় তাকেই নির্ধারণ করতে হবে। সালিতকে সেনাপতি নিয়োগ করতে আমাকে কেউ বাধা দিতে পারত না। কিন্তু তার তাড়াহুড়া করার মানসিকতার কারণেই আমি তা করিনি। পরিকার নিদর্শন ছাড়া রণক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করলে নিশ্চিত পরাজয় বরণ করতে হবে।^{২৮০} তারপর তিনি বলেন, ‘তোমরা এমন এক ভূখণ্ডে জিহাদে গমন করছ যা বিশ্বাসঘাতকতা, বিদ্রোহ এবং অন্যায়-অবিচারে সয়লাব। তোমাদের প্রতিপক্ষ এমন, যারা দুষ্কর্মে পারদর্শী এবং অভিজ্ঞ; তারা ন্যায়-পরায়ণতার ধার ধারে না। সুতরাং ভেবেচিন্তে কাজ করবে। চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলবে এবং নিজেদের গোপন বিষয় ফাঁস কোরো না। গোপনীয়তা রক্ষাকারী ব্যক্তি নিরাপদ। যদি সে তা না রাখে, তাহলে পরিণতিতে বিপর্যয় ডেকে আনবে।’^{২৮১}

তারপর তিনি মুসান্না ইবনে হারিসাকে অগ্রসর হতে বললেন এবং সামরিক বাহিনী তার পেছনে রওনা হয়ে তার সঙ্গে মিলিত হবে। তিনি তাকে এগিয়ে গিয়ে মুরতাদদের মধ্যে যারা সত্যিকার অর্থেই তাওবা করেছে, তাদের একত্র করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি রওনা হয়ে গেলেন এবং আল-হেরায় গিয়ে পৌঁছলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইরাক ও সিরিয়ার ফ্রন্ট লাইনে যুদ্ধরত মুসলিম বাহিনীর সব খবরাখবর সংগ্রহ করতে লাগলেন। তাদের সাহায্য-সৈন্য প্রেরণসহ রসদপত্রও সরবরাহের ধারা অব্যাহত রাখেন। তাদের বিভিন্ন পরামর্শ ও নির্দেশ প্রেরণ করেন এবং যুদ্ধের গতিবিধি অনুযায়ী সময় পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, যা তিনি নিজেই পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন।

^{২৭৯} আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/২৬।

^{২৮০} ইতমামুল ওয়াফা ফি সিরাতিল খুলাফা, পৃ. ৬৫।

^{২৮১} প্রাগুক্ত।

মদীনা থেকে সাত হাজার মুজাহিদ ইরাকের উদ্দেশে রওনা হয়ে যায়। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে চিঠি প্রেরণ করেন, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে যে সকল সৈন্য ইরাক থেকে এসেছে তাদের পুনরায় ইরাকে পাঠিয়ে দিতে বললেন। তিনি দশ হাজার সৈন্য একত্র করে রণসাজে সজ্জিত করলেন এবং হাশিম ইবনে উতবার নেতৃত্বে ইরাকে প্রেরণ করেন। এদিকে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জারির ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালির নেতৃত্বে চার হাজার সৈন্যের একটি বিশাল বাহিনী ইরাকে প্রেরণ করেন। জারির ইবনে আব্দুল্লাহ তার বাহিনী নিয়ে কুফায় পৌঁছেন। তারা ইরাকে পৌঁছে পারস্যে রাজনৈতিক গণ্ডগোলার সংবাদ পান। সর্বশেষ পরিস্থিতি দাঁড়ায়, রানি আযার মীদাখতকে হত্যা করে তারা বুরান বিনতে কিসরাকে ক্ষমতার মসনদে বসায়। রানি বুরান রুস্তম ইবনে ফারাখযায নামের এক সাহসী বীর যোদ্ধার নিকট দশ বছরের জন্য রাজত্ব হস্তান্তর করে এই শর্তে যে, সে যুদ্ধ পরিচালনা করবে। এরপর রাজত্ব ফিরে আসবে কিসরার বংশধরদের নিকট। রুস্তম তা মেনে নেয়। এই রুস্তম ছিল একজন জ্যোতিষ্ক। জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে তার ছিল পর্যাপ্ত জ্ঞান। একদিন তাকে বলা হয়েছিল, আপনি জানতেন যে, এই রাজত্ব আর পূর্ণতা পাবে না। তবু এটি গ্রহণে কিসে আপনাকে উৎসাহিত করল? তিনি বললেন, ‘লোভ-লালসা এবং মর্যাদা লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা।’^{২৮২}

১.২। নামারিকের যুদ্ধ, সাকাতিয়ার যুদ্ধ, এবং বারুসমার যুদ্ধ

১.২.১। নামারিকের যুদ্ধ (১০ হি.)

আবু উবাইদ ইবনে মাসউদ আস-সাকাফি ইরাকে পৌঁছে সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব বুঝে নেওয়ার পরই যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। তিনি ছিলেন সেনাপতি হিসাবে নতুন। সম্ভবত এ কারণেই পারসিকরা শুরুতেই আক্রমণ করে তাকে কারু করতে চেয়েছে যাতে তার যুদ্ধ করার ইচ্ছা এবং জয়ের আশা গুঁড়িয়ে যায়। সুতরাং পারসিকরা সাধারণ জনগণকে প্রস্তুত করল এবং তাদের সৈন্যদের নিয়ে সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিক থেকে মুসলমানদের মুখোমুখি হলো (নামারিকে)। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে

^{২৮২} আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/২৭।

প্রতিটি অঞ্চলের সর্দারদের বিদ্রোহ করার জন্য পত্র প্রেরণ করে এবং তারা প্রতিটি এলাকায় লোকজনকে উৎসাহিত করতে লোক প্রেরণ করে। তারা জাবানকে বাবাহাঙ্কাবায আল-আসফাল এবং নারসিকে কাসকার পাঠায়। তারা মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করে। মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহু এ সংবাদ পেয়ে সৈন্যদের সতর্ক করেন। বিভিন্ন জায়গায় চৌকি স্থাপন করে শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। সর্দাররা একের পর বিদ্রোহ শুরু করে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরাও একের পর এক বিদ্রোহে যোগ দেয়। আবু উবাইদ এবং মুসান্না কাফফানে তাঁর গাড়েন। তারপর নামারিকে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। অবশেষে আল্লাহ তা‘আলা পারসিকদের পরাজিত করেন। সেনাপতি জাবান এবং মারদানশাহ—যারা শত্রুদলের দুটি বাহুকে নেতৃত্ব দিচ্ছিল—মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়।^{২৮৩}

মাতার ইবনে ফুদাহ আত-তামিমী নামে এক মুসলিম সৈনিক জাবানকে বন্দী করে। তিনি জাবানের পরিচয় জানতেন না। এই সুযোগে জাবান গ্রেপ্তার হওয়ার পর প্রতারণার আশ্রয় নেয়—কিছু উপটৌকনের বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দিতে বলে। জাবানকে ছেড়ে দেওয়া হলেও অন্য মুসলিমরা তাকে আবার আটক করে সর্বাধিনায়ক আবু উবাইদের কাছে নিয়ে আসে। তারা তাকে বলেন, জাবানকে হত্যা করুন। কারণ, সে শত্রুপক্ষের প্রধান সেনাপতি। তিনি বলেন, ‘একজন মুসলমান তাকে নিরাপত্তা দিয়েছিল। এখন আমি তাকে হত্যা করার ব্যাপারে আল্লাহর আযাবের ভয় করছি।’ পুরো মুসলিম জাতি পারস্পরিক ভালোবাসা আর সম্প্রীতিতে একটি শরীরের মতো। একজন যদি নিরাপত্তা দেয়, তাহলে তা পুরো মুসলিম জাতির পক্ষ থেকেই দেওয়া হয়। তারা বলল, ‘সে-ই শত্রুসৈন্যের প্রধান ব্যক্তি।’ তিনি বললেন, ‘যা-ই হোক। আমি ওয়াদা ভঙ্গ করব না (মানে জনৈক মুসলিম তাকে একবার নিরাপত্তা দিয়েছে)। তাকে ছেড়ে দাও।’^{২৮৪}

আবু উবাইদ-এর এই আচরণ ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের ধৈর্য ও চুক্তি বাস্তবায়নে একনিষ্ঠতার এক জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে আছে, যদিও এতে

^{২৮৩} হারকাতুল ফাতিল ইসলামি, শুকরি ফায়সাল, পৃ. ৭২।

^{২৮৪} আল-কামিল ফিত তারিখ, ২/৮৭।

তাদের খুব কম লোকই রাজি ছিল। নিঃসন্দেহে এই অবিশ্বাস্য আচরণ মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে বিশাল ভূমিকা রাখে। শীঘ্রই এই খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল যে, মুসলমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক তাদের চরম শত্রুপক্ষের এক পারসিক নেতাকে ছেড়ে দিয়েছে; কারণ, একজন সাধারণ মুসলিম সৈন্য মুক্তিপণের বিনিময়ে তাকে আগেই ছেড়ে দেওয়ার ওয়াদা করেছিল। এ ঘটনায় মানুষজন ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয়; এটি কোনো সাধারণ ধর্ম নয় যেখানে এমন মানুষ তৈরি হয়! যখন আবু উবাইদ সর্বাধিনায়ক হিসাবে নিয়োগ পেয়ে প্রথমবারের মতো ইরাকের উদ্দেশে রওনা হন, তখন মুসান্না ইবনে হারিসার বিস্ময়কর আচরণকে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। তিনি একজন সুযোগ্য সেনাপতি এবং সুদক্ষ সৈনিক। এটাই ছিল মুসান্নার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রেও তিনি একই কাজ করেছিলেন এবং ইসলামে তার অবদান—সেনাপতি কিংবা সৈনিক হিসাবে—একই। তারা এমনই মহান ব্যক্তি ছিলেন!^{২৮৫}

১.২.২। কাসকারে সাকাতিয়ার যুদ্ধ

তারপর আবু উবাইদ পরাজিত পারসিক সৈনিকদের তাড়া করতে বের হলেন। তারা তখন কাসকার^{২৮৬} মহলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। সেটির শাসক ছিল কিসরার খালাত ভাই নারসী। আবু উবাইদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সে তাদের সাহায্য করেছিল। আবু উবাইদ তাদের সঙ্গে সাকাতিয়ায়^{২৮৭} মোকাবিলা করেন। তিনি তাদের ওপর আক্রমণ করে পরাজিত করেন এবং প্রচুর গণীমতের মাল ও খাদ্যদ্রব্য লাভ করেন।^{২৮৮} নারসী পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। মুসলমানরা ওই ভূখণ্ডের দখল নিলে তাদের গুদামে প্রচুর খাদ্যদ্রব্যের সন্ধান পায়।

আবু উবাইদ কাসকারে অবস্থান করেন এবং পারসিকদের তাড়া করতে সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তিনি আশেপাশের এলাকার লোকজনের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন যারা চুক্তি ভঙ্গ করে পারসিকদের সাহায্য

^{২৮৫} তারিখুল ইসলামি, ১০/৩৩৪।

^{২৮৬} কাসকার : কূফা এবং বসরার মধ্যবর্তী একটি এলাকা।

^{২৮৭} সাকাতিয়া : কাসকারের একটি জেলা।

^{২৮৮} তারিখ আত-তাবারি, ৪/২৭২।

করেছিল। এই জয়ের ফলে মুসলমানরা এ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। কয়েকজন গভর্নর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে শান্তিচুক্তি করে। তাদের মধ্যে দুজন আবু উবাইদের জন্য তাদের সবচেয়ে সুস্বাদু খাবার নিয়ে আসে। বলে, এটি আপনার প্রতি আমাদের সম্মানের প্রতীক হিসাবে আনা হয়েছে। তিনি বললেন, ‘তোমরা কি একই ভাবে পুরো মুসলিম বাহিনীকে সম্মান দেখিয়েছ? তারা বলল, ‘এটি সহজ নয়, তবে আমরা চেষ্টা করব।’ আবু উবাইদ বললেন, ‘আমাদের এর কোনো প্রয়োজন নেই যদি-না তা সকল সৈন্যের জন্য পর্যাপ্ত হয়।’ তারপর তারা ভয় পেয়ে যায় এবং নিজেদের জীবনের আশঙ্কা করে। আবু উবাইদ বলেন, ‘তোমরা কি জানো যে, আমি কেবল তখনই এই খাবার গ্রহণ করব যখন আমাদের সকল সৈন্যের একই খাবার সরবরাহ করা হবে?’ তারা বলল, ‘কেউই এই খাবার থেকে বঞ্চিত হয়নি এবং গুদামে আরও খাবার মজুদ আছে।’ যখন তিনি এটি নিশ্চিত হলেন, তখন তিনি তাদের খাবার গ্রহণ করলেন। তিনি এর কিছু নিজে খেলেন এবং বাকি মেহমানদের খেতে দিলেন যাদের তিনি দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। মেহমানরা পার্সিয়ান খাবার খেল এবং তারা চিন্তাও করতে পারেনি যে, আবু উবাইদের নিকট এ ধরনের খাবার রয়েছে। তারা ভেবেছিলেন, আবু উবাইদ তাদের সাধারণ খাবারই খেতে দাওয়াত দিয়েছেন, যা তিনি সাধারণত খেয়ে থাকেন। আর তাদের সামনে যে খাবার দেওয়া হয়েছিল, তার সবটুকুই তারা খেলেন। তারা বলল, ‘সর্বাধিনায়ককে বলো, তিনি আমাদের যা কিছু খেতে দেবেন, তা আমরা না খেয়ে থাকতে চাই না।’ তিনি খবর পাঠালেন, ‘এখানে অনেক পার্সিয়ান খাবার রয়েছে। আসো এবং তোমরা যা খাও, তার সঙ্গে তুলনা করে দেখো।’^{২৮৯}

এই মহান ও বিনয়ী সেনাপতি দু-বার না করে দেওয়ার পর পার্সিয়ান খাবার খান। কারণ, তৃতীয়বার তিনি জানতে পারেন যে, একই খাবার সকল সৈন্যদের দেওয়া হয়েছে। তিনি মেহমান ছাড়াও খেতে চাননি। এ জন্য তাদের ডেকে খেতে অনুরোধ করেন। তিনি জানতেন, তারা এ রকম খাবার আরও খেয়েছে এবং তিনি খাবারের তালিকা তৈরি করে তাদের তার সঙ্গে খাবার খেতে উৎসাহিত করেছেন। এটি একটি মহৎ গুণ

এবং নেতৃত্বের জন্য একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই আচরণ থেকে সাহাবা এবং তাদের অনুসারীদের ঈমান ও তাকওয়ার উঁচু অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।^{২৯০}

১.২.৩। বারুসমার যুদ্ধ

তারপর তারা কাসকার এবং সাকাতিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ স্থানটির নাম বারুসমা। নারসীর বাহিনীর ডান এবং বাম পার্শ্বের সেনাদলের দায়িত্ব ছিল তার দুই মামাত ভাইয়ের ওপর; বানদাবিয়্যাহ ও বায়রাবিয়্যাহ। এদিকে রুস্তম জালীনূসের নেতৃত্বে একটি সুসজ্জিত দল প্রেরণ করে। এ সংবাদ অবগত হয়ে আবু উবাইদ ত্বরিত গতিতে নারসী বাহিনীর ওপর আক্রমণ করেন। জালীনূসের বাহিনী তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগেই তিনি এই আক্রমণ করেন। যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে এবং পারসিকরা পরাজিত হয়। নারসী পালিয়ে যায়। আবু উবাইদ মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এবং অন্যান্য সেনাদলকে নাহর জুর ও অন্যান্য সীমান্তের দিকে প্রেরণ করেন। তারা অবস্থাভেদে শক্তি প্রয়োগ ও সন্ধির মাধ্যমে ওইসব স্থান জয় করেন এবং স্থানীয় জনগণের ওপর জিযিয়া কর নির্ধারণ করেন। সেখানে তারা অনেক গনীমতের মাল লাভ করেন। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। তারা জালীনূসকে পরাজিত করেন যে জাবানকে সাহায্যের জন্য আগমন করে এবং তার বাহিনী থেকে প্রচুর গনীমতের মাল জব্দ করেন। তার ব্যক্তিগত সম্পদও জব্দ করেন। অপমানিত, লাঞ্ছিত ও পরাজিত হয়ে জালীনূস তার সম্প্রদায়ের নিকট পালিয়ে যায়।^{২৯১}

সুতরাং সামান্য সময়ের ব্যবধানে পারস্যের তিনটি সেনাদল মুসলমানদের নিকট পরাজয় বরণ করে। পারসিকরা চাইলে তিনটি দলকে একত্র করে মুসলমানদের ওপর চারিদিক থেকে আক্রমণ পরিচালনা করতে পারত, কারণ, তারা সংখ্যায় ছিল অনেক। কিন্তু আল্লাহ তাদের সন্দেহে পতিত করেছেন এবং তাদের অন্তরে মুসলমানদের ব্যাপারে ভয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর তাদের প্রত্যেক সেনাপতি আশা করেছে, অন্যরা আগে

^{২৯০} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৩৩৬।

^{২৯১} তারতিব ওয়া তাহযিব আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ড. মুহাম্মাদ সামিল আস-সুলামি, পৃ. ৮৯।

আক্রমণ করে মুসলমানদের দুর্বল করে ফেলবে এবং পরিশেষে সে আক্রমণ করে বিজয়ের দাবি করবে। শত্রুদের ধীর মুভমেন্টের সুযোগে মুসলমানরা ত্বরিত গতিতে আক্রমণ করায় এই বিজয় লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।^{২৯২}

১.৩। আবু উবাইদ-এর সেতু যুদ্ধ (১৩ হিজরী)

মুসলমানদের হাত থেকে জালীনূস পালিয়ে যাওয়ার পর পারসিকরা মহাবীর রুস্তমের নিকট সমবেত হয়। সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশাল এক সেনাদল প্রেরণ করে। এদের সেনাপতি ছিল বাহমান হাদাবিয়্যাহ। সে তার হাতে দূরকাশ কবিয়ান পতাকা তুলে দেয়। পারসিকরা এই পতাকা দ্বারা বরকত ও শুভযাত্রা কামনা করত। এই পতাকা ছিল চিতা বাঘের চামড়ায় তৈরি। পতাকাটির প্রস্থ ছিল আট হাত। তারা মুসলমানদের নিকটে এসে পৌঁছে। উভয়পক্ষের মধ্যে একটি নদী ছিল। সেখানে ছিল একটি সেতু। তারা খবর পাঠাল, ‘হয় তোমরা নদী পার হয়ে আমাদের নিকট আসো, নতুবা আমরা তোমাদের নিকট যাব।’ মুসলমানরা আবু উবাইদকে বলল, ‘তাদের বলুন আমাদের নিকট আসতে। তিনি বললেন, ‘তারা আমাদের চেয়ে বেশি সাহসী নয়।’ তারপর তিনি সেতু পার হয়ে নিজ সৈন্যসহ তাদের নিকট পৌঁছে গেলেন। সংকীর্ণ এ জায়গায় সকলে সমবেত হলো। উভয় পক্ষে সেখানে ভীষণ যুদ্ধ হয়। এমন যুদ্ধ দেখা যায়নি।

মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। পারসিকরা সঙ্গে করে বড় বড় হাতি নিয়ে এসেছিল। আর হাতির পিঠে ছিল প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টিকারী ঘণ্টা। হাতিগুলো দাঁড়িয়ে ছিল, যাতে মুসলমানদের ঘোড়াগুলো হাতি দেখে আর শব্দ শুনে ভয় পায়। তারা মুসলমানদের ওপর হামলা চালায়। বস্তুত বিশাল বিশাল হাতি দেখে এবং প্রচণ্ড ঘণ্টাধ্বনি শুনে মুসলমানদের ঘোড়াগুলো ভয়ে পালিয়ে যেতে থাকে। শক্তিপ্রয়োগে মাত্র অল্পসংখ্যক ঘোড়াকে ধরে রাখা সম্ভব হয়। অন্যদিকে মুসলমানগণ যখন তাদের ওপর আক্রমণে অগ্রসর হতে চায় তখন হাতির ভয়ে তাদের ঘোড়াগুলো সামনে এগুতে চায় না। তা ছাড়া প্রচণ্ড তির নিক্ষেপে পারসিকরা সেগুলো রক্তাক্ত

^{২৯২} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৩৩৭।

করে ফেলে। ফলে বহু মুসলমানকে তারা হত্যা করে ফেলে। পক্ষান্তরে মুসলমানগণও প্রায় ছয় হাজার শত্রু হত্যা করেন।^{২৯৩}

মুসলমানদের ঘোড়াগুলো হাতির ঘণ্টাধ্বনিতে ভয় পেয়ে গেল। এ অবস্থায় মুসলমানগণ ঘোড়া নিয়ে শত্রুর কাছাকাছি যেতে পারল না। আবু উবাইদ ঘোড়া থেকে নেমে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাকিরাও তাকে অনুসরণ করল। মুসলমানগণ তরবারি দিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করতে লাগল। মুসলমানগণ তাদের ঘোড়া হারিয়ে পদাতিক বাহিনীতে পরিণত হলো। এ বাহিনীকে এখন শত্রুপক্ষের হস্তিবাহিনী, ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক বাহিনীসহ তিরন্দাজদের সঙ্গে লড়াইতে হচ্ছে। কয়েকটি ঘোড়াকে অতি কষ্টে নিয়ন্ত্রণ করে অগ্রসর হতে চাইলেই এসব তিরন্দাজেরা তির নিষ্ক্ষেপ করছে এবং ঘোড়াগুলো সামনে অগ্রসর হচ্ছে না। এটি ছিল খুবই কঠিন পরিস্থিতি। এদিন মুসলমানগণ এত বেশি আত্মত্যাগ ও সাহসের পরিচয় দিয়েছে যে, ইতিহাসে এর নজির খুব একটা পাওয়া যায় না। তারা রণকৌশল ও যুদ্ধাঙ্গ্রে অগ্রগামী পারসিকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। মুসলমানরা এর আগে কোনো যুদ্ধে হস্তিবাহিনীর মুখোমুখি হয়নি। হাতিদের কারণে মুসলমানদের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আবু উবাইদ তাদের ডেকে হাতিদের প্রতি মনোযোগ দিতে নির্দেশ দেন। তিনি প্রথমে হাতির জিন আসন কেটে দিতে এবং তার বাহককে ধরাশায়ী করতে বলেন। তিনি নিজেই একটি সাদা হাতির এগিয়ে যান; তিনি সেটির জিন আসন কেটে দেন এবং এতে এর বাহক মাটিতে পড়ে যায়। মুসলমান সৈন্যগণও তাকে অনুসরণ করে। তারা প্রতিটি হাতির ওপর আক্রমণ করে শত্রুসেনাকে হত্যা করতে থাকে। কিন্তু প্রশিক্ষিত হাতির আক্রমণ বন্ধ হয় না।

আবু উবাইদ এসব হাতির আক্রমণ প্রতিহত করার উপায় নিয়ে চিন্তা করছিলেন। তিনি হাতি হত্যা করার কৌশল সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তখন তাকে বলা হলো, শুঁড় কেটে দিলেই হাতি মৃত্যুবরণ করবে। তারপর তিনি সাদা হাতিটির ওপর তরবারির আঘাত হানেন। হাতির শুঁড় কেটে যায়। হাতি মাতাল ও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং ভয়ংকর একটি চিৎকার দিয়ে সেনাপতি আবু উবাইদ-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু-পায়ে

^{২৯৩} তারতিব ওয়া তাহযিব আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃ. ৯০ (ইফা, ৭/৫৭ দ্রষ্টব্য)।

তাকে দলিত-মথিত করে ফেলে। তিনি শাহাদাত বরণ করেন। আবু উবাইদ-এর ভাই আল-হাকাম ইবনে মাসউদ পতাকা তুলে নেন এবং হাতির ওপর আক্রমণ করে আবু উবাইদ-এর নিখর দেহ সরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু হাতিটি তাকেও মেরে ফেলে। এভাবে আবু উবাইদের মনোনীত সাত জন সেনাপতি নিহত হন যার মধ্যে তার তিন জন ছেলেও ছিল; ওয়াহব, মালিক এবং জাবর। শেষ পর্যন্ত সেনাপতির দায়িত্ব পান মুসান্না ইবনে হারিসা। কিছু মুসলমান সৈন্য সেতু পার হয়ে এপারে চলে এল। তারা রণক্ষেত্র থেকে পেছনে পালাতে লাগল। আব্দুল্লাহ ইবনে মারসাদ আস-সাকাফি এ দৃশ্য দেখে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সেতুটি কেটে দেয় এবং বলে, ‘তোমাদের সেনাপতিগণ যে কারণে মৃত্যুবরণ করেছে, তোমরাও একই কারণে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করো অথবা বিজয় অর্জন করো।’ সে সেতু পার হয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া থেকে মুসলিম সৈন্যদের প্রতিহত করতে চেয়েছে। লোকেরা তাকে ধরে সেনাপতি মুসান্নার নিকট নিয়ে আসে। তিনি তাকে ভীষণ জোরে আঘাত করেন, কারণ, তার কর্মকাণ্ডে তিনি খুব রাগান্বিত হন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কেন এমন করলে? সে বলল, ‘যেন তারা লড়াই অব্যাহত রাখে।’ কিন্তু তার এ ধারণা সঠিক ছিল না। সেতুটি কেটে দেওয়াতে অনেক মুজাহিদ পানিতে পড়ে যায় এবং ডুবে মৃত্যুবরণ করে। তবে বেঁচে যাওয়া মুসলমানদের রক্ষা করার কৌশলই তখন সঠিক ছিল। এ জন্য মুসান্না সেতুটি দ্রুত মেরামত করার নির্দেশ দেন।

মুসান্না এবং তার সঙ্গে আরও কয়েকজন বীর মুজাহিদ ওই পারে থেকে মুসলমানদের পাহারা দিতে থাকে যতক্ষণ তারা সেতু পার হয়। মুসান্না বলেন, ‘হে লোকসকল, আমরা আপনাদের নিরাপত্তা দেব; ধীর-স্থিরভাবে সেতু পার হন এবং তাড়াহুড়া করবেন না। আপনাদের সকলে পার না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেতু পার হব না। অহেতুক পানিতে পড়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন।’ এ-সময় মুসান্নার পাশে ছিলেন আসিম ইবনে আমর এবং আল-খালয আদ-দাক্বি। তারা সকলের শেষে সেতু পার হন।

বাহমান যাজাওয়াহ বেঁচে যাওয়া মুসলমানদের শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সে তা করতে সক্ষম হয়নি। মুসলমানদের রক্ষা করার দায়িত্ব

নেওয়ার পর মুসান্না তার ওপর আক্রমণ করে তাকে প্রতিহত করেন। নিঃসন্দেহে এসব বীর মুজাহিদ মুসলমানদের নিরাপত্তায় তাদের জান বাজি রেখেছিলেন। তারা পাঁচ হাজার মুসলমানের জীবন রক্ষা করতে পেরেছিলেন। আর চার হাজার পেছনে রেখে যান যারা শাহাদাত বরণ করেন। এর মধ্যে বিরাটসংখ্যক সাহাবা ছিল; বিশেষ করে যারা মদীনা থেকে আবু উবাইদ-এর সঙ্গে এসেছিলেন। দুই হাজার সৈন্য মদীনায় ও অন্যান্য এলাকায় ফিরে যান। বাকি তিন হাজার সৈন্য মুসান্নার সঙ্গে অবস্থান করেন। চরম বিরূপ পরিস্থিতি সত্ত্বেও মুসলমানগণ ছয় হাজার শত্রুসেনাকে হত্যা করে, যা মুসলমানদের দৃঢ় মনোবল ও সাহসের প্রতীক হয়ে আছে।^{২৯৪}

সেতুযুদ্ধ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা

১.৩.১। সত্য স্বপ্ন

সেনাপতি আবু উবাইদ-এর স্ত্রী দাওমা একটি স্বপ্ন দেখেন যে, একজন ব্যক্তি আকাশ থেকে তার নিকট নেমে এসেছেন। তার হাতে একটি পানীয়-ভর্তি পাত্র। আবু উবাইদ, তার কয়েকজন সন্তান এবং পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্য সেখান থেকে পান করেন। তিনি এ ঘটনা তার স্বামীকে জানান। তখন আবু উবাইদ বলেন, ‘এতে আমাদের শাহাদাতের ইশারা রয়েছে।’ আবু উবাইদ লোকদের উদ্দেশে বলেন, ‘যদি আমি শাহাদাত বরণ করি, তাহলে আমার গোত্রের অমুক অমুক সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবে।’ এভাবে তিনি সাকিফ গোত্রের সাত জনের নামের তালিকা ঘোষণা করেন, যারা সবাই তার আত্মীয় ছিল। যখন তাদের শেষজন শাহাদাত বরণ করেন, তখন সেনাপতির দায়িত্ব বুঝে নেন মুসান্না ইবনে হারিসা।^{২৯৫}

১.৩.২। দুটি ভুল, যা পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে

আবু উবাইদ তার সঙ্গে থাকা রণকৌশলে বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট সামরিক ব্যক্তিদের পরামর্শের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তারা তাকে সেতু

^{২৯৪} তারিখ আত-তাবারি, ৪/২৭৯; আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৩৪১।

^{২৯৫} তারিখ আত-তাবারি, ৪/২৭৭।

অতিক্রম না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এতে কণ্ঠপাত করেননি। তিনি তার মতো কাজ করেছেন এবং প্রচণ্ড সাহস ও শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সেতু অতিক্রম করে শত্রু-এলাকায় গমন করেছেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় রণকৌশলও প্রণয়ন করেননি। তিনি শত্রুপক্ষের যুদ্ধক্ষেত্র ঠিকমতো পর্যবেক্ষণ করেননি।^{২৯৬} তিনি এমন এক জায়গায় নিজেকে আবদ্ধ করেছেন যেখানে তার বহির্গমনের পথ ছিল খুবই সংকুচিত। ফলে তিনি যথাযথ নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেননি। মনে হয় তিনি তার বাহিনীকে কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই একটি ফাঁদে জড়িয়ে ফেলেছেন। তিনি তার দক্ষ সৈন্যদের সঙ্গে থাকা বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, যুদ্ধে অশ্বারোহীরা কোনো ভূমিকা রাখতে পারেননি। তাদের পদাতিক বাহিনীতে পরিণত হয়ে শত্রুদের পদাতিক, অশ্বারোহী ও হস্তিবাহিনীর মোকাবিলা করতে হয়েছে। এ যুদ্ধে দক্ষ নেতৃত্বেরও বিপর্যয় ঘটে, যতক্ষণ না মুসান্না সেনাপতি হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং তার পূর্বেই সাত জন সেনাপতি শাহাদাত বরণ করতে বাধ্য হন। তিনি রণক্ষেত্রের স্বল্প পরিসরে মুসলিম সৈন্যদের যথাযথভাবে পরিচালনা করতে পারেননি। বিরীটসংখ্যক মুসলিম সৈন্যরা কার্যত বিরূপ ভূমিতে অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং তিনি যুদ্ধে জয়ের জন্য গঠনমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতেও সফল হননি। তিনি সবকছুই হারিয়েছেন এবং বস্তুত তিনি তার সামর্থ্যকে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহারের নিমিত্তে শত্রুর হাতে অর্পণ করেছেন।^{২৯৭}

আরেকটি ভুল সিদ্ধান্তের জন্য আবু উবাইদের ভুলগুলো চরম বিপর্যয়ের কারণ হয়ে ওঠে। আর এ সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মারসাদ আস-সাকাফি। তিনি সেতুটি কেটে দিয়ে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদপসরণে বাধা সৃষ্টি করেন, যাতে কেউই রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে না পারে। যদি আল্লাহর সাহায্য না থাকত এবং মুসান্নার দৃঢ় সিদ্ধান্ত কার্যকর না হতো, তাহলে তখনো যারা বেঁচে ছিলেন, তাদের সকলকেই হয়তো সেদিন শাহাদাত বরণ করতে হতো।^{২৯৮}

^{২৯৬} আওয়ামিল আন-নাসর ওয়াল হাযিমাহ, পৃ. ৫৫।

^{২৯৭} আত-তারিখ ইলাল-মাদায়িন, পৃ. ৪১৪।

^{২৯৮} আওয়ামিল আন-নাসর ওয়াল হাযিমাহ, পৃ. ৫৫।

১.৩.৩। শক্তিশালী নেতৃত্বের বিকল্প নেই

সেতুযুদ্ধ প্রমাণ করে, রণক্ষেত্রে শক্তিশালী নেতৃত্বের বিকল্প নেই। পরবর্তী সময়ে মুসান্না এবং তার সঙ্গী সেনাপতিরা এর স্বাক্ষর রাখেন। মুসলিম সেনাবাহিনীর ওপর দুর্যোগ নেমে এলে তারা সেনাসদস্যদের কঠিন পরিস্থিতি থেকে নিরাপদে বের করে আনেন।^{২৯৯} বীর সেনাদের সহযোগিতায় মুসান্না মুসলিম বাহিনীকে রক্ষা করতে সমর্থ হন এবং তিনিই সর্বশেষ ব্যক্তি, যিনি সেতু পার হন। এটি মহান আত্মত্যাগের একটি বাস্তব নমুনা।^{৩০০}

১.৩.৪। আল-মুসান্না সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করেন

মুসলিম সেনাবাহিনীর দশ হাজার সৈন্যের মধ্যে বেঁচে যাওয়া চার হাজার সৈন্যকে নিয়ে রণক্ষেত্র থেকে মুসান্না নিরাপদে পেছনে ফিরে আসেন। তিনি দুই পারসিক সেনাপতি জাবান ও মারদানশাহকে আলিস (আস-সামাওয়াহ)-এর দিকে ধাওয়া করেন। তিনি তাদের অনেক দূর পর্যন্ত তাড়িয়ে নেন যাতে পারসিকরা মুসলমানদের পশ্চাদপসরণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুনর্বার আক্রমণ করতে না পারে। তিনি যখন আস-সামাওয়াহতে পৌঁছেন, তখন তিনি তার অশ্বারোহী বাহিনীর সহযোগিতায় শত্রুপক্ষের ওপর অকস্মাৎ এক কঠিন আঘাত হানেন। তিনি নিজেই এর নেতৃত্ব দেন এবং তাদের পরাজিত করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে এ রকম হঠাৎ আক্রমণ এবং যে সেনাবাহিনী তাদের অধিকাংশ সদস্যকেই হারিয়েছে, তাদের পক্ষ থেকে এ রকম পাল্টা আক্রমণ তারা চিন্তাও করতে পারেনি। পারসিকরা এতে হতবিস্মল হয়ে যায় এবং তারা অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। মুসান্না ওই দুই পারসিক নেতাকে বন্দী করেন এবং হত্যা করেন। এ ঘটনা ও বিজয় তার সঙ্গে থাকা সৈন্যদের মনোবল অনেকাংশে বৃদ্ধি করে। স্থানীয় অধিবাসীরাও এতে আশ্বস্ত হয়। পাশ্চাত্য গোত্রসমূহ এবং মুসলিম সেনাদের নিকট এতে মুসান্নার মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়।^{৩০১}

^{২৯৯} আত-তারিখ ইলাল মাদায়িন, পৃ. ৪১৪।

^{৩০০} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৩৪৩।

^{৩০১} আল-হারব আস-নাফসিয়াহ, ড. আহমাদ নওফল, ১/১৬৭।

১.৩.৫। যেকোনো বিরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহ মুসলমানদের সাহায্য করেন

আল-মুসান্না ইরাকে অবস্থান করেন। তার সঙ্গে থাকা সেনাবাহিনী ভূমির নিরাপত্তা ও মুসলমানদের বিজিত এলাকা রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। পারসিক বাহিনী অবশিষ্ট মুসলিম বাহিনীকে ইরাক থেকে বিতাড়িত করতে পারত এবং তারা তাদের অনুগত আরবদের নিয়ে মুসলিম বাহিনীকে মরুভূমির দিকে তাড়িয়ে দিতে পারত। কিন্তু আল্লাহ মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন যেমন তিনি সর্বদা সব জায়গায় ঈমানদারদের সাহায্য করে থাকেন। যখনই একনিষ্ঠ মুসলমানগণ কোনো বিপদের সম্মুখীন হন, তখন আল্লাহ তাদের উদ্ধার করেন। আল্লাহ এমন কিছু করলেন যাতে পারসিকরা মুসলমানদের ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়ে গেল এবং তারা দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। তাদের একটি দল ছিল রুস্তমের নেতৃত্বে এবং অন্যটি ছিল ফাইরাযানের হাতে। পারস্যের রাজা বাহমান জাযওয়াহর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি দ্রুত মাদাইনে ফিরে আসেন। কারণ, তিনিই পারস্যের রাজনৈতিক বিষয়াদি দেখভাল করতেন। এভাবে আল্লাহ মুসলমানদের যুদ্ধ করা থেকে হেফাজত করেন এবং তাদের দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেন। এই সুযোগে মদীনা থেকে অতিরিক্ত সৈন্য এসে তাদের সঙ্গে যোগদান করে এবং তারা এ অঞ্চলে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে সমর্থ হন।^{৩০২}

১.৪। বুওয়াব-এর যুদ্ধ (১৩ হিজরী)

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকজনকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করে ইরাকে সাহায্য-সৈন্য প্রেরণ করেন। এসব সৈন্যদের মধ্যে জারির ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাযালি ও তার গোত্রের লোকজন এবং হানযালা ইবনে আর-রাবিও ছিলেন। তিনি হিলাল ইবনে আলকামা এবং খাসাম গোত্রের একদল লোককে আব্দুল্লাহ ইবনে যিসাহমাইনের নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। তিনি তাদের ইরাকে অবস্থানরত মুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগদান করার নির্দেশ দেন। ইমর ইবনে রিবি ইবনে হানযালা ও তার লোকজন এবং রিবি ইবনে আমির ইবনে খালিদ—উভয়ে খলীফার নিকট আগমন করেন এবং

^{৩০২} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৩৪৫, ৩৪৬।

খলীফা তাদেরও ইরাকে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। এভাবে ইরাকে একের পর এক সাহায্য-সৈন্য আসতে থাকে। একই সময় আল-মুসান্না ইবনে হারিসা আস-শাইবানি ইরাকে অবস্থানরত অন্যান্য মুসলিম সেনাপতিদের নিকট সাহায্য চেয়ে পাঠান এবং তারাও সাহায্য-সৈন্য প্রেরণ করে মুসলিম বাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি করেন।^{৩০৩}

পারসিকরা যখন দেখল, সেনাপতি মুসান্নার বাহিনীতে বিরাটসংখ্যক সৈন্য জমা হয়েছে, তখন তারা মাহরান আল-হামাযানির নেতৃত্বে একটি অশ্বারোহী বাহিনীকে মুসান্নার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করে। মুসান্না এ খবর পেয়ে তার সাহায্যে এগিয়ে আসা সেনাদলের নিকট জরুরি পত্র প্রেরণ করেন এবং তাদের বুওয়ায়ব নামক স্থানে মিলিত হতে বলেন। এই সাহায্য-সেনাদলের নেতৃত্বে ছিলেন জারির ইবনে আব্দুল্লাহ। তার নিকট প্রেরিত চিঠিতে মুসান্না লেখেন, ‘এ অঞ্চলে নতুন যুদ্ধ-পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং আপনাদের আগমন পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করার সুযোগ নেই। সুতরাং দ্রুত আমাদের সঙ্গে যোগদান করুন এবং বুওয়ায়বে আমাদের সাক্ষাৎ হবে ইনশাআল্লাহ।’ সুতরাং তারা বুওয়ায়বে মিলিত হলেন।

বুওয়ায়বে মুসলিম বাহিনী ও পারসিক বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করল। উভয়পক্ষের মাঝে একটি নদী ছিল। মুসান্না অপেক্ষা করতে লাগলেন। একসময় শত্রুসেনাপতি মাহরান তাকে লিখে পাঠাল : হয় তোমরা নদী পার হয়ে আমাদের নিকট আসো নইলে আমরা নদী অতিক্রম করে তোমাদের নিকট যাব।’ মুসান্না বললেন, ‘তোমরাই নদী পার হয়ে আসো।’ সুতরাং সেনাপতি মাহরান তার বাহিনী নিয়ে নদী পার হয়ে এল। এটি ১৩ হিজরীর রমযান মাসে সংঘটিত হয়। মুসান্না দাঁড়িয়ে তার সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে বলেন, ‘আপনারা নিশ্চয়ই রোযা রেখেছেন এবং রোযা আপনাদের দুর্বল করে রেখেছে। আমার মতে আপনাদের রোযা ভেঙে ফেলা উচিত এবং শক্তি অর্জনের জন্য কিছু পানাহার করা প্রয়োজন।’ তারা তার কথায় একমত পোষণ করল এবং রোযা ভেঙে ফেলল।

^{৩০৩} আল-আমলিয়াতু তারিখিয়াতুদ দিফাইয়াহ, নিহাদ আক্বাস, পৃ. ১১৫।

মুসান্না তার বাহিনীকে রণসাজে সজ্জিত করলেন এবং ঘুরে ঘুরে তাদের উৎসাহ দিতে লাগলেন। প্রতিটি দলের নিকট গিয়ে বললেন, ‘আমি আশা করি, আপনাদের জন্য আরবরা পরাজিত হবে না। আল্লাহর কসম, আজকের দিনে আমি নিজের জন্য এমন কিছু চাই না যা আপনাদের জন্যও আশা করি না।’ বর্ণনাকারী বলেন, মুসান্না কথা ও কাজে তাদের প্রতি দয়ালু ছিলেন। তিনি তাদের সঙ্গে শান্তির সময় যেমন পাশে থেকেছেন, তেমনি কঠিন অবস্থায়ও পাশে থেকেছেন; কেউই তার কথা ও কাজে কোনো ত্রুটি খুঁজে পায়নি।^{৩০৪} এ থেকে তার সৎ নেতৃত্ব ও মহান গুণাবলির পরিচয় যাওয়া যায়। তার অধীনস্থ সকল সৈন্য ভালোবাসা ও আগ্রহের সঙ্গেই তাকে মেনে চলত। নিজ সেনাবাহিনীর প্রস্তুতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে মুসান্না বলেন, ‘আমি তিনবার আল্লাহু আকবার বলব। তাতে সকলে প্রস্তুত হয়ে যাবে। আমি চতুর্থবার আল্লাহু আকবার বলার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষের ওপর আক্রমণ করবে।’ কিন্তু তিনি যখন প্রথম তাকবির বলেন, তখনই পারসিকরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে বসে। তখন মুসলমানগণও প্রথম তাকবিরের সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে যুদ্ধে পারসিকদের এত দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা না। এটা তাদের রীতিবিরুদ্ধ। সম্ভবত সেতুযুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পরাজয় তাদের অন্তর থেকে মুসলমানদের প্রতি ভয় কিছুটা কমিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং পারসিকরা প্রথমে আক্রমণ করে এবং মুসলমানরা তার প্রতিরোধে দৃঢ়ভাবে লড়াইতে থাকে। যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণের পাশাপাশি মুসান্না তার বাহিনীর প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন। যখনই সৈন্যদের সারিতে কোথাও কোনো দুর্বলতা বা ত্রুটি পেতেন, তিনি সেখানে একজন লোক পাঠাতেন। সে গিয়ে তাদের বলত : সেনাপতি তোমাদের সালাম জানিয়েছেন। আর বলেছেন যে, মুসলমানদের আজ বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে না।’ তারা এতে সম্মত হতো এবং সারির মধ্যে সৃষ্ট ঘাটতি পূরণ করে নিত।^{৩০৫}

যুদ্ধ ভয়ংকর আকার ধারণ করে এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে চলতে থাকলে মুসান্না আনাস ইবনে হিলালকে বলেন, ‘হে আনাস, আমি মাহরানের ওপর আক্রমণ করব। তুমি আমাকে পেছন দিক থেকে সাহায্য করবে।’ তিনি

^{৩০৪} তারিখ আত-তাবারি, ৪/২৮৮।

^{৩০৫} তারিখ আত-তাবারি, ৪/২৮৮।

একই কথা ইবনে মারদি আল-ফাহরকেও বললেন। তারপর মুসান্না মাহরানকে আক্রমণ করলেন। তাকে তার স্থান থেকে সরিয়ে দিলেন। মাহরান তার সৈনিকদের ডান পার্শ্বস্থ দলে ঢুকে গেল। মুসান্না মাহরানের বাহিনীর ওপর আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। উভয়পক্ষের কেন্দ্রীয় বাহিনী সম্মুখ লড়াইতে অবতীর্ণ হলো এবং চারিদিক ধূলিতে ভরে উঠল; সাধারণ সৈনিকদের সারিতেও যুদ্ধ চলছে। তবে তারা তাদের নেতাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারছে না—মুসলিম ও মুশরিকদের উভয় পক্ষেই একই অবস্থা। মুসলিম পদাতিক বাহিনীর প্রধান মাসউদ ইবনে হারিসা তার সৈন্যদের উদ্দেশে বলেন, ‘যদি আমি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে তোমরা যুদ্ধ বন্ধ কোরো না। তাহলে শত্রুপক্ষ তোমাদের ওপর বিজয়ী হবে এবং তোমরা পরাজয় বরণ করবে। তোমরা তোমাদের অবস্থানে দৃঢ় থাকো এবং কোনোভাবেই শূন্যতা তৈরি কোরো না।’

মাসউদসহ আরও কয়েকজন মুসলিম কমান্ডার শহীদ হয়ে গেলেন। মাসউদ চরম আহত অবস্থায় লক্ষ করলেন, তার সৈনিকরা দৌল্যমানতায় ভুগছে। তিনি তখন তাদের বললেন, হে বকর ইবনে ওয়ালির সৈনিকরা, তোমাদের পতাকা উঁচু করো, আল্লাহ তোমাদের বিজয় দান করবেন! আমার মৃত্যুতে লড়াই বন্ধ কোরো না।’ মুসান্নাও তার ভাইয়ের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখলেন এবং তিনি তার লোকদের উদ্দেশে বললেন, ‘হে মুসলমানগণ, আমার ভাইয়ের মৃত্যুতে দুঃখ কোরো না; বরং এমন উত্তম মৃত্যুই কামনা করো।’^{৩০৬}

আনাস ইবনে হিলাল আন-নুমাইর শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত লড়াই করলেন। মুসান্না তার ভাই মাসউদ এবং আনাস ইবনে হিলালের মৃতদেহ বহন করে তাঁবুতে আনলেন। তখনো সবদিকেই যুদ্ধ চলছে। তবে ভেতরে ভেতরে যুদ্ধের স্রোত পারসিকদের বিপরীতে যেতে শুরু করেছে। মুসলিম কেন্দ্রীয় বাহিনীর সৈনিকরা পারসিকদের কেন্দ্রীয় বাহিনীকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সমর্থ হয়। মুসান্না তীব্র আক্রমণে পারসিকদের বাহিনীর কেন্দ্রীয় সারি একেবারে চিরে ফেলেন। তার সঙ্গে আর যারা পারসিক সৈনিকদের সারি ভেদ করে এগিয়ে যান, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জারির ইবনে আব্দুল্লাহ, বাজির, ইবনে আল-হাওবার

এবং আল-মুনযির ইবনে হাসান ও তার সঙ্গে থাকা দাব্বাহর লোকজন। কুরত ইবনে জামাহ আল-আবদি লড়াই করে নিজ হাতে শত্রুর অনেক বর্ম ও তরবারি ভেঙে ফেলেন; তিনি পারসিক নেতা ও অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান শাহর বারায়কে হত্যা করেন। যুদ্ধ চলতেই থাকে। একসময় মুসলিম বাহিনী পারসিক সেনাদের কেন্দ্রীয় দলকে সমূলে ধ্বংস করে ফেলে। সৈনিকদের সারিতে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে।^{৩০৭}

রণক্ষেত্রে ধূলির আস্তরণ বাড়ছেই। মুসান্না দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ-পরিস্থিতি অবলোকন করছেন। মুশরিকদের সেন্ট্রাল কমান্ড শেষ করে দেওয়া হয়েছে। তাদের নেতা মাহরানকে হত্যা করা হয়েছে। তবে সৈনিকদের সারিতে তখনো যুদ্ধ চলছে। মুসলমান সৈনিকরা মাহরানের নিহত হওয়ার খবর পেয়ে নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠল এবং পারসিকদের ধাওয়া করতে লাগল। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে থাকা মুসান্না এবং তার সঙ্গী মুসলমানগণ বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন যতক্ষণ না তারা পারসিকদের পরাজিত করে। তারপর মুসান্না পারসিকরা পৌছার পূর্বেই দ্রুত সেতুর নিকট গমন করেন এবং সেতুটি বিচ্ছিন্ন করে দেন। তখন পারসিকরা ফোরাত নদীর তীরে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম অশ্বারোহীরা তাদের ধাওয়া করে হত্যা করে। বর্ণনায় পাওয়া যায়, ওইদিন নিহতের সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে যায়।^{৩০৮}

১.৪.১। যুদ্ধ-পরবর্তী আলোচনা

যুদ্ধ বন্ধ ঘোষণা করা হলো এবং মুসান্না ও অন্যান্য মুসলমানগণ হাজার হাজার লাশের সারির দিকে দৃষ্টি দিলেন; সম্পূর্ণ রণক্ষেত্র লাশের রক্তে ভিজে গেছে। তারপর তিনি মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনায় বসলেন। তিনি প্রত্যেককে তাদের কৃতিত্বের বর্ণনা দিতে বললেন। মুসান্নার নিকট কেউ এগিয়ে এলেই তাকে জিজ্ঞাসা করতেন, ‘তুমি এ যুদ্ধে কী করেছ, বলো।’ তারা তাকে তার কৃতিত্বের কথা এবং যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করলেন। মুসান্না বললেন, ‘আরব এবং পারসিকরা জাহেলী যুগে ও ইসলাম আবির্ভাবের পর যুদ্ধ করেছে। আল্লাহর কসম, জাহেলী যুগে এক শ পারসিক সেনা আরবদের এক হাজার সৈনিকদের তুলনায়

^{৩০৭} প্রাপ্ত।

^{৩০৮} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৩৪৯; তারিখ আত-তাবারি, ৪/২৮৯।

শক্তিশালী ছিল। আর আজ এক শ আরব সেনা এক হাজার পারসিক সেনা থেকে বেশি শক্তিশালী। আল্লাহ তাদের ক্ষমতা ও দস্ত কেড়ে নিয়েছেন এবং তাদের দুর্বল করে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের বাহ্যিক চাকচিক্য ও সংখ্যা দেখে বিমোহিত হয়ে যেয়ো না...।’^{৩০৯}

এ সময় এ মন্তব্য ছিল যথার্থ। কারণ, মুসান্না তার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সুচারুভাবে বর্ণনা করেন যেখানে অনেক আরব প্রথমবারের মতো পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল। তিনি তার পূর্বের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এ যুদ্ধের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন।^{৩১০}

১.৪.২। পশ্চাদপসরণের পথ রুদ্ধ করে দেওয়ায় মুসান্নার দুঃখ প্রকাশ

সেতু কেটে দিয়ে মুসান্না শত্রুপক্ষের পশ্চাদপসরণের পথ রুদ্ধ করে দেন এবং এ জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘আমি একটি ভুল কাজ করেছি। তবে আল্লাহ তা‘আলা এর ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে দিয়েছেন। আমি শত্রু পৌছার আগেই সেতুর কাছে চলে যাই এবং সেটি কেটে দিয়ে শত্রুপক্ষের পালানোর পথ বন্ধ করে দিই। আমি মনে করি, এ কাজটি সঠিক ছিল না, তোমরা কখনো এ রকম কোরো না এবং আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ কোরো না। কাউকে এ রকম অসহায় অবস্থায় অবরুদ্ধ করে ফেলা ঠিক নয়।’

মুসান্না তার বক্তব্যের শেষ দিকে এ ভুলের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি অতীত যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, শত্রুর পশ্চাদপসরণের পথ রুদ্ধ করে দিলে যুদ্ধ আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। যখন তার পালানোর কোনো পথ থাকে না, তখন সে নিজেকে বাঁচাতে আরও মরিয়া হয়ে লড়াই করে। এ জন্য শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করতে বেগ পেতে হয়। তবে আল্লাহ এ ব্যাপারে মুসলমানদের সাহায্য করেন। তিনি মুসলমানদের দৃঢ়পদ রাখেন এবং এতে শত্রুপক্ষ মুসলমানদের শক্তির কাছে অসহায় হয়ে পড়ে। আল্লাহ মুশরিকদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দেন এবং তারা আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধের সাহস হারিয়ে ফেলে।^{৩১১}

^{৩০৯} তারিখ আত-তাবারি, ৪/২৯০।

^{৩১০} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৩৫২।

^{৩১১} আত-তারিখুল ইসলামী, ১০/৩৫০।

এ যুদ্ধে বিশাল বিজয় অর্জনের পরেও মুসান্না তার ভুল স্বীকার করেছেন। এতে তার দৃঢ় ঈমান ও নিঃস্বার্থপরতার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, তিনি নিজের ওপর দলের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এটাই মহান ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।^{৩১২}

১.৪.৩। মুসান্নার সামরিক মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান

মুসান্না অন্যান্য গুণাবলির মধ্যে আরেকটি প্রাধান্যযোগ্য গুণ হচ্ছে সামরিক ক্ষেত্রে তার মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান। রণভূমিতে নিজের ভাইয়ের মৃত্যুকে কীভাবে দেখতে হবে, এ ব্যাপারে তার দৃষ্টিকোণ সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। যারা তার সঙ্গে রণক্ষেত্রে যুদ্ধে লিপ্ত, তাদের প্রতি তার বাঁধভাঙা ভালোবাসার প্রকাশ দেখে আমরা অভিভূত হই। এতে তার আবেগের স্বচ্ছতা ফুটে ওঠে। তাদের প্রতি তার ভাষণ এবং তার প্রতি তাদের অভিব্যক্তি থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা দেখি, তিনি তার ঘোড়া আশ-শুমুসে চড়ে বিভিন্ন দলের নিকট গমন করছেন, তাদের উৎসাহ দিচ্ছেন, প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন এবং তাদের সর্বোচ্চ বিলিয়ে দিতে অনুপ্রাণিত করছেন। তিনি তাদের বলেন, ‘আল্লাহর কসম, আজকের দিনে আমি নিজের জন্য এমন কিছু চাই না যা আপনাদের জন্যও আশা করি না।’^{৩১৩} তারাও তার কথায় একই ভাবে সাড়া দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, কেউই তার কথা ও কাজে কোনো ত্রুটি দেখতে পায়নি।^{৩১৪} যখন তিনি পারসিকদের বিকট শব্দে আক্রমণে উদ্যত দেখতে পান এবং তিনি অনুধাবন করেন, এটি মুখোমুখি এবং কঠিন যুদ্ধ হতে যাচ্ছে, বিশেষভাবে আবু উবাইদের সেতুযুদ্ধের স্মৃতি শত্রুদের অন্তরে উজ্জ্বল—তখন তিনি তাদের মধ্যে এমন এক সাহসী বক্তব্য উচ্চারণ করেন, যা তাদের দৃঢ়পদ থাকতে উৎসাহিত করে। মুসলমানগণ ওই বিকট শব্দের যথোচিত জবাব প্রদান করেন। তিনি খুবই আশ্চর্যজনক শান্ত ভঙ্গিতে বলেন, ‘তোমরা যা শুনছ, তা পরাজয়ের করুণ সুর। শান্ত থাকো এবং চুপেচুপে কথা বলো।’^{৩১৫}

^{৩১২} প্রাগুক্ত।

^{৩১৩} তারিখ আত-তাবারি, ৪/২৮৭; আত-তারিখ ইলাল মাদায়িন, পৃ. ৪৪৬।

^{৩১৪} তারিখ আত-তাবারি, ৪/২৮৭।

^{৩১৫} আত-তারিখ ইলাল মাদায়িন, পৃ. ৪৪৬।

যখন তার ভাই মাসউদ মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি যা বলেছেন তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো : ‘হে মুসলমানগণ, আমার ভাইয়ের মৃত্যুতে দুঃখ কোরো না; বরং এমন উত্তম মৃত্যুই কামনা করো।’^{৩১৬} আর তার ভাইয়ের উক্তিও কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, যা তিনি জীবনের শেষ মুহূর্তে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করার আগে আনন্দচিত্তেই উচ্চারণ করেছিলেন : তোমাদের পতাকা উঁচু করো, আল্লাহ তোমাদের বিজয় দান করবেন! আমার মৃত্যুতে লড়াই বন্ধ কোরো না।’ মুসান্না এ যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী তার ভাইসহ আরও কয়েকজনের জানাযার নামায শুরু করার আগে বললেন, ‘আমার সান্ত্বনার কারণ এটিই যে, তারা বুওয়ায়বের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে; তারা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে এগিয়ে গিয়েছে এবং তারা তাতে আমৃত্যু দৃঢ়পদ ছিল। তারা ভীত হয়নি এবং পশ্চাদপসরণও করেনি। আর শহীদরা তো বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’^{৩১৭}

মুসান্না তার সৈন্যদের খুব ভালোবাসতেন এবং তিনি তাদের প্রতি সহমর্মী ছিলেন। তাদের অবস্থার খোঁজ-খবর নিতেন। তবে তিনি সামরিক শৃঙ্খলার দিক দিয়ে খুব কঠোর ও দৃঢ়সংকল্প ছিলেন।^{৩১৮} একবার তিনি এক সেনাকে খুব আগ্রহের সঙ্গে রণক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তার কী হয়েছে? লোকেরা বলল, ‘সে সেতুযুদ্ধে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। এ জন্য সে এখন অনুতপ্ত এবং যুদ্ধ করার জন্য মরিয়া হয়ে গেছে।’ মুসান্না সেনাটিকে বর্শা দিয়ে মৃদু আঘাত করলেন এবং বললেন, ‘তোমার সমস্যা কী? তুমি যেখানে আছ, সেখানেই অবস্থান করো। যখন তোমার সমতুল্য কাউকে পাবে, তখন তার ওপর আক্রমণ করো। কোনো কারণ ছাড়াই নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।’ সে বলল, ‘আমি তা-ই করব।’ তারপর সে তার সারিতেই অবস্থান করল এবং স্থির হলো। মুসান্না যেমন তার সৈনিকদের প্রতি সহমর্মী ছিলেন, তেমনি তারাও তার প্রতি সহমর্মী ছিল। তার সৈনিকদের একজনের কবিতা আবৃত্তি থেকে এ বিষয়টি ফুটে ওঠে। সে তার কবিতায় পরিকারভাবে বলে, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এবং আবু

^{৩১৬} প্রাপ্ত।

^{৩১৭} তারিখ আত-তাবারি, ৪/২৯১।

^{৩১৮} আত-তারিখ ইলাল মাদায়িন, পৃ. ৪৪৭।

উবাইদা আস-সাকাফি থেকে তার মুসান্নাকেই বেশি পছন্দ। এ কবি ছিল আবদ কাইস গোত্রের। সে বনু শাইবান কিংবা বনু বকর গোত্রের ছিল না। সুতরাং বলা যায় যে, স্বগোত্রের প্রতি তার দুর্বলতা ছিল।^{৩১৯} সেনাপতি মুসান্না সামরিক মনস্তাত্ত্বিক বিদ্যায় গভীর জ্ঞানী ছিলেন। শত বছর আগে কোনো এক প্রফেসর এ বিষয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন।^{৩২০}

১.৪.৪। মহিলা মুহাজিদদের ভূমিকা

গনীমতের মাল হিসাবে প্রাপ্ত কিছু খাবার মুসলিম মহিলাদের নিকট পাঠানো হয়। তখন তাদের আচরণ বিশেষভাবে উল্লেখ করার দাবি রাখে। সেনাপতি মুসান্না খাবারগুলো একজন খিষ্টান আরব নেতা আমর ইবনে আব্দুল মাসীহ ইবনে বুকাইলি এবং তার কিছু লোকজনের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন। মহিলারা যখন তাদের দেখে, তারা ভাবল এরা লুটতরাজ করতে এসেছে। এ জন্য তারা তাদের দিকে পাথর নিক্ষেপ করে নিজেদের সন্তানদের রক্ষা করতে মরিয়া হয়ে উঠল। আমর ইবনে আব্দুল মাসীহ বললেন, ‘মুসলিম বাহিনীর মহিলাদের এমনই হওয়া উচিত।’ এই বলে তিনি তাদের বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেন।^{৩২১}

মহিলাদের এ আচরণ থেকে তাদের যথার্থ ইসলামী শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। এতে একজন আদর্শ মুসলমানের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত, তারও ইশারা রয়েছে। পুরুষশূন্য পরিবেশে মুসলিম মহিলাদেরও আত্মরক্ষার কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান রাখা উচিত। এই একতরফা বিজয়ের কারণে মুসলমানরা দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুযোগ লাভ করে। মুসান্না আশেপাশের এলাকা মুসলিম শাসনের অধীনে আনার জন্য তার সেনাপতিদের প্রেরণ করেন। তারা সেখানে প্রচুর গনীমতের মাল লাভ করেন। এতে তাদের নতুন নতুন এলাকায় জিহাদের পথ সুগম হয়।^{৩২২}

^{৩১৯} আত-তারিখ ইলাল মাদায়িন, পৃ. ৪৪৭।

^{৩২০} প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৮।

^{৩২১} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৩৫২; তারিখ আত-তাবারি, ৪/২৯২।

^{৩২২} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৩৫২।

১.৪.৫। পালিয়ে যাওয়া শত্রুদের ধাওয়া

বিজয়ের আনন্দ মুসান্নাকে তার লক্ষ্য অর্জন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলে তিনি লোকজনকে পরাজিত বাহিনীকে আস-সাইয়িব পর্যন্ত ধাওয়া করতে নির্দেশ দেন। মুসলমানগণ পালিয়ে যাওয়া শত্রুদের পেছনে ধাওয়া করতে থাকেন। তাদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন যারা আবু উবাইদের সেতুযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন; তারা আস-সাবাত এলাকা পর্যন্ত বাড়ি-ঘর তল্লাশি চালায় এবং প্রচুর পরিমাণে গনীমতের মাল হস্তগত করে। তারপর তারা ফিরে এসে মুসান্নার দলে যোগদান করে। সেতুযুদ্ধে পরাজয়ের পর বুওয়াবের যুদ্ধের বিজয় শুধু সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করেনি; বরং দুই নদীর (ফোরাতি ও দজলা নদী) মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এর আগে তারা ফোরাতি নদী পর্যন্ত যুদ্ধ করেছে। তারপর তারা ফোরাতি ও দজলা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল বিজয় করেছে। তারা পুরো এলাকায় নির্ভয়ে চলাচলের স্বাধীনতা লাভ করে।^{৩২৩} বুওয়াবের যুদ্ধ সিরিয়ার ইয়ারমুকের যুদ্ধের মতোই ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই করে নেয়।^{৩২৪}

১.৪.৬। পারসিকদের প্রতিক্রিয়া

এ রকম একটি ঘটনা পারস্যের অধিপতিদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে পারে না। এতে পারসিক নেতারা জমা হয়ে তাদের দুই সেনাপতি রুস্তম ও ফাইরাযানের সঙ্গে আলোচনা করে। নেতারা বলল, ‘তোমরা কেন এত দলে বিভক্ত হয়ে পারসিকদের দুর্বল করে ফেলেছ এবং শত্রুদের সুযোগ করে দিয়েছ? আল্লাহর কসম, তোমাদের মতো সেনাপতিদের জন্যই আমাদের আজ এই দুরবস্থা। তোমরাই পারসিকদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করেছ এবং তাদের শত্রুদের থেকে বিভ্রান্ত করেছ। বাগদাদ, সাবাত এবং তাকরিত শত্রুরা দখল করে নিয়েছে। এখন মাদাইন ছাড়া আর কোনো এলাকা বাকি নেই। আল্লাহর কসম, হয় তোমরা একতাবদ্ধ হবে, আর নতুবা আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণে কেউ খুশি হওয়ার আগেই আমরা তোমাদের দিয়েই দুর্ভাগ্যের সূচনা করব। যদি

^{৩২৩} তারিখ আত-তাবারি, ৪/২৯৩।

^{৩২৪} তারতিব ওয়া তাহযিব আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া খিলাফা উমর, পৃ. ৯৩।

তোমাদের হত্যা করা আমাদের বিপর্যয়ের কারণ না হতো, তাহলে এখনই তোমাদের হত্যা করে ফেলতাম। যদি তোমরা এ কাজ ত্যাগ না করো (বিভক্তি), তাহলে আমরা তোমাদের হত্যা করে ফেলব এবং তোমাদের খুন করে আমরা মনের ক্ষোভ নিরসন করব।^{৩২৫}

এ ঘটনার পর রুস্তম এবং ফাইরাযান বুরানের নিকট গমন করে এবং তাকে বলে : কিসরা স্রাটের সকল পত্নী ও উপপত্নী এবং স্রাটের আত্মীয়দের সকল পত্নী ও উপপত্নীদের আমাদের নিকট আসার জন্য পত্র প্রেরণ করো।' সে তা-ই করল। চিঠি পাঠিয়ে সকলকে আসতে বলল। তারা সবাই এল। তারপর তাদের কোনো একজনের হাতে সোপর্দ করা হলো যাতে তাদের নির্যাতন করে এবং স্রাটের বংশের কোনো পুত্র সন্তান আছে কি না তা জানার চেষ্টা করে। এ পর্যায়ে তারা ইয়াযদগিরদের সন্ধান পায় যে স্রাটের ছেলে শাহরিয়ারের ছেলে; তার মা ছিল বাদুরিয়া গোত্রের। তারা লোক পাঠিয়ে ইয়াযদগিরদের মাকে ধরে নিয়ে আসে এবং তার ছেলের সন্ধান চায়। যখন সকল মহিলাকে জমা করা হয়, তখন তার চাচা শিরাওয়াইহ শ্বেত প্রাসাদে অবস্থান করছিল এবং সেখানে অবস্থানরত রাজকীয় লোকদের মধ্যে যত পুরুষ ছিল, সবাইকে সে হত্যা করে; এতে সতের ভাই নিহত হয়। এর কারণ ছিল, যাতে কেউই পারস্যের ক্ষমতা লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করতে না পারে। ইয়াযদগিরদের মা ছেলেকে লুকিয়ে তার মামার মাধ্যমে ইসতাখারে পাঠিয়ে দেয়।

শ্বেত প্রাসাদের শিরাওয়াইহ তার আপন ভাই শাহরিয়ারকেও হত্যা করে। সে ছিল কিসরার স্রাট বারবিযের ছেলে এবং তার মা ছিল শীরীন। এই শাহরিয়ারই ছিল ইয়াযদগিরদের পিতা। তারা ইয়াযদগিরদের মায়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং তার অবস্থান বলতে বাধ্য করে। তারপর তারা স্রাটের বংশধরদের মধ্যে বেঁচে থাকা একমাত্র সন্তান হিসাবে ইয়াযদগিরদকে রাজা মনোনীত করে। তখন তার বয়স ছিল একুশ বছর। পারসিকরা তাকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ হয়। সকল পারসিকরা তাকে মেনে নেয় এবং তার নির্দেশ মানার ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। তাকে তারা সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকে। তারা মনে করেছিল,

এটিই তাদের সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করার একমাত্র উপায়।^{৩২৬} ইয়াযদগিরদ সেনাপতি রুস্তম এবং ফাইরাযানের সহায়তায় তার ক্ষমতা প্রয়োগ করা শুরু করে। তারা আল-হিরা, আল-আনবার এবং আল-আবলাহতে নতুনভাবে সীমান্ত চৌকি নির্ধারণ করে এবং প্রতিটি চৌকি পাহারায় ভিন্ন ভিন্ন সেনাদল নিযুক্ত করে।^{৩২৭}

১.৪.৭। মুসান্নার প্রতি উমর রা.-এর নির্দেশ

ইয়াযদগিরদের এসব কর্মকাণ্ডের খবর মুসান্নার নিকট পৌঁছে। গুপ্তচরের মাধ্যমে তিনি আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি এসব বিষয়ে আমীরুল মুমিনীন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অবহিত করেন এবং সম্ভাব্য পাল্টা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে তার পরামর্শ চান। মুসান্নার এই ধারণা সত্য হতে বেশিদিন লাগেনি। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট তার চিঠি পৌঁছার আগেই দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা কুফরীতে ফিরে যায়, সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যিম্মিরা যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করে তখন পারসিকরা দ্রুত আক্রমণে তৎপর হয়ে ওঠে এবং যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হতে থাকে। মুসান্না এ খবর পেয়ে অনুধাবন করলেন যে, তিনি এত বেশি এলাকা দখল করে ফেলেছেন যা তার সৈন্য-সামন্ত দিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন; ফলে সেগুলো হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এ জন্য তিনি যুকার পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে রেখে বাকি স্থান থেকে প্রহরী উঠিয়ে নেন এবং সৈন্যরা আ-তাফে এক ক্যাম্পে অবস্থান গ্রহণ করে।^{৩২৮}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আরও বেশি সতর্ক ছিলেন। তিনি চিঠি প্রেরণ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে গিয়ে বললেন, ‘পারসিকদের নাগালের মধ্য থেকে বের হয়ে মরুভূমির দিকে চলে আসো। পারসিকদের সীমান্ত এলাকা বরাবর মরুদ্যানে অবস্থান গ্রহণ করো; তোমাদের এবং তাদের সীমান্তের মধ্যে। রাবিআ গোত্রের কাউকে ফেলে এসো না। মুদার গোত্রের কোনো সৈন্য কিংবা অশ্বারোহী এবং তাদের মিত্ররা যেন বাদ না পড়ে। যদি তারা স্বেচ্ছায় আসে, ভালো। আর তা না হলে শক্তি প্রয়োগ করো।

^{৩২৬} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩০১; আত-তারিখ ইলাল মাদায়িন, পৃ. ৪৬৭।

^{৩২৭} আত-তারিখ ইলাল মাদায়িন, পৃ. ৪৬৮।

^{৩২৮} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩০১।

তোমাদের ও শত্রুদের সীমান্ত এলাকায় অবস্থান করতে থাকো যতক্ষণ না পরবর্তী নির্দেশ পাও।’^{৩২৯}

আল-মুসান্না যুকারে তাঁরু গাড়েন। আর মুসলমানরা আল-জুল এবং শারায় থেকে গাদা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।^{৩৩০} ইরাকের মরুভূমির এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সকল মরুদ্যানেই সৈন্যরা অবস্থান গ্রহণ করে। গাদা থেকে আল-কাতকাতানা পর্যন্ত কিছু চৌকি স্থাপন করা হয় যেখান থেকে তারা একে অন্যকে দেখার সুযোগ পায় এবং যদি কোনো অঘটন ঘটে, তখন প্রয়োজনে একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে। এভাবে তারা পর্যবেক্ষণ এবং নতুন অভিযানের অপেক্ষায় প্রহর গুনতে লাগল।

একই সময় পারসিকদের সীমান্ত চৌকিগুলোও সতর্ক অবস্থায় ছিল এবং তারা যুদ্ধের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল। তবে তারা মুসলমানদের আক্রমণের ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিল। মুসলমানগণ যুদ্ধের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলেন, কিন্তু মুসলিম সেনাপতি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের বিরত রাখে। তিনি সাহায্য-সৈন্যের অপেক্ষায় থাকেন। ১৩ হিজরীর যিলকদ মাসের শেষ দিকে (জানুয়ারি, ৬৩৫ খ্রি.) এ ঘটনা ঘটে।^{৩৩১} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আল্লাহর কসম, আমি আরব নেতৃত্ব দ্বারা অনারব রাজা-বাদশাদের আক্রমণ করব।’

তারপর তিনি সর্বপ্রথম ছোট ছোট গোত্র ও শহরের সেনাপতিদের নিকট চিঠি প্রেরণ করেন। তখন যিলহজ মাস থাকাতে সবাই হজের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মক্কা-মদীনার পথে প্রথমে একটি গোত্র তার নিকট আগমন করে। তাদের অনুসরণ করে আরও অনেক দল ইরাক থেকে যাত্রা করে মদীনার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছে। তারা ফেরার পথে মদীনায় খলীফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং খলীফাকে ইরাকে অবস্থানকারী লোকদের ইতিবৃত্ত অবহিত করে। ইরাকে পৌঁছে তারা মুসান্নার বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। মুসলমানদের মধ্যে কোনো নেতা, বিদ্বান, সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা ক্ষমতাধর ব্যক্তি কিংবা কোনো খতীব বা কবি—কাউকেই তিনি বাদ দেননি—সবাইকে তিনি পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করেন।^{৩৩২}

^{৩২৯} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩১০।

^{৩৩০} বসরার দিকে একটি পাহাড়।

^{৩৩১} আত-তারিখ ইলাল মাদায়িন, পৃ. ৪৭০।

^{৩৩২} আত-তারিখ ইলাল মাদায়িন, পৃ. ৪৭১।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কার্দিসিয়ার যুদ্ধ

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন দেখলেন, পারসিকরা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে এবং তারা ইরাকে অবস্থানরত স্বল্পসংখ্যক মুসলিম বাহিনীকে সমূলে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করছে, তখন তিনি বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্য নিয়োগের আদেশ জারি করেন। কারণ, পরিস্থিতির চাহিদা এ রকমই ছিল। এ জন্য তিনি মুসান্নাকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন আশেপাশের গোত্র থেকে যুদ্ধ করতে সক্ষম ব্যক্তিদের তার বাহিনীতে নিয়োগ দেন। এতে যদি কেউ স্বেচ্ছায় আসতে না চায়, তাহলে তাকে যেকোনো উপায়ে বাধ্য করতে হবে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ওই সময়কার পরিস্থিতি সাপেক্ষে এ বাধ্যবাধকতার নীতি জরুরি মনে করেছিলেন এবং তিনিই প্রথম ইসলামে এ আদেশ জারি করেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল-আসকারিয়াহ বইয়ের লেখক মুহাম্মাদ ফারায ভুল তথ্য সংযোজন করেছিলেন। কারণ, তিনি লিখেছেন, উমাইয়া খেলাফতকালে এ বাধ্যবাকতা আরোপ করা হয়। কিন্তু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই প্রথম এ আদেশ দিয়েছিলেন এবং সেটি বাস্তবায়িত হয়েছিল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশ পেয়েই মুসান্না তা বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে ওঠেন এবং খলীফার পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্যান্য প্রদেশের গভর্নরদের নিকট চিঠি প্রেরণ করে তাদের অধীনদের মধ্যে যাদের কাছে অস্ত্র, ঘোড়া রয়েছে এবং যারা দৈহিকভাবে সক্ষম বা বিদ্বান ব্যক্তি, তাদের সবাইকে ইরাকে মুসান্নার নিকট প্রেরণ করার নির্দেশ দেন। তিনি তাদের যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করতে আদেশ দেন এবং ইরাকে নিয়োগ দিতে বলেন।^{৩৩৩}

ইয়াযদগিরদ শাসনক্ষমতা বুঝে নেওয়ার পরই পারস্যের অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। তাদের অবস্থা ছিল নিম্নরূপ :

- ✓ ইয়াযদগিরদকে রাজা হিসাবে নিয়োগ দেওয়ার পরই পারস্যের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা স্থিতিশীল হয় এবং তাকে কেন্দ্র করে লোকজন ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। পারসিকদের মনোবল ও শক্তি বৃদ্ধি পায়।
- ✓ রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ ইয়াযদগিরদকে মেনে চলার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা শুরু করে এবং তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে থাকে। তারা সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে সকল যুবককে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করে; তারা মুসলমানদের দখলকৃত এলাকাসমূহে বিভিন্ন সৈন্যদল প্রেরণ করে।
- ✓ পরিশেষে তারা সকল গ্রাম, মহল্লা ও জনপদের লোকজনকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে থাকে। এতে তারা মুসলমানদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে, মুসলমানদের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।^{৩৩৪}

তখন মুসলমানদের অবস্থাও পরিবর্তিত হয় এবং তা ছিল নিম্নরূপ :

- ✓ মুসান্না এবং তার অন্যান্য সেনাপতিরা ইরাকের বিভিন্ন এলাকা থেকে মুসলমানদের সরিয়ে আনে এবং বিজিত এলাকাসমূহ ছেড়ে দেয়।
- ✓ মুসলমানগণ আরব এবং ইরাকের সীমান্তে মরুভূমির মরুদ্যানে ছড়িয়ে পড়ে। মুসান্না যুকারে তাঁবু গাড়েন এবং অন্যান্য সেনারা আত-তাফে অবস্থান গ্রহণ করেন। তারা ইরাকে এমনভাবে সামরিক চৌকি স্থাপন করেন যেন একে অন্যকে দেখতে পান এবং বিপদে সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারেন।
- ✓ পারসিকদের বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্য নিয়োগের সঙ্গে মুসলমানদের বাধ্যতামূলক নিয়োগ সৈন্যসংখ্যায় ভারসাম্য নিয়ে আসে।^{৩৩৫}

^{৩৩৪} হারকাতুল ফাতহিল ইসলামি, পৃ. ৮০।

^{৩৩৫} প্রাপ্ত।

২.১। ইরাকের সেনাপতি হিসাবে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.-কে নিয়োগ

এটি ছিল ইরাক বিজয়ে অভিযানের তৃতীয় ধাপ। আর এর শুরু হয় ইরাকে জিহাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মুসলিম সামরিক বাহিনীর সেনাপতি হিসাবে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়োগদানের মধ্য দিয়ে। এটি ১৪ হিজরীর ঘটনা। পারসিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আহ্বান জানিয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ওই বছরের সূচনা করেছিলেন। মুহাররম মাসের প্রথম দিনেই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিশাল এক সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে যাত্রা করেন এবং সিরার নামক এক জলাশয়ের নিকট গিয়ে তারা যাত্রাবিরতি করেন।^{৩৩৬} তিনি সেখানে তাঁবু গাড়েন। খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সশরীরে ইরাকীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করার পরিকল্পনা করেন। মদীনায় তার অনুপস্থিতিতে শাসনভার আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট অর্পণ করেন এবং উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-সহ নেতৃস্থানীয় সাহাবাদের সঙ্গে নেন। নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্য তিনি সাহাবীগণের উপস্থিতিতে এক পরামর্শ-সভার ব্যস্থা করেন। সভার দাওয়াত দিতে গিয়ে বলা হয়—আসসালাতু জামিআতুন (নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হবে)।

ইতিমধ্যে মদীনায় আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দাওয়াত দেওয়া হয়। তিনি মদীনা থেকে পরামর্শ-সভায় যোগ দেন। সকলে মিলে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও তা মোকাবিলা করার বিষয়ে পরামর্শ করেন। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত সকলে একমত হন যে, খলীফা স্বয়ং ইরাক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমি আশঙ্কা করছি, আল্লাহ না করুন, যদি যুদ্ধে আপনি নিহত হন, তাহলে সকল অঞ্চলের মুসলমান মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। তাদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে হতাশা নেমে আসবে। আমি মনে করি, আপনার স্থলে অন্য কাউকে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে আপনি মদীনায় ফিরে যান।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সহ অন্যান্যরা আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথায় একমত পোষণ করলেন। তারপর তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনি সেনাপতি হিসাবে কাকে ইরাকে

^{৩৩৬} সিরার : মদীনা থেকে তি মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি এলাকা; মুজামুল বুলদান, ৩/৩৯৮।

পাঠানো উচিত বলে মনে করেন?’ আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দেন, ‘আপনি ইতিমধ্যে তাকে পেয়ে গেছেন।’ তখন তিনি বলেন, ‘কে সেই লোক?’ তিনি বললেন, ‘সেই লোক হলেন আক্রমণে সিংহ-পুরুষ সাদ ইবনে মালিক যুহরী রাযিয়াল্লাহু আনহু (সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু)।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ প্রস্তাব পছন্দ করলেন। ইরাক অভিযানে তিনি তাকে সেনাপতি নিয়োগ করলেন।^{৩৩৭}

২.১.১। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.-এর প্রতি খলীফার উপদেশ

যখন সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় আগমন করেন, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে ইরাকে সামরিক অভিযানে সেনাপতি নিয়োগ করেন এবং তাকে বলেন :

হে সাদ, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতুল গোত্রীয় ও তার সাহাবী এই মর্যাদা যেন আপনাকে মহান আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকায় না ফেলে। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা মন্দ দ্বারা মন্দ মোচন করেন না; বরং ভালো দ্বারা মন্দ মোচন করেন। একমাত্র পূর্ণ আনুগত্য ব্যতীত মহান আল্লাহর সাথে কারও কোনো বংশীয় সম্পর্ক নেই। আল্লাহর দৃষ্টিতে অভিজাত ও সাধারণ সকল মানুষ সমান। আল্লাহ সকলের মালিক, সবাই তার বান্দা। সততার গুণে তাদের মর্যাদার তারতম্য হয়। আনুগত্যের মাধ্যমে তারা আল্লাহর নিয়ামত অর্জন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত-প্রাপ্তি থেকে শুরু করে আমাদের থেকে তাঁর বিদায় গ্রহণ পর্যন্ত তার নীতিমালা আপনি পর্যালোচনা করে অবশ্যই তার অনুসরণ করবেন। কারণ, মূলত ও প্রকৃত কর্ম তা-ই। এটি আমার পক্ষ থেকে আপনার জন্য উপদেশ। আপনি যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তা বর্জন করেন, তবে আপনার সকল কর্ম বিনষ্ট হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবেন।^{৩৩৮}

একজন মহান ও বিজ্ঞ খলীফার পক্ষ থেকে এটি একটি চমৎকার উপদেশ। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু দুর্বল বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে

^{৩৩৭} তারতিব ওয়া তাহযিব আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃ. ৯৬।

^{৩৩৮} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩০৬।

পেরেছিলেন, যা সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কারু করতে পারে। তিনি চিন্তা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারেন এবং এতে হয়তো তার মনে অন্যান্য মুসলমানদের তুলনায় অহংকার দানা বাঁধতে পারে। এ জন্য উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে ইসলামের শাশ্বত নীতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, দুনিয়ায় একজন মুসলমানের সম্মানের কারণ হচ্ছে—যেমন তাদের প্রতিপালক আল্লাহ বলেছেন এবং তারা তার বান্দা—এটাই চরম সত্য এবং তারা আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমেই তা অর্জন করতে পারে। অন্তরের পরিশুদ্ধতাই আনুগত্যের সর্বোচ্চ মাধ্যম। তিনি যেন বলছেন, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহর আনুগত্যের কারণেই মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা যায়। এটাই তাকওয়া (খোদাভীতি)। আল্লাহ মানুষের জন্য এটাকেই সম্মানের মানদণ্ড হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

হে মানব, আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সে-ই সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।^{৩৩৯}

এটি ন্যায়সংগত এবং বরকতময় মানদণ্ড, যা প্রত্যেক মুসলমানই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের সুখ-শান্তি লাভের জন্য চেষ্টা করে অর্জন করতে সক্ষম। বক্তব্যের শেষ দিকে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন যা সম্পূর্ণ দীনকেই অনুসরণ এবং তা লোকদের ওপর প্রয়োগ করার শামিল।^{৩৪০}

^{৩৩৯} সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩।

^{৩৪০} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৩৬২।

২.১.২। অন্যান্য উপদেশ

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আরও কিছু উপদেশ দেন। তিনি বলেন :

আমি আপনাকে ইরাকে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য সেনাপতি নিয়োগ করেছি। সুতরাং আমার কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনুন। আপনি একটি কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন এবং সত্যের ওপর অটল থাকা ছাড়া সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। নিজেকে এ জন্য প্রস্তুত করুন। আপনার সঙ্গীদের ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করুন। ভালো কাজ দিয়েই সবকিছু শুরু করুন এবং জেনে রাখুন, ভালো অভ্যাস তৈরি করার উপায় রয়েছে। আর এ উপায় হচ্ছে ধৈর্যধারণ করা। আপনার ওপর আপতিত সকল বিপদ ও ঘটনায় যদি ধৈর্যধারণ করতে পারেন, তাহলে আপনি আল্লাহর ভয় অর্জন করতে সক্ষম হবেন। জেনে রাখুন, দুটি বিষয়ে মহান আল্লাহর ভয় রাখতে হয়। তার আনুগত্যে এবং তার অবাধ্যতা বর্জনে। দুনিয়াকে অবজ্ঞা করে আখেরাতের মহব্বতে যে তার আনুগত্য করেছে, সেটিই প্রকৃত আনুগত্য। দুনিয়ার মহব্বতে আখেরাতের অবজ্ঞায় যে তার অবাধ্য হয়েছে সেটিই প্রকৃত অবাধ্যতা। অন্তরসমূহের কিছু হাকীকত ও সত্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা আছে। আল্লাহ তা'আলা সেগুলো সৃষ্টি করে দেন। গোপনীয়তা ও প্রকাশ্য সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। প্রকাশ্য হলো সত্যের অনুসরণে তার প্রশংসাকারী ও সমালোচনাকারী তার নিকট সমান। আর গোপনটি উপলব্ধি করা যায় তার অন্তর থেকে মুখের মাধ্যমে হিকমত ও প্রজ্ঞা প্রকাশের মাধ্যমে, তার প্রতি গণ-মানুষের মহব্বতের মাধ্যমে এবং মানুষের প্রতি তার মহব্বতের মাধ্যমে। সুতরাং মানুষের প্রতি মহব্বত স্থাপনে কমতি ও কার্পণ্য করবেন না। সকল নবী মানুষের মহব্বত প্রাপ্তি কামনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা যখন কাউকে ভালোবাসেন তখন সকলের ভালোবাসার পাত্র বানিয়ে দেন। আর তিনি কাউকে ঘৃণা করলে তাকে সকলের ঘৃণার পাত্র বানিয়ে দেন। সুতরাং মানুষের নিকট আপনার অবস্থানের নিরিখে আল্লাহর নিকট আপনার অবস্থান মূল্যায়ন করুন।^{৩৪১}

^{৩৪১} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩০৬, ৩০৭।

এ বক্তব্য থেকে অনেকগুলো শিক্ষা লাভ করা যায়। নিচে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

- ✓ সত্যকে আঁকড়ে থাকলে মুসলমানগণ বিপদাপদ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। কারণ যে সত্যের পথে অবিচল থাকে, সে তো আল্লাহর সঙ্গেই রয়েছে। আর যে আল্লাহর সঙ্গে থাকে, আল্লাহ তার জন্য সাহায্য ও করুণা বর্ষণ করেন। এ অনুভূতি মুসলমানদের অন্তরে বিপদ ও কঠিন সময় মোকাবিলা করার স্পৃহাকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেবে। আর কথা ও কাজে যে সত্যকে অনুসরণ করবে, সে অন্তরে শান্তি অনুভব করবে। যে কিনা সত্রপথ থেকে বিচ্যুত হয়, তার পরিণতি হবে এর বিপরীত। তার অন্তর বিষাদ ও দুর্ভোগে অস্থির হয়ে উঠবে। যেমন : অপরাধী মানসিকতা তাকে ঘিরে ধরবে এবং লোকজনের ভয়ে সে তটস্থ থাকবে। এর সঙ্গে সত্য থেকে বিমুখ হওয়ায় অজানা পরিণতির আশঙ্কায় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে।
- ✓ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, সদগুণ অর্জন করার উপায় হচ্ছে ধৈর্যধারণ করা। কারণ সদগুণ অর্জনের পথ কার্পেটে মোড়া নয়, বরং বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ। এ পথে সফর করতে অনেক মুজাহাদার প্রয়োজন পড়ে। সুতরাং যে এ বিপদসংকুল পথে সফর করতে চায়, তাকে অবশ্যই ধৈর্যধারণ করতে হবে। নতুবা সে মাঝপথেই থেমে যাবে।
- ✓ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, আল্লাহর ভয় মানে তার আনুগত্য এবং তার অবাধ্যতা বর্জন। তারপর তিনি ওই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেন যা তাকে এই ভয় অর্জনে উৎসাহিত করবে। আর তা হলো দুনিয়াকে অবজ্ঞা করা এবং আখেরাতকে ভালোবাসা। যা মানুষকে আল্লাহর অবাধ্যতায় বাধ্য করে, তা হলো, আখেরাতকে অবজ্ঞা করে দুনিয়ার ভালোবাসায় মেতে ওঠা।
- ✓ তারপর তিনি ঈমানী শক্তিতে উজ্জীবিত অন্তরের চিহ্ন বর্ণনা করেন। এ জন্য তিনি মানুষের আচরণের উদাহরণ দেন; যখন সত্যকে আঁকড়ে থাকার কারণে কেউ তার প্রশংসা বা সমালোচনা করে, তখন তার কি অনুভূতি হয় কারও প্রশংসায় সে প্রশংসাকারীকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে সত্য থেকে বিচ্যুত হন না। আবার সমালোচকদের সঙ্গে মন্দ আচরণও করেন না।

✓ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আরও বলেন, অন্তরের গোপন ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায় তার মুখে হিকমত ও প্রজ্ঞা প্রকাশের মাধ্যমে, তার প্রতি মানুষের মহব্বত এবং মানুষের প্রতি তার মহব্বতের মাধ্যমে। কোনো বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা দুনিয়াতে তার প্রতি অন্যান্য মুসলিম ভাইদের ভালোবাসার সঙ্গে সম্পর্কিত; আল্লাহ তা'আলা যখন কাউকে ভালোবাসেন তখন তাকে সকলের ভালোবাসার পাত্র বানিয়ে দেন।^{৩৪২}

যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য এ রকম উপদেশের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমাদের উপায় কী হবে—যারা ইসলাম সম্পর্কে খুব কমই জ্ঞান রাখে এবং তা অনুসরণে চরম দুর্বলতার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে? ^{৩৪৩}

২.১.৩। উমর রা.-এর খুতবা

চার হাজার (অন্য বর্ণনায় ছয় হাজার) মুজাহিদ নিয়ে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইরাকে গমন করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সিরার থেকে আওয়াস^{৩৪৪} পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দেন। সেখানে সৈনিকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, ‘মহান আল্লাহ আপনাদের জন্য উদাহরণ বর্ণনা করেছেন এবং আপনাদের জন্য বাণী প্রদান করেছেন যাতে অন্তরগুলো জীবন্ত হয়। কারণ মহান আল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধে থাকা অন্তর জীবিত না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তা মৃতই থাকে। যে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে, তা দ্বারা কল্যাণ অর্জন করা দরকার। কারণ ন্যায়পরায়ণতার কতক চিহ্ন ও কতক সৌন্দর্য রয়েছে। চিহ্নগুলো হলো লজ্জা, দানশীলতা, বিনয় ও নম্রতা, আর সৌন্দর্য হলো দয়া ও করুণা। মহান আল্লাহ সকল বিষয়ের জন্য দরজা সৃষ্টি করেছেন। সকল দরজা খোলার চাবি সহজলভ্য করে দিয়েছেন। ন্যায়পরায়ণতার দরজা হলো বিবেচনা-শক্তি ও শিক্ষা গ্রহণ, আর তার চাবি হলো সংযম ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। শিক্ষা গ্রহণ হলো মৃত্যুর কথা স্মরণ করা এবং ধন-সম্পদ প্রেরণ করে তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। সংযম হলো সত্যগ্রহণকারীর নিকট সত্য অর্জন করা এবং সংসার ধর্ম

^{৩৪২} আত-তারিখ আল-ইসলামী, ১০/৩৬৪।

^{৩৪৩} প্রাগুক্ত, ১০/৩৬৫।

^{৩৪৪} আওয়াস : ইরাকের পথে একটি এলাকা। বর্তমানে সেখানে মদীনা বিমানবন্দর অবস্থিত।

পালনের জন্য ঠিক যতটুকু পার্থিব বস্তু দরকার, ততটুকুতে তুষ্ট থাকা। প্রয়োজন পরিমাণ বস্তু যাকে তুষ্ট করতে না পারে কোনো কিছুই তাকে তুষ্ট করতে পারবে না। মহান আল্লাহ আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন যাতে তার নিকট কারও আহাজারি করতে না হয়। সুতরাং আপনাদের দুঃখ-কষ্টের কথা আমাকে জানাবেন। কেউ যদি সরাসরি আমার নিকট আসতে সক্ষম না হয়, তাহলে এমন কারও নিকট পেশ করবে যে তা আমার নিকট পৌঁছে দিবে। তাহলে বিনাকষ্টে আমরা তার অধিকার তাকে ফিরিয়ে দেব।’^{৩৪৫}

২.১.৪। ইরাকে সাদ রা.-এর উপস্থিতি এবং মুসান্নার ইত্তেকাল

সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইরাকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তিনি নাজদ অঞ্চলে জারুদ^{৩৪৬} এলাকায় পৌঁছে যাত্রা বিরতি করলেন। খলীফা অতিরিক্ত চার হাজার সৈন্য পাঠিয়ে মুসলিম বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করলেন এবং সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নাজদ অঞ্চল থেকে আরও সাত হাজার সৈন্য দলে অন্তর্ভুক্ত করলেন। ইরাকে বারো হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে মুসান্না ইবনে হারিসা তার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন।

সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যারুদে অবস্থান করেন। পারসিকদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন এবং খলীফার নির্দেশের অপেক্ষা করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ যুদ্ধের ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন। তিনি শহরের কোনো বিদ্বান ব্যক্তি, সেনাপতি, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ক্ষমতাধর, বক্তা বা কবি—কাউকে বাদ দেননি—সবাইকে পারসিকদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছেন। তিনি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী লোকদের তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছেন। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার বাহিনী যারুদে অবস্থানকালীন মুসান্না গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। বর্ণনাকারী বলেন, সেতুযুদ্ধে তিনি মারাত্মকভাবে যখম ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তার বিদায়ের সময় ক্ষনিয়ে এসেছে। ব্যথা খুব বেড়ে গেলে তিনি বশীর ইবনে খাসাসিয়্যাহকে তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। মুসান্না তার ভাই

^{৩৪৫} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩০৮; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইফা, বাংলাদেশ, ৭/৭১ দ্রষ্টব্য।

^{৩৪৬} জারুদ : ইরাক থেকে হাজীদের আসার পথে সালাবিয়া ও খুজাইমিয়ার মধ্যবর্তী একটি মরুভূমি অঞ্চল।

মুআল্লাকে কাছে ডাকেন। তাকে তার শেষ অসিয়ত করেন এবং সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এ খবর পৌঁছে দিতে বলেন। তারপর মুসান্না তার পরম সৃষ্টিকর্তার নিকট তার আত্মাকে সমর্পণ করেন। ইরাক বিজয়ে যে সূর্য তীব্র আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছিল, পরিশেষে তা অস্ত গেল।^{৩৪৭}

সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি সর্বশেষ উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ইসলামের শত্রুরা যখন পুরোপুরিভাবে তাদের সীমানার ভেতর প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তখন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন না; বরং তাদের সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন যা কিনা আরব ভূমির নিকটবর্তী এবং পারস্যের রিফিউজি এলাকারও নিকটবর্তী। যদি আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় দান করেন, তাহলে তারা তাদের পেছনের সব ভূমিই দখল করে নিতে পারবে। আর যদি যুদ্ধের ফলাফল এর বিপরীত হয়, তাহলে তারা পিছু হটতে পারবে এবং অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে এসে যোগ দিতে পারবে। তখন তাদের পথ-ঘাট সম্পর্কে ভালো ধারণা তৈরি হবে এবং নিজের ভূমিতে তারা আরও বেশি সাহসী হয়ে উঠবে যতক্ষণ না আল্লাহ তাদের পক্ষে ফায়সালা করেন।^{৩৪৮}

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শেষ মুহূর্তের সঙ্গে মুসান্না বিদায়ের মুহূর্তের কি আশ্চর্য মিল! উভয়ে জীবনের শেষ মুহূর্তে মুসলমানদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করেছেন এবং বিজয় অভিযানের ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুর সময় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উপদেশ দিয়েছেন এবং ইরাক বিজয়ের ব্যাপারে লেঅকজনকে উৎসাহ দিয়েছেন। আর মুসান্নাও তার ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে পারসিকদের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ইরাক অভিযানে পরবর্তী সেনাপতি সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি ব্যক্ত করছেন। তিনি তার শেষ নিশ্বাস নেওয়ার সময় চিন্তা করছেন, পরিকল্পনা করছেন এবং সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পরামর্শ দিচ্ছেন।^{৩৪৯}

মুসান্না ইবনে হারিসার মৃত্যু সংবাদ এবং তার দেওয়া পরামর্শ শুনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার জন্য মাগফেরাতের দুআ করেন। তারপর তিনি

^{৩৪৭} আল-কাদিসিয়া, আহমাদ আদিল কামিল, পৃ. ২৯।

^{৩৪৮} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩১০।

^{৩৪৯} আল-কাদিসিয়া, আহমাদ আদিল কামিল, পৃ. ৩০।

তাকে সেখানেই দাফন করতে এবং তার পরিবারের দেখভাল করার নির্দেশ জারি করেন।^{৩৫০} প্রসংগত উল্লেখ্য, ইন্তেকালের পূর্বে মুসান্না তার স্ত্রী সালমা বিনতে খাসফাহ আত-তাইমিয়াকে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে বিবাববন্ধনে আবদ্ধ হতে নির্দেশ দিয়ে যান। ইদতকালীন সময় শেষ হলে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন এবং তাকে বিয়ে করেন। এখানে দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে, ইসলামের একজন মহান বীর—যার সম্পর্কে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন—সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে বিবাববন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি দিয়ে মুসান্না কি তার স্ত্রীর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন? আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তিনি কি তার স্ত্রীর মেধা, প্রজ্ঞা ও স্বামীর যুদ্ধ-অভিজ্ঞতার জ্ঞান থেকে মুসলিম উম্মতের উপকারের কথা চিন্তা করে এর অনুমতি দিয়েছিলেন? দুটিই হতে পারে। এটি মহান ব্যক্তিদের অনন্য গুণাবলির সামান্য একটি দৃষ্টান্তমাত্র।^{৩৫১}

২.১.৪। ইরাকে সাদ রা.-এর অভিযান এবং উমর রা.-এর উপদেশ

খলীফার পক্ষ থেকে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি যারুদ ত্যাগ করে ইরাক অভিমুখে চূড়ান্ত লড়াইয়ের নির্দেশ এল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন :

আমি আপনাকে এবং আপনার অধীন সব সৈন্যদের সব পরিস্থিতিতে আল্লাহকে ভয় করার আদেশ করছি। কারণ, শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহর ভয়ই সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। আমি আপনাকে এবং আপনার অধীন সব সৈন্যদের শত্রুকে এড়ানোর চেয়ে গোনাহকে বেশি এড়িয়ে চলার আদেশ করছি। কারণ, শত্রুর চেয়ে গোনাহকে বেশি ভয় করা উচিত। শত্রুর কুফরীই মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের মূল কারণ। যদি তা না হতো, তাহলে আমরা এত সামর্থ্য অর্জন করতে পারতাম না। কারণ, আমাদের সংখ্যা শত্রুদের মতো নয় এবং আমাদের অস্ত্রও তাদের মতো নয়। যদি উভয়ের গোনাহের পরিমাণ সমান হতো, তাহলে শত্রুরাই আমাদের ওপর বিজয়ী হতো। আর যদি সৎ গুণাবলির

^{৩৫০} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩১৩।

^{৩৫১} আত-তারিখুল ইসলামী, ১০/৩৭০, ৩৭১।

দিক দিয়ে আমরা তাদের চেয়ে অগ্রগামী না হতাম, তাহলে আমরা আমাদের শক্তি দিয়ে তাদের পরাজিত করতে পারতাম না।

মনে রাখবেন, আপনাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে। তারা জানে, যা আপনারা করছেন। সুতরাং তাদের সামনে লজ্জা করা উচিত এবং কোনোভাবেই আল্লাহর অবাধ্য হবেন না। আপনারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করছেন; এ কথা বলবেন না যে, শত্রুরা আমাদের থেকে নিকৃষ্ট এবং আমরা গোনাহ করলেও তারা কখনো আমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না। নিকৃষ্ট লোকেরাও কখনো কখনো বিজয়ী হতে পারে, যেমন বনী ইসরাইল আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার কারণে অগ্নিপূজকদের কাছে পরাজিত হয়েছিল। আল্লাহ বলেন,

فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا

অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল।^{৩৫২}

শত্রুদের বিরুদ্ধে আপনারা যেমন আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, ঠিক তেমনি নিজেদের নফসের মন্দ চাহিদা ও প্রতারণা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন। আমি নিজের জন্য, আপনাদের জন্য এবং সকলের জন্য এ বিষয়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি। সফরে দলের সকল সদস্যদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন। যাত্রাপথে তাদের বেশি কষ্ট দেবেন না যেন তারা শত্রুর নিকটবর্তী হতেই দুর্বল হয়ে না পড়ে। তারা এমন এক শত্রুদলকে মোকাবিলা করতে যাচ্ছে যাদের সফরের প্রয়োজন নেই এবং তাদের রয়েছে শক্তিশালী ঘোড়া ও যোদ্ধা। আপনার এবং আপনার অধীন সব সৈন্যদের সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম নেওয়া উচিত, যাতে সবাই পুনরায় শক্তি অর্জন করতে পারে, নিজেদের অস্ত্র ও মালামাল গুছিয়ে নিতে পারে।

এমন কোনো জনবসতির নিকট যাত্রাবিরতি করবেন না যারা আমাদের সঙ্গে সন্ধি-চুক্তিতে বা নিরাপত্তায় রয়েছে। আর তাদের কারও সঙ্গে আপনার অধীন কর্তব্যপরায়ণ ও একনিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে মেলামেশার সুযোগ দেবেন না। কোনো জনবসতির লোকদের উত্ত্যক্ত

করবেন না। কারণ, তাদের নিরাপত্তা বিধান ও সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়ন আপনাদের জন্য পরীক্ষা। ঠিক তাদের জন্য এ চুক্তির প্রতি ধৈর্যশীল থাকাও পরীক্ষা। যতক্ষণ তারা আপনাদের প্রতি তাদের ওয়াদা রক্ষা করে চলবে, আপনিও তাদের প্রতি আপনার ওয়াদা রক্ষা করে চলবেন। যাদের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে, তাদের নির্যাতন করে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ের আশা করবেন না।

শত্রুর কাছকাছি পৌঁছে গুপ্তচর প্রেরণ করবেন। তাদের কর্মকাণ্ডের কোনোকিছুই যেন আপনার নিকট গোপন না থাকে। এ কাজে আরব এবং স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে যারা বিশ্বস্ত, তাদের প্রেরণ করবেন। কারণ, মিথ্যাবাদীর সংবাদ আপনার কোনো উপকারে আসবে না যদিও সে মাঝে মাঝে সত্য বলে ফেলে। অসৎ লোকেরা আপনার গুপ্তচর হতে পারে না; বরং তারা আপনার বিরুদ্ধে কাজ করবে। শত্রুদলের খুব নিকটে পৌঁছে গেলে আপনি অগ্রগামী ও সহসা আক্রমণকারী দল প্রেরণ করবেন যাতে তারা শত্রুর রসদ সরবরাহ লাইন কেটে দিতে পারে এবং তাদের দুর্বল পয়েন্ট বের করতে পারে। অভিজ্ঞ ও শক্তিশালী ব্যক্তিদের এ কাজে নিযুক্ত করবেন এবং তাদের দ্রুতগামী ঘোড়া সরবরাহ করবেন। যদি তারা শত্রুর দেখা পায়, তাহলে তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই সর্বোত্তম। মুজাহিদ, ধৈর্যশীল ও নির্ভীক লোকদের এসব আক্রমণকারী দলে নিয়োজিত করবেন এবং এ কাজে নিজের পছন্দকে প্রাধান্য দেবেন না। তাহলে এটি পুরো বাহিনীর ওপর প্রভাব ফেলবে এবং দুর্যোগ বয়ে নিয়ে আসবে।

এমন কোনো জায়গায় এসব অগ্রগামী ও সহসা আক্রমণকারী দল প্রেরণ করবেন না যেখানে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে। যদি আপনি শত্রুদের দেখতে পান, তাহলে তাদের ফিরিয়ে আনবেন। বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না; বরং এ-সময় তাদের সবচেয়ে দুর্বল দিক এবং রণক্ষেত্রের পরিবশে-পরিস্থিতি সম্পর্কে স্থানীয় লোকদের মতো জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করবেন। যদি কোনো বন্দীকে আপনার নিকট আনা হয় যার ব্যাপারে মুসলমানদের কোনো চুক্তি নেই, তাহলে তাকে হত্যা করবেন যেন আপনাদের ও আল্লাহর শত্রুদের মনে ভীতির সৃষ্টি হয়। আল্লাহই আপনাদের সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক; তিনিই শত্রুর বিরুদ্ধে আপনাদের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আমরা আল্লাহর সাহায্যই কামনা করি।^{৩৫৩}

প্রয়োজনীয় উপদেশবাণীতে সমৃদ্ধ এটি একটি মহান বক্তৃতা এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মহত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক—সমর-পরিকল্পনায় তার সবিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এর প্রতিটি আদেশ ও নির্দেশে মহান আল্লাহ তা‘আলার প্রত্যক্ষ সাহায্য ও অনুগ্রহ দৃশ্যমান।^{৩৫৪} আমরা এই বক্তৃতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নীতিমালা বের করতে পারি যা নিচে দেওয়া হলো।

- ✓ ১। সেনাবাহিনীকে আল্লাহকে ভয় করার এবং সকল পরিস্থিতিতে তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ থাকার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। মুসলমানদের জন্য এটিই হচ্ছে প্রথম অস্ত্র এবং গোনাহ হচ্ছে প্রথম শত্রু। তারপর কাফেরদের দ্বিতীয় শত্রু হিসাবে গণ্য করতে বলা হয়েছে। তারপর তিনি এদিকে ইশারা করেন যে, ফেরেশতারা মুসলিম বাহিনীর ওপর সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখছে এবং গোনাহ করার ব্যাপারে তাদের লজ্জা করা উচিত। কারণ, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করতে গিয়ে রণক্ষেত্রে গোনাহ করার কোনো মানে হয় না। এটা কখনো সঠিক নয় যে, শত্রুর আচরণের সঙ্গে তুলনা করে মুসলিম বাহিনীর আচার-আচরণ বিচার করা। প্রতিমুহূর্তে আল্লাহর সাহায্য কামনা করা প্রয়োজন—এটিও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।
- ✓ ২। প্রতিক্ষণে আল্লাহর ধ্যানে থাকা; জনবসতির লোকজনের সঙ্গে কৃত চুক্তি কিংবা তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা যেন তা ভঙ্গ না করে। মুসলমানদের ব্যাপারে কোনো মন্দ ধারণা যেন ছড়িয়ে না পড়ে, যাতে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে মানবিক বোধ ও সংবেদনশীলতায় কোনো ছেদ না পড়ে। এতে প্রয়োজনে মন্দ আচরণের জন্য অভিযুক্ত মুসলিম ব্যক্তিকেও শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

এ নীতি বাস্তবায়নের জন্য উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সেনাপতিকে এ আদেশ দেন যে, এমন পদ্ধতি ও উপায় অবলম্বন করতে হবে যাতে সৈনিকদের মনোবল দৃঢ় থাকে এবং রণক্ষেত্রে পৌছার পরও তাদের শক্তি-সামর্থ্য অটুট থাকে। তিনি বলেন, ‘সফরে দলের সকল সদস্যদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন যাতে

সবাই পুনরায় শক্তি অর্জন করতে পারে, নিজেদের অস্ত্র ও মালামাল গুছিয়ে নিতে পারে।' মুসলিম বাহিনীর সৈনিক ও অস্ত্র-শস্ত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও রক্ষা করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপের পর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধের দিকে ইশারা করেন। তিনি কথা ও কাজের ভারসাম্য বজায় রেখে সঠিক ইসলামী আচরণে আবির্ভূত হওয়াকে মুসলিম বাহিনীর জন্য সর্বোত্তম একটি অস্ত্র হিসাবে সাব্যস্ত করেন। সতর্কতা হিসাবে তিনি এমন কোনো জনপদের নিকট তাঁর গাড়তে নিষেধ করেন, যাদের সঙ্গে মুসলমানদের চুক্তি রয়েছে। ফলে যেকোনো বাড়াবাড়ির আশঙ্কাকে—যা সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় বাধা হতে পারে—এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। এ জন্য বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে এসব জনপদে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না, যেন চুক্তির শর্তসমূহ লঙ্ঘিত না হয় এবং তারাও এর প্রতি একনিষ্ঠ থাকতে পারে।

- ✓ ৩। সম্পর্কের প্রকারভেদে লোকদের সঙ্গে আচরণের পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে এবং তাদের ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো বোঝা চাপানো যাবে না। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সেনাপতিকে এ নির্দেশ দেন যে, শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় ছিনিয়ে আনতে গিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে যাদের চুক্তি রয়েছে, তাদের কারও প্রতি যেন অসদাচরণ কিংবা নির্যাতন করা না হয়। আর বিশ্বস্ত মনে করে বিজিত অঞ্চলের নিকটবর্তী কোনো অঞ্চল বা লোকদের সাহায্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে সেনাপতিকে নির্দেশ দিয়েছেন; তিনি যেন সম্পূর্ণ আস্থা অর্পণ করার ব্যাপারে সতর্ক থাকেন এবং বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে প্রান্তিকতা অবলম্বন না করেন।
- ✓ ৪। চৌকশ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত অগ্রগামী দল গঠন করে শত্রুদের তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি সেনাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং তাদের বাহিনীর সর্বোৎকৃষ্ট ঘোড়া ও অস্ত্র সরবরাহের তাগিদ দিয়েছেন। কারণ, শত্রুরা তাদের চিহ্নিত করে ফেলতে পারে এবং তাদের লড়াইতে বাধ্য করতে পারে। এ জন্য

তাদের যথেষ্ট শক্তিশালী ও নির্ভীক হতে হবে যেন সহজেই শত্রুসেনাদের ওপর মানসিকভাবে ভ্রাস সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। শত্রুরা যেন মনে করতে বাধ্য হয়, মুসলমানদের রয়েছে এক শক্তিশালী বাহিনী এবং তাদের আক্রমণের ধারণা অনেক।

- ✓ ৫। শত্রুর তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্য এই নয় যে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে; বরং এর উদ্দেশ্য সতর্কতা অবলম্বন, যাতে শত্রুরা বাধ্য করলে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়। সুতরাং তথ্য সংগ্রহের পর মুসলমানরা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে, তবে যাবতীয় সতর্কতা অবলম্বন করে প্রয়োজনে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত থাকবে।^{৩৫৫}

২.১.৬। তাওবাকারী ধর্মত্যাগীদের সাহায্য নেওয়া

মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এবং অন্যান্য অভিযানে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কখনো পূর্বে ধর্মত্যাগীদের—যারা একবার ইসলাম ত্যাগ করে পুনর্বার ফিরে এসেছে—সাহায্য নেননি। তবে যারা সত্যিকার অর্থেই তাওবা করেছে, ঈমান-আমল ঠিক করে নিয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ইসলামী শিক্ষাও অর্জন করেছে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের জিহাদে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি কখনোই তাদের নেতৃত্বের পদে নিযুক্ত করেননি।^{৩৫৬}

এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ আল-আসাদি এবং আমর ইবনে মাদি ইয়াকরিব আয-যুবাইদি সম্পর্কে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, ‘তাদের সাহায্য গ্রহণ করবে, কিন্তু তাদের ওপর কখনো এক শ লোকের দায়িত্ব অর্পণ করবে না।’^{৩৫৭}

সুতরাং আমরা ইসলামের দুই মহান খলীফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর^{৩৫৮} আচরণ থেকে এই শিক্ষা লাভ করি যে,

^{৩৫৫} আদ-দাওরুস সিয়াসি লিস সাফওয়াতি ফি সাদরিল ইসলাম, পৃ. ৪২৯।

^{৩৫৬} আত-তারিখুল ইসলামি, ৪/৩০৬।

^{৩৫৭} প্রাপ্ত।

^{৩৫৮} সুনান, তিরমিযি, হাদীস নং ৩৭৪২।

যদি কেউ ইসলাম ত্যাগ করার পর অনুতপ্ত হয় এবং ফিরে আসে, তাহলে তার তাওবাকে কবুল করা হবে। সে তার জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করবে। অন্যান্য মুসলমানদের মতোই সে ইসলামী রাষ্ট্রের সকল সুবিধা ভোগ করবে। তবে তাকে রাষ্ট্রীয় কোনো পদে বা দায়িত্বে নিয়োজিত করা যাবে না; বিশেষ করে নেতৃত্বে। কারণ, তার এই পরিবর্তনে মুনাফিকির একটা আশঙ্কা থেকেই যায়। আর যদি সত্যি সত্যি তা-ই হয়, তাহলে তাকে নেতৃত্ব দান করলে বড় ধরনের অঘটন সৃষ্টি করবে এবং মুসলমানদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করবে। সে তখন তার মতো মুনাফিকদের উস্কে দিয়ে সমাজ থেকে সত্যিকার ঈমানদারদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও পদ থেকে বহিস্কার করবে। সংগত কারণেই ইসলামী সমাজব্যবস্থায় তখন জাহেলী যুগের আচার-আচরণ প্রতিষ্ঠিত হবে। মহান দুই খলীফা এই নীতি অনুসরণ করেই মুসলিম সমাজকে রক্ষা করার তাগিদে দুষ্কৃতকারীদের কখনোই নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করেননি। এ নীতি বাস্তবায়নের আরেকটি পরিপ্রেক্ষিত এই হতে পারে যে, তারা ধর্ম ত্যাগ করে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করতে চেয়েছিল, তার বিরুদ্ধেই এ শাস্তি; যারা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে আঁতাত করে নেতৃত্বের আশা করছে, তাদের জন্যও এটি একটি শিক্ষা।

২.১.৭। খলীফার পক্ষ থেকে সাদ রা.-এর প্রতি চিঠি

ইরাকের সীমান্তে শিরায় এলাকায় তাঁবু গাড়ার সময় সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফার পক্ষ থেকে একটি চিঠি পান, যেখানে তাকে ইরাক অভিমুখে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে লেখা হয়েছে : ‘আপনার নেতৃত্বাধীন সম্পূর্ণ বাহিনী নিয়ে শিরায় থেকে ইরাক অভিমুখে রওনা হন। আল্লাহর ওপর ভরসা করুন এবং সকল পরিস্থিতিতে তার সাহায্য কামনা করুন। মনে রাখবেন, আপনারা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন, যাদের সংখ্যা আপনাদের চেয়ে বেশি এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্রও উন্নত। তারা এক ভীতিকর দেশের কঠিন যোদ্ধা। তাদের ভূখণ্ড সমতল হলেও তা বিজয় করা কঠিন। কারণ, তাতে রয়েছে জলাশয়, নদী-নালা ও দুর্গম পর্বতমালা। যদি পশ্চিমধ্যে তাদের কোনো ক্ষুদ্র সেনাদল দেখতে পান, তাহলে তাদের ওপর দ্রুত আক্রমণ করবেন। তাদের কোনোভাবেই প্রথম আক্রমণের পর দল ভারী করার সুযোগ দেবেন না। আর প্রতারণিত হবেন না, কারণ তারা প্রতারক ও ধোঁকাবাজ জাতি।

তাদের খুব গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে এবং তাদের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে হবে। কাদেসিয়া^{৩৫৯} পৌঁছে সেখানে তাঁর গাড়বেন। মুসলিম সৈন্যগণ যেন পাথর আর বালুময় স্থানের মাঝখানে অবস্থান নেয়। তারা যেন পারসিকদের চলাচলের রাস্তা ও সকল পথ আগলে থাকে। তারপর সেখানে অবস্থান করুন এবং স্থান ত্যাগ করবেন না। পারসিকরা যদি আপনাদের অবস্থানের টের পায়, তাহলে তারা সর্বশক্তি দিয়ে আপনাদের ওপর আক্রমণ করবে। এ কাজে তারা তাদের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী ব্যবহার করবে। শত্রুর মোকাবিলায় যদি আপনারা ধৈর্যধারণ করেন এবং শত্রুকে আক্রমণের সময় আল্লাহর পুরস্কারের আশা করে দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আপনারা বিজয়ী হবেন। তারা এমন ছত্রভঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে যে, কখনো আর একত্র ও ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না। আর যদি হয়ও, তবু তারা এমন ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে যে, তারা যুদ্ধ করার সাহস হারিয়ে ফেলবে। আর যদি ফলাফল ভিন্ন হয়, তাহলে পেছনে গিয়ে পাথুরে অঞ্চলে অবস্থান গ্রহণ করবেন। কারণ, আপনাদের পাথুরে এলাকায় অবস্থান নেওয়ার সাহস আছে। তাদের এ সাহস নেই। তারা পাথুরে এলাকায় যুদ্ধে অনভিজ্ঞ।’

রণক্ষেত্রে কোথায় অবস্থান গ্রহণ করতে হবে, এ ব্যাপারে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশ আর সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি মুসান্নার পরামর্শ একই। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং মুসান্না এই স্থান নির্ধারণে একমত হয়েছিলেন। তিন বছরের অধিক সময় ধরে পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় মুসান্না তার এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। এখান থেকেই রণকৌশল নির্ধারণে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অবিশ্বাস্য পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়, যদিও তিনি কখনোই ইরাকে পা রাখেননি। এ চিঠিতে সেনাদের শত্রুদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতেও উপদেশ দেওয়া হয়েছে যখন অগ্রগামী দলকে শত্রুদের বিব্রত করা ও তাদের বিরুদ্ধে তাদের অনুসারীদের উস্কে দিতে প্রেরণ করা হবে, যতক্ষণ না নিজেদের পছন্দমতো জায়গায় বড় লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে শত্রুদের নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।^{৩৬০}

^{৩৫৯} জাহেলিয়াতের যুগে পারস্য রাষ্ট্রে প্রধান প্রবেশপথ ছিল কাদেসিয়া।

^{৩৬০} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৩৭৯।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু চিঠিতে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বিজয়ের আধ্যাত্মিক মাধ্যম সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেন, যা সবেচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তার চিঠিতে বলেন : ‘নিজের আত্মিক অবস্থার দিকে (নিয়তের বিশুদ্ধতা) বেশি নয়র রাখবেন। সেনাদের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলবেন, তাদের উৎসাহ দেবেন এবং তাদের নিয়তের বিশুদ্ধতা ও আত্ম-সমালোচনার গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেবেন। তাদের ধৈর্যধারণ করতে বলবেন। আর নিয়ত অনুপাতে আল্লাহর সাহায্য আসে। নিষ্ঠা অনুপাতে সওয়াব আসে। আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা কামনা করুন। বেশি বেশি করে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো আশ্রয় ও শক্তি নেই) পাঠ করুন। সৈন্যদের সকল অবস্থা ও বিবরণ আমাকে লিখে জানাবেন। আপনারা কোথায় থাকছেন, শত্রুগণ কোথায় অবস্থান করছে—সবকিছু অবহিত করবেন। আপনার চিঠির মাধ্যমে আপনাদের অবস্থা আমাকে এমনভাবে জানাবেন যেন আপনারা আমার দৃষ্টির সামনেই আছেন। আপনাদের সকল বিষয় আমার নিকট খোলাখুলিভাবে পেশ করবেন। আল্লাহকে ভয় করুন, তার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করুন এবং কোনো কিছুই নিশ্চিত মনে করবেন না। স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ এই বিষয়টি আপনার প্রতি ন্যস্ত করেছেন। এই অভিযানে লক্ষ্য অর্জনে আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখুন। সতর্ক থাকুন—এই দায়িত্ব যেন আপনার নিকট থেকে প্রত্যাহার করতে না হয় এবং এ কাজের জন্য আপনাদের বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নিযুক্ত করতে না হয়।^{৩৬১}

এই চিঠিতে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আত্মার পরিচর্যার দিকে খেয়াল রাখতে বলেছেন। কারণ, আত্মাই শরীরের ইঞ্জিন। যদি আত্মা সুস্থ থাকে, তাহলে পুরো শরীরই সুস্থ। তারপর তিনি তার সেনাদের উৎসাহ দিতে বলেন এবং আল্লাহর ইবাদতে একনিষ্ঠ ও তাঁর নিকট থেকেই পুরস্কার আশা করার কথা মনে করিয়ে দিতে বলেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, আল্লাহর সাহায্য এর সঙ্গেই সম্পর্কিত। তিনি তার দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক করেন যাতে তাতে কোনো অবহেলা না হয়। তিনি

আল্লাহর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত হওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং তাদের শক্তি-সামর্থ্য আল্লাহর সাহায্যের সঙ্গেই সম্পর্কিত। তিনি মুসলিম সেনাপতিকে আল্লাহর প্রতি ভয় ও আশার সম্পর্ক স্থাপন করতে বলেন। এটি একটি জরুরি বিষয়, যা তাওহীদের মূলমন্ত্র। তিনি তাকে বলেন, কোনো ভালো কাজ করলে কিংবা লোকজন তার প্রশংসা করলে তিনি যেন কোনো ফলাফলকে নিশ্চিত মনে না করেন। তিনি মনে করিয়ে দেন, আল্লাহ ঈমানদের জন্য বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং কুফরের ধ্বংস অনিবার্য করেছেন। তিনি তাকে বিজয়ের ব্যাপারে এসব উপায়-উপকরণ প্রয়োগে অবহেলা না করার জন্য সতর্ক করেছেন। কারণ, তার হাতে বিজয় নাও হতে পারে; বরং এটি হয়তো আল্লাহ অন্য কারও হাতে দান করবেন, যাকে তিনি পছন্দ করেন।^{৩৬২}

২.১.৯। রণক্ষেত্র কাদেসিয়ার বিবরণ-সম্বলিত সাদ রা.-এর চিঠি এবং উমর রা.-এর প্রত্যুত্তর

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফার নিকট চূড়াই লড়াই করার জন্য যে স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে, সে জায়গার বিস্তারিত বিবরণ লিখে পাঠালেন। তিনি লিখলেন, ‘দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে যারা মুসলমানদের চুক্তির অধীনে এসেছিল, তারা সবাই পারসিকদের সহায়তা করছে। তারা তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। শত্রুপক্ষ পারসিকরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রুম্ম ও তার সমপর্যায়ের লোকদের নিযুক্ত করেছে। তারা আমাদের উস্কানি দিচ্ছে এবং আমাদের আগে যুদ্ধে জড়াতে চায়। আর আমরাও তাদের উত্ত্যক্ত করছি এবং যুদ্ধ শুরু করার প্রলোভন দেখাচ্ছি। অবিলম্বে আল্লাহর নির্দেশ কার্যকরী হবে। তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবে। আমাদের পক্ষে-বিপক্ষে তার ফায়সালা মেনে নিতে হবে। আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তাসহ কল্যাণময় ফায়সালার জন্য প্রার্থনা করছি।’^{৩৬৩}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে জবাবে লিখলেন, ‘আপনার চিঠি পেয়েছি। সকল বিষয় অবগত হয়েছি। আপনি স্বস্থানে অবস্থান করুন যতক্ষণ না

^{৩৬২} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৩৭৯।

^{৩৬৩} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৭/৩৮।

আল্লাহ শত্রুদের আপনাদের নিকটে না নিয়ে আসে এবং মনে রাখবেন, এ লড়াই হবে চূড়ান্ত ফায়সালার লড়াই। যদি আল্লাহ আপনাদের হাতে তাদের পরাজিত করেন, তাহলে সেখানেই ক্ষান্ত হবেন না। মাদাইন দখল করা পর্যন্ত আক্রমণ অব্যাহত রাখবেন। আর মাদাইনের পতন আপনাদের হাতেই ঘটবে ইনশাআল্লাহ।’^{৩৬৪}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রত্যুত্তর থেকে এটি স্পষ্ট যে, তিনি সঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন—সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার অবস্থানেই স্থির থাকবেন এবং স্থান ত্যাগ করবেন না। শত্রুকে মোকাবিলা করার জন্য তিনি তাড়াহুড়া করবেন না; বরং শত্রুকেই আগে যুদ্ধ শুরু করার সুযোগ দেবেন। তিনি বিজয়ী হলে মাদাইন পর্যন্ত আক্রমণ অব্যাহত রাখবেন এবং তা দখল করে নেবেন।^{৩৬৫} একই সময় তিনি বিজয় অর্জনের জন্য যাবতীয় জাগতিক প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

এ ক্ষেত্রে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আত্মিক বিষয়েও ছাড় দেননি। তিনি শত্রুর নিজ ভূখণ্ডে—তাদের প্রাচুর্যময় সাম্রাজ্যে—স্নায়ুযুদ্ধ শুরু করে দিয়েছেন। তিনি সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে লিখে পাঠিয়েছেন, ‘আমার অন্তরে এই ভাব জন্মেছে যে, যখন আপনারা শত্রুর মোকাবিলা করবেন, তখন নিশ্চিতভাবেই তাদের পরাজিত করবেন। তারপর যদি আপনার অধীন কেউ ইঙ্গিতে বা কথায় (পারসিকদের) কাউকে নিরপত্তা দেয়, তাহলে তাকে নিরপত্তা দিতে হবে। কারণ, এটি যদিও ভুলক্রমে হয়ে থাকে, তবু ওয়াদা রক্ষা করতে হবে। ওয়াদা রক্ষা করার দ্বারাই বিজয় আসে এবং ওয়াদা ভঙ্গ করলে—যদিও তা ভুলক্রমে হয়—পরাজয় ডেকে আনে; এতে আপনারা দুর্বল হয়ে পড়বেন এবং শত্রুরা শক্তিশালী হয়ে উঠবে।’^{৩৬৬}

দৃশ্যত মনে হয় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম বাহিনীর সঙ্গেই অবস্থান করছেন। তাদের খবর না পাওয়া পর্যন্ত তিনি আহার বা বিশ্রাম করতে পারতেন না। এ পরিস্থিতিতে এ খবর যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম

^{৩৬৪} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৭/৩৮ (ইফা, ৭/৭৪ দ্রষ্টব্য)।

^{৩৬৫} আল-ফান আল-আসকারি আল-ইসলামি, পৃ. ২৫৩।

^{৩৬৬} ইতমামুল ওয়াফা ফি সিরাতিল খুলাফা, পৃ. ৭৩।

হিসাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিশাল বোঝাকে লাঘব করত এবং মুসলমানদের দৃঢ় ও তাদের অন্তরকে শক্তিশালী করে তুলতে সহায়তা করত। আমরা দেখি, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেনাদের আত্মিক পরিচর্যার দিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন তাদের আল্লাহর বড়ত্বের কথা বেশি বেশি পড়তে বলেছেন, কথায় সত্যবাদিতা অবলম্বন করতে বলেছেন এবং ওয়াদা রক্ষা করা আহ্বান জানিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে যদিও কোনো একজন মুসলিম কাউকে নিরাপত্তা দেওয়া ওয়াদা করে এবং এতে ভুল বোঝাবুঝি হয়—মুসলমানরা আসলে তাকে নিরাপত্তা দিতে চায়নি, কিন্তু শত্রু তা-ই বুঝেছে—তবু সে ওয়াদা রক্ষা করতে হবে।^{৩৬৭}

২.২। পারস্যের সম্রাটের নিকট প্রতিনিধিদল পাঠাতে সাদ রা.-কে খলীফার নির্দেশ

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট প্রেরিত চিঠিতে বলেন, ‘শত্রুদের পক্ষ থেকে কোনো কিছুই যেন আপনাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করতে না পারে। তাদের শক্তিমত্তাও যেন আপনাকে ভীত-শঙ্কিত না করে। আপনি আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন এবং তার ওপর তাওয়াক্কুল রাখুন। কয়েকজন দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে সম্রাট ইয়াযদগিরদ-এর নিকট পাঠান এ জন্য যে, তারা সম্রাটকে ইসলামের দাওয়াত দেবে।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রতিদিন চিঠি প্রেরণ করতে নির্দেশ দেন।^{৩৬৮} সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু একদল বিচক্ষণ ও সাহসী লোক নির্বাচন করলেন। তারা হলেন :

- ✓ নুমান ইবনে মুকাররিন আল-মুযানী
- ✓ বিশর ইবনে আবি রহম আল-যুহানী
- ✓ হামলা ইবনে যুওয়াই ইল-কিনানী
- ✓ হানযালা ইবনে রাবী আত-তামিমী
- ✓ ফুরাত ইবনে হাব্বান আল-আযালী
- ✓ আদিয় ইবনে সুহাইল
- ✓ মুগীরা ইবনে জুরারা ইবনে নাবাস ইবনে হাবীব^{৩৬৯}

^{৩৬৭} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৩৮১।

^{৩৬৮} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৭/৩৮ (ইফা, ৭/৭৫ দ্রষ্টব্য)।

^{৩৬৯} দেখুন : আদ-দাওয়াতুল ইসলামিয়া ফি আহদি উমর ইবনুল খাত্তাব রা., হাসানি মুহাম্মাদ ইবরাহিম।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ কাজে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত, সুদর্শন এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিকে নির্বাচন করেন :

- ✓ আতারিদ ইবনে হাযিব আত-তামিমী
- ✓ আশআস ইবনে কাইস আল-কিনদী
- ✓ হারিস ইবনে হাসান আয-যুহালী
- ✓ আসিম ইবনে আমর আত-তামিমী
- ✓ আমর ইবনে মাদি কারিব আজ-জুবাইদী
- ✓ মুগীরা ইবনে শুবাহ আস-সাকারী
- ✓ মুআন্না ইবনে হারিসা আশ-শাইবানী^{৩৭০}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশে এই চৌদ্দ জন দাঈকে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু পারস্যের সম্রাটকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য প্রেরণ করেন। তারা সবাই স্ব-স্ব গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এমনই চেয়েছিলেন। বিচক্ষণতা ও চমৎকার বাচনভঙ্গিতে সর্বোত্তম পন্থায় ইয়াযদগিরদকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে হবে। তারা অন্তরে এই আশা পোষণ করবে যে, আল্লাহ হয়তো তাকে হেদায়েত নসীব করবেন এবং উভয়পক্ষের রক্তপাত এড়ানো সম্ভব হবে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এই প্রতিনিধিদল নির্বাচন করা হয়। তারা সকলেই ছিলেন প্রচণ্ড ধীশক্তির অধিকারী এবং তাদের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা সুচারুভাবেই পালনে সক্ষম। তা ছাড়া তারা ছিলেন সুদর্শন, উঁচু মর্যাদার ও বিচক্ষণ এবং পারসিকদের সম্পর্কে তাদের পূর্ব-অভিজ্ঞতাও ছিল। তাদের কেউ কেউ পারসিকদের সঙ্গে লড়াই করেছেন, তাদের পরাজিত করেছেন এবং অতীতে বিভিন্ন অভিযানে যুদ্ধ করেছেন। আবার কেউ কেউ জাহেলী যুগে পারস্যের সম্রাটের নিকট প্রতিনিধি হিসাবে গিয়েছিলেন এবং কেউ কেউ পারস্যের ভাষাও জানতেন। দৃশ্যত মনে হয়, সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এই প্রতিনিধিদলকে বিভিন্ন মানসিক ও শারীরিক পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে নির্বাচন করেছেন। আর তারা যোগ্য হিসাবে এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এতে তাদের শারীরিক সক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ও বিক্ষণতার পাশাপাশি বাহ্যিক সৌন্দর্যেরও পরীক্ষা দিতে হয়েছে।^{৩৭১}

^{৩৭০} দেখুন : আল-কামিল আত-তারিখ, ২/১০১।

^{৩৭১} দেখুন : আল-কাদিসিয়াহ, আহমাদ আদিল কামিল, পৃ. ৭০।

বরকতময় এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন নুমান ইবনে মুকাররিন। তারা মাদাইনে প্রবেশ করে পারস্যের সম্রাট ইয়াযদগিরদ-এর সঙ্গে দেখা করলেন। সম্রাট তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমরা এখানে কেন এসেছ? কী উদ্দেশ্যে তোমরা আমাদের আক্রমণ করেছ এবং আমাদের ভূখণ্ডের এত ভেতরে অনুপ্রবেশ করেছ? এটা কি এ জন্য যে, তোমাদের ব্যাপারে বিভ্রান্তির কারণে আমাদের ওপর আক্রমণ করতে তোমরা উৎসাহিত হয়েছ?’ নুমান ইবনে মুকাররিন বললেন,

আল্লাহ আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। আমাদের নিকট তার রাসূল প্রেরণ করেছেন যিনি আমাদের ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করেন। আমাদের এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যদি আমরা তাকে অনুসরণ করি, তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারব। খুব কম গোত্রই এতে সাড়া দিয়েছে। তারপর তিনি আরবদের মধ্যে যারা তার বিরোধিতা করেছে, তাদের সঙ্গে লড়াইয়ের নির্দেশ দেন। তখন আমরা তাদের সঙ্গে লড়াই শুরু করি। তখন তারা অনেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে মেনে নেয় এবং পরবর্তী সময়ে এ জন্য আনন্দিত হয়; আর অনেকে স্বেচ্ছায় তার নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং কল্যাণ লাভ করে। আমরা যে শত্রুতা ও অজ্ঞতার মধ্যে জীবনযাপন করতাম, তার ওপর—তিনি যা নিয়ে এসেছেন—সেটাকে প্রাধান্য দিয়েছি। তারপর তিনি আমাদের নিকটবর্তী দেশ ও জাতির মধ্যে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে বললেন। আমরা তাদের সত্য ও ন্যায়ের দিকে আহ্বান করি। আমরা আপনাকে আমাদের ধর্ম ইসলামের দিকে দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা ভালোকে ভালো হিসাবে চিহ্নিত করে এবং মন্দকে নিশ্চিত মন্দ হিসেবে। যদি আপনি আমাদের এই আহ্বান না মেনে নেন, তাহলে দুটির একটি বেছে নিতে হবে; জিযিয়া এবং সেটি দিতে অস্বীকার করলে, যুদ্ধ। যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহলে আমরা আপনাকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী রাজ্য শাসন করার স্বাধীনতা দিয়ে আমরা ফিরে যাব। আর যদি জিযিয়া দিতে রাজি হন, তাহলে আমরা সেটিও গ্রহণ করব এবং তাতে আপনার রাজ্য আপনার অধীনেই থাকবে। জিযিয়া করের বিনিময়ে আপনাদের নিরাপত্তা দেওয়া হবে। আর যদি তা না দিতে চান, তাহলে আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

ইয়াযদগিরদ বললেন, ‘আমি পৃথিবীর বুকে তোমাদের চেয়ে সংখ্যালঘু, দরিদ্র এবং শতধাবিভক্ত জাতি আর দেখিনি। আমরা সীমান্ত এলাকার কিছু

গোত্রকে তোমাদের দেখভাল করার জন্য নিয়োজিত করতাম। তোমরা কখনোই পারস্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস পাওনি। যদি তোমরা সত্যিই মনে করো যে, আমাদের পরাজিত করতে সক্ষম হবে, তাহলে এটি হবে চরম বোকামি। তোমাদের দুরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা খাদ্য-দ্রব্য দিয়ে সাহায্য করব যতদিন না তোমাদের অবস্থার উন্নতি হয়। আমরা তোমাদের সর্দারকে সম্মান করব এবং কাপড়-চোপড় দেব। আর তোমাদের জন্য একজন রাজা নির্বাচন করে দেব যে হবে তোমাদের প্রতি দয়ালু।’

এবার মুগীরা ইবনে জুরারা উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ‘আপনি আমাদের দুরবস্থার ব্যাপারে যা বলেছেন, তা সত্য; বরং এটি তার চেয়েও খারাপ ছিল।’ তিনি আরবদের জাহেলী জীবনের চিত্র তুলে ধরেন এবং আল্লাহ তা‘আলা রাসূল প্রেরণ করে কীভাবে তাদের ওপর দয়া করেছেন, তারও বিবরণ দেন—যেমনটি নুমান বলেছেন। তারপর তিনি বলেন, ‘স্বেচ্ছায় জিযিয়া (কর) দিতে রাজি হোন এবং নিজেকে পদানত মনে করুন (কুরআন ৯ : ২৯ দ্রষ্টব্য) অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন, অথবা ইসলাম কবুল করে নিজেকে রক্ষা করুন।’

ইয়াযদগিরদ বললেন, ‘দূতদের হত্যা করার বিধান থাকলে আমি তোমাদের হত্যা করার আদেশ দিতাম। এখন আমার নিকট তোমাদের কিছু চাওয়া-পাওয়ার নেই।’ তারপর তিনি তার লোকদের এক ঝুড়ি মাটি নিয়ে আসতে হুকুম করল এবং বলল, ‘এই মাটির ঝুড়িটি তাদের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তির মাথায় তুলে দাও। তারপর তাকে তাড়িয়ে মাদাইন থেকে বের করে দাও।’ আসিম ইবনে আমর বলে উঠলেন, ‘আমি সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি।’ আসিম মাটির ঝুড়ি কাঁধে নিয়ে নিজ সওয়ারীতে চড়লেন এবং দ্রুত গতিতে রওনা হয়ে গেলেন। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পৌঁছলে তিনি তাকে বললেন, ‘আল্লাহর কসম, মহান আল্লাহ তাদের রাজ্যের চাবি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।’^{৩৭২}

তারপর সাবাত এলাকা থেকে রুস্তম তার বিশাল বাহিনী নিয়ে বের হলেন। এক লক্ষ কিংবা তার চেয়ে বেশি সৈন্য ছিল তার দলে। যখন সে মাদাইন

ও বাবিল-এর মধ্যে কূথা এলাকা অতিক্রম করছিল, তখন এক আরবের সাক্ষাৎ পেল। রুস্তম তাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি এখানে কী করছ? তুমি আমাদের নিকট কী চাও’ তিনি বললেন, ‘আমরা এসেছি আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য। তিনি তোমাদের শহর-নগর ছিনিয়ে নেবেন, তোমাদের নারী ও শিশুদের বন্দী করে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ তুলে নিয়ে আমাদের হাতে সমর্পণ করবেন।’ রুস্তম বললেন, ‘তাহলে আমরা তোমাদের অধীন।’ আরব লোকটি বলল, ‘তোমাদের মন্দ কর্মই তোমাদের নিচে নামিয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তোমাদের আমাদের অধীন করে দিয়েছেন। দুনিয়ার চাকচিক্য দেখে ধোঁকায় পোড়ো না। তোমরা আসলে আমাদের সঙ্গে লড়াই করছ না; বরং আল্লাহর শাস্ত বিধানের বিরোধিতা করছ।’ রুস্তম রাগান্বিত হয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করল।

তারপর রুস্তমের বাহিনী কূথা ও হিল্লার মধ্যবর্তী বারাস এলাকা অতিক্রম করার সময় ওই এলাকার লোকদের যিম্মি করে তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে, মদ্যপান করে এবং নারীদের ধর্ষণ করে। বারাসের লোকজন তার নিকট অভিযোগ করলে তিনি বলেন, ‘আল্লাহর কসম, আরব সত্য কথাই বলেছে। আমাদের অপকর্মই আমাদের সর্বনাশ করেছে। আরবরা যুদ্ধাবস্থায় থাকলেও এসব লোকদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করেছে।’^{৩৭৩}

রুস্তমের সেনাবাহিনীর সংবাদ লাভ করে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আমর ইবনে মাদি ইয়াকরিব আজ-জুবাইদি এবং তুলাইহা ইবনে খুওয়ালিদের সঙ্গে আরও দশ জনের একটি দলকে শক্রপক্ষের খবর সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। তারা অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়। তারা দেখেন যে, শক্ররা নদীর তীরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তাঁবু গেড়েছে। দলের সবাই ফিরে এলেও তুলাইহা তার মিশন অব্যাহত রাখে। শত্রুর সারিতে প্রবেশ করে তিনি আরও তথ্য সংগ্রহ করেন। তারপর তিনি সেনাপতির নিকট ফিরে গিয়ে তার প্রাপ্ত তথ্য সরবরাহ করেন। এই তুলাইহা একরার নিজেকে নবীরূপে দাবি করেছিলেন, পরে তাওবা করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এসব ব্যক্তিদের জিহাদে শরীক হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন যদিও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর অনুমতি দেননি। তবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের কখনো নেতৃত্বের আসনে

নিযুক্ত করেননি। তিনি তাদের ইসলামী শিক্ষা ও আচরণের ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিলেন। আর তাদের অনেক সুযোগ দিয়েছেন যেখানে তারা তাদের একনিষ্ঠতা ও ঈমানের পরিচয় রাখতে পারেন। তুলাইহা ও আমর আজ-জুবাইরী ইরাক ও পারস্য যুদ্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

২.৩। রুস্তমকে ইসলামের দাওয়াত দিতে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্বাস রা.-এর প্রতিনিধিদল প্রেরণ

রুস্তম তার বাহিনী নিয়ে আল-হেরা থেকে রওনা হয়ে কাদেসিয়ায় আ-আতীক নামে একটি সেতুর নিকট পৌঁছেন। তারা মুসলমানদের দিকে মুখ করে তাঁর গাড়েন। দুই বাহিনীর মধ্যে দূরত্ব ছিল শুধু একটি নদী। পারসিকদের বাহিনীতে ৩৩টি হাতি ছিল। তারা তাঁর ফেলে মুসলিম সেনাপতি সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট সংবাদ পাঠাল : ‘এমন কাউকে পাঠান যার সঙ্গে আমরা কথা বলতে পারি।’ সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রিবঈ ইবনে আমিরকে পাঠালেন। তিনি রুস্তমের নিকট গেলেন। তার লোকেরা মজলিস সাজিয়েছিল সোনালি গদি ও রেশমি চাদর দিয়ে, থরে থরে ঝুলিয়ে রেখেছিল মহামূল্যবান মণিমুক্তো ও নয়নকাড়া সাজ-সজ্জায়। তার মাথায় ছিল মুকুট। সে বসেছিল স্বর্ণ-নির্মিত সিংহাসনে। মুসলিম প্রতিনিধি রিবঈ ইবনে আমির সেখানে প্রবেশ করেছিলেন পুরোনো পোশাক, তরবারি, ঢাল ও ছোট একটি ঘোড়া নিয়ে। তিনি ঘোড়ার পিঠেই ছিলেন। ঘোড়া গিয়ে রুস্তমের সুসজ্জিত বিছানা মাড়ায়। তারপর রিবঈ ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন। একটি গদির সাথে সেটিকে বাঁধেন। হাতে অস্ত্র, পরিধানে বর্ম এবং মাথায় শিরস্ত্রাণ নিয়ে তিনি রুস্তমের দিকে এগিয়ে যান। রুস্তমের লোকজন তাকে বলল, ‘অস্ত্র রেখে দিন।’ তিনি বললেন, ‘আমি স্বেচ্ছায় আসিনি। আমাকে ডেকেছ বলেই এসেছি। আমাকে এভাবে থাকতে দিলে থাকব নতুবা ফিরে যাব।’

তিনি এলেন। বর্ষায় ভর দিয়ে গদির ওপর দিয়ে তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন। বর্ষার আঘাতে অনেক গদি ছিঁড়ে যায়। রুস্তমের নিকটে গিয়ে তিনি মাটিতে বসে পড়েন এবং বর্ষাকে কার্পেটে বিদ্ধ করেন এবং বলেন, ‘আমরা চেয়ারে বসি না।’ রুস্তম তাকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘তোমরা এখানে কেন এসেছ?’ তিনি বললেন, ‘মহান আল্লাহ আমাদের প্রেরণ করেছেন।

তিনি যাদের চান, আমরা তাদের মানুষের গোলামি থেকে বের করে আল্লাহর গোলামিতে নিয়ে যাই। দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে তার বিশালত্বে নিয়ে যাই। অন্যান্য ধর্মের হুকুম ও অত্যাচার থেকে বের করে ইসলামের ন্যায় বিচারের দিকে নিয়ে যাই। আল্লাহ পুরো সৃষ্টিজগতের জন্য তার রাসূলকে সত্য দীন দিয়ে আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন। যারা আমাদের দাওয়াত গ্রহণ করবে, আমরা তাদের ওই অবস্থা মেনে নিয়ে ফিরে যাব। আর যারা ওই দাওয়াত ও আহ্বান গ্রহণ করবে না, আমরা অবিরাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাব যাতে আমরা বিজয়ী কিংবা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।’^{৩৭৪}

রুস্তম বললেন, ‘আপনার বক্তব্য আমি শুনেছি। আমাদের কি একটু সময় দেবেন যাতে আমরা আরেকটু চিন্তা করতে পারি?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ। তবে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার পর তিন দিনের বেশি অবকাশ দেওয়ার নিয়ম রেখে যাননি। সুতরাং আমরা আপনাদের তিন দিন সময় দিলাম। চিন্তা-ভাবনা করুন এবং তিনটির যেকোনো একটি গ্রহণ করে নিন; হয় ইসলাম কবুল করুন এবং আমরা আপনাদের অবস্থানে রেখে ফিরে যাব; নতুবা জিযিয়া প্রদান করুন এবং আমরা ফিরে যাব; অথবা চতুর্থ দিন যুদ্ধে লিপ্ত হোন, যদি না এর আগেই আপনারা শুরু করে দেন।’ রুস্তম জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনি কি তাদের নেতা?’ তিনি বললেন, ‘না। তবে মুসলমান সম্প্রদায় একই দেহের ন্যায়; একে অন্যের অংশ। তাদের মধ্যে নিম্নস্তরের ব্যক্তিও যদি কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে উচ্চস্তরের লোকজনও সেটি বাস্তবায়ন করেন।’ তারপর তিনি ফিরে আসেন।

রুস্তম তার সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তিনি বলেন, ‘এই ব্যক্তির কথার মতো কোনো কিছু আপনারা কখনো শুনেছেন?’ তারা রিবঈর বাহ্যিক পোশাক-আশাক দেখে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করল। কিন্তু রুস্তম বললেন, ‘তোমাদের জন্য আফসোস, আমি তার বিচক্ষণতা, বক্তব্য ও চরিত্র নিয়ে ভাবছি। আরবগণ জামা-কাপড় তুচ্ছজ্ঞান করে। তারা নিজেদের ইযযত ও বংশ-মর্যাদা রক্ষা করে।’

দ্বিতীয় দিন, রুস্তম সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট সংবাদ পাঠাল, ‘লোকটিকে আমাদের নিকট আবার প্রেরণ করুন।’ কিন্তু সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হুয়াইফা ইবনে মিহসানকে পাঠালেন। তিনি তা-ই বললেন, যা রিবঈ বলেছিলেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ, তারা তো একই ছাঁচে তৈরি—ইসলামের অকুতোভয় বীর। রুস্তম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘প্রথম দিন যে এসেছিল, তিনি কেন আসেননি?’ তিনি বলেন, ‘আমাদের সেনাপতি সমর ও শান্তিতে সমানভাবে সকলের সঙ্গে একই আচরণ করেন। আজ আমার পালা।’ রুস্তম বললেন, ‘আমাদের হাতে আর কয়দিন আছে?’ তিনি বললেন, ‘তিন দিন, যা গতকাল থেকে শুরু হয়েছে।’

তৃতীয় দিন রুস্তম আবার সংবাদ পাঠালেন, ‘আমাদের নিকট একজন লোক প্রেরণ করুন।’ এবার সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মুগীরা ইবনে শুবাহকে প্রেরণ করলেন। মুগীরা রুস্তমের দরবারে পৌঁছে এবং নিঃসংকোচে সোজা মঞ্চের ওপর উঠে রুস্তমের পাশে বসে পড়েন। কিন্তু রুস্তমের পারিষদবর্গ দ্রুত তার দিকে ধাবিত হয় এবং তাকে হাত ধরে টেনে এনে মঞ্চের নীচে বসিয়ে দেয়। তিনি তাদের বলেন, ‘আমি আপনাদের বড়ত্বের কথা অনেক শুনেছি। কিন্তু আমি কখনো আপনাদের মতো বোকা লোক কখনো দেখিনি। আমরা আরববাসী, আমাদের সেখানে এ ব্যক্তি খোদা হবে, আর অন্যরা তার পূজা করবে—এমন বিধান নেই। আমি ভেবেছিলাম, আপনারাও আমাদের মতো সবাইকে সমানভাবে দেখেন। আমাকে আগে বলা উচিত ছিল যে, তোমরা কাউকে নিজেদের খোদা বানিয়ে নিয়েছ। তোমাদের অবস্থা যদি এমন হয়ে থাকে, খুব শীঘ্রই তোমরা বিলীন হয়ে যাবে।’

তখন সাধারণ লোকেরা বলল, ‘আল্লাহর কসম, এই আরব লোকটি সত্য কথাই বলেছে।’ পারসিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বলল, ‘এমন কথা শোনার জন্যই আমাদের দাস-দাসীরা উদ্গ্রীব। আল্লাহ আমাদের পূর্বসূরিদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করুন। তারা জাতির জন্য এসব কিছুই করেনি।’ তারপর রুস্তম আরবদের অবমাননা করে এবং পারসিকদের বড়ত্বের কথা বড়াই করে বলতে থাকেন। তিনি আরবদের দুর্দশা ও কষ্টকর জীবনের কথা তুলে ধরেন।^{৩৭৫}

মুগীরা বলেন, ‘আমাদের দুর্দশা ও কষ্টকর জীবন ও জাতিগত বিভক্তি সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, তা আমরা স্বীকার করি, অস্বীকার করি না। তবে দুনিয়ার এই চাকচিক্য চিরদিন থাকবে না এবং কষ্টের পরেই সুখ আসে। আল্লাহ আপনাদের যা দিয়েছেন, তার জন্য যদি শুকরিয়া আদায় করতেন, তাহলে ভালো হতো। কিন্তু প্রাপ্তির তুলনায় আল্লাহর প্রতি আপনাদের কৃতজ্ঞতা খুব কম। এ রকম অকৃতজ্ঞতার জন্য আপনাদের অবস্থার অবনতি হবে। আল্লাহ আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন।’ তারপর তিনি অন্যদের মতো আরও কথা বলেন। পরিশেষে তাকে তিনটির যেকোনো একটি বেছে নিতে বলেন; ইসলাম গ্রহণ, জিযিয়া অথবা যুদ্ধ।^{৩৭৬}

রুস্তম পারসিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ‘তোমাদের তুলনায় তারা কেমন? প্রথম দুজন এল এবং নির্ভীকচিত্তে তোমাদের সামনে কথা বলে গেল। তারপর তৃতীয় জন একই ভঙ্গিতে কথা বলল। তারা সবাই একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছে এবং একই ভাবে কাজ করেছে। আল্লাহর কসম, এরাই প্রকৃত বীর, যদিও তারা একনিষ্ঠ কিংবা মিথ্যাবাদী হয়। আল্লাহর কসম, তাদের শৃঙ্খলা এবং ঈমান এ পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে সকলে একই পদ্ধতি অবলম্বন করে, কখনো তার ব্যত্যয় না হয়, তাহলে পৃথিবীতে তাদের মতোই কেউই উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না। আর যদি তারা সত্যনিষ্ঠ হয়, তাহলে তাদের সামনে কেউই দাঁড়াতে পারবে না।’ তারপর সভাষদদের মধ্যে যুক্তি-তর্ক ও শোরগোল শুরু হয়ে গেল।

২.৪। যুদ্ধের প্রস্তুতি

পারসিকরা ইসলামের আহ্বানে সন্তুষ্ট হলো না এবং এমন ঔদ্ধত্য পোষণ করল যাতে আল্লাহ যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা বাস্তবায়িত হয় (সূরা আনফাল, ৮:৪২)। পারসিকরা যুদ্ধের জন্য সমবেত হলো এবং মুসলমানগণও যুদ্ধের যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। পারসিকরা আতীক নদী অতিক্রম করে কাদেসিয়া প্রান্তরে এল। রুস্তম তার বিশাল বাহিনীকে নিম্নরূপ সজ্জিত করল :

- ✓ কেন্দ্রীয় বাহিনী : যুল আল-হাযিব, তার সঙ্গে রয়েছে সৈন্য ও অস্ত্র বহনকারী আঠারোটি হাতি।
- ✓ কেন্দ্রীয় বাহিনীর ডানে: জালিনূস
- ✓ ডান পার্শ্ব বাহিনী : হরমুযান, তার সঙ্গে রয়েছে সৈন্য ও অস্ত্র বহনকারী সাত কিংবা আটটি হাতি।
- ✓ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বামে : বিরায়ান
- ✓ বাম পার্শ্ব বাহিনী : মাহরান, তার সঙ্গে রয়েছে সৈন্য ও অস্ত্র বহনকারী সাত অথবা আটটি হাতি।

রুস্তম নদীর ওপর সেতুর নিকটে একটি অশ্বারোহী দল প্রেরণ করে, যাতে মুসলমানগণ নদী পার হয়ে তাদের বাহিনীর দিকে না আসতে পারে। সুতরাং মুসলিম বাহিনী ও মুশরিক বাহিনীর মাঝামাঝি ছিল সেতুটি। রুস্তম তার সৈন্যদের নিম্নলিখিতভাবে সাজালেন :

প্রথম সারিতে অশ্বারোহী বাহিনী, তাদের পেছনে রয়েছে হাতি এবং তার পেছনে পদাতিক বাহিনী। রুস্তমের জন্য বিশাল তাঁবু টাঙানো হয়, যার নিচে বসে রুস্তম যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ্য করছেন।^{৩৭৭} মুসলমানগণও ছিল যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনীকে আগেই রণসাজে সজ্জিত করেছেন। কমান্ডার ও দলনেতা নিযুক্ত করেছেন। পতাকা বহন করার জন্য এমন লোকদেরই নিযুক্ত করেন যাদের গুণাবলি ছিল প্রসিদ্ধ এবং অগ্রবাহিনী, পশ্চাদবাহিনী, দুই পার্শ্ব বাহিনী এবং অগ্রগামী দল নিযুক্ত করেন। তিনি কাদেসিয়ার রণসাজেই প্রবেশ করেন। তিনি তার বাহিনীকে নিম্নরূপে সজ্জিত করেন :

- ✓ অগ্রগামী দল : যুহরা ইবনে হাবিয়া
- ✓ ডান পার্শ্ব বাহিনী : আব্দুল্লাহ ইবনে আল-মুতাম
- ✓ বাম পার্শ্ব বাহিনী : শুরাহবিল ইবনে আস-সামত আল-কিন্দি এবং তার ডেপুটি হিসাবে ছিলেন খালিদ ইবনে উরফাতাহ
- ✓ পশ্চাদবাহিনী : আসিম ইবনে আমর
- ✓ অগ্রগামী দলের দলনেতা : সাওয়াদ ইবনে মালিক
- ✓ অশ্বারোহী বাহিনীর দলনেতা : সালমান ইবনে রাবিআ আল-বাহিলি
- ✓ পদাতিক বাহিনীর দলনেতা : হাম্মাল ইবনে মালিক আল-আসাদি
- ✓ বাহনের দলনেতা : আব্দুল্লাহ ইবনে যি আস-সাহামাইন আল-হানাফি

- ✓ বিচারক : আব্দুর রহমান ইবনে রাবিআ আল-বাহিলি
- ✓ বাহিনীর সচিব (লেখক) : যিয়াদ ইবনে আবি সুফিয়ান
- ✓ বাহিনীর পক্ষ থেকে নিযুক্ত বক্তা : সালমান আল-ফারসি।

উল্লেখ্য, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশেই পুরো সেনাবাহিনীকে এভাবে বিন্যস্ত করা হয়।^{৩৭৮}

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু সেনাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন এবং কুরআন মাজীদে এই আয়াত তিলাওয়াত করেন :

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ
الصَّالِحُونَ ﴿٥٩﴾

আমি উপদেশের পর যবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে।^{৩৭৯}

তিনি ক্বারীদের সূরা আনফাল তিলাওয়াত করতে বলেন এবং তারা তা-ই করে। সৈন্যগণ এতে দারুণ প্রভাবিত হন এবং তাদের অন্তরে প্রশান্তিতে ভরে যায়। সেনাপতি সবাইকে নিয়ে যোহরের নামায আদায় করেন। তারপর সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু চতুর্থ তাকবীরের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর ওপর আক্রমণ করতে আদেশ দিলেন এবং মুখে ‘লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ পড়তে বললেন।

যুদ্ধ চার দিন স্থায়ী হয়েছিল। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ ছিলেন। ইরকুন-নিসা রোগে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। তাঁর শরীরে ফোড়া উঠেছিল। তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করতে পারছিলেন না। তিনি কাদেসিয়ার প্রান্তরে কুদাইসের একটি সুউচ্চ দুর্গের মধ্যে বালিশের ওপর বসে বুকে ভর দিয়ে রণক্ষেত্রে সৈন্যদের ওপর নয়র রাখছিলেন। তিনি খালিদ ইবনে উরফাতাহকে তার নির্দেশসমূহ মাঠপর্যায়ে পৌঁছানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তাদের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দিতে বললেন : ‘ঈর্ষা করার অনুমতি নেই। তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করার ক্ষেত্রে তা বৈধ। হে লোকসকল, সুতরাং জিহাদে একে অন্যকে ঈর্ষা করো (মানে অন্যদের থেকে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করো)।’^{৩৮০}

^{৩৭৮} প্রাপ্ত।

^{৩৭৯} সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ১০৫।

^{৩৮০} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৫৬।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিনিধি খালিদ ইবনে উরফাতাকে নিয়ে গণ্ডগোল দেখা দিল। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমাকে নিয়ে চলো এবং এমন জায়গায় রাখো যেখান থেকে আমি তাদের দেখতে পাই।’ সুতরাং তারা তাকে উঁচু করে তুলে ধরল। তিনি দুর্গের দেয়ালের নিচে দাঁড়ানো সৈন্যদের দিকে তাকালেন। তিনি খালিদকে নির্দেশ দিতেন, খালিদ লোকদের তা জানিয়ে দিত। খালিদ ওইসব ব্যক্তিদের একজন, যাদের জন্য কিছু প্রসিদ্ধ লোক গণ্ডগোল সৃষ্টির পায়তারা করেছিল। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহর কসম, শত্রুরা যদি তোমাদের নাকের ডগায় না থাকত, তাহলে আমি তোমাদের শাস্তি দিয়ে দৃষ্টান্ত তৈরি করতাম।’ তিনি তাদের বন্দী করেন। এর মধ্যে আবু মিহযান আস-সাকাফিও ছিলেন। তাদের দুর্গে শেকল পরিয়ে আটকে রাখেন। জারির ইবনে আব্দুল্লাহ দলনেতার প্রতি আনুগত্যের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে এই মর্মে বাইআত গ্রহণ করেছি যে, আল্লাহ যাকেই নেতৃত্বের আসনে বসাবেন, আমি তার কথা শুনব এবং তাকে মেনে চলব—যদি সে হাবশার কৃতদাসও হয়।’ সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহর কসম, আর যদি কেউ একই সমস্যা সৃষ্টির চেষ্টা করে, মুসলমানদের শত্রুর মোকাবিলা করা থেকে বিভ্রান্ত করে, যখন তারা তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব যা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।’^{৩৮১}

এ ঘটনার পর সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু উঠে দাঁড়ান এবং লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। আল্লাহর হামদ ও দরুদের পর তিনি বলেন, ‘আল্লাহই একমাত্র সত্য এবং তার কোনো অংশীদার নেই। তার প্রতিশ্রুতি কখনো ভঙ্গ হয় না। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ

الصَّالِحُونَ ①

আমি উপদেশের পর যবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে।^{৩৮২}

এটি তোমাদের উত্তরাধিকার, যা আল্লাহ তোমাদের অঙ্গীকার করেছেন। আল্লাহ তিন বছর আগেই তোমাদের এই ভূমির দখল দান করেছিলেন এবং আজ পর্যন্ত তোমরা এর ফল ভোগ করছ। আর এর পেছনে তোমাদের পূর্বসূরির লড়াই করে গেছে। এখন শত্রুর দল এসে জমা হয়েছে। কিন্তু তোমরা আরবদের সর্দার এবং স্ব-স্ব গোত্রের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি—পরবর্তীদের জন্য যারা গর্ব ও অহংকার। যদি তোমরা দুনিয়ার প্রতি অবজ্ঞা ও আখিরাতে প্রতি আশা পোষণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করবেন। এই জিহাদ কারও মৃত্যুকে কাছে ডেকে আনে না। যদি তোমরা ব্যর্থ হও এবং দুর্বল হয়ে পড়ো, তাহলে এ দুনিয়ায় যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তেমনি আখিরাতেও হবে লাঞ্ছিত।^{৩৮৩}

পতাকা বহনকারীদের উদ্দেশে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু লেখেন, ‘আমি খালিদ ইবনে উরফাতাহকে তোমাদের দলনেতা হিসাবে মনোনয়ন দিয়েছি। আমি অসুস্থ। আমার ঊরু ও নিতম্বে ফোড়া ও জখমের তীব্র ব্যথা। এটি না হলে এ কাজ নিজেই পালন করতাম। আমি বুকে ভর দিয়ে শুয়ে শুয়ে তোমাদের দেখছি। সুতরাং তার কথা শোনো ও তাকে মেনে চলো। কারণ, সে আমারই নির্দেশ ও আদেশ তোমাদের নিকট নিয়ে আসবে।’

এ চিঠি সৈন্যদের পড়ে শোনানো হয়। তারা এতে আশ্বস্ত হয় এবং তার সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়। একে অন্যকে তা অনুসরণ ও মেনে চলার জন্য উৎসাহ দিতে থাকে। তারা সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওয়র ও অক্ষমতা মেনে নেয়। তার গৃহীত পদক্ষেপের সঙ্গে একমত পোষণ করে।^{৩৮৪} সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু দুর্গের চূড়াতেই অবস্থান করেন এবং সেখান থেকেই সৈনিকদের সুবিধা-অসুবিধা পর্যালোচনা করছিলেন। দুর্গটি সুরক্ষিত ছিল না। এটি সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাহসের প্রমাণ।

বর্ণিত আছে, উসমান ইবনে রাযা আস-সাদি বলেন, ‘সাদ ইবনে মালিক ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ও ভয়ংকর। তিনি অরক্ষিত

^{৩৮৩} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৫৭।

^{৩৮৪} প্রাপ্ত।

একটি দুর্গের চূড়ায় বসে দুই বাহিনীর লড়াই দেখছিলেন। তার সৈনিকদের অবস্থান দেখছিলেন। মুসলমানগণ যদি সামান্য পশ্চাদপদও হতো, তাহলে দুর্গটি শত্রুর নাগালে চলে আসত এবং পারসিকরা তাকে ধরে ফেলত। তারপর সে আর রক্ষা পেত না। আল্লাহর কসম, তিনি কখনো এ ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন না কিংবা যুদ্ধের কঠিন দিনগুলোতে একটু ভয়ও পাননি।^{৩৮৫}

আযান শুনে রুস্তমের হতবিস্ময় হয়ে ওঠেন

নাযাফ এলাকায় তাঁরু গাড়ার পর রুস্তম মুসলমানদের তাঁরুতে গুপ্তচর প্রেরণ করে। এই গুপ্তচর কাদেসিয়ায় অবস্থানরত মুসলমানদের সারির ভেতর ঢুকে পড়ে। সে তাদের দেখে যে, তারা প্রতিওয়াক্তে নামাযের আগে মিসওয়াক ব্যবহার করছে। তারপর নামায আদায় করছে। নামাযের পর তারা যে যার কাজে চলে যাচ্ছে। সে রুস্তমের নিকট ফিরে মুসলমানদের এসব আচার-আচরণ তুলে ধরল। রুস্তম তাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘তারা কী খায়?’ সে বলল, ‘আমি তাদের সঙ্গে এক রাত অবস্থান করেছি। আল্লাহর কসম, আমি তাদের কিছু খেতে দেখিনি। তবে তারা সন্ধ্যায়, ঘুমানোর সময় এবং সকালে একধরনের কাঠের ছড়ি চুষে থাকে।’

রুস্তম আরও অগ্রসর হয়ে হাসন এবং আতীক-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাঁরু গাড়েন।^{৩৮৬} তিনি যখন মুসলমানদের খুব কাছাকাছি চলে আসেন, তখন সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মুআযযিন ফজরের নামাযের আযান দিচ্ছিল। তিনি মুসলমানদের ঘুম থেকে জেগে উঠতে দেখলেন। তিনি ওই পারসিকদের ডাকলেন এবং দ্রুত বাহনে চড়তে বললেন। ওই গুপ্তচর তখন এর কারণ জানতে চাইলে রুস্তম বললেন, ‘দেখো না, তোমাদের শত্রুরা যুদ্ধের ডাক দিয়েছে এবং তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে?’ গুপ্তচর বলল, ‘না। তারা নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছে।’^{৩৮৭}

^{৩৮৫} আত-তারিখ আল-ইসলামী, ১০/৩৪৭।

^{৩৮৬} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৫৮।

^{৩৮৭} প্রাপ্ত।

যখন তারা সেতু পার হচ্ছিল, তখন মুসলমানদের তাঁবু থেকে যোহরের নামাযের আযান শোনা যাচ্ছিল। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নামায আদায় করলেন। আর রুস্তম বলে ওঠল, ‘উমর আমাকে হত্যা করে ফেলছে।’^{৩৮৮}

মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রথম দিন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে সেনাপতি ও নেতাদের একত্র করেন। তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘সৈনিকদের সঙ্গে কথা বলুন, তাদের উৎসাহ দিন। কারণ, আরবদের মধ্যে আপনারা প্রসিদ্ধ ও মর্যাদাবান, কবি ও বক্তা এবং বিচক্ষণ ও নেতৃস্থানীয়।’ সুতরাং তারা সৈন্যদের মুসলমানদের শৌর্য-বীর্যের কথা মনে করিয়ে দিল এবং জিহাদে উৎসাহ দিতে লাগল।^{৩৮৯}

কাইস ইবনে হুবাইরা আল-আসাদি বললেন : হে লোকসকল, আল্লাহর প্রশংসা করো যিনি তোমাদের হেদায়েত নসীব করেছেন, তার অনুগ্রহ দান করেছেন এবং তিনি তা আরও বাড়িয়ে দেবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখো এবং তার নিকট প্রার্থনা করো। গনীমত অথবা জান্নাত তোমাদের সামনে। এই দুর্গের পেছনে বিস্তীর্ণ পাথুরে আর মরুপ্রান্তর, যা পাড়ি দেওয়া অসম্ভব।

গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ আল-লাইসি বললেন, ‘হে লোকসকল, আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য তার প্রশংসা করো এবং তার নিকট আরও প্রার্থনা করো। তাকে ডাকো এবং তিনি সাড়া দেবেন। হে মুআদের লোকসকল, আজ দেখি তোমরা কেমন বীরদর্পে লড়াই করো যেখানে তোমাদের রয়েছে ঘোড়া আর তরবারি? চিন্তা করো, আগামীকাল লোকেরা তোমাদের নিয়ে কী আলোচনা করবে। আর আগামীকাল তোমরাই সকল আলোচনার শীর্ষে থাকবে।’

বুসর ইবনে আবি রহম আল-জুহানি বললেন, ‘আল্লাহর প্রশংসা করো এবং কথাকে কাজে পরিণত করো। ইসলামের পথে হেদায়েত লাভ করার

^{৩৮৮} প্রাপ্ত।

^{৩৮৯} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৫৯।

জন্য তোমরা আল্লাহর প্রশংসা করেছ এবং তোমরা তার একক সত্তার ওপর ঈমান এনেছ—তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তোমরা তার মর্যাদাকে সমুন্নত করেছ এবং তার নবী ও রাসূলের ওপর ঈমান এনেছ। মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। তোমাদের চোখে দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে অবজ্ঞার যেন আর কিছুই না থাকে। যারা এ নিয়ে কম চিন্তা করে, তাদের নিকটই দুনিয়া বেশি ধরা দেয়। দুনিয়ার দিকে ধাবিত হোয়ো না, তাহলে তা তোমাকে বিপথে নিয়ে যাবে। আল্লাহর দীনকে সাহায্য করো এবং তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন।’

আসিম ইবনে আমর বললেন, ‘হে আরব, তোমরা আরবের নেতা এবং তোমরা পারসিকদের নেতৃস্থানীয় লোকদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছ। জান্নাত লাভই তোমাদের পণ হওয়া উচিত। শত্রুদের দুনিয়া লাভের যে আগ্রহ, তা যেন তোমাদের জান্নাত লাভের আগ্রহ থেকে বেশি না হয়।

রাবী ইবনে আল-বিলাম আস-সাদি বললেন, ‘হে আরব, দীন ও দুনিয়ার জন্য যুদ্ধ করো। আল্লাহ বলেন,

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢١﴾

তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ছুটে যাও,
যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরি করা হয়েছে
পরহেযগারদের জন্য।^{৩৯০}

রাবি ইবনে আমির বললেন, ‘আল্লাহ তোমাদের ইসলামের দিকে হেদায়েত নসীব করেছেন। তোমাদের ঐক্যবদ্ধ করেছেন এবং বিজয় দান করেছেন। ধৈর্যধারণেই শান্তি। সুতরাং ধৈর্যধারণে নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলা এবং তখন এটি আর কঠিন মনে হবে না। আর ভীত-সন্ত্রস্ত হতে চেষ্টা করো না এবং পরে তা অভ্যাসে পরিণত হবে।

এবং বাকি সকলেই একই কথা বলেছেন।^{৩৯১}

^{৩৯০} সূরা আল-ইমরান, ৩ : ১৩৩।

^{৩৯১} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৫৯।

২.৪.১। আরমাস দিবস

কাদেসিয়া যুদ্ধের প্রথম দিনকে আরমাস দিবস বলা হয়। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনীকে হুকুম দিলেন, ‘যে যেখানে আছ, সেখানেই অবস্থান করো। যোহরের নামায না পড়ে কেউ নড়বে না। যোহরের নামায হয়ে গেলে আমি তাকবীর বলব। তোমরাও তাকবীর বলবে এবং প্রস্তুত হয়ে যাবে। মনে রেখো, তোমাদের পূর্বে কারও জন্য তাকবীর দেওয়া হয়নি এবং এটি তোমাদের সাহায্যার্থেই দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় তাকবীর শোনার পর তোমরাও তাকবীর বলবে এবং প্রস্তুত থাকবে। তৃতীয় তাকবীর শোনার পর তাকবীর বলবে এবং অশ্বারোহী বাহিনী শত্রুদের মোকাবিলা করবে। আর আমি যখন চতুর্থ তাকবীর বলব, তখন সকলেই শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বলবে।’^{৩৯২}

সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যোহরের নামায শেষ করলেন। তার একজন গোলাম ছিল যাকে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সঙ্গে থাকতে বলেছিলেন। এই গোলাম কুরআনে খুব পারদর্শী ছিল। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিহাদের সূরা (সূরা আনফাল) তিলাওয়াত করতে বললেন। সে নিকটস্থ সেনাদলের সামনে সূরা আনফাল তিলাওয়াত করল এবং অন্য সেনাদলগুলোতেও এই সূরা তিলাওয়াত করে শোনানো হলো। এত সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি পেল এবং তাদের অন্তর প্রশান্তিতে ভরপুর হয়ে গেল।^{৩৯৩}

কুরআন তিলাওয়াত শেষ হলে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকবীর বললেন। যারা তার আশেপাশে ছিল, তারাও তাকবীর বলল। তাদের থেকে শুনে শুনে সকলেই তাকবীর বলল। লোকজন সম্মুখে অগ্রসর হলো। তারপর তিনি দ্বিতীয় তাকবীর বললেন এবং লোকজন প্রস্তুত হয়ে গেল। তিনি যখন তৃতীয় তাকবীর বললেন, তখন কিছু অশ্বারোহী যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলেন। পারসিক বাহিনী থেকেও একই সংখ্যক লোক তাদের মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে এল। তাদের মধ্যে লড়াই শুরু হলো।^{৩৯৪}

^{৩৯২} প্রাগুক্ত, ৪/৩৬১।

^{৩৯৩} প্রাগুক্ত, ৪/৩৬২।

^{৩৯৪} প্রাগুক্ত।

মুসলিম বাহিনীর বীর যোদ্ধা গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আসাদি, আসিম ইবনে আমর আত-তামিমী, আমর ইবনে মাদি কারিব আজ-বুবাইদি এবং তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ শত্রুর ওপর তীব্র আঘাত হানলেন। তারা শত্রুদের কতককে হত্যা করলেন, কতক পারস্যের বীরকে বন্দী করে নিয়ে এলেন। এ ক্ষেত্রে কোনো মুসলমানই আহত বা পরাজিত হয়নি। এ ধরনের দ্বৈত লড়াই যুদ্ধের সবচেয়ে কঠিন কৌশল। এতে হাতেগোনা কিছু বীর বেঁচে আসতে পারে। এটি বিজয়ীদের মনোবল বাড়িয়ে দেয়, তাদের সাহস বৃদ্ধি করে এবং পরাজিতদের মনোবল ভেঙে দেয় ও তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দেয়। ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানগণ এসব দ্বৈত লড়াইয়ে খুব বীরত্বের সঙ্গে লড়েছেন এবং সব সময়ই তারা শত্রুর চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। এভাবে তারা এ মল্লযুদ্ধ থেকে উপকৃত হয়েছিলেন।^{৩৯৫} লোকজন চতুর্থ তাকবীরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এ-সময় বনু নাহদ গোত্রের নেতা কাইস ইবনে হুযাইম ইবনে যারসুমাহ দাঁড়িয়ে বলেন, ‘হে বনু নাহদের লোকসকল, শত্রুর দিকে দ্রুত ধাবিত হও (ইনহাদু)। তোমাদের নাম নাহদ। সুতরাং নামের মর্যাদা রাখবে।’ তখন খালিদ ইবনে উরফাতাহ তাকে বলে পাঠালেন, ‘আল্লাহর কসম, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করো। নতুবা তোমার পরিবর্তে আরেকজনকে নিয়োগ করব।’ তারপর সে শান্ত হয়।^{৩৯৬}

রুস্তম তার বাহিনীর কয়েকজনকে আক্রমণ করার আদেশ দেয়

রুস্তম দেখল যে, দ্বৈত লড়াইয়ে মুসলমানরা সাফল্যে এগিয়ে গেছে এবং তারা তাদের শত্রুদের ধরাশায়ী করে ফেলেছে, তখন পরিকল্পনা অনুযায়ী সে আরও কিছু দ্বৈত লড়াইয়ের জন্য অপেক্ষা করেনি; বরং সে তার কিছু সৈন্যদের একটি মুসলিম সেনাদলের ওপর আক্রমণ করার জন্য আদেশ দেয় যেখানে ছিল বনু বাযিলা গোত্র ও অন্যান্যরা। এ আক্রমণে অনেকেই অবাক হয়। কারণ, পারসিকরা তাদের প্রায় অর্ধেক বাহিনীকে মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র ডিভিশনের ওপর আক্রমণ করার আদেশ দেয়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বৈত লড়াইয়ে পরাজয়ের হতাশাকে দমন করতে তারা এই আক্রমণ করে। এভাবে পারসিকরা মুসলিম বাহিনীর

^{৩৯৫} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৪৪৫।

^{৩৯৬} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৬৩।

একটি বাহুর ওপর তেরোটি হাতি নিয়ে আক্রমণ করে। আর পারসিকদের সামরিক বাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি হাতির সঙ্গে পদাতিক ও অশ্বারোহী মিলে ছিল চার হাজার সৈন্য। মুসলিম বাহিনীর বিভিন্ন অংশে হাতিগুলো ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু থাকে বনু বাযিলা এবং তাদের সঙ্গীরা। মুসলিম পদাতিক বাহিনী, যারা তাদের বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, তারা শত্রুর বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

সাদ রা. বনু বাযিলার সাহায্যার্থে বনু আসাদকে প্রেরণ করেন

বনু বাযিলার ওপর আক্রমণের তীব্রতা লক্ষ করে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বনু আসাদের লোকজনকে খবর পাঠান, ‘বনু বাযিলার সাহায্যে এগিয়ে যাও।’ তুলাইহা ইবনে খুওয়ালিদ, হামমাল ইবনে মালিক, গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ এবং আর-রিকাইল ইবনে আমর দ্রুত তাদের দল নিয়ে এগিয়ে গেলেন। আল-মাকর ইবনে সুওয়াইদ এবং সাকীক বলেন, ‘আল্লাহর কসম, তারা তাদের ওপর অনবরত তরবারির আঘাত করতে থাকে যতক্ষণ না আমরা হাতিগুলোকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হলাম। তারপর এক শক্তিশালী বীর এগিয়ে এল এবং তুলাইহা তার সঙ্গে দ্বৈত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলো। খুব দ্রুতই তুলাইহা তাকে হত্যা করে ফেলল। পারসিকরা দেখল যে, বনু আসাদ অনবরত তিরের বর্ষণে হাতিগুলোর অবস্থা কাহিল করে দিচ্ছে। এ-সময় তারা মুসলমানদের ওপর প্রবল আক্রমণ শানিত করল। যুল হাযিব এবং জালিনূস—দুই পারসিক সেনাপতি—মুসলমানদের ওপর যৌথ আক্রমণ করে। আর এদিকে মুসলমানগণ চতুর্থ তাকবীর শোনার অপেক্ষায় ছিলেন। বনু আসাদকে পারসিক সৈন্যরা ঘিরে ফেলে। এতে তাদের হাতি তো ছিলই। কিন্তু আসাদ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করে। তারপর সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু চতুর্থ তাকবীর দেন। মুসলমানরা শত্রুর দিকে এগিয়ে যায়। আসাদের ওপর আক্রমণ অব্যাহত আছে এবং ডান-বাম দিকে থেকে হাতিগুলো মুসলমানদের ঘোড়াগুলোকে তাড়া করতে থাকে। হাতির কারণে ঘোড়াগুলো বেদিশা হয়ে যায়। তখন অশ্বারোহী সৈন্যগণ পদাতিক সৈন্যদের ঘোড়াগুলো হাতির দিকে ঠেলে দিতে বলে।

সাদ রা. বনু তামীমকে হাতি দমন করার দায়িত্ব দেন

সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আসিম ইবনে আমর আত-তামীমির নিকট আদেশ প্রেরণ করেন, ‘হে তামীম, তোমরা উট আর ঘোড়ার মালিক না? তোমরা হাতির ব্যাপারে কিছু করতে পারবে না?’ তারা বলল, ‘ইনশাআল্লাহ পারব।’ তারপর তিনি কিছু তিরন্দাজকে এবং কিছু অস্ত্রচালনায় দক্ষ ও ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে ডাকলেন। তাদের তিনি বললেন, ‘হে তিরন্দাজ, হাতির ওপরে আরোহী সৈন্যদের দিকে নিশানা করে তির নিক্ষেপ করো।’ আরও বললেন, ‘হে দক্ষ ও ক্ষিপ্ত সৈনিক, হাতির পেছনে গিয়ে বাক্সগুলো কেটে দাও যাতে এর আরোহীরা নিচে পড়ে যায়।’ সবাই আসাদের দিকেই লক্ষ রাখছিল। কিন্তু ডানে-বামেও তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল। আসিমের লোকজন হাতির লেজ ও রশি কেটে দিল। তারপর হাতি উত্তেজিত হয়ে উঠল। ওইদিন এমন কোনো হাতি বাকি ছিল না যেগুলোর বাক্স কেটে ফেলা হয়নি এবং আরোহীকে হত্যা করা হয়নি। যুদ্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আসাদের ওপর চাপও কমে আসল এবং পারসিকদের পেছনে হটিয়ে দেওয়া হলো। সূর্যাস্ত পর্যন্ত লড়াই চলল এবং রাতের শুরুতেই উভয় পক্ষ তাঁবুতে ফিরে গেল।

এদিন বনু আসাদের ৫০০ মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। তারা ছিল বাহিনীর অগ্রভাগে। আসিম এবং বনু তামীম লোকজনের ঢাল হিসাবে লড়াই করছিল। এ-ই ছিল প্রথম দিন, যা আরমাস দিবস নামে পরিচিত।^{৩৯৭}

তুলাইহা ইবনে খুওয়ালিদে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথায় বনু আসাদ গোত্রে আশ্চর্যজনক প্রভাব পড়ে। তুলাইহা ইবনে খুওয়ালিদ বলেন, ‘হে আমার গোত্র, আমাদের ওপর সেনাপতির গভীর আস্থা রয়েছে। তিনি যদি জানতেন আমাদের ছাড়া অন্য কেউ এসব লোকজনের সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারবে, তাহলে তিনি তাদেরই প্রেরণ করতেন। শত্রুর ওপর তীব্র আক্রমণ চালাও। অগ্নিশর্মা সিংহের মতো তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো।’

^{৩৯৭} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৬৫।

তোমাদের বলা হয় আসাদ (সিংহ)। সুতরাং সিংহের মতোই আক্রমণ করবে। কখনো পশ্চাদপদ কিংবা পালানোর চেষ্টা করবে না। সামনে অগ্রসর হও এবং পেছনে ফিরবে না। রাবিআ কত উত্তম লড়াই করছে! আল্লাহর নামে তাদের ওপর আঘাত হানো।’^{৩৯৮}

এই কথাগুলো তার গোত্রের লোকদের ওপর বিস্ময়কর প্রভাব ফেলে। তাদের উৎসাহ এবং শক্তি জোগায়। তারা তাদের মতো বীরত্বের সঙ্গেই লড়াই করছিল যতক্ষণ না বনু তামীম তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। সেদিন তাদের ৫০০ জন শাহাদাত বরণ করে আগেই জান্নাতের পথে পাড়ি জমায়।^{৩৯৯}

অন্যান্য গোত্র বনু আসাদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখে খুবই প্রভাবিত হয়। আল-আশআস ইবনে কাইস আল-কিন্দি বলেন, ‘হে কিন্দা, বনু আসাদ কতই-না বীরত্বপূর্ণ লড়াই করছে।’ এ কথা শুনে কিন্দার লোকজন রক্ষণশীল ভূমিকা থেকে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে এবং তাদের সম্মুখে থাকা পারসিকদের তাড়িয়ে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে।^{৪০০}

সামরিক হাসপাতাল

আল-উযাইব নামক এলাকায় যুদ্ধে আহতদের জন্য সামরিক হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। সেখানে মুজাহিদদের স্ত্রীরা অবস্থান গ্রহণ করে। তারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় থাকে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারের আশা করে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা আহতদের চিকিৎসা সেবা দিতে থাকে। এ ছাড়া শহীদদের জন্য কবর খননের দায়িত্বও তারা পালন করে। আর এ কাজে তাদের শিশুরাও এগিয়ে আসে। চিকিৎসা-সেবা মহিলাদের জন্য সাধারণ কাজ হলেও কবর খনন সহজ ছিল না। পুরুষেরা সবাই জিহাদে ব্যস্ত থাকায় তাদের বাধ্য হয়েই এ কঠিন কাজ করতে হয়। ধৈর্য আর ঈমানী শক্তির কারণে তারা এ কাজের যোগ্য হয়ে ওঠেন। মুশাররিফ উপত্যকায়—আল-উযাইব ও আনি আশ-শামস অঞ্চলের মধ্যবর্তী একটি

^{৩৯৮} প্রাগুক্ত, ৪/৩৬৪।

^{৩৯৯} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৪৪৯।

^{৪০০} আল-কাদিসিয়া, আহমাদ আদিল কামাল, পৃ. ১৩৯; তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৬৪।

এলাকা— শহীদদের স্থানান্তর করা হতো। প্রথম দিন শেষে যুদ্ধবিরতির পর অনেক মুজাহিদ রাতে তাদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করে।

যুদ্ধের আগের রাতে আল-খানসা বিনতে আমর কর্তৃক তার ছেলের যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহ প্রদান

আল-উযাইবে মহিলা ক্যাম্পে আল-খানসা বিনতে আমর—বনু সুলাইমের প্রসিদ্ধ মহিলা কবি, যার জীবন জাহেলী ও ইসলামী যুগে বিস্তৃত—তার চার ছেলেকে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহ দিতে থাকেন। তিনি বলেন, ‘তোমরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছ এবং নিজেদের সিদ্ধান্তেই হিজরত করেছ। তোমরা জানো যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আল্লাহ বিরাট পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তোমরা এও জানো যে, আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের তুলনায় অনেক উত্তম। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠١﴾

হে ঈমানদারগণ, ধৈর্যধারণ করো এবং (কাফেরদের) মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।^{৪০১}

যদি তোমরা আগামীকাল প্রত্যুষে সুস্থ ও নিরাপদভাবে জেগে ওঠো, তাহলে ইনশাআল্লাহ যুদ্ধে শরীক হবে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আর আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে তারই সাহায্য প্রার্থনা করবে। যখন দেখবে যে, যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, তখন সম্মুখেই অগ্রসর হবে। যদি তোমরা তা করো, তাহলে গনীমত লাভ করবে এবং আখেরাতে সম্মানিত হবে।^{৪০২}

^{৪০১} সূরা আল-ইমরান, ৩ : ২০০।

^{৪০২} আল-ইসতিআব, নং ২৮৭; নিসা আল-কাদেসিয়া, পৃ. ১৪৬-১৪৭।

আন-নাখ গোত্রের জনৈক মহিলা কর্তৃক তার ছেলেকে জিহাদে যেতে উৎসাহ প্রদান

আন-নাখ গোত্রের জনৈক মহিলার চার ছেলে ছিল, যারা কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। প্রত্যুষে তিনি তার ছেলেদের বলেন, ‘তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছ এবং তা ত্যাগ করোনি। তোমরা হিজরত করেছ ঠিকই, তবে মদীনায হিজরত করোনি। তারপর তোমরা তোমাদের বৃদ্ধ মাকে নিয়ে এসে পারসিকদের মুখোমুখি করেছ। আল্লাহর কসম, তোমরা একই বাপের সন্তান, যেমন কিনা তোমরা একই মায়ের সন্তান। আমি তোমার পিতার অবাধ্য হইনি এবং তোমাদের মামাদেরও কোনো বেইজ্জত করিনি। যাও, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করো এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লড়াই করো।’ তারপর তারা দ্রুত গিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ছেলেরা চলে যাওয়ার পর বৃদ্ধ মা আকাশের দিকে হাত তুলে বলেন, ‘হে আল্লাহ, আমার ছেলেদের রক্ষা করুন।’ পরবর্তী সময়ে যুদ্ধ শেষে তার মায়ের কাছে ফিরে আসে। অসীম বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে এবং তাদের কেউই আহত হয়নি।’

কাদেসিয়া যুদ্ধের প্রথম দিনে কিছু মহীয়সী নারী এ রকমই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

২.৪.২। আগওয়াস দিবস

কাদেসিয়ার যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনকে আগওয়াস দিবস বলা হয়। এদিনে কাকা ইবনে আমরের নেতৃত্বে সিরিয়ার সামরিক বাহিনীর একটি দল কাদেসিয়ায় পৌঁছে। আমীরুল মুমিনীন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ার গভর্নর আবু উবাইদাকে ইরাক থেকে ফিরে এলে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীকে কাদেসিয়ায় সাহায্যের জন্য পাঠাতে বলেন। তিনি সৈন্যদের পাঠালেও খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিজের সঙ্গে রাখেন। কারণ, তাকে তার প্রয়োজন ছিল। তিনি হাশিম ইবনে উতবা ইবনে আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে এ দলকে কাদেসিয়ায় প্রেরণ করেন। তারা যখন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ইরাক থেকে সিরিয়া আগমন করেন, তখন সৈন্যসংখ্যা ছিল নয় হাজার। সেখান

থেকে ছয় হাজার ইরাকের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। হাশিম ইবনে উতবা অগ্রগামী দলের প্রধান হিসাবে কাকা ইবনে আসরকে নিযুক্ত করেন। এ দলের সৈন্যসংখ্যা ছিল এক হাজার।^{৪০৩}

কাকা ইবনে আমরের অসীম বীরত্ব

কাকা ইবনে আমর দ্রুত তার বাহিনী নিয়ে আগওয়াস দিবসে কাদেসিয়ায় এসে পৌঁছেন। আসার পথে তিনি মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধির উপায় নিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা করেছেন। তিনি তার বাহিনীকে এক শ উপদলে বিভক্ত করেন। প্রতিটি উপদলে দশ জন করে সৈন্য ছিল এবং তাদের একের পর এক কাদেসিয়ায় আবির্ভূত হতে নির্দেশ দিলেন। এ জন্য যখন একটি দল দৃষ্টিসীমানার বাইরে চলে যায়, তখন তারা পরবর্তীটি প্রেরণ করতে শুরু করে। তিনি প্রথম দশ জন নিয়ে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। তারপর তাকে অনুসরণ করে একের পর উপদল প্রবেশ করে। কাকা ইবনে আমর যতবারই দিগন্তের দিকে দৃষ্টি দিতেন, তখন নতুন আরেকটি দলকে দেখতে পেতেন। তিনি তাকবীর বলে উঠতেন। অন্যান্য মুসলমানরা তাকে অনুসরণ করত এবং সবাইকে অনবরত যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করতে লাগলেন। এ পদ্ধতিতে মুসলমানদের মনোবল অনেকাংশে বেড়ে যায়। মূলত ত্রিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীতে মাত্র এক হাজার সৈন্য যোগ দিয়ে খুব বেশি শক্তিবৃদ্ধি করতে না পারলেও এ ক্ষেত্রে কাকা ইবনে আমর সফল হন। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে তিনি যে পরিকল্পনা করেছেন, তাতে সামান্য শক্তিবৃদ্ধি হলেও সাধারণভাবে মুসলমানদের মনোবল বেড়ে যায়।

তিনি তাদের অনেক সাহায্য-সৈন্য আসার শুভসংবাদ প্রদান করেন এবং বলেন, ‘হে লোকসকল...আমি যা করি, তা-ই করো।’ তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বললেন, ‘কে আছ আমার সঙ্গে লড়াই করবে?’ তার সম্পর্কে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যে কথা বলেছিলেন, সবাই সে কথাই বলতে লাগল : ‘যে বাহিনীতে তার মতো লোক রয়েছে, সে বাহিনীকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না।’ সবাই তাকে পেয়ে আনন্দিত হলো।

^{৪০৩} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৬৭; আত-তারিখুল ইসলামি, ১৯/৩৬৭।

পারসিকদের পক্ষ থেকে যুল আল-হাযিব^{৪০৪} তার মোকাবিলায় এগিয়ে এল। কাকা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি কে?’ সে বলল, ‘আমি বাহমান যাযাওয়াহ। সেতুযুদ্ধে তার নেতৃত্বেই পারসিকরা মুসলমানদের চরম বিপদের সম্মুখীন করে। ওই মুহূর্তে সেই দৃশ্য কাকার সামনে ভেসে ওঠে। তিনি ইসলামী চেতনায় উদ্বেলিত হয়ে চিৎকার করে বলে ওঠেন, ‘আবু উবাইদ, সুলাইত এবং সেতুযুদ্ধের সব সহযোগীদের জন্য প্রতিশোধ!’ যদিও এই পারসিক যুদ্ধা তার সাহসিকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু কাকার এই চিৎকারে তার সাহস উবে গেল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কাকা সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, ‘এক হাজার সৈন্যের চিৎকারের চেয়ে কাকার গর্জন বেশি।’^{৪০৫} কীভাবে একজন মানুষ তা সহ্য করবে, যতই সে সাহসী ও দৃঢ় হোক না কেন? খুব ত্বরিত গতিতেই কাকা তাকে তার সৈন্যদের চোখের সামনে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করেন। এভাবে তার তরবারির আঘাতের ভয়াবহতা দেখে পারসিকরা নার্ভাস হয়ে পড়ে এবং মুসলমানদের মনোবল বেড়ে যায়। কারণ, পারসিক এই নেতা ছিল বিশ হাজার সৈন্যের প্রধান।

তারপর কাকা আবার জোরে চিৎকার করে বলে ওঠে, ‘কে আছ আমার সঙ্গে লড়াই?’ পারসিকদের সারি থেকে দুজন বেরিয়ে এল; একজন বাইরাযান এবং আরেকজন ছিল বান্দাবান। আল-হারিস ইবনে জাবাইন ইবনে হারিস এসে কাকার সঙ্গে যোগ দেয়। কাকা বাইরাযানের সঙ্গে লড়াই করে এবং তাকে হত্যা করে। ইবনে জাবাইন বান্দাবানের সঙ্গে লড়াই করে এবং তাকে হত্যা করে।^{৪০৬} বান্দাবান ছিল পারসিকদের মহাবীরদের একজন। এভাবে দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই কাকা পারসিকদের পাঁচ জন সেনাপতির দুজনকে শেষ করে দেন। নিশ্চিতভাবেই এটি ছিল পারসিকদের জন্য এক বিরাট ধাক্কা। এতে তাদের মনোবল ভেঙে যায়। উভয়পক্ষ থেকে দুজন করে অশ্বারোহী লড়াইয়ের জন্য মুখোমুখি হয় এবং কাকা বলতে থাকেন, ‘হে মুসলিম, তুমি তোমার তরবারি ব্যবহার করো এবং ফসল কেটে নাও।’ লোকেরা একে অন্যকে এই কথা শোনাতে থাকে এবং তারা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে

^{৪০৪} একজন পার্সিয়ান বীর ও সেনাপতি যে কিনা মুসলমানদের সেতু যুদ্ধে পরাজিত করেছিল।

^{৪০৫} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৪৫৫।

^{৪০৬} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৬৮।

থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, কাকা তিরিশের অধিক আক্রমণ পরিচালনা করেন; যখনই তিনি নতুন কোনো দলকে আসতে দেখতেন, তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। সর্বশেষে তার হাতে যে ব্যক্তিটি নিহত হয়, তার নাম ছিল বারয যামহার আল-হামাযানি।

আলবা ইবনে জাহশ আল-উজালি : যুদ্ধে তার পেটের নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যায়

পারসিকদের জনৈক সৈন্য বাকর ইবনে ওয়ালির সৈন্যদের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে বলে, ‘কে আছ আমার সঙ্গে লড়াই করবে?’ আলবা ইবনে জাহশ আল-উজালি তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতে এগিয়ে যান। আলবা পারসিককে এমন আঘাত হানেন যা তার ফুসফুসকে বিদ্ধ করে। তারপর পারসিক সৈন্য আলবার পেটে আক্রমণ করে এবং তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যায়। তিনি মাটিতে পড়ে যান। পারসিক সৈন্য তখনই মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু আলবা বেঁচে ছিলেন, তবে দাঁড়াতে পারছিলেন না। তিনি তার নাড়িভুঁড়িগুলো পেটের ভেতর ঢুকাতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু পারেননি। পাশ দিয়ে মুসলিম সৈন্যদের কেউ যাচ্ছিল। তিনি তাকে বললেন, ‘আমাকে সাহায্য করো।’ তখন লোকটি তার নাড়িভুঁড়ি পেটে ঢুকিয়ে দেয়। আলবা তার ক্ষতস্থান হাত দিয়ে চেপে ধরে পারসিকদের সারির দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। মুসলিম সৈন্যটির দিকে আর ফিরেও তাকাননি। কিন্তু তিরিশ হাত দূরত্ব অতিক্রম করেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। মৃত্যুর সময় তিনি বলতে থাকেন,

أرجو بها من ربنا ثواباً قد كنت ممن أحسن الضراباً

যুদ্ধে যারা ভালো করেছিল আমি ছিলাম তাদের একজন
আমি আশা করি, আল্লাহ আমাকে পুরস্কৃত করবেন।

আল-আরাফ ইবনে আল-আলম আল-উকাইলি

পারসিকদের যোদ্ধাদের একজন চিৎকার দিয়ে বলে, ‘কে আছ আমার সঙ্গে লড়াই করবে?’ আল-আরাফ ইবনে আল-আলম আল-উকাইলি এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং তাকে হত্যা করে। তারপর আরেকজন পারসিক যোদ্ধা তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতে এগিয়ে

আসে। আল-আরাফ ইবনে আল-আলম তাকেও হত্যা করেন। তারপর পারসিকদের অশ্বারোহীরা তাকে ঘিরে ফেলে এবং তাকে মাটিতে ফেলে দেয়। তিনি তার অস্ত্র মাটিতে ফেলে দেন এবং পারসিকরা তা দেখতে পায়। তিনি মাটির ধুলো তাদের চেহারার দিকে ছুড়ে মারেন। এই ফাঁকে তিনি তার সহযোদ্ধাদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন।^{৪০৭}

খানসা রা.-এর চার ছেলের আত্মত্যাগ

ওইদিন খানসা রাযিয়াল্লাহু আনহার চার ছেলে শাহাদাত বরণ করেন। তারা প্রচণ্ড আগ্রহ-উদ্দীপনায় জিহাদে অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেকেই কুরআন মাজীদেবর আয়াত তিলাওয়াত করে নিজেকে এবং ভাইদের উৎসাহ দিতে থাকেন। তারা একের পর এক রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং শহীদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত লড়াই করেন।^{৪০৮} চার ছেলের শাহাদাতের খবর খানসা রাযিয়াল্লাহু আনহার নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, ‘আল্লাহর জন্য প্রশংসা, যিনি আমাদের ছেলেদের শাহাদাত নসীব করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। আমি আশা করি, আল্লাহর রহমতে তাদের সঙ্গে আমার জান্নাতে আবার সাক্ষাৎ হবে।’^{৪০৯}

কাকা রা.-এর অভূতপূর্ব রণকৌশল

আগওয়াস দিবসে কাকা এবং তার চাচাত ভাই তামীম এমন এক রণকৌশল প্রয়োগ করেন, যা পারসিকদের মারাত্মক ভয় ধরিয়ে দেয়। তিনি যখন জানলেন যে, প্রথম দিন পারসিক বাহিনীর হাতি মুসলমানদের ঘোড়াগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে, তখন তিনি আল্লাহর অনুগ্রহে নতুন এক কৌশল বের করলেন। তিনি উটগুলোকে ভীতিকর এক সাজে সাজালেন যাতে শত্রুপক্ষের ঘোড়াগুলো তা দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তারা উটের ওপর কাপড় জড়ালেন, সাজ-সরঞ্জাম পরালেন এবং সেগুলোর চেহারা মুখোশ পরিয়ে দিলেন। তারপর পদাতিক সৈন্যদের এসব উটের ওপর আরোহণ করতে বললেন। আর এদের নিরাপত্তায়

^{৪০৭} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৭০।

^{৪০৮} আল-কাদিসিয়া, আহমাদ আদিল শাকির, পৃ. ১৫৪।

^{৪০৯} আল-খানসা উম্মুয শুহাদা, আব্দুল মুনইম আল-হাশিমি, পৃ. ৯৮।

চারিদিকে নিজেদের অশ্বারোহী বহর রাখলেন। তারপর তারা পারসিক বাহিনীর অশ্বারোহীদের ওপর আক্রমণ করলেন। ফলে আরমাস দিবসে মুসলমানদের ঘোড়াগুলোর যে দুর্গতি হয়েছিল, আগওয়াস দিবসেও পারসিকদের ঘোড়াগুলো একই আচরণ করল। ভয়ানক আকৃতির উটগুলো সেদিন ছোট-বড় সব শত্রুদলের ওপরই আক্রমণ করেছে। আর অশ্বারোহীরা সেগুলো ধাওয়া করে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে। মুসলমানদের অন্যান্য সেনাদল এ দৃশ্য দেখে তারাও একইভাবে উটগুলো সাজানো শুরু করে। ওইদিন মুসলমানদের উটের বহরের জন্য পারসিক বাহিনী এত বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়, যা মুসলমানগণ আরমাস দিবসে হাতির জন্য হয়েছিল।^{৪১০}

এ থেকে এটি স্পষ্ট যে, প্রথম যুগের মুসলমানগণ অভিনব রণকৌশল চিন্তা ও প্রয়োগে শত্রুদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। পারসিকরা যুদ্ধের প্রথম দিন হাতি ব্যবহার করে মুসলমানদের তটস্থ করে রাখে। আর যেহেতু মুসলমানদের কোনো হাতি ছিল না, এ জন্য তারা তাদের বোকা বানানোর জন্য উটগুলোকে হাতির মতো সজ্জিত করে। এই জিনিয়াস কৌশল প্রয়োগ করে শত্রুদের ঘোড়াগুলোকে দিশেহারা করে তোলা সম্ভব হয় এবং সেগুলো পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। মুসলমানদের এমনই কাজ করা উচিত—জাগতিক সকল প্রস্তুতি নিয়ে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভে এগিয়ে যাবে।

রণাঙ্গানের মূল পটভূমিতে আবু মিহজান আস-সাকাফি

আগওয়াস দিবসে মধ্যরাত অবধি যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। এ রাতকে লাইলাতুল আস-সাওয়াদ বলা হয়। উভয় পক্ষ পেছনে হটলে যুদ্ধ থামে। এই যুদ্ধবিরতিতে মুসলমানদের ব্যাপক লাভ হয়। এই সুযোগে তারা শহীদদের মুশারররিক উপত্যকায় দাফন করতে সমর্থ হয়। আর আহতদের আল-উযাইবে চিকিৎসা নিতে প্রেরণ করে। ওই রাতে আবু মিহজান আস-সাকাফি প্রথমবারের মতো এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।^{৪১১} তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ কবি ও বীর। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে

^{৪১০} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৪৬।

^{৪১১} প্রাগুক্ত, ১০/৪৬২।

পায়ে শেকল দিয়ে বন্দী করে রেখেছিলেন। সন্ধ্যায় তিনি সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গমন করেন এবং তার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করে মুক্তির আশা করেন। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে তিরস্কার করেন। তখন তিনি নিচে নেমে এসে সালামা বিনতে খাসাফার নিকট গিয়ে বলেন, ‘হে সালামা, হে খাসাফার কন্যা, আপনি ভালো কিছু করতে চান?’ সালামা বিনতে খাসাফা বলেন, ‘সেটা কী?’ তিনি বলেন, ‘আমাকে ছেড়ে দিন এবং একটি ঘোড়া ধার দেন। আল্লাহর কসম, যদি আল্লাহ আমাকে অক্ষত রাখেন, তাহলে আবার এসে স্বেচ্ছায় এই বন্দীত্ব গ্রহণ করব।’ তিনি বললেন, ‘আমি কেন এ কাজ করব?’ আবু মিহযান নিরাশ হয়ে এ কবিতা পাঠ করতে থাকেন,

كفى حزناً أن تردى الخيل بالقنا وأترك مشدوداً علي وثاقيا
إذا قت عناني الحديد وأغلقت مصارع دوني قد تصم البناديا
وقد كنت ذاملاً كثير وإخوة فقد تركوني واحداً لا أخاليا
والله عهداً لا أخيس بعهده لئن فرجت أن لا أزور الحوانيا

আমার জন্য এ দুশ্চিন্তাই যথেষ্ট যে, আরোহীরা পরাজিত বর্শাঘাতে, আর আমি শিকলে বন্দী অবস্থায় পরিত্যক্ত।

আমি যখন উঠতে চাই, শিকল আমাকে উঠতে দেয় না এবং দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর চিৎকারকারী চিৎকার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায়।

অথচ ইতিপূর্বে প্রচুর ধনসম্পদ ও জনবলে আমি ছিলাম গর্বিত

আজ তারা আমাকে একা ফেলে চলে গেছে; আমার কোনো সাথী নেই।

আমি প্রতীজ্ঞা করেছি আল্লাহর সঙ্গে এবং তা আমি কিছুতেই ভঙ্গ করব না। যদি কোনোদিন এই জিজির ছুটে যায়, তবে কখনো এসব পশুদের চেহারা আর দেখব না।

সালামা বললেন, ‘আমি ইস্তেখারা করেছি এবং তোমার প্রতিশ্রুতিতে আমার বিশ্বাস জন্মেছে।’ তারপর তিনি আবু মিহজানকে ছেড়ে দেন এবং বলেন, ‘তবে আমি তোমাকে কোনো ঘোড়া ধার দিতে পারব না।’ তিনি তার ঘরে ফিরে গেলেন। কিন্তু আবু মিহজান ঘোড়াটি নিয়ে নিলেন এবং দুর্গের গেইট—যা পরিখার নিকটে ছিল—পার হয়ে তাতে চড়ে বসলেন।

তারপর দ্রুত রণক্ষেত্রে মুসলমানদের ডান বাহুতে যোগ দেন। ভীষণ জোরে তাকবীর বলে শত্রু বাহিনীর বাম বাহুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন—শানিত তরবারির আঘাতে শত্রুদের কাবু করতে থাকেন। তারপর তিনি পেছনে সরে এসে মুসলমানদের বাম বাহুতে যোগ দেন। আবারও তাকবীর বলে শত্রু বাহিনীর ডান বাহুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন—তরবারির তীব্র আঘাতে শত্রুদের হত্যা করতে থাকেন। তারপর তিনি আবার পেছনে গিয়ে শত্রুদের মূল কেন্দ্রে আঘাত হানেন। তিনি মুশরিকদের বধ করতেই থাকেন; সেই রাতে বিস্ময়করভাবে লড়াই করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। কিন্তু কেউই জানত না এই লোকটি কে। কারণ, তারা তাকে যুদ্ধের শুরুতে দেখেনি। কেউ কেউ বলতে লাগল, ‘তিনি নিশ্চয়ই হাশিমের কোনো সহযোগী হবেন অথবা হয়তো হাশীমই।’

দুর্গের ছাদে পেটে ভর দিয়ে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এ দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি বললেন, ‘এ বাহাদুর তো আবু মিহজানের মতো লাগে, কিন্তু সে তো কয়েদখানায় বন্দী। আর এ তো আমার আল-বালকা ঘোড়ার মতো লাগছে।’ চারিদিকে আবু মিহজান সম্পর্কে গুজব রটে গেল, কে এই ব্যক্তি? মধ্যরাত্ৰিতে উভয়পক্ষ পেছনে সরে আসতে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলো। আবু মিহজান ফিরে এসে তার পায়ে বেড়ি পরে নিল। সালামা তাকে বললেন, ‘হে আবু মিহজান, সেনাপতি তোমাকে কেন বন্দী করে রেখেছে?’ তিনি বললেন, ‘আমাকে মদ্যপানের অভিযোগে তিনি বন্দী করেননি। কারণ, আমি জাহেলী যুগে মদ্যপান করতাম; বরং আমি কবি। আমার মনে যা আসে, আমি তা-ই বলে ফেলি। আমার কথাই আমাকে বিপদে ফেলে। এ জন্য তিনি আমাকে বন্দী করেছেন। আমি আমার এক কবিতায় বলেছি,

إِذَا مِتُّ فَأَذْفَنِي إِلَى أَصْلِ كَرْمَةٍ تُرَوِّي عِظَامِي بَعْدَ مَوْتِي عُرْقَهَا

وَلَا تَدْفِنَنِي بِالْفَلَاةِ فَإِنِّي أَخَافُ إِذَا مَامَتْ أَلَا أذْوَقَهَا

وَتُرَوَّى بِخَيْرِ الْحِصْنِ لِحْدِي فَإِنِّي أَسِيرُ لَهَا مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ أُسَوِّقُهَا

যদি আমি মারা যাই, তাহলে আমাকে আঙুর বাগানে কবর দিয়ে যাতে তার মাতাল রসে আমার শিরা-উপশিরা তৃপ্ত থাকে।

আমাকে কোনো মরুভূমিতে কবর দিয়ে না; আমার ভয় হয়, আমি হয়তো কখনোই আর এর স্বাদ পাব না।

আঙুরের মাদকতায় আমার কবরের সব ধূলিকণা সিক্ত হয়ে উঠবে আর আমি তখন তার স্বাদ আশ্বাদন করব।

পরদিন সালামা সেনাপতি সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট সব ঘটনা খুলে বলেন। তিনি তাকে ডেকে মুক্ত করে দিয়ে বলেন, ‘এখন থেকে আমি আর কখনোই তোমাকে ধরব না যদি তুমি যা বলো, তা করে থাকো।’ আবু মাহজান বললেন, ‘আমি আর কখনো জিহ্বার মন্দ কথায় সাড়া দেব না।’^{৪১২}

আস-সাওয়াদ রাতের শেষ দিকে কাকা রা.-এর পরিকল্পনা

আস-সাওয়াদ রাতের শেষ অর্ধেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা সংঘটিত হয়। এ সময় কাকা ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু পরের দিন মুসলমানদের মনোবল ও শক্তি বৃদ্ধিতে নতুন এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি তার বাহিনীকে রাতেই যুদ্ধ ময়দান ত্যাগ করে দূরে কোথাও অবস্থান নিতে বলেন। এক শ সৈন্যের ছোট ছোট দলে তাদের বিভক্ত করেন এবং পরের দিন প্রত্যুষে একের পর এক আবার রণক্ষেত্রে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। তিনি তাদের বলেন, ‘সূর্য ওঠার পর একসঙ্গে এক শ জন আসবে; যখনই কোনো দল দৃষ্টির আড়াল হবে, তখন আবার এক শ জনকে পাঠাবে। যদি হাশিমও একই নীতি অনুসরণ করে, তাহলে ভালো। আর তা নাহলে এভাবে আমরা আমাদের লোকজনের মনোবল ও শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হব।’

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কাকা রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রহরী নিযুক্ত করলেন। তিনি দূর থেকে এক অশ্বারোহী বাহিনীকে আসতে দেখে তাকবীর বলে উঠলেন এবং লোকজনও তাকবীর বলল। তারা বলতে লাগল, ‘নতুন সাহায্য-সৈন্য এসে পড়েছে।’ তার ভাই আসিম ইবনে আমরও একই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন এবং তার লোকদের একই কাজ করতে বলেন। তারা রণক্ষেত্রে অন্য আরেক দিক থেকে প্রবেশ করে। কাকা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীর শেষ দলটি আসার পরেই হাশিম ইবনে উতবাও সিরিয়া থেকে সাত শ মুজাহিদ নিয়ে প্রবেশ করেন।

কাকা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীর শেষ দলটি এসে পৌঁছার পর হাশিম রাযিয়াল্লাহু আনহু সত্তর জন সৈন্য নিয়ে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেন।^{৪১৩}

^{৪১২} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৭৪।

^{৪১৩} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৭৫।

এখানে হাশিম ইবনে উতবার বিনয় দেখার মতো। তিনি কাকা রাযিয়াল্লাহু আনহুর রণকৌশল মেনে নেন। তিনি তার বাহিনীকে সত্তর জনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করেন, যেমন কিনা কাকা রাযিয়াল্লাহু আনহু করেছিলেন। তিনি তার অধীন এক সেনাপতির রণকৌশল মেনে নিতে কার্পণ্য করেননি। এ ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিত্ব কিংবা অবস্থান কোনো বাধা হয়ে ওঠেনি। তিনি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে গড়া মানুষ, যারা ইসলামের স্বার্থে নিজেদের সব চাওয়া-পাওয়া বিসর্জন দিতে শিখেছেন। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমে এটাই তাদের বিজয়ের অন্যতম কারণ এবং তারা তদানীন্তন পরাশক্তিদের এ কারণেই পরাভূত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।^{৪১৪}

২.৪.৩। ইমাস দিবস

এটি ছিল যুদ্ধের তৃতীয় দিন; ইমাস দিবস। পারস্যের সেনাপতিরা নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আবির্ভূত হয়। যুদ্ধের প্রথম দিন মুসলিম সেনারা তাদের হাতির বাক্স ও দড়ি কেটে দেয়। ফলে তারা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল, তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিটি হাতির সঙ্গে পদাতিক বাহিনীর সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে। আর পদাতিক সৈন্যদের রক্ষায় অশ্বারোহী সেনাদের নিযুক্ত করে। মুজাহিদরা হাতি, হাতির ওপরে ও চারিদিকে অবস্থানরত সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যায় এবং বস্তুত তারা এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের এই কঠিন অবস্থা দেখে বিচলিত হন। তিনি দলের সঙ্গে থাকা কিছু পারসিক মুসলমানকে ডেকে হাতি থেকে পরিত্রাণের উপায় ও তাদের দুর্বল দিক সম্পর্কে জানতে চান। তারা তাকে জানান যে, হাতির দুর্বল পয়েন্ট হচ্ছে গুঁড় ও চোখ; এগুলো অকেজো করে দিলে হাতি অনিবার্যভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। দ্রুত সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু কাকা ইবনে আমর ও আসিম ইবনে আমরের নিকট নির্দেশ পাঠালেন : ‘সাদা হাতিটাকে বধ করো।’ কাকা হাতিটির ব্যাপারে জ্ঞাত ছিলেন এবং এর কাছাকাছিই ছিলেন। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হাম্মাল ইবনে মালিক এবং রুবাইবিল ইবনে আমর আল-আসদির নিকটও নির্দেশ প্রেরণ করেন, ‘তোমরা ঘেয়ো

^{৪১৪} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৪৬৬।

হাতিটিকে শায়েস্তা করো।' তারাও এ হাতির ব্যাপারে জানতেন এবং কাছাকাছিই ছিলেন।

কাকা এবং আসিম কিছু পদাতিক ও অশ্বারোহী সদস্য নিয়ে হাতির দিকে এগিয়ে যান। তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হাতিটিকে ঘিরে ফেলো এবং এটিকে বিভ্রান্ত করো।' সত্যি সত্যি হাতিটি ডান-বামে বিভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করতে লাগল। চারিদিকে মানুষ দেখে সে কোনদিকে তাড়া করবে, বুঝে উঠতে পারছে না। এই সুযোগে কাকা এবং আসিম হাতিটির নিকটে অগ্রসর হলেন। তারা তাদের বর্শা দিয়ে দুরন্ত নিশানায় হাতির চোখ দুটো ঘায়েল করে ফেলে। এতে হাতি উত্তেজিত হয়ে এর আরোহীকে ছুড়ে ফেলে। তারপর তরবারির এক আঘাতে কাকা হাতিটির শূঁড় কেটে দেন। হাতিটি তখন একদিকে কাত হয়ে পড়ে যায়। আর তাতে এর ওপরে থাকা পারসিক সৈন্যরা চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করে।

হাম্মাল ইবনে মালিক ঘেয়ো হাতির দিকে এগিয়ে যান এবং রিবাইল ইবনে আমরকে বলেন, 'হয় তুমি হাতির শূঁড়ে আঘাত করো, তাহলে আমি এর চোখ বরাবর নিশানা করব। আর যদি তুমি এর চোখে আঘাত করতে চাও, তাহলে আমি এর শূঁড় কেটে দেব।' রুবাইবিল শূঁড়ে আঘাত করতে মনস্থ করেন। হাম্মাল বর্শা দিয়ে হাতিটির চোখ অন্ধ করে দেয়। হাতিটি পেছনে কাত হয়ে পড়ে যায়। এরপর সেটি উঠে দাঁড়ালে রুবাইবিল তরবারির আঘাতে এর শূঁড় কেটে দেয়। হাতির ওপর বসে থাকা পারসিক সৈন্য এ দৃশ্য দেখে এবং রুবাইবিলের মাথা ও নাক বরাবর কঠিন আঘাত করে। তবে রুবাইবিল ও হাম্মাল দুজনই অক্ষত ফিরে আসতে সক্ষম হন। এদিকে অন্যান্য হাতিগুলো নেতৃস্থানীয় দুটি হাতিকে হারিয়ে শূকরের মতো বিকট আওয়াজ করে রণক্ষেত্র থেকে দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। পারসিক সেনাদের সারি ছত্রভঙ্গ করে আতীক নদীতে ঝাঁপ দেয় এবং মাদাইনের দিকে পালাতে থাকে। আর এসব হাতির সব আরোহীই নিহত হয়।^{৪১৫}

রণক্ষেত্র হাতিমুক্ত হতেই উভয়পক্ষের সৈনিকরা একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকে এবং যুদ্ধ কঠিন আকার ধারণ করে। পারসিক

বাহিনীতে কিছু বীর যোদ্ধা মজুদ ছিল। যদি তাদের কোনো সারিত গ্যাপ তৈরি হতো, তখনই ইয়াযদগিরদ সেখানে সৈন্য পাঠিয়ে তা পূরণ করার চেষ্টা করত। ওই দিন উভয়পক্ষই সমানে সমান যুদ্ধ করে ক্ষান্ত হয়।^{৪১৬}

আমর ইবনে মাদি কারিবের বীরত্ব

আমর ইবনে মাদি কারিব বলেন, ‘আমি হাতি এবং এর চারিদিকে অবস্থানরত সৈনিকদের আক্রমণ করতে যাচ্ছি। একটি উটকে জবাই করতে যতক্ষণ সময় লাগে, এর চেয়ে বেশি সময় আমাকে একা ফেলে যেয়ো না। যদি এতে দেরি করো, তাহলে আবু সওরকে (মানে আমাকে) আর জীবিত পাবে না। আর তোমরা আবু সওরের মতো আরেকজন লড়াকু সৈনিক কোথায় পাবে? যদি তোমরা সময়মতো আসো, তাহলে আমার তরবারি আমার হাতেই দেখতে পাবে।’ এ কথা বলেই আমর ইবনে মাদি কারিব শত্রুদের আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অগ্রসর হতে হতে ধুলোর আস্তরণে হারিয়ে যায়। তারা সাথিরা বলাবলি করল, ‘কিসের জন্য অপেক্ষা করছ? তোমরা তো তাকে হারিয়ে ফেলবে। আর যদি তাকে হারিয়ে ফেলো, তাহলে মুসলিম জাতি তাদের এক অভিজাত বীর সন্তানকে হারাবে।’ তারপর তারাও শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুশরিকরা আমর ইবনে মাদি কারিবকে ছুরিকাহত করে মাটিতে ফেলে দেয়। কিন্তু তখনো তার হাতে তরবারি থাকায় তা দিয়ে তিনি শত্রুদের প্রতিহত করার চেষ্টা করছিলেন। তার ঘোড়াও আহত হয়। তিনি তার সঙ্গীদের দেখলেন এবং পারসিকরাও তখন তার থেকে দূরে সরে গেছে, তখন তিনি এক পারসিক সৈন্যের ঘোড়ার পা ধরে ফেলেন। পারসিক সৈন্যটি ঘোড়াকে চালানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে; ঘোড়া হোঁচট খেল এবং পারসিক সৈন্যটি আমরকে দেখতে পেল। সে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। অন্যান্য মুসলমান সৈনিকরা দেখে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে। পারসিক সৈন্য ঘোড়া থেকে নেমে দৌড়ে তার সঙ্গীদের কাছে চলে যায়। আমর তখন বলেন, ‘আমাকে ঘোড়ার রশিটি দাও।’ তাকে তা দেওয়া হলে তিনি তার ওপর চড়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন।^{৪১৭}

^{৪১৬} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৭৬।

^{৪১৭} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৭৮।

তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ আল-আসাদি

তৃতীয় দিন রাতেও যুদ্ধ চলতে থাকে। তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ আল-আসাদি যুদ্ধ করতে করতে শত্রুপক্ষের পেছনের সারি ভেদ করে চলে যান। তখন তার আওয়াজ শোনা যায়। তিনি তাদের যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করেন এবং তখন যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। তার চিৎকারে পারসিকরা ভয় পেয়ে যায় এবং মুসলমানগণ বিস্মিত হয়। তারা যুদ্ধ বন্ধ করে চারিদিক দেখতে থাকে যে, আসলে কী হচ্ছে। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে এমন স্থানে প্রেরণ করেন যেখানে মুসলমানদের বিপদে পড়ার আশঙ্কা ছিল। তিনি তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শত্রু-লাইন অতিক্রম করেন এবং পারসিকদের পেছন থেকে বেরিয়ে এসে তিনবার তাকবীর-ধ্বনি—আল্লাহু আকবার—দেন।^{৪১৮} তার এই কৌশল খুব কার্যকরী ছিল। যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাতে লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

কাইস ইবনে আল-মাকশুহ

হাশিম ইবনে উতবার সঙ্গে তিনি সিরিয়া থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তার লোকদের বলেন, ‘হে আরব, আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের ইসলামে দাখিল করে তার রহমতে সিদ্ধ করেছেন এবং তার রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিয়ে সম্মানিত করেছেন। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে একে অন্যের ভাই হয়েছে। তোমাদের আহ্বান একই এবং তোমরা ঐক্যবদ্ধ। এর আগে তোমরা পরস্পর শত্রুতায় লিপ্ত ছিলে। একে অন্যের সঙ্গে সিংহের মতো লড়াই করতে এবং ভল্লুকের মতো অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নিতে। আল্লাহকে সাহায্য করো। তাহলে আল্লাহও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তিনি পারসিকদের ওপর তোমাদের বিজয় দান করবেন। আল্লাহ তোমাদের ভাইদের সিরিয়ায় বিজয় দান করেছেন। তারা সেখানে লাল প্রাসাদ ও দুর্গ দখল করে নিয়েছে।’^{৪১৯}

^{৪১৮} প্রাগুক্ত, ৪/৩৮২।

^{৪১৯} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৭৮।

আল-হারির রজনী

চতুর্থ দিন শুরু হওয়ার আগের রাতেই আবার যুদ্ধ শুরু হয়। এ রাতকে হারির রজনী বলা হয়। পারসিকরা এ রাতে তাদের যুদ্ধকৌশলে পরিবর্তন আনে। রুস্তম উপলব্ধি করে যে, তার অশ্বারোহী বাহিনী মুসলমানদের অশ্বারোহীদের মতো বীরত্ব প্রদর্শন করতে পারছে না। এমনকি তার ধারে-কাছেও নেই। এ জন্য সে পুরো বাহিনী দিয়ে একত্রে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাহলে অতীতের মতো তাদের আর পেছনে সরে আসতে হবে না। এর আগের ঘটনায় সৈনিকদের মনোবল ধ্বংস করে দিয়েছে। মল্লযুদ্ধে মুসলমানদের বিস্ময়কর বীরত্ব দেখে আর কোনো পারসিক সেনা মল্লযুদ্ধ করার সাহস পায়নি। রুস্তম তার বাহিনীকে তেরোটি লাইনে সারিবদ্ধ করে; কেন্দ্রসহ উভয় বাহুতেই। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকবীর বলার আগেই বাহিনীর সেরাদের নিয়ে কাকা ইবনে আমর যুদ্ধ শুরু করে দেন। পরে তিনি তাদের থামিয়ে দেন এবং এ জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। তারপর তিনি তিনবার তাকবীর বলার পর সকল সেনাপতি ও সৈন্যরা তিন সারিতে সম্মুখে অগ্রসর হয়; তিরন্দাজ বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী এবং পদাতিক বাহিনী। ওই রাতে যুদ্ধ মারাত্মক আকার ধারণ করে। তারা প্রথম রাত থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যান। যুদ্ধের ময়দানে কোনো কথার আওয়াজ শোনা যায়নি। কেবল ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ (আল-হারির) ছাড়া। এ জন্য এ রাতকে হারির রজনী বলে। মুসলমানরা একে অন্যকে সর্বাত্মক শক্তি দিয়ে লড়াই করার জন্য উৎসাহ দিতে থাকেন। কারণ, তারা প্রচণ্ড লড়াইয়েরই আশঙ্কা করছিলেন। তাদের কথা-বার্তা অনুযায়ী এ রকমই মনে হয়। নিচে কিছু বর্ণনা করা হলো^{৪২০} :

দুরাইদ ইবনে কাব আন-নাখাসী লোকজনকে বলেন, “আজ রাতে মুসলমানগণ সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সুতরাং তাদের প্রথম হওয়ার চেষ্টা করো; আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সবার আগে জিহাদে অগ্রসর হও। আজ রাতে যে অন্যকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে, সে-ই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পুরস্কার লাভ করবে। শাহাদাতের জন্য মরিয়া হয়ে তাদের মোকাবিলা করো এবং মৃত্যুকে সন্তুষ্টিতে গ্রহণ করো। যদি তুমি

বেঁচে থাকতে চাও, মৃত্যুকে এড়ানোর এটাই শ্রেষ্ঠ উপায়। আর যদি তানা চাও, তাহলে আখেরাত তেমনই, হবে যা তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ।’

আল-আশআস ইবনে কাইস বলেন, ‘হে আরব, এসব লোকেরা (পারস্য বাহিনী) মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার ক্ষেত্রে তোমাদের থেকে বেশি উৎসাহিত এবং দুনিয়াকে অবজ্ঞা করার ক্ষেত্রে তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী যেন না হয়। নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের জন্য লড়াইয়ে প্রতিযোগিতা করো এবং মৃত্যুকে ভয় পেয়ো না। কারণ, মহান লোকেরা এর মাধ্যমেই শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করে।’^{৪২১}

হুমাইদাহ ইবনে আন-নুমান আল-বারাকি বলেন, ‘হারির রজনিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত এক পারসিক বাহিনী যুফা গোত্রের সম্মুখে ছিল। তারা তাদের দিকে অগ্রসর হয়ে তরবারি দিয়ে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, কিন্তু তারা দেখতে পেল তাদের তরবারি তাদের শিরজ্ঞাণ ভেদ করতে পারছে না। এ জন্য তারা পেছনে সরে আসে।’ হুমাইদাহ ইবনে আন-নুমান তাদের বলেন, ‘তোমাদের কী হলো?’ তারা বলল, ‘আমাদের অস্ত্র তাদের বিরুদ্ধে কোনো কাজেই আসছে না।’ তিনি বললেন, ‘অপেক্ষা করো। আমি তোমাদের দেখাচ্ছি কীভাবে তা কাজে লাগাতে হয়।’ সুতরাং তারা দেখতে লাগল। হুমাইদাহ ইবনে আন-নুমান শত্রুদের একজনকে পেছন থেকে আক্রমণ করলেন, বর্শার আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করলেন।’ তারপর লোকদের কাছে ফিরে এসে বললেন, ‘তাদের হত্যা করার এটাই পদ্ধতি।’ তারপর সবাই শত্রুদের বিরুদ্ধে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের বিতাড়িত করে।’^{৪২২}

পারসিক এক কমান্ডার তুরক আত-তাবারির বাহিনী মুসলমানদের কিন্দা গোত্রের নিকটেই অবস্থান করছিল। আল-আশআস ইবনে কাইস আল-কিন্দি বললেন, ‘হে লোকসকল, তাদের দিকে অগ্রসর হও।’ তারপর তারা সাত শ মুজাহিদ নিয়ে ওই বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে এবং তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। আর তিনি নিজেই কমান্ডার তুরককে হত্যা করেন।

^{৪২১} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৮৪।

^{৪২২} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৮৬।

এ রাতে যুদ্ধ ভয়াবহ হয়ে ওঠে এবং অনবরত চলতে থাকে। গোত্রের নেতারা লোকজনকে দৃঢ়পদ ও ধৈর্যধারণে উৎসাহিত করতে থাকেন। আনাস ইবনে আল-হুলাইস থেকে আত-তাবারি কর্তৃক বর্ণিত এক বর্ণনা যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা যায়। তিনি বলেন, ‘আমি আল-হারির রজনিতে উপস্থিত ছিলাম। সে রাতে সকাল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অস্ত্রের ঝনঝনানি কামারের লোহা পেটানোর শব্দের মতোই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। তারা সে রাতে চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এমন এক রাত অতিক্রম করেন, যা তিনি কখনোই করেননি। আরব ও পারসিকরা এমন যুদ্ধ কখনো দেখেনি। রক্তম কিংবা সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে কোনো খবরই আসছিল না। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু অর্ধরাত পর্যন্ত দুআয় মশগুল ছিলেন।

সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পেরেছিলেন, বিজয় খুব সন্নিকটে। এ জন্য সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাতে দুআয় মশগুল থাকেন এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা করেন। এখানে উল্লেখ্য, সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ‘মুসতাজাবুদ দাওয়া’, মানে তার দুআ কবুল করা হতো।^{৪২৩}

২.৪.৪। কাদেসিয়া দিবস

চতুর্থ দিনেও যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। কাকা ইবনে আমর লোকদের মধ্যে গিয়ে ঘোষণা করলেন, ‘ধৈর্যধারণকারীদের জন্য বিজয় অনিবার্য। সুতরাং আর কিছু সময় ধৈর্যধারণ করো এবং প্রবল বিক্রমে আক্রমণ করো। ধৈর্যধারণের মাধ্যমেই বিজয় অর্জিত হয়। সুতরাং অস্থিরতার পরিবর্তে ধৈর্যকে প্রাধান্য দেবো।’ অনেক নেতৃস্থানীয় লড়াকু বীর এসে তার চারিদিকে জমা হয়। তারপর তারা রক্তমের কেন্দ্রীয় বাহুতে আক্রমণ করে এবং এক পর্যায়ে তারা তার খুব নিকটে পৌঁছে যায়। গোত্রের লোকেরা এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলে তাদের নেতারা জ্বালাময়ী বক্তব্য দেন। কাইস ইবনে আবদি ইয়াগসুস, আশআস ইবনে কাইস, ইমর ইবনে মাদি ইয়াকরিব, ইবনে যি আস-সাহমাইন, খাসামি এবং ইবনে যি আল-বুরমাইন আল-হিলালি উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, ‘তোমাদের থেকে এসব লোকদের (পারসিক বাহিনী) মধ্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার সাহস কখনোই বেশি

^{৪২৩} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৪৭৪।

নয়, অথবা দুনিয়াকে অবজ্ঞা করার ক্ষেত্রে তোমাদের চেয়ে তারা অগ্রগামীও নয়।' রাবিআ গোত্রের কয়েকজন দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমরা পারসিক বাহিনী সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানো এবং ইতিপূর্বে তাদের বিরুদ্ধে অসীম সাহসিকতার পচিয় দিয়েছ। এখন অতীতের মতো সাহসী ভূমিকা রাখতে তোমাদের কিসে বাধা দিচ্ছে?'^{৪২৪}

সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে কাকা ইবনে আমরের বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার আরেকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মূলত তার বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির অনেক ঘটনা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বিরল সাহস, বিচক্ষণতা এবং দৃঢ় ঈমান দান করেছিলেন। আর তিনি মুসলমান ও ইসলামের স্বার্থে সব যোগ্যতারই পরিপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। কাকা অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, টানা এক দিন ও এক রাত যুদ্ধ করে পারসিকরা ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছে। এর আগে দুদিন যুদ্ধের মধ্যে সামান্য সময় বিরতি পেয়েছিল। তার অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির কারণে এবং আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যুদ্ধের সাফল্য তাদের দিকেই ঝুঁকবে, যারা এ দীর্ঘ ও কষ্টকর লড়াইয়ে ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হবে। কাকা এবং তার সঙ্গে থাকা সাহসী বীরগণ পারসিক বাহিনীর কেন্দ্রীয় বাহুতে আঘাত হানেন এবং দুপুর নাগাদ লড়াই করে রক্তমকে তাদের হাতের নাগালে পেয়ে যান। আর এ মুহূর্তেই আল্লাহর সাহায্য নেমে আসে এবং তিনি তার প্রিয় ও নিকটতম বান্দাদের (আউলিয়ায়ে কেরাম) তার সৈন্যসামন্ত দিয়ে সাহায্য করেন; এক ভীষণ ঝড়, দাবুর বা পশ্চিমা বাতাস রক্তমের রাজকীয় আসনের তাঁবু উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং সেটিকে আতীন নদীতে নিক্ষেপ করে। তারপর ধূলিঝড়ে পারসিক বাহিনীর দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে এবং তারা আত্মরক্ষা করতে ব্যর্থ হয়।^{৪২৫}

রক্তমকে হত্যা করার ঘটনা

ধূলিঝড় প্রশমিত হলে কাকা এবং তার বাহিনী পারসিকদের সেনাপতি রক্তমের সিংহাসন দেখতে পায়। রক্তম সিংহাসন ছেড়ে একটি খচ্চরের পেছনে আশ্রয় নেয়, যা তার ওপর গিয়ে পড়ে এবং তার পাঁজরের একটি

^{৪২৪} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৮৭।

^{৪২৫} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৪৭৬।

হাড় ভেঙে যায়। রুস্তম আতীক নদীর দিকে পালিয়ে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, কিন্তু হিলাল তাকে ধরে ফেলে। তিনি তার পা ধরে হেঁচড়াতে থাকেন এবং তাকে হত্যা করেন। তারপর তিনি সিংহাসনে উঠে চিৎকার দিয়ে বলেন, ‘কাবার রবের শপথ, আমি রুস্তমকে হত্যা করেছি।’ পারসিক বাহিনীর মূল দল পলায়ন করে। মুসলমানগণ তাদের বিপরীতে অবস্থানরত পারসিক বাহিনীর দিকে অগ্রসর হয় এবং পারসিকরা পালিয়ে যায়।

রুস্তমের নিহত হওয়ার পর খবর পেয়ে জালিনূস নদীর বাঁধের ওপর দাঁড়ায় এবং পারসিকদের নদী পার হতে বলে। মৃত্যু থেকে বাঁচতে তারা নদী পার হতে থাকে। পারসিক সেনাদের মধ্যে যারা শেকল পরা ছিল—সংখ্যায় তিরিশ হাজার—তারা আতীক নদীর দিকে যেতে থাকে। মুসলমানগণ বর্শা দিয়ে তাদের হত্যা করে এবং তাদের কেউই প্রাণে বাঁচতে পারেনি।^{৪২৬}

যুদ্ধের সমাপ্তি

আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে মুসলিম বীরদের সাফল্য ও সেনাপতি সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিচক্ষণতায় যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এটা ছিল এক ভয়াবহ ও কঠিন যুদ্ধ। সাধারণত মুসলমানগণ এক দিনেই শত্রুদের পরাজিত করে বিজয় লাভ করে থাকে। কিন্তু এখানে শত্রুরা তিন দিন ধরে মুসলিম মুজাহিদদের আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে। পরিশেষে আল্লাহ মুসলমানদের চতুর্থ দিনে বিজয় দান করেন। শত্রুদের এই প্রতিরোধের অন্যতম কারণ, পারসিকরা এটিকে তাদের চূড়ান্ত লড়াই হিসাবে গণ্য করে : যদি তারা বিজয় লাভ করে, তাহলে তারা তাদের রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে, কিন্তু যদি পরাজিত হয়, তাহলে তারা চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। আরেকটি কারণ, এই যুদ্ধে তাদের মহাবীর রুস্তম সশরীরে উপস্থিত ছিল। সে ছিল পারসিক সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তার কোনো পরাজয়ের ইতিহাস ছিল না। এর সঙ্গে ছিল পারসিকদের উন্নত যুদ্ধাস্ত্র ও বিপুল সৈন্যসংখ্যা। পারসিক বাহিনীর মূল যোদ্ধা ছিল এক

লাখ বিশ হাজার। এতে তাদের অনুসারীদের গণনা করা হয়নি। আবার এর বাইরে ইয়াযগিরদ প্রতিনিয়ত আরও সাহায্য-সৈন্য প্রেরণ করেছেন, যার সংখ্যাও ছিল অনেক। আর মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র তিরিশ হাজার।^{৪২৭} সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মুসলমানগণ বিজয় লাভ করে এবং তাদের সাড়ে আট হাজার মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন।^{৪২৮} মুসলমানদের অন্য কোনো যুদ্ধে এত অধিকসংখ্যক শহীদ কোথাও হয়নি। এ থেকেই যুদ্ধের ভয়বহতা উপলব্ধি করা যায় এবং এই কঠিন পরিস্থিতিতেও মুজাহিদগণ নিজেদের জান বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হননি। মহান আল্লাহ তা‘আলা তাদের সকলের ওপর সন্তুষ্ট হোন।^{৪২৯}

পরাজিত বাহিনীকে ধাওয়া

সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের পরাজিত শত্রুদের পেছনে ধাওয়া করার আদেশ জারি করেন। তিনি কাকা ইবনে আমর এবং শুরাহবিল ইবনে আস-সামত আল-কিন্দিকে ডান-বামে শত্রুদের যারা আতীক নদী অতিক্রম করতে পারেনি, তাদের ধাওয়া করতে প্রেরণ করেন। আর যারা নদী অতিক্রম করে গিয়েছিল, তাদের ধাওয়া করার জন্য যুহরা ইবনে আল-হাওইয়্যাহকে তার দলসহ প্রেরণ করেন। পারসিকরা নদীর বাঁধে একটি ছিদ্র করে দেয়, যাতে মুসলমানগণ তাদের অনুসরণ করতে না পারে। কিন্তু যুহরা এবং তার সঙ্গে তিন শ অশ্বারোহী সেটি ভালোভাবেই অতিক্রম করেন। আর বাকিদের সেতু পার হয়ে তার সঙ্গে যোগ দিতে বলেন। সেতুটি একটু দূরে অবস্থিত ছিল। পারসিক বাহিনীর একজন নেতৃস্থানীয় সেনাপতি জালিনূস পালিয়ে যাওয়া পারসিক বাহিনীর নিরাপত্তায় সকলের পেছনে ছিল। যুহরা তাকে ধরে ফেলেন এবং তারা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। যুহরা তাকে হত্যা করেন এবং তার পরিধেয় বর্মটি খুলে নেন। তারা পারসিকদের আরও কিছু দূর পর্যন্ত ধাওয়া করেন, তাদের কয়েকজনকে হত্যা করেন এবং সন্ধ্যায় কাদেসিয়ায় ফিরে আসেন।^{৪৩০}

^{৪২৭} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৮৮।

^{৪২৮} প্রাগুক্ত।

^{৪২৯} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৪৭৯।

^{৪৩০} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৮৯।

উমর রা.-এর নিকট বিজয়ের সংবাদ পৌঁছল

সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আমীরুল মুমিনীন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট কাদেসিয়া যুদ্ধের বিজয়-সংবাদ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। চিঠিটি বহন করে নিয়ে যান উমাইলা আল-ফাযারি। তিনি তার চিঠিতে বলেন, ‘এক দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আল্লাহ তা‘আলা আমাদের পারসিক বাহিনীর ওপর বিজয় দান করেছেন। আর আল্লাহ তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় একই শক্তি দিয়েছেন। তার এত অধিক সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, যা ইতোপূর্বে কেউ দেখেনি। কিন্তু আল্লাহ তাদের এ সংখ্যাধিক্য ও অস্ত্রশস্ত্রের কারণে কোনো কল্যাণ দেননি; বরং তিনি মুসলমানদের সাহায্য করেছেন। মুসলমানগণ পরাজিত শত্রুদের নদীপথে, বনে-বাদাড়ে এবং পার্বত্য পথে ধাওয়া করেছেন। মুসলমানদের মধ্যে সাদ ইবনে উবাইদ আল-কারি, অমুক অমুক নিহত হয়েছেন এবং এমন বহু মুসলমান নিহত হয়েছেন, যা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা জানেন। তাদের সম্পর্কে তো তিনিই সম্পূর্ণ জ্ঞাত। মুসলিম মুজাহিদগণ রাতের বেলা মৌমাছির গুঞ্জনের মতো গুনগুন করে কুরআন মাজীদ তিলওয়াত করতেন। আর দিনের বেলায় তারা সিংহের রূপ ধারণ করতেন, যে সিংহের কোনো তুলনা হয় না। যারা আখেরাতের পথে পাড়ি জমিয়েছেন, তারা জীবিতদের চেয়ে শাহাদাত বরণের বিশেষ মর্যাদা ছাড়া অন্য কোনো অতিরিক্ত মর্যাদা লাভ করতে পারেননি। কারণ, জীবিতদের জন্য শাহাদাত বরণ মঞ্জুর হয়নি—শুধু এতটুকু পার্থক্য।’^{৪৩১}

এই চিঠি থেকে অনেকগুলো শিক্ষা লাভ করা যায়। নিচে এর কয়েকটি দেওয়া হলো :

তাওহীদের ব্যাপারে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সচেতনতা এবং কীভাবে তিনি মহান আল্লাহর গৌরব বর্ণনা করেছেন। আর এ ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি নিজে কোনো ক্ষমতা বা শক্তির অধিকারী নন; শত্রুর ওপর এ বিজয় সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে এবং এটি মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্যের কারণে আসেনি, যদিও এতে তারা শত্রুপক্ষের সংখ্যাধিক্য ও শক্তির বিরুদ্ধে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। যুদ্ধের ফলাফল

^{৪৩১} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪০৮; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ইফা, ৭/৯০।

কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর নির্ভর করে না; বরং এটি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনিই শত্রুদের শক্তি-সমার্থ্যকে অকেজো করে দিয়েছেন এবং তিনিই মুসলমানদের দুর্বল শক্তিকে কাজে লাগানোর সুযোগ দিয়েছেন। মানুষ তো কেবল তার নির্ধারিত উপকার বা ক্ষতি পৌছে দেওয়ার মাধ্যম। আল্লাহই একমাত্র শক্তি, যিনি ক্ষতি দূর করতে পারেন অথবা উপকার বয়ে আনতে পারেন। সুতরাং তাওহীদের মর্ম সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব ভালোভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন এবং তিনি তার সৈন্যদের এ বোধ থেকেই দিনের পর দিন পরিচালনা করেছেন।

তার চিঠিতে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি সাহাবা এবং তাবয়ীদের ইবাদত ও যুদ্ধে তারা সর্বাত্মক দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তারা রাতে ইবাদতে মশগুল হতো, মৌমাছির গুঞ্জনের মতো তারা কুরআন তিলওয়াত করত। তারা কখনোই ক্রান্ত কিংবা অস্থির হননি। আর দিনে তারা ছিল বীর যোদ্ধা, যাদের সাহস ও দৃঢ়তা সিংহকেও হার মানায়।^{৪৩২}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রতিদিন মদীনার বাইরে এসে কাদেসিয়া থেকে কোনো সংবাদবাহকের আগমনের অপেক্ষায় থাকতেন। তিনি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সেখানে বসে থাকতেন এবং তারপর মদীনায় ফিরে আসতেন। একদিন তিনি অভ্যাসমতো বসে আছেন। এমন সময় একজন উটারোহীকে দেখা গেল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি কোথেকে এসেছ?’ দূত জবাব দিল, কাদেসিয়া থেকে। তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহর বান্দা, আমাকে বলো সেখানে কী হয়েছে!’ সংবাদবাহক বলল, ‘আল্লাহ শত্রুদের পরাজিত করেছেন।’ দূত শহরের দিকে দ্রুত উট চালিয়ে যাচ্ছে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পেছনে পেছনে দৌড়াতে লাগলেন, তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। উটের ওপর আসীন দূত বুঝতে পারেনি সে কার সঙ্গে কথা বলছে। তারপর তারা যখন মদীনায় প্রবেশ করল, তখন লোকেরা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আমীরুল মুমিনীন বলে সম্বোধন করে সালাম পেশ

করতে শুরু করল। এ-সময় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দূত বলল, ‘আল্লাহ আপনার ওপর কল্যাণ বর্ষণ করুন, আপনি আমাকে আগে বলেননি কেন যে, আপনিই আমীরুল মুমিনীন? উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘এ জন্য তুমি চিন্তিত হোয়ো না, হে আমার ভাই।’^{৪৩৩}

এ ঘটনা থেকে অনেকগুলো শিক্ষা লাভ করা যায়। নিচে এর কয়েকটি দেওয়া হলো :

- ✓ উম্মতের কল্যাণের চিন্তায় অস্থির থাকতেন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু। এ চিন্তাই তাকে প্রতিদিন মদীনার বাইরে উন্মুক্ত মরুপ্রান্তরে টেনে নিয়ে যেত। তিনি ইরাক থেকে আগত কোনো দূতের আশা করতেন, যার কাছ থেকে তিনি মুসলমান ও তাদের শত্রুদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন। এ কাজে তিনি অন্য কাউকে দায়িত্ব দিলেও পারতেন, যে তার নিকট খবর নিয়ে আসতে পারত। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও উৎকর্ষার কারণে তিনি তা করেননি। এটিই চরম কল্যাণকামিতা এবং পরিপূর্ণ দায়িত্ববোধ।
- ✓ বিনয়ের চরম পরাকাষ্ঠা : উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু দূতের উটের সাথে সাথে দৌড়াচ্ছেন এবং যুদ্ধের বিভিন্ন তথ্য জানার চেষ্টা করছেন। দূত খলীফার নিকট পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত তাকে বিস্তারিত বলতে চায়নি এবং বুঝতেও পারেনি যে, সে যার সঙ্গে কথা বলছে তিনিই খলীফা। মদীনায় পৌঁছার পর লোকজনের প্রতিক্রিয়া দেখে সে খলীফার পরিচয় জানতে পারে। এটিই সর্বোত্তম চরিত্র ও আচরণ যে জন্য মুসলমানরা সারা জগতে সব জাতির ওপর গর্ব করতে পারে। এটিই ইসলামের মহান শিক্ষা ও চেতনা, যা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো ব্যক্তিত্ব তৈরি করতে পারে, যিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও বিনয়ী।^{৪৩৪}

^{৪৩৩} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪০৮।

^{৪৩৪} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৪৮৮।

২.৫। শিক্ষা ও ফায়দা

২.৫.১। যুদ্ধের তারিখ এবং বিজয়ের ক্ষেত্রে এর প্রভাব

ইতিহাসবিদদের মধ্যে এই যুদ্ধের তারিখ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। প্রফেসর আহমাদ আদিল কামাল বিস্তারিতভাবে বিষয়টি গবেষণা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কাদেসিয়া যুদ্ধ ১৫ হিজরীর শাবান মাসে সংঘটিত হয়েছিল।^{৪৩৫} আমার নিকট এ মতটিই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়।

এতে কোনো সন্দেহ নেই, ইতিহাসে যতগুলো চূড়ান্ত লড়াই সংঘটিত হয়েছে তার মধ্যে কাদেসিয়ার যুদ্ধের অবস্থান সবার ওপরে এবং এ যুদ্ধে ঐশ্বরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও বাস্তবায়িত হতে দেখা যায়, যা কেবল ঈমানদারদের জন্যই বরাদ্দ। এ বিজয়ের ফলে মুসলমানদের জন্য ইরাক এবং পারস্যের সকল দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। তারপর থেকে মুসলমানগণ একের পর এক বিজয় অর্জন করতে থাকেন। এ যুদ্ধ রাজনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে সাসানীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটায় এবং ধর্মীয়ভাবে ম্যাগিয়ান ধর্মকে ধ্বংস করে। তখন থেকে পারস্য ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইসলামের প্রচার-প্রসার শুরু হয়। কাদেসিয়া যুদ্ধে মুসলমানগণ পারসিক বাহিনীর ওপর এমন আঘাত হানেন, যা তারা আর কখনো সামলে উঠতে পারেনি। সুতরাং সংগত কারণেই ইতিহাসে কাদেসিয়া যুদ্ধ সকল চূড়ান্ত লড়াইয়ের শ্রেষ্ঠ লড়াই হিসাবে স্থান করে নেয়।^{৪৩৬}

২.৫.২। কাদেসিয়া যুদ্ধে বিজয়ের পর উমর রা.-এর ভাষণ

খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কাদেসিয়া যুদ্ধে বিজয় লাভের এই সুসংবাদ মিশ্বরে দাঁড়িয়ে লোকজনকে জানানেন। তারপর তিনি তাদের বললেন, ‘এখন আমাদের প্রত্যেকের যে সচ্ছলতা ও সামর্থ্য আছে, আমি মনে করি তাতে আমাদের সকলের অভাব পূরণ হয়ে যাবে। যদি তাতে সকল অভাব পূরণ না হয়, তাহলে আমরা কৃচ্ছতা সাধন করব যাতে

^{৪৩৫} আল-কাদিসিয়া, পৃ. ২৬৬; আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৪৮৮।

^{৪৩৬} আত-তারিখ ইলাল মাদায়িন, পৃ. ৪৭৩-৪৭৪।

পর্যাপ্ত পরিমাণের পরিসীমাতে আমরা সকলে সমান হয়ে যেতে পারি। আমি আশা করছি যে, আপনাদের কল্যাণ সাধন সম্পর্কে আমার অন্তরে যে মনোভাব ও মানসিকতা আছে তা আপনারা জেনে নেবেন। আমি কাজ ছাড়া আপনাদের অন্য কিছু শিক্ষা দেব না। আমি আপনাদের রাজা নই যে, আপনাদের সাথে ক্রীতদাসের ন্যায় আচরণ করব। আমি বরং আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে এই আমানত দিয়েছেন। আমি যদি আপনাদের এটি ফেরত দিয়ে আমি আপনাদের অনুসরণ করি, আর তাতে আপনারা নিজ নিজ ঘরে বসে বিনাশ্রমে তৃপ্তির সঙ্গে পানাহার করতে পারেন, তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। আর যদি ওই আমানত আমি বহন করি, আর আপনাদের আমার বাড়ির দিকে লাইন ধরতে বলি, তবে আমি নিজেকে দুর্ভাগা বলে গণ্য করব। তাতে আমি অল্পই খুশি হব এবং ভীষণভাবে দীর্ঘকাল ধরে দুঃখ পাব। কারণ, আমি তখন তা ফেরতও দিতে পারব না, ঠিকমতো রাখতেও পারব না। এমন অবস্থা থেকে আমি মুক্তি চাই।^{৪৩৭}

২.৫.৩। মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট আরেকটি চিঠি প্রেরণ করেন। তিনি তাতে ইরাকে আরব আহলে যিম্মিদের সঙ্গে করণীয় সম্পর্কে জানতে চান, যারা মুসলমানদের দুর্বল মুহূর্তে চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে লোকজনের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, ‘যদি কেউ নিজের খেয়াল-খুশিমতো কাজ করে, তাহলে গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে। আর এতে সে কেবল নিজেকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আর যে কেউ সুনাতকে অনুসরণ করবে, ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে সত্যের ওপর অটল থাকবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করবে, সে-ই প্রকৃতভাবে ভালো কাজ করছে এবং সফল। আল্লাহ বলেন,

وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۚ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি যুলুম করবেন না।^{৪৩৮}

^{৪৩৭} আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ইফা, ৭/৯১; তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪০৯।

^{৪৩৮} সূরা আল-কাহফ, ১৮ : ৪৯।

মুসলমানরা তাদের শত্রুদের পরাজিত করেছে এবং মূল অধিবাসীরা পালিয়ে গিয়েছে। আর এমন কিছু লোক রয়ে গেছে যারা পূর্বের চুক্তির ভিত্তিতে মুসলমানদের নিকট আশ্রয়প্রার্থী হয়েছে। আপনি তাদের ব্যাপারে কী বলবেন যারা দাবি করে যে, শত্রুদের সঙ্গে যোগ দিতে তাদের বাধ্য করা হয়েছে; আর যারা এ দাবি করেনি, তারা স্বেচ্ছায় ভূখণ্ড ছেড়ে চলে গেছে এবং যারা চলে যায়নি আবার এ দাবিও করেনি, কিন্তু আত্মসমর্পণ করেছে?’

মুসলমানগণ তাদের প্রতিশ্রুতির প্রতি সম্মান জানাতে সম্মত হলেন যারা রয়ে গিয়েছে ও মুসলমানদের কোনো ক্ষতি করেনি; যারা শত্রুর বাধ্যবাধকতার দাবি করেছে এবং তা বিশ্বাস করা হয়েছে; আর যারা চুক্তি যথাযথ মেনে চলেছে। তবে যাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি, তাদের নতুন চুক্তির আওতায় আনার জন্য বলা হলো। আর যারা নিজ ভূখণ্ড ছেড়ে পারসিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, তারা চাইলে মুসলমানদের সঙ্গে আবার চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে এবং তারা পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু যদি তারা তাতে সম্মত না হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। যারা এখনো অবস্থান করেছে এবং আত্মসমর্পণ করেছে, তাদের জিযিয়া কর প্রদান অথবা তা দিতে সম্মত না হলে চলে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে; কৃষকদেরও একই সুযোগ দেওয়া হলো।^{৪৩৯}

উপরিউক্ত ঘটনা থেকে অনেকগুলো শিক্ষা লাভ করা যায়। নিচে এর কয়েকটি দেওয়া হলো :

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু শূরা পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। তিনি যদিও দূরদর্শী ও অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তবু তার প্রিয় অভ্যাস ছিল তিনি রাষ্ট্রের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমাজের বিদ্বান ও প্রবীণদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। এটিই অন্যতম কারণ, যার ফলে এই উম্মতকে সুচারুভাবে শাসন করার ক্ষেত্রে তিনি এত সফলতা অর্জন করেন। এখানে পরামর্শ শুরু করার পূর্বে তিনি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, প্রত্যেককে তার ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি থেকে বিরত থাকতে হবে,

নিয়তকে পরিশুদ্ধ করতে হবে এবং রাসূলের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরতে হবে। যে কেউ এ কাজগুলো করবে, আল্লাহ তাকে ন্যায় বিচারে ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা করবেন, সবকিছু সঠিকভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ দেবেন এবং আখেরাতে পুরস্কারে ভূষিত করবেন।^{৪৪০} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এসব উপদেশ একত্র করে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট চিঠি প্রেরণ করেন। তিনি তাতে লেখেন : আল্লাহ তা‘আলা সব ব্যাপারেই কিছু ছাড় দিয়েছেন। তবে দুটি জিনিস ছাড়া : ন্যায়বিচার ও যিকির। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া যাবে না। আর আল্লাহ এটি ছাড়া কোনো কিছু কবুল করেন না। ন্যায়বিচারেও কোনো ছাড় নেই। এতে কঠিন বা সহজ পরিবেশ-পরিস্থিতি বলে কিছু নেই। যদি বিচারে শাস্তি লঘুও হয়, তবু এটি অবিচার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং অবিচার থেকে মিথ্যাকে দূর করার ক্ষেত্রে বেশি সক্ষম। ইরাকী আরবদের মধ্যে যারা চুক্তির প্রতি একনিষ্ঠ ছিল এবং কোনোভাবেই শত্রুকে সহায়তা করেনি, তারা মুসলমানদের নিরাপত্তায় থাকবে এবং জিযিয়া কর দেবে। আর যারা বলে যে, তারা চুক্তি ভঙ্গ করতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু আপনার নিকট আসেনি বা ছেড়েও যায়নি অথবা অন্য কোথাও চলে গিয়েছে, তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না যদি-না আপনি চান। যদি আপনি বিশ্বাস করতে না চান, তাহলে তাদের চুক্তি বাতিল করুন এবং তাদের পছন্দমতো নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দেবেন।^{৪৪১}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই জবাব থেকে অনেকগুলো শিক্ষা লাভ করা যায়। নিচে এর কয়েকটি দেওয়া হলো :

ন্যায়বিচার ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, রক্ষা এবং উন্নতির মূল ভিত্তি। এটি এ জগতেই কায়েম করতে হবে। আখেরাতে আর এর সুযোগ নেই। সেখানে অন্যায়-অবিচারকারীর পালানোর সুযোগ থাকবে না। কারণ, বান্দা যদি আল্লাহর কোনো হুকুম নষ্ট করে, তাহলে তিনি তার অপার করুণায় তা ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু বান্দা যদি অন্য কোনো বান্দার হুকুম নষ্ট করে থাকে, তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ অত্যাচারিত বান্দার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে ও মুখে

^{৪৪০} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৪৮৫।

^{৪৪১} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪১০।

সর্বদা যিকির চালু থাকা উচিত, যাতে সবকিছুতে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য থাকে; তার সন্তুষ্টিমূলক কথাই সে বলে এবং তার সন্তুষ্টির জন্যই কাজ করে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পৃথিবীতে কথা, কাজে ও বিশ্বাসে আল্লাহর স্মরণকে প্রতিষ্ঠা করা। যদি সে তা করতে পারে, তাহলে আচমকা-সুন্দর যুক্তি ও নিজের খেয়াল-খুশির কারণে উদ্ধৃত সন্দেহ থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন।

সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার লোকজন খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেন। তারা নিকটবর্তী এলাকাসমূহে খলীফার প্রস্তাবসমূহ প্রচার করেন। যারা ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাদের নতুন চুক্তি ও জিযিয়া কর প্রদানের মাধ্যমে নিরাপত্তা দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়। এখানে আমরা লোকদের অন্তঃকরণ জয় করার এক বিন্দ্র ও দূরদর্শী দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই। যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছিল, তারাও ইসলামের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয় এবং তারা পর্যায়ক্রমে ইসলামে দাখিল হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে তারা একনিষ্ঠ মুসলিম হিসাবে নিজেকে গৌরবান্বিত করে।^{৪৪২}

২.৫.৪। কাদেসিয়া যুদ্ধে যোদ্ধাদের উমর রা. খুমস প্রদান করেন এবং বিশেষ দক্ষতার জন্য বীর সেনাদের পুরস্কৃত করেন

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নির্দেশ জারি করেন, কাদেসিয়ার খুমস সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফার এই নির্দেশ বাস্তবায়ন করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই ইজতিহাদ ছিল তার মেধার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি আস-সাওয়াদ ভূমিকে এর অধিবাসীদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে তিনি একই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।^{৪৪৩} তিনি মনে করেছেন, রাষ্ট্রীয় স্বার্থেই মুজাহিদদের মধ্যে খুমস বিতরণ করা উচিত যাতে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়, তাদের জীবনকে সহজ করে তোলা যায় এবং তাদের ত্যাগ-তিতিষ্কার যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা জানানো সম্ভব হয়।^{৪৪৪}

^{৪৪২} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৪৮৭।

^{৪৪৩} আস-সাওয়াদ (কালো ভূমি—আরব মরুভূমির বিপরীত অর্থবোধক) : তাইগ্রিস নদীর পশ্চিমে ইরাকের সমতল উর্বর ভূমি।

^{৪৪৪} আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব আল-খলীফা আল-মুজতাহিদ, আল-ইমরানি, পৃ. ১৬৩।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু চারটি তরবারি এবং চারটি ঘোড়া সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট প্রেরণ করেন। যুদ্ধে যারা দৃষ্টান্তমূলক বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, তিনি তাদের এগুলো পুরস্কার হিসাবে দিতে বলেন। তিনি এর তিনটি তরবারি বনু আসাদের তিন জনকে প্রদান করেন। তারা হলেন হাম্মাল ইবনে মালিক, রিবাসিল ইবনে আমর ইবনে রাবিআ এবং তুলাইহা ইবনে খুওয়ালিদ। আর চতুর্থ তরবারিটি দেন আসিম ইবনে আমর আত-তামীমিকে। তিনি কাকা ইবনে আমরকে একটি ঘোড়া এবং বাকি তিনটি ঘোড়া আগওয়াস দিবসে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য ইয়ারবুয়িন গোত্রকে প্রদান করেন।^{৪৪৫} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এভাবেই মুজাহিদদের মনোবল বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতেন যাতে মুসলমানদের মহান লক্ষ্য অর্জিত হয়।

২.৫.৫। যুহরা ইবনে হাবিয়ার সম্মান পুনরুদ্ধার

পরাজিত সৈন্যদের ধাওয়া শেষে যুহরা কাদেসিয়ায় ফিরে আসেন। জালিনূসকে হত্যা করার পর যুহরা তার সব পরিধেয় সামগ্রী খুলে নেন এবং বর্মটি পরিধান করেন। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট যে সকল পারসিক বন্দীরা ছিল, তারা সেটি দেখে চিনতে পারে এবং বলে ওঠে, ‘এগুলো তো আমাদের সেনাপতি জালিনূসের।’ সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘জালিনূসকে হত্যা করার ব্যাপারে তোমাকে কেউ সাহায্য করেছিল?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ।’ সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘কে?’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহ।’ যুহরা বয়সে ছিলেন যুবক; জাহেলী যুগে গোত্রের নেতা ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে খুব মজবুত ঈমানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মনে করলেন কাজটিতে সীমালঙ্ঘন করা হয়েছে। এ জন্য তিনি তাকে বললেন, ‘তুমি আমার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করলে না কেন?’^{৪৪৬}

এ খবর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পৌছল। তিনি সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট চিঠিতে জানালেন, ‘আপনি কেমন করে যুহরার মতো মুজাহিদকে পাকড়াও করেছেন—সে কী করেছে, কোথায় করেছে, সামনে আরও অনেক যুদ্ধ বাকি রয়েছে—এখনই আপনি তার সাহস ও মনোবল ভেঙে দিতে চান? তাকে তার লুট করা মাল ফিরিয়ে দেন এবং তাকে আরও পাঁচ শ দিরহাম বেশি দিয়ে তার সঙ্গীদের ওপর তাকে প্রাধান্য দিন। আমি

^{৪৪৫} খিলাফত আস-সিদ্দীক ওয়াল ফারুক, আস-সাআলাবি, পৃ. ২৫৩।

^{৪৪৬} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৯১।

ঘোষণা দিচ্ছি. এখন থেকে জিহাদের ময়দানে কেউ যদি কোনো শত্রুকে হত্যা করে. তাহলে সে তার যাবতীয় বস্তুর মালিক হবে।' সুতরাং সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যুহরাকে বর্মটি ফেরত দিলেন এবং যুহরা বর্মটি সত্তর হাজারে বিক্রি করে দিলেন।^{৪৪৭} এভাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যুহরার সম্মান পুনরুদ্ধার করেন।^{৪৪৮}

২.৫.৬। শহীদ মুজাহিদ এবং মুসলমানদের মধ্যে আযানের প্রতিযোগিতা

কাদেসিয়া যুদ্ধে কিছু আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনা থেকে প্রথম যুগের মুসলমানদের দ্বীনী জযবা এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে তাদের একনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধে অনেক মুজাহিদ শহীদ হন। আর যখন নামাযের সময় হতো, তখন তারা আযান দেওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। বিষয়টা এত মারাত্মক পর্যায়ে চলে যেত যে, মনে হতো আযান দেওয়ার সুযোগ পাওয়ার জন্য তারা নিজেরা তরবারি দিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের মধ্যে লটারির ব্যবস্থা করলেন। লটারিতে যার নাম উঠত, সে-ই আযান দিত।^{৪৪৯} একটি নেক কাজ করার জন্য তাদের জযবা থেকে তাদের ঈমানের শক্তি বোঝা যায়। কারণ, আযান দিলে দুনিয়ার কোনো সম্পদ, মর্যাদা বা খ্যাতি লাভ করা যাবে না; বরং তাদের অন্তরে আখেরাতে মুয়াযযিনের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুত প্রতিদানের গভীর আশা ছিল। এসব মহান লোকেরা যখন আযানের জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারেন, নিশ্চয়ই তারা দ্বীনের আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতেও একই কাজ করেছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে জিহাদ ও মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকার ক্ষেত্রে এটাই তাদের সফলতার গোপন অস্ত্র।^{৪৫০}

২.৫.৭। যুদ্ধে ইসলামী সামরিক কৌশল

ইসলামের ইতিহাসে কাদেসিয়ার যুদ্ধ একটি অনবদ্য রণকৌশলের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মুসলিম মুজাহিদরা পরিস্থিতি সাপেক্ষে তাদের গতি-

^{৪৪৭} প্রাগুক্ত।

^{৪৪৮} আল-কাদিসিয়া, পৃ. ২০৪।

^{৪৪৯} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৯০।

^{৪৫০} আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৪৮০।

প্রকৃতি নির্ধারণ করেছে। সৈন্য সংগ্রহে বাধ্যবাধকতা আরোপ ও তাদের যথাযথভাবে প্রেরণ এবং যুদ্ধে সকল উপায়-উপকরণ ব্যবহারে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু অতুলনীয় দক্ষতা দেখিয়েছেন। এই যুদ্ধে খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাধারণ ও অভিজাত—উভয় বাহিনীর সেনাদের ব্যবহার করেছেন। তিনি সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে চিঠিতে অভিজ্ঞ ও সাহসী অশ্বারোহী সেনাদের বাছাই করে নিতে বলেন। এই যুদ্ধে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সত্তরের অধিক বদরী সাহাবী, বাইআতে রিদওয়ানের পরবর্তী তিন সহস্রাধিক সাহাবী, মক্কা বিজয়ে উপস্থিত ছিল এমন তিন শ সাহাবী এবং সাহাবায়ে কেরামের সাত শ সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি কোনো নেতৃস্থানীয়, বিদ্বান, প্রভাবশালী, বক্তা কিংবা কবি—কাউকেই বাদ দেননি। তিনি সবচেয়ে উত্তম এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের এই যুদ্ধে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এভাবে তিনি সকল জাগতিক ও মানসিক উপায়-উপকরণ এই যুদ্ধে ব্যবহার করেন।

এই যুদ্ধে সৈন্যদের মুভমেন্টে নতুন কিছু পদ্ধতি দৃষ্টিগোচর হয়, যা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীর গঠন করার পূর্ব পর্যন্ত সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সিরারে বসে থাকেননি; বরং তিনি চার হাজার সৈন্য নিয়ে ইরাক অভিযুখে রওনা হয়ে যান এবং কাদেসিয়া প্রান্তরে পৌঁছার পর তার সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় সতেরো হাজার। এটি সৈন্য সংগ্রহের একটি নতুন পদ্ধতি, যা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আগে মুসলমানদের জানা ছিল না। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু চিঠিতে মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু—উভয়কেই কোথায় চূড়ান্ত লড়াই করতে হবে, তা জানিয়ে দেন। আর তা ছিল কাদেসিয়া। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই প্রথম মুসলিম খলীফা, যিনি রণক্ষেত্রের অবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে ম্যাপের ব্যবহার করেছিলেন। তিনি সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে চিঠিতে মুসলিম তাঁবুর অবস্থান ও রণক্ষেত্রের বিবরণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে বলেন, যাতে তা তার চোখের সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এই নির্দেশ অনুযায়ী কাদেসিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান—পরিখা ও আতীক নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল, রণক্ষেত্রের ডান-বামে স্থাপনা এবং সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতিসহ স্থানীয় বাসিন্দাদের শত্রুভাবাপন্ন মানসিকতারও বিবরণ তুলে ধরেন। এ

বর্ণনার আলোকে আমীরুল মুমিনীন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধের রণকৌশল নির্ধারণ করেন।^{৪৫১}

শত্রুভূমিতে পা রাখার পর থেকেই মুসলমানগণ শত্রুর রসদ সরবরাহে আক্রমণ করার কৌশল অবলম্বন করে এবং এভাবে তাদের উপদ্রব করে অতিষ্ঠ করে তোলে। এ আক্রমণে প্রাপ্ত গনীয়ত মুসলিম বাহিনীর চাহিদা পূরণে সহায়তা করে। এটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে : শত্রুর প্রাণরস শুষে নেওয়া এবং স্থানীয় জনসাধারণকে যুদ্ধের প্রভাব ও কষ্ট বহনে সক্ষম করে তোলা।

মুসলমানগণ পারসিক সেনা ইউনিটের ছোট ছোট দলের ওপর অকস্মাৎ আক্রমণ করার কৌশলও অবলম্বন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল, শত্রুদের উত্তেজিত করে তোলা এবং তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়া।

একবার বাকের ইবনে আব্দুল্লাহ আল-লাইস কয়েকজন মুসলিম অশ্বারোহী সেনা নিয়ে আস-সিরিন অভিমুখে খেজুর বাগান-বেষ্টিত পথে পারসিকদের এক কাফেলার ওপর অকস্মাৎ আক্রমণ করে। কাফেলাটিতে আল-হেরার শাসক আযামারদের বোনকে আস-সিরিনের শাসকের পাত্রী হিসাবে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। কাফেলাটি এমবুসের জন্য নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছামাত্র মুসলিম দল তাদের ওপর আক্রমণ করে। বাকের পাত্রীর ভাই শিরযাদের নেতৃত্বে অগ্রগামী দলকে কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। হঠাৎ আক্রমণে শত্রুদের ঘোড়াগুলো দিগ্বিদিক পালিয়ে যায়। মুসলমানগণ বাকি কাফেলাকে অবরোধ করে এবং আযামারদের কন্যাকে বন্দী করে। এর সঙ্গে গোত্রপ্রধানের অধীন আরও তিরিশ জন মহিলা এবং এক শ জন অনুসারীসহ সব মালামাল জব্দ করেন। কাফেলার সঙ্গে থাকা মণি-মুক্তাসহ বিভিন্ন দ্রব্যাদির মূল্য জানা যায়নি।^{৪৫২}

এ যুদ্ধে মুসলমানগণ পরিস্থিতির পরিবর্তন সাপেক্ষে তাদের কৌশলেও পরিবর্তন আনেন। প্রথম দিন দেখা যায়, তারা হাতি দমন করতেই বেশি ব্যস্ত ছিলেন। হাতির দিকে তির নিক্ষেপ করে তার ওপরের বাক্স ও রশি

^{৪৫১} আল-ফানুল আসকারিল ইসলামি, পৃ. ২৭১-২৭২।

^{৪৫২} প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩।

কেটে দিতে থাকে, যতক্ষণ না সেগুলো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। মুসলমানগণ সিরিয়া থেকে সাহায্য-সৈন্যের অপেক্ষায় ছিলেন। তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয় রণক্ষেত্রে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয় যাতে বাহ্যিকভাবে সংখ্যাধিক্যের আশঙ্কায় শত্রুর মনে ভীতির সৃষ্টি হয়। তারপর তারা এক অভিনব পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তারা উটগুলো ভীতিকর এক সাজে সজ্জিত করে, যাতে সেগুলোকে দেখতে হাতির মতো মনে হয়। তারা সেগুলোকে শত্রুর সারিতে প্রেরণ করে এবং পারসিকদের ঘোড়াগুলো সত্যি হাতি দেখার মতোই বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে ও রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যায়। তৃতীয় দিনও মুসলিম সৈন্যরা হাতির বিরুদ্ধে লড়াই করে যেগুলো শত্রুদের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর পাহারায় ছিল। তারা পারসিকদের বড় সাদা হাতিকে আক্রমণ করে তার চোখে তির বিদ্ধ করে ও শূঁড় কেটে দেয়; হাতি পালিয়ে যায়। তখন মুসলিম ও পারসিক সৈন্যরা রণক্ষেত্রে একই অবস্থানে চলে আসে; অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী। মুসলমানরা যখন দেখল, যুদ্ধ প্রলম্বিত হচ্ছে, তখন তারা যৌথভাবে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা সারিবদ্ধ হয়ে একদল হিসাবে অগ্রসর হয়। যখন শত্রু বাহিনী পিছু হটতে শুরু করল, তখন তাদের কেন্দ্রীয় বাহু অরক্ষিত হয়ে পড়ে; সেনাপতি রুস্তম মুসলমানদের নিশানায় চলে আসে। রুস্তম নিহত হলে পারসিক বাহিনী এক লজ্জাজনক পরাজয়ের সম্মুখীন হয়।

সুতরাং দেখা যায়, এই যুদ্ধের রণকৌশল প্রচলিত যুদ্ধের মতো ছিল না; বরং তারা প্রত্যেক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন নতুন কৌশল গ্রহণ করেছেন। তারা প্রাচীন কৌশল থেকে সরে আসে; যেমন : মল্লযুদ্ধ থেকে কৌশলগত আক্রমণ; উটকে ছদ্মবেশে উপস্থাপন, হাতির চোখ নষ্ট করে দেওয়া এবং রশি ও শূঁড় কেটে ফেলা; আর যুদ্ধের চিরায়ত পদ্ধতি অবলম্বন যেমন : দলনেতাকে টার্গেট করা। এ যুদ্ধের আরেকটি অন্যতম দিক হচ্ছে, সৈন্যদের গোত্রভিত্তিক লড়াই করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তাতে গোত্রগত একটি প্রতিযোগী মনোভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।^{৪৫৩}

কাদেসিয়া যুদ্ধে মুজাহিদদের ব্যবহৃত ইসলামী সামরিক কৌশল এমনই ছিল।

২.৬। মাদাইন বিজয়

সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু কাদেসিয়ায় দুই মাস অবস্থান করেন। তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। একসময় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মাদাইন অভিযানে বের হতে বলেন এবং মহিলা ও শিশুদের আতীক এলাকায় পর্যাপ্ত সৈন্যদের নিরাপত্তায় রেখে যেতে নির্দেশ দেন। তিনি এটিও বলেন, যেসব সৈন্য পেছনে রয়ে যাবে, তারাও প্রাপ্ত গনীমতের অংশীদার হবে। কারণ, তারা মুসলিম পরিবারের নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকার কারণেই পশ্চাতে অবস্থান করছে। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তা-ই করলেন এবং শাওয়াল মাসের শেষ দিকে তিনি সৈন্যবহর নিয়ে মাদাইনের উদ্দেশে রওনা হন।

কাদেসিয়ায় পরাজিত পারসিক বাহিনীর যেসব সেনাপতি বেঁচে গিয়েছিল, তারা নিজেদের আত্মরক্ষায় বাবিলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পারসিকদের একের পর এক শহর ও নগরের পতন হতে লাগল। মুসলমানগণ প্রথমে বারস, ফোরাত নদী অতিক্রম করে বাবিল, তারপর কুসা, সাবাত (এর কিছু অংশ যুদ্ধ করে এবং কিছু অংশ চুক্তিতে) দখল করে নেয়।^{৪৫৪}

সুশৃঙ্খল মুসলিম বাহিনী তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে। তারপর তারা মাদাইন পৌঁছেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নগরবাসীদের সঙ্গে ন্যায় আচরণ এবং চুক্তির প্রতি সম্মান জানাতে নির্দেশ দেন। এতে বিপুল পরিমাণ স্থানীয় অধিবাসীরা মুসলমানদের নিরাপত্তায় চলে আসে। তারা মুসলমানদের আচরণ, ন্যায়বিচার ও সাম্য দেখে অবাক হয়। কারণ, ইসলামের শিক্ষা এমনই। এখানে মহান প্রতিপালকের নিকট সেনাপতি আর সাধারণ সৈন্যের মধ্যে পার্থক্য নেই। তাদের মধ্যে কোনো অন্যায়-অবিচার ও দুর্নীতি নেই। তারা এতকাল যেমন পরাধীন ও দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল, মুসলমানদের মধ্যে এ রকম কোনো আচরণ দেখতে পায়নি। তারা কেবলই এক আল্লাহর দাস।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মাদাইন অভিযুখে রওনা হন। তিনি যুহরা ইবনে হাবিয়ার নেতৃত্বে অগ্রগামী দল

প্রেরণ করেন। আর তার পেছনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুআত্তাম ও শুরাহবিল ইবনে সামাত দুটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে তাকে অনুসরণ করেন। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের সহকারী হিসেবে খালিদ ইবনে উরফুতার পরিবর্তে হাশিম ইবনে উতবা ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে নিযুক্ত করেন।^{৪৫৫} তারপর সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বাকি সৈন্যসহ তাদের সঙ্গে মিলিত হন এবং খালিদ ইবনে উরফুতার হাতে পশ্চাদবাহিনীর নেতৃত্ব অর্পণ করেন।

অগ্রগামী দলের প্রধান সেনাপতি যুহরা পারসিক রাজ্যের রাজধানী মাদাইন শহরের দিকে অগ্রসর হন। শহরটি তাইগ্রিস নদীর পশ্চিম-পূর্ব পাড়ে অবস্থিত। নদীর পশ্চিম পাড়ের এলাকাকে বাহুরসির এবং পূর্ব পাড়ের এলাকাকে আসবানির ও তিসফুন বলা হতো। যুহরা বাহুরসিরে পৌঁছেন এবং এলাকাটি অবরোধ করেন। তারপর সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং সঙ্গে তার ভাই হাশিম ইবনে উতবাহর নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী নিয়ে মাদাইনের পশ্চিমাঞ্চলে উপনীত হন। সেখানেই ছিল পারসিক সম্রাট ইয়াযদগিরদ। মুসলমানগণ শহরটি দু-মাস অবরোধ করে রাখে। পারসিকরা কখনো কখনো বের হয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করত, কিন্তু মুসলমানদের প্রতি-আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেত।

ঘটনাক্রমে যুহরার শরীরে শত্রুদের একটি তির বিদ্ধ হয়। কারণ, তার বর্মটির বিভিন্ন জায়গায় ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল। লোকেরা বলল, ‘আপনি একটু বর্মটি ঠিক করে নিলেই পারেন। তাহলে আপনার শরীরে আর তির বিদ্ধ হতো না।’ তিনি বললেন, ‘কেন?’ তারা বলল, ‘আমরা আপনাকে নিয়ে শঙ্কিত।’ তিনি বললেন, ‘আমি আল্লাহর নিকট সবার চেয়ে পছন্দনীয় ব্যক্তি হব, যদি এই জিহাদে সবাইকে এড়িয়ে সর্বপ্রথম তিরটি এসে আমার বুকে বিদ্ধ হয়!’ বস্তুত তিনি আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় ব্যক্তিই ছিলেন। তিনি যা চেয়েছিলেন, তা-ই হয়েছে। ওই দিন তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যার বুকে তির বিদ্ধ হয়েছে। এটি তাকে মারাত্মকভাবে আহত করে। লোকেরা কেউ কেউ বলল, ‘তার জখম থেকে তিটি টেনে বের করো।’ তিনি বললেন, ‘তির যেভাবে আছে, সেভাবেই থাকুক; বরং বের করার চেষ্টা করলেই আমার মৃত্যু হতে পারে। এ অবস্থায় আমি এখনো

^{৪৫৫} আত-তারিখুল ইসলামি, ১১/১৫৫।

শত্রুদের কাউকে আঘাত করতে পারব।' তিনি যুদ্ধ করতে লাগলেন এবং আসতাখারের প্রসিদ্ধ বীর সেনাধ্যক্ষ শাহরিয়ারকে হত্যা করেন।^{৪৫৬}

মুসলমানগণ দুই মাস ধরে অবরোধ অব্যাহত রাখলেন। পারসিকদের মিত্র বাহিনীরা মুসলমানদের জন্য বিশটি মিনজানিক (ভারী পাথর নিক্ষেপের প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ) প্রস্তুত করে। এগুলো দিয়ে তারা পারসিকদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করত। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিজয়ে সহায়ক কোনো জাগতিক বস্তু ব্যবহারে তারা কার্পণ্য করেননি। তারা নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর কালামকে সঠিক অর্থে বুঝেছিলেন :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

আর প্রস্তুত করো তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা-ই কিছু সংগ্রহ করতে পার, নিজের শক্তি-সামর্থ্যের মধ্যে থেকে।^{৪৫৭}

এতৎসঙ্গে তাদের আত্মিক শক্তি বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছে, যা সবেচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ—আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল থাকা, তাকে স্মরণ করা এবং তার নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনায় নিমগ্ন থাকা।

২.৬.১। আল্লাহ তার নিকটতম বান্দাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করেন

বর্ণিত আছে, আনাস ইবনে আল-হালীস বলেন, 'আমরা বাহুরশির অবরোধ করে রাখার সময় পারস্যের এক দূত এসে বলে, 'আমাদের সম্রাট তোমাদের নিকট এই বার্তা পাঠিয়েছেন যে, তিনি তোমাদের সঙ্গে এই শর্তে চুক্তি করতে আগ্রহী : তাইগ্রিস ও আমাদের পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকা হবে আমাদের এবং তাইগ্রিস ও তোমাদের পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকা তোমরা শাসন করবে। যদি তোমরা এতে সন্তুষ্ট না হও, তাহলে হয়তো আর কখনোই সন্তুষ্ট হতে পারবে না।' মুসলমানদের মধ্যে কেউ কোনো কথা বলার আগেই আবু মুফাজ্জির আল-আসওয়াদ দাঁড়িয়ে এর জবাব দেন। তিনি এমন কিছু কথা বলেন, যার কিছুই আমরা বুঝতে পারিনি। এমনকি তিনি নিজেও কিছু বোঝেননি। তখন দূত ফিরে গেল। আমরা তাদের মাদাইনের পূর্বদিকে নদী পার হয়ে যেতে দেখলাম।

^{৪৫৬} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪৫৪।

^{৪৫৭} সূরা আনফাল, ৮ : ৬০।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ‘হে আবু মুফাজ্জির, তুমি তাকে কী বলেছ?’ তিনি বললেন, ‘ওই সত্তার কসম, যিনি সত্যসহ মুহাম্মাদকে প্রেরণ করেছেন, আমি জানি না কী বলেছি। তবে মনে হয়, ভালো কিছুই বলেছি।’ অন্যান্য লোকেরাও তাকে একই প্রশ্ন করতে লাগলেন। একসময় সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘটনা শুনলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে আবু মুফাজ্জির, তুমি তাকে কী বলেছ? আল্লাহর কসম, তারা সব পালিয়ে যাচ্ছে।’ আবু মুফাজ্জির একই জবাব দিলেন। তিনি পারসিকদের ডাক দিলেন। একজন ছাড়া কেউ এল না। লোকটি নিরাপত্তা চাইলে আমরা তাকে নিরাপত্তা দিলাম। লোকটি বলল, ‘শহরে কেউ নেই। কিসে তোমাদের বাধা দিচ্ছে?’ সুতরাং তারা শহরে প্রবেশ করে সেটি দখল করে নিল।

পুরো শহরে সুনসান নীরবতা। কোনো জনমানব নেই। কিছু বন্দীকে পাওয়া গেল। তাদের আমরা পাকড়াও করলাম। লোকদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করা হলো এবং তারা বলল, ‘আমাদের সশ্রুট তোমাদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। তোমরা তাকে জানিয়েছ যে, কখনোই তোমাদের ও তার সঙ্গে সন্ধি হবে না যতক্ষণ না তোমরা কূসা শহরে এসে মধু পান না করবে।’ তখন সশ্রুট বলল, ‘তোমরা জানো এটি কী? ফেরেশতারা তাদের ঠোঁটে কথা বলছে এবং আরবদের পক্ষে জবাব দিচ্ছে। আল্লাহর কসম, এই লোক যা বলছে, তার অর্থ হলো, আমাদের সবাইকে হত্যা করা হবে। সুতরাং শহরের অপর প্রান্তে পালিয়ে গিয়ে নিজেকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করো।’^{৪৫৮}

২.৬.২। মাযলাম সাবাতের পৌছার পর সাদ রা. কর্তৃক কুরআন তিলাওয়াত

হাশিম তার বাহিনী নিয়ে বাহুরশিরে পৌছার পর সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু মাযলাম সাবাতের যাত্রাবিরতি করেন। তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন,

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا
إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۖ أَوْ لَمْ تَكُونُوا
أَقْسَبْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ۝ۙ

মানুষকে ওই দিনের ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন তাদের কাছে
আযাব আসবে। তখন যালেমরা বলবে, ‘হে আমাদের পালনকর্তা,
আমাদের সামান্য মেয়াদ পর্যন্ত সময় দিন, যাতে আমরা আপনার
আহ্বানে সাড়া দিতে এবং পয়গম্বরগণের অনুসরণ করতে পারি।
তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেতে না যে, তোমাদের দুনিয়া
থেকে যেতে হবে না?’^{৪৫৯}

তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন; কারণ, সেখানে সম্রাট কিসরার সৈন্য
ছিল যাদের বুরান বলা হতো। তারা প্রতিদিন কসম করে বলত, ‘আমরা
জীবিত থাকতে পারসিক সাম্রাজ্যকে দুনিয়ার কোনো শক্তিই বিপন্ন করতে
পারবে না।’^{৪৬০} যুরাহ ইবনে হাবিয়া তাদের পরাজিত করেন এবং শহীদ
হওয়ার আগেই তাদের ছিন্নভিন্ন করে দেন।^{৪৬১} মুসলমানগণ যখন
মধ্যরাত্রিতে বাহুরশিরে প্রবেশ করে সম্রাট কিসরার শ্বেত প্রাসাদ দেখতে
পান। যিরার ইবনে আল-খাত্তাব বলেন, ‘আল্লাহু আকবার, সম্রাট কিসরার
শ্বেত প্রাসাদ!’ এটাই আল্লাহ এবং তার রাসূল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন
এবং তারা সকাল পর্যন্ত তাকবির-ধ্বনি দিতে থাকে।^{৪৬২}

২.৬.৩। নদীর পার হওয়ার ব্যাপারে সাদ রা. এবং সৈন্যদের সঙ্গে
পরামর্শ

সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু খবর পেলেন যে, সম্রাট কিসরা নদী পার হয়ে
মাদাইনের পূর্বদিকে পাড়ি জমিয়েছেন এবং এ পাড়ে কোনো নৌকাও
নেই, তখন তিনি একটু চিন্তিত হলেন। শত্রু হাতের নাগালে, কিন্তু
মাঝখানে একটি নদী বাধা হয়ে আছে। কোনো জাহাজ বা নৌকা না

^{৪৫৯} সূরা ইবরাহিম, ১৪ : ৪৪।

^{৪৬০} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪৫১; আত-তারিখুল ইসলামি, ১১/১৬০।

^{৪৬১} আত-তারিখুল ইসলামি, ১১/১৬০।

^{৪৬২} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪৫১।

থাকাতে সেটি পাড়ি দেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। তিনি আশঙ্কা করলেন, শত্রুরা এই সুযোগে আরও দূরে সরে যাবে এবং তিনি তাদের শেষ করতে পারবেন না। তখন পারসিক মিত্ররা এগিয়ে আসে। তারা নদীর একদিকে পানির গভীরতা কম রয়েছে বলে জানায় এবং সেখান দিয়ে একটু ঝুঁকি নিয়ে পার হওয়া সম্ভব। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এ প্রস্তাব বাতিল করলেন। কারণ, নদীতে পানির স্রোত ছিল প্রচুর। ঢেউয়ের ধাক্কা এসে পাড়ে লাগছিল। স্রোতে উত্তীর্ণ ফেনায় পানির বর্ণ কালো হয়ে গিয়েছিল।

সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এ-সময় একটি স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নে তিনি মুসলমানদের নিয়ে নদী পারও হওয়ার দৃশ্য দেখতে পান। তিনি নিজেই এ স্বপ্নের তাবির করেন যে, তারা নদী পার হবেন। তিনি লোকজন জমা করে আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসার পর বললেন, ‘তোমাদের শত্রুরা এ নদী পার হয়ে তোমাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে এবং তোমরা তাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। কিন্তু তারা চাইলে নৌকা করে তোমাদের প্রান্তে পৌঁছতে পারবে। তোমাদের পশ্চাতে কোনো শত্রুর পক্ষ থেকে আক্রমণের ভয় নেই। তোমাদের পূর্ববর্তী মুজাহিদরা ওইসব শত্রুদের পরাজিত করেছে। আমি মনে করি, তোমাদের দ্রুত শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। আমি নদী অতিক্রম করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’ উপস্থিত সবাই বলল, ‘আল্লাহ সহজ করুন; চলুন, তা-ই করি।’^{৪৬৩}

এ থেকে নিম্নলিখিত শিক্ষাসমূহ লাভ করা যায় :

আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের সাহায্য করে থাকেন। আল্লাহর পক্ষ থেকেই সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এই ভালো স্বপ্ন দেখেছিলেন। এটি তার মনোবলকে দৃঢ় করেছে এবং নদী পার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে, যার পরিণতি তার জানা ছিল না। আল্লাহ অবশ্যই ঈমানদারদের পক্ষেই তার ফায়সালা অবতীর্ণ করবেন। হঠাৎ করেই নদী খুব তীব্র বেগে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে এবং মনে হচ্ছিল, এটি পারসিকদের পক্ষেই যাচ্ছে। কারণ, এ দৃশ্য দেখে মুসলমানরা নদী পার হতে সাহস করবে না। বস্তুত এটি ছিল মুসলমানদের

পক্ষেই। কাফেররা নিজেদের সুরক্ষিত মনে করেছে এবং তারা মুসলমানদের পক্ষ থেকে আক্রমণের কোনো আশাই করেনি। শত্রুরা পালিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সব জিনিস-পত্তর সঙ্গে নিতে পারেনি। সাহাবায়ে কেরাম তাদের সেনাপতির মতো একজন মহান ব্যক্তির স্বপ্নে দারুণভাবে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। এটি তাদের এগিয়ে যেতে সাহসী করে তোলে। তারা আল্লাহর ব্যাপারে উচ্চ ধারণাই পোষণ করেছে এবং এ স্বপ্নকে তারা তাঁর পক্ষ থেকে সাহায্য হিসাবে নিয়েছে। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মুসলমানগণ তাদের সাহস ও দৃঢ় ঈমানের পরিচয় দিয়ে প্রতিটি সুযোগকেই সৈন্যদের উৎসাহিত করতে কাজে লাগিয়েছেন। সুতরাং সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনীকে ঈমানের দৌলত ও ধার্মিকতার অস্ত্র ব্যবহার করে নদী পার হয়ে শত্রুকে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। তিনি আল্লাহর ওপর ভরসা করে সবার আগে নদীতে ঘোড়া চালিয়ে দেন। অবশ্যই মুসলিম বাহিনীর মধ্যে তার ঈমানের গভীরতাই ছিল সবচেয়ে বেশি। সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবয়েয়ীনরা তাদের নেতাদের অনুসরণে সব সময়ই ছিলেন ঐকান্তিক এবং পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী। তারা এই আনুগত্যকে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে ফরয মনে করতেন এবং এমন উঁচু নেক কাজ মনে করতেন যার দ্বারা তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশা করতেন।^{৪৬৪}

২.৬.৪। নদী পার হয়ে শত্রুর ওপর আক্রমণ পরিচালনা

সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সৈন্যদের নদী হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, ‘কে আছ নদীর পূর্ব দিক রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করবে, যাতে সবাই নিরাপদে নদী পার হতে পারে?’ তিনি আসিম ইবনে আমর আত-তামীমিকে এই দায়িত্ব দেন। তিনি ছিলেন সাহসী এবং শক্তিশালী। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার অধীনে ছয় শ সেনা প্রেরণ করেন। তিনি তাদের নিয়ে নদীর পারে গিয়ে বলেন, ‘আমার সঙ্গে কে শত্রুর হাত থেকে নদীর পূর্ব পার রক্ষায় যেতে আগ্রহী, যাতে সকল মুসলিম নিরাপদে ওই প্রান্তে পৌঁছতে পারে?’ ষাট জন বীর এগিয়ে আসে। তারা আগে নদী অভিমুখে রওনা হন এবং ছয় শ সৈন্য তাদের অনুসরণ করে। এভাবে মুসলিম বাহিনীর এলিট গ্রুপ গঠিত হয়, যাদের আহওয়াল স্কোয়াড্রন বলা হতো।

^{৪৬৪} আত-তারিখুল ইসলামি, ১১/১৬৭।

এ দলের সদস্য-সংখ্যা ছয় শ। আসিম তাদের মধ্য থেকে ষাট জনকে নির্বাচন করেন এবং অগ্রগামী দল গঠন করেন। প্রথমে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং পরবর্তী সময়ে আসিম-এর বিজ্ঞ পরিকল্পনা খুবই কাজে দেয়। কারণ, বিশাল বাহিনী নিয়ে ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়; বরং স্বল্পসংখ্যক সৈন্যবহর নিয়ে এই ঝুঁকি মোকাবিলা করা উচিত। কেননা, যদি শুরুতেই কম সাহস ও দক্ষতার সৈন্য ঝুঁকিতে অংশগ্রহণ করে, তাহলে শত্রুর আক্রমণে একবার যদি তারা পিছিয়ে আসে, তাহলে পুরো বাহিনীই পরাজয়ের মুখোমুখি হবে।

আসিম ষাট জন মরণপণ যোদ্ধা নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে নদী পার হলেন। বর্ণনায় পাওয়া যায়, যারা এই দলের অগ্রভাগে নদী পার হয়ে ওই পাড়ে গমন করেন, তারা হলেন : আসাম বানি ওয়াল্লাদ, আল-কালায আদ-দাক্বি, আবু মুফাজ্জির আল-আসওয়াদ ইবনে কুতবা, শুরাহবিল ইবনে আস-সামাত আল-কিন্দি, হাযল আল-আজলি, মালিক ইবনে কাব আল-হামাদানি এবং বনু হারিস ইবনে কাবের একজন যুবক। পারসিকরা তাদের দেখে যুদ্ধ করার জন্য অশ্বারোহীদের প্রস্তুত করে এবং তারা নদীর পূর্বপ্রান্তে মুখোমুখি হয়। আসিম গর্জে ওঠেন, ‘বর্শা, বর্শা!’ এবং তাদের শত্রুর চোখ বরাবর টার্গেট করতে নির্দেশ দেন। পারসিকরা মুসলমানদের বর্শার আঘাতে তীরবর্তী এলাকায় দ্রুত পালিয়ে যায়। ঘোড়াগুলো বর্শার আঘাতে দিশেহারা হয়ে যায় এবং তাদের সওয়ারীরা সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। মুসলমানরা ধাওয়া করে তাদের বেশির ভাগকে হত্যা করে; কিছু সৈন্য এক চোখে জখম নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরপরেই মুসলিম বাহিনীর ছয় শ সৈন্য এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং তারা পুরোপুরিভাবে নদীর পূর্ব পাড়ের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়।^{৪৬৫}

২.৬.৫। মুসলিম সেনাবাহিনীর নদী অতিক্রম

সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন দেখলেন যে, আসিম ওই পাড়ে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে, তখন তিনি তার বাহিনীর সবাইকে নদী পার হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, সবাই এই দুআ পাঠ করো :

^{৪৬৫} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪৫৬-৪৫৭।

نَسْتَعِينُ بِاللّٰهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

আমরা আল্লাহর সাহায্য চাই এবং তারই ওপর ভরসা করি।
আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম
কার্যসম্পাদনকারী। আল্লাহ ছাড়া আর কারও কোনো শক্তি ও
ক্ষমতা নেই, তিনিই সুউচ্চ মহান, চরম ক্ষমতাশীল।

মুসলিম সৈন্যরা ঘোড়ায় চড়েই নদী পার হলেন। তাদের ঘোড়াগুলো
খরশ্রোতা নদীর ওপর দিয়ে এমনভাবে সাঁতরে যাচ্ছিল যেন হাঁস সাঁতরে
যাচ্ছে এবং যমীনে পথ চলার সময় পরস্পরের মধ্যে যেমন কথাবার্তা হয়,
তেমনি তারা একে অন্যের সঙ্গে কথা-বার্তা বলছিলেন।^{৪৬৬} সাদ ইবনে
আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর পাশাপাশি ছিলেন সালমান ফারসী
রাযিয়াল্লাহু আনহু। তাদের ঘোড়াগুলো নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে
এগোতে থাকলে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ! وَاللّٰهِ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ وَلِيَّهٗ وَلَيُظْهِرَنَّ اللّٰهُ
دِيْنَهٗ وَلَيَهْزِمَنَّ اللّٰهُ عَدُوَّهٗ

আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম
কার্যসম্পাদনকারী। আল্লাহর কসম, আল্লাহ অবশ্যই তার প্রিয়
বান্দাদের সাহায্য করবেন এবং তার দীনকে বিজয়ী করবেন।
আল্লাহ তার শত্রুদের পরাজিত করবেন (যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম
বাহিনী—যাদের নেক কাজের পাল্লাই ভারী—সীমালঙ্ঘন বা
গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে)।^{৪৬৭}

সালমান ফারসী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, ‘ইসলাম নতুন।
যমীনের মতো নদী ও সমুদ্রকে তাদের অধীন করে দেওয়া হয়েছে। কসম
ওই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ, একদিন মানুষ দলে দলে (ইসলাম)
ছেড়ে যাবে যেমন করে তারা দলে দলে তাতে প্রবেশ করেছে।’^{৪৬৮}

^{৪৬৬} আত-তারিখুল ইসলামি, ১১/১৬৯।

^{৪৬৭} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪৫৯।

^{৪৬৮} প্রাগুক্ত।

সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এখানে ‘ইসলাম নতুন’ বলে এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, ইসলাম এখনো বেঁচে আছে, এর অনুসারীরা ঈমান ও আমলে মজবুত এবং তারা এ জন্য গৌরববোধ করে। ইসলামই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, যার জন্য তারা বাঁচে এবং মরে। তারা মানুষকে এর দিকে আহ্বান করে এবং এটিকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। কিন্তু শীঘ্রই এমন এক জাতি আসবে, যারা জন্মগতভাবে ইসলাম লাভ করবে এবং নিজের চেষ্টা-সাধনায় তা অর্জন করবে না। আর এটি তাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মূল বিষয় হবে না; বরং তাদের সকল চেষ্টার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে জাগতিক প্রাপ্তি ও আরাম-আয়েশের দিকে; ইসলাম তাদের জীবনে গৌণ বিষয় হয়ে উঠবে। এ-সময় মানুষ দলে দলে ইসলাম ছেড়ে যাবে, যেমন করে তারা একদিন দলে দলে তাতে প্রবেশ করেছে।^{৪৬৯}

মুসলিম বাহিনী নিরাপদেই নদী পার হয়ে যায়। কারও কোনো ক্ষতি হয়নি। কেউ পানিতে পড়ে যায়নি একজন ছাড়া। বারিক গোত্রের একজন আরোহী ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাকা তৎক্ষণাৎ নিজ ঘোড়ার লাগাম নদীতে ফেলে তাকে অক্ষত ও সুস্থাবস্থায় উঠিয়ে নেন। ওই বারিকী—তার গোত্রের একজন শক্তিশালী মানুষ—বলেন, ‘হে কাকা, কোনো মায়ের পক্ষেই আর তোমার মতো সন্তান জন্ম দেওয়া সম্ভব নয়।’ তিনি কাকা ইবনে আমরের মামা ছিলেন।^{৪৭০}

মুসলিম বাহিনীকে এভাবে নদী পার হতে দেখে পারসিকরা ভয় পেয়ে যায়। ইয়াযদগিরদ রাজধানী ছেড়ে হুলওয়ানের দিকে পালিয়ে যায়। মুসলমানদের বাধা দেওয়া কেউ ছিল না। তারা বিনা বাধায় শহরে প্রবেশ করেন। সাদ রা, শ্বেত প্রাসাদে ইসলামী ঝান্ডা স্থাপন করেন। তিনি সেখানে নামাযের স্থান নির্ধারণ করেন এবং তারপর সুউচ্চ সুরম্য প্রাসাদ ও সবুজ শ্যামল সতেজ বাগিচাসমূহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করেন :

^{৪৬৯} আত-তারিখুল ইসলামি, ১১/১৭০।

^{৪৭০} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪৫৯।

كَمْ تَرَ كُؤًا مِنْ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۖ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝ وَنَعْمَةً كَانُوا
فِيهَا فَاكِهِينَ ۝ كَذَلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝

তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ; কত শস্যক্ষেত্র ও
সুরম্য স্থান। কত সুখের উপকরণ, যাতে তারা খোশগল্প করত।
এমনিই হয়েছিল এবং আমি ওগুলোর মালিক করেছিলাম ভিন্ন
সম্প্রদায়কে।^{৪৭১}

সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সেখানে আট রাকাত নামায আদায় করেন—
বিজয়ের নামায।

মাদাইন শহরে সর্বপ্রথম মুসলিম বাহিনীর আহওয়াল স্কোয়াড্রন প্রবেশ
করে, তারপর আল-খাসরা স্কোয়াড্রন।^{৪৭২} আহওয়াল স্কোয়াড্রনের
নেতৃত্বে ছিলেন আসিম ইবনে আমর আত-তামীমি এবং আল-খাসরা
স্কোয়াড্রনের নেতৃত্বে ছিলেন কাকা ইবনে আমর।^{৪৭৩}

২.৬.৬। মুসলমানদের সততার দৃষ্টান্ত

আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা এবং আমি তার পুরস্কারেই সন্তুষ্ট।

মুসলিম বাহিনী মাদাইন শহরে প্রাপ্ত সব গনীমতের মাল জমা করে।
একজন একটি আশ্চর্যজনক বস্তু এনে গনীমতের দায়িত্বে নিয়োজিত
ব্যক্তির নিকট জমা দেয়। সে এবং তার সঙ্গীরা তখন বলে, ‘আমরা
কখনো এমন জিনিস দেখিনি, আমরা কখনো এমন জিনিস বা এর
কাছাকাছি কোনো কিছুও পাইনি।’ তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি কি
এ থেকে কোনো কিছু নিয়েছ?’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহর কসম, যদি
আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য না হতো, তাহলে হয়তো এটি আপনার নিকট
আমি আনতামই না।’ তারা বুঝতে পারলেন যে, লোকটি খুবই সৎ। এ
জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমার পরিচয় কী?’ সে বলল, ‘আল্লাহর

^{৪৭১} সূরা আদ-দুখান, ৪৪ : ২৫-২৮।

^{৪৭২} আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/৬৭।

^{৪৭৩} ইতমামুল ওয়াফা, পৃ. ৮৫।

কসম, আমি আমার পরিচয় দেব না। তোমরা আমার প্রশংসা শুরু করবে। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা এবং আমি তার পুরস্কারেই সন্তুষ্ট।’ লোকটি তার গোত্রের নিকট ফিরে যাওয়ার পথে একজন তাকে অনুসরণ করে। পরে তার নাম জানা গেল; আমার ইবনে আদ কাইস।^{৪৭৪}

আসমা ইবনে হারিস আদ-দাক্বি বলেন, ‘আমি লোকজনের সঙ্গে গনীমতের মাল সংগ্রহ করতে বের হই। আমি অনেক পথ অতিক্রম করার পর একজনকে গাধার পিঠে সওয়ার দেখতে পাই। সে তার কাছাকাছি থাকা আরেকজনকে নিয়ে পালিয়ে যেতে থাকে। তারা গাধা হাঁকিয়ে দ্রুত নদীর তীরে উপনীত হয়। কিন্তু নদীর ওপর সেতুটি ছিল ভাঙা। আমি তাদের নিকটে পৌঁছতেই তারা দুজন দু-দিকে দৌড়ে পালাতে থাকে। তাদের একজন আমার দিকে কিছু একটা ছুড়ে মারে। আমি তাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলি এবং হত্যা করি। তারপর নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকা তাদের দুটি গাধাকে নিয়ে এসে গনীমতের ইনচার্জের নিকট জমা দিই। তিনি প্রথম গাধাটির দিকে দৃষ্টি দিলেন। তাতে দুটি ব্যাগ ঝুলানো ছিল। একটি ব্যাগ খুলে তাতে একটি স্বর্ণের ঘোড়া পাওয়া যায়, যার বুকে ছিল ইয়াকূত পাথর লাগানো। অন্যটিতে একটি রৌপ্যের উটনী পাওয়া যায় যার ওপর একটি স্বর্ণের গদি ছিল, আর লাগাম ছিল বহু মূল্যবান মুক্তায় গাঁথা। এ উটনীর আরোহী আপাদমস্তক মণিমুক্তার প্রলেপ যুক্ত ছিল। সশ্রুটি কিসরা এগুলো তার প্রাসাদে সাজিয়ে রেখেছিল, যা ছিল তাদের ইতিহাসের গৌরবগাঁথা।^{৪৭৫}

কাকা ইবনে আমরের মহত্ব

কাকা ইবনে আমর একজন পারসিক লোককে ধরে ফেলেন এবং তাকে হত্যা করেন। লোকটির সঙ্গে দুটি বাক্স এবং দুটি থলে ছিল। বাক্সগুলোর একটিতে পাঁচটি এবং অন্যটিতে ছয়টি তরবারি ছিল। এগুলো ছিল পারস্যের রাজাদের তরবারি, যা দিয়ে তারা যুদ্ধ করেছিল। এর মধ্যে একটি সশ্রুটি কিসরা এবং হিরাক্লিয়াসের তরবারিও ছিল। আর ব্যাগে ছিল কিছু বর্ম। এতে সশ্রুটি কিসরা এবং হিরাক্লিয়াসেরও বর্ম ছিল। তিনি

^{৪৭৪} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪৬৮।

^{৪৭৫} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪৬৮।

সেগুলো সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট নিয়ে এলেন। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, ‘তুমি যেকোনো একটি তরবারি পছন্দ করে নাও।’ তখন কাকা ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হিরাক্রিয়াসের তরবারিটি বেছে নেন। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বাহরামের বর্মটি প্রদান করেন। বাকিগুলো তিনি আল-খাসরা স্কোয়াড্রনকে প্রদান করেন। এই স্কোয়াড্রনের নেতৃত্ব ছিল কাকা ইবনে আমরের হাতে। তবে কিসরা ও নুমানের তরবারি দুটি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ, আরবরা এ দুজনকে চিনত।^{৪৭৬}

সাহাবায়ে কেরাম মুসলিম বাহিনীর সদস্যদের প্রশংসা করেন

প্রবীণ সাহাবীরা মুসলিম বাহিনীর সদস্যদের প্রশংসা করেন। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আল্লাহর কসম, এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য খুব সৎ। যদি বদরের সাহাবীদের মর্যাদা ইতিমধ্যে নির্ধারিত না হতো, তাহলে আমি বলতাম, তারা বদরের সাহাবীদের চেয়ে উত্তম।’^{৪৭৭}

যাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আল্লাহর কসম, আমি কাদেসিয়ার সৈন্যবাহিনী থেকে উত্তম কোনো বাহিনী দেখিনি, যারা দুনিয়ার ওপর আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছে। আমরা তিন জনের ব্যাপারে সন্দিহান ছিলাম। পরে আমাদের ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তাদের সততা এবং ধর্মভীরুতা অনেক উঁচু স্তরের।’ তারা ছিলেন তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ, আমর ইবনে মাদি ইয়াকরিব এবং কাইস ইবনে আল-মাকশুহ।

তবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসা এ সবকিছুকেই ছাড়িয়ে যায়। তিনি কাদেসিয়ার গনীমতের মালের মধ্যে তরবারি, কোমরবন্ধ এবং কিসরার হীরা-পান্না ও মণি-মুক্তা দেখতে পান, তখন বলেন, ‘যারা এসব মূল্যবান সামগ্রী প্রেরণ করেছে, তারা সত্যিই সৎ।’ আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আপনি যেহেতু সৎ, এ জন্য আপনার লোকজনও সৎ। আর যদি আপনি অসৎ হতেন, তাহলে তারাও অসৎ হতো।’^{৪৭৮}

^{৪৭৬} প্রাগুক্ত।

^{৪৭৭} আত-তারিখুল ইসলামি, ১১/১৮১; তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪৬৮।

^{৪৭৮} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪৬৮।

গনীমতের মালের ব্যাপারে উমর রা.-এর আচরণ

কাদেসিয়া যুদ্ধের পর সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। সেগুলোর মধ্যে ছিল সশ্রুট কিসরার উন্নত পরিধেয় বস্ত্র, তরবারি, কোমরবন্ধ, ব্রেসলেট, জামা-কাপড়, শিরজ্ঞাণ ইত্যাদি। এগুলো রেশম, স্বর্ণ ও মণি-মুক্তায় খচিত ছিল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে একজন লম্বা ও সুঠামদেহী লোক বাছাই করেন। তিনি ছিলেন সুরাকা ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বললেন, ‘হে সুরাকা, দাঁড়াও এবং এগুলো পরিধান করো।’ সুরাকা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমি এগুলো পাওয়ার আশা করেছিলাম। সুতরাং আমি উঠে দাঁড়িলাম এবং পরিধান করলাম।’ তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘সবার সামনে একটু হেঁটে বেড়াও।’ সুরাকা রাযিয়াল্লাহু আনহু হাঁটলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘ফিরে আসো।’ তারপর তিনি ফিরে এলেন। তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘চমৎকার! মাদলায গোত্রের এক বেদুইন পারসিক সশ্রুট কিসরার তরবারি, কোমরবন্ধ, ব্রেসলেট, জামা-কাপড়, শিরজ্ঞাণ পরেছে! আজ কি সৌভাগ্যের দিন, হে সুরাকা! আজ তোমার ও তোমার লোকদের জন্য কত সম্মান! এখন এসব খুলে ফেলো।’

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হে আল্লাহ, আপনি আপনার রাসূলকে এসব থেকে বিরত রেখেছিলেন, যিনি আমার চেয়ে আপনার নিকট বেশি প্রিয় এবং আমার চেয়ে আপনার নিকট বেশি সম্মানিত। তারপর আবু বকরকে এসব থেকে বিরত রেখেছিলেন, যিনি আমার চেয়ে আপনার নিকট বেশি প্রিয় এবং আমার চেয়ে আপনার নিকট বেশি সম্মানিত। এখন আপনি আমাকে এসব দান করেছেন। আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি—না জানি আমি এসব দ্বারা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে যাই।’ তারপর তিনি কাঁদতে থাকেন। লোকজন এসে তাকে সান্ত্বনা দিলেন। তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বলেন, ‘আপনি দ্রুত এগুলো বিক্রি করুন এবং সন্ধ্যার আগেই প্রাপ্ত মূল্য লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিন।’^{৪৭৯}

^{৪৭৯} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪৭২; আল-বিদিয়া ওয়ান নিহায়া, ৭/৬৮।

২.৭। জালুলার যুদ্ধ

পারসিকরা জালুলায় এসে সমবেত হলো। পারস্যের বিভিন্ন শহরে যাওয়ার রাস্তা এসে এখানে মিলিত হয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে একে অন্যকে দোষারোপ করতে লাগল। তারা বলল, ‘আজ যদি তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও, তাহলে আর কখনো ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না। আর যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, তাহলে এখান থেকেই আমরা আলাদা হতে যাচ্ছি। চলো, আমরা আরবদের বিরুদ্ধে আবার ঐক্যবদ্ধ হই এবং তাদের সঙ্গে লড়াই করি। যদি আমরা বিজয়ী হই, তাহলে তো আমরা সফলকাম; আর যদি ব্যর্থ হই, তাহলে আমরা বলতে পারব যে, আমরা আমাদের সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করেছি।’ সুতরাং তারা মাহরান আর-রাযির নেতৃত্বে পুনরায় সংগঠিত হলো। তারা নিরাপত্তার জন্য শহরের চারিদিকে গভীর পরিখা খনন করল এবং নিজেদের যাতায়াতের পথ ছাড়া বাকি অংশে কাঠের গজাল পুঁতে রাখে।

সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু পারসিকদের এই প্রস্তুতির কথা যথাসময়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট লিখে পাঠান। এর জবাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে হাশিম ইবনে উতবার নেতৃত্বে বারো হাজার সৈন্য প্রেরণ করতে বলেন এবং সৈন্যবাহিনীর সম্মুখভাগে কাকা ইবনে আমর, ডানভাগে মাশআর ইবনে মালিক, বামদিকে আমর ইবনে মালিক ও পেছন দিকে আমর ইবনে মুররা প্রমুখ সেনাধ্যক্ষগণের ওপর সেনা পরিচালনার দায়িত্ব দিতে বলেন।

হাশিম তার বাহিনী নিয়ে জালুলায় গমন করেন এবং শহরটিকে অবরোধ করেন। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে অবরোধ চলতে থাকে। পারসিকরা সুযোগ বুঝে মাঝে মাঝে আক্রমণ করতে লাগল; এভাবে প্রায় আশিটি খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হলো। আল্লাহ মুসলমানদের সাহায্য করলেন। তারা মুশরিকদের এসব যুদ্ধে প্রতিবারই পরাজিত করে এবং তাদের দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। শত্রুরা এবার শহরের চারিদিকে লোহার পেরেক পুঁতে রাখে। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু অনবরত সাহায্য-সৈন্য প্রেরণ করতে থাকেন। অবরোধে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হতে থাকলে এবং মুসলমানদের ধৈর্যের কারণে তাদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছলে পারসিকরা আক্রমণের সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করে। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা করলেন, ‘আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বাত্মক শক্তি দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করো যাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ পুরস্কার এবং গনীমতের মাল লাভ করতে পার।’ তারা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। আল্লাহ শত্রুর বিরুদ্ধে এক ঘূর্ণিবায়ু প্রেরণ করলেন। ধূলিঝঞ্ঝায় চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। পারসিকরা নিরুপায় হয়ে পেছাতে শুরু করে। অন্ধকারে পথ খুঁজে না পেয়ে তাদের ঘোড়াগুলো পরিখায় গিয়ে পড়তে লাগল এবং সেখান থেকে তারা আর উঠতে পারেনি। এভাবে তারা নিজেদের তৈরি পরিখায় প্রাণ হারাতে লাগল।^{৪৮০}

শত্রুদের দলে দলে পরিখায় পড়ে প্রাণ হারানোর সংবাদ পেয়ে মুসলিম সেনারা বলল, ‘এটাই শত্রুদের আক্রমণ করার চূড়ান্ত সময়।’ মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করতে দেখে শত্রুরা পরিখার চারিদিকে লোহার পেরেক পুঁততে থাকে যাতে তাদের ঘোড়াগুলো আক্রমণ করতে এগিয়ে আসতে না পারে। কিন্তু তারা নিজেদের জন্য কিছু জায়গা নিরাপদ রাখে যাতে তারা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করতে পারে। অতঃপর উভয়পক্ষে আক্রমণ শুরু হলো এবং এমন ভীষণ যুদ্ধ হলো যে, একমাত্র কাদেসিয়ার লাইলাতুল হারীর ব্যতীত আর কখনো এমন যুদ্ধ দেখা যায়নি। তবে এটি ছিল সংক্ষিপ্ত এবং দ্রুততর যুদ্ধ। কাকা ইবনে আমর বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করতে করতে দুর্গের ফটকে এসে পৌঁছেন এবং তিনি তা অবরোধ করেন। তিনি একজনকে জোরে ঘোষণা করতে বলেন, ‘হে মুসলিম, সেনাপতি ফটকে এসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি তার নিকট আসো। আসার পথে তার আর তোমাদের মধ্যে কোনো কিছুই যেন বাধা না হয়।’ তিনি মুসলমানদের সাহস ও শক্তি বৃদ্ধি করার জন্যই এ আদেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং মুসলমানগণ প্রবল বিক্রমে আক্রমণ করল এবং সৈন্যদের মধ্যে তাদের সেনাপতি হাশিম ইবনে আমরের উপস্থিতি থাকার ব্যাপারে কারও কোনো সন্দেহ ছিল না। কোনো বাধাই তারা মানেনি। শেষ পর্যন্ত তারা দুর্গের ফটকে এসে পৌঁছে তারা কাকা ইবনে আমরকে দুর্গ অবরোধ করে রাখতে দেখে। মুশরিকরা চারিদিকে পালাতে থাকে। কিন্তু কোনোদিকে পালাবার পথ ছিল না। ফলে নিজেদের খনন করা খাদে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে লাগল।

ওইদিন শক্ররা মুসলমানদের কৌশলের নিকট পরাস্ত হয়, নিজেদের পুঁতে রাখা লোহার পেরেকে তাদের ঘোড়াগুলো ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তারা পদাতিক বাহিনীতে পরিণত হয়। মুসলমানগণ তাদের ধাওয়া করে এবং কাউকেই রেহাই দেয়নি। ওইদিন এক লক্ষ পারসিক সেনা নিহত হয় এবং যমীনে লাশের স্তুপ জমে ওঠে।^{৪৮১}

২.৭.১। আমাদের সামরিক বাহিনীর গৌরবগাথাই আমাদের কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছে

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু সুসংবাদ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশসহ যিয়াদ ইবনে উবাইকে মদীনায় খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। যিয়াদ সৈন্যদের তথ্য সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি খলীফার নিকট গিয়ে সুন্দরভাবে যুদ্ধের বর্ণনা এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বিবরণ তুলে ধরেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘তুমি কি লোকজনের সম্মুখে আমাকে যা বলেছ তা পুনরায় বলতে পারবে?’ যিয়াদ তা-ই করলেন। তিনি যুদ্ধের একটি নিখুঁত চিত্র সবার সমানে অপূর্ব বাগ্মিতায় তুলে ধরলেন; যুদ্ধে তাদের ভূমিকা এবং কীভাবে তারা শত্রুদের দুর্গে আঘাত করেছে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘এটি একটি চমৎকার বাগ্মিতার দৃষ্টান্ত।’ যিয়াদ বললেন, ‘আমাদের সামরিক বাহিনীর গৌরবগাথাই আমাদের কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছে।’

২.৭.২। জালুলার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে উমর রা.-এর প্রতিক্রিয়া

জালুলার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে এবং প্রচুর পরিমাণে গণীমতের সম্পদ লাভ করে। তারা এর এক-পঞ্চমাংশ খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। এ সম্পদ দেখে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আল্লাহর কসম, এগুলো কোনো ছাদের নিচে রাখা যাবে না, যতক্ষণ না আমি এগুলো বিতরণ করে দিই।’ তবে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় সেদিন বণ্টন করা সম্ভব হয়নি। সেগুলো মসজিদের বারান্দায় স্তুপীকৃত করে রাখা হলো। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আব্দুল্লাহ ইবনে

আকরাম রাযিয়াল্লাহু আনহু সারারাত ধরে এগুলো পাহারা দেন। পরের দিন সকালে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকজনসহ সম্পদগুলোর ওপর আবরণ সরিয়ে ফেলেন। তিনি স্তূপীকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য ও রাশিকৃত মণিমুক্তা দেখে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনি কেন কাঁদছেন, হে আমীরুল মুমিনীন? বরং এ-সময় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহর কসম, আমি এই ধনরাশির মধ্যে ধ্বংসের বীজ দেখতে পাচ্ছি। যেখানে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য থাকে, সেখানে হিংসা-বিদ্বেষও দানা বেঁধে ওঠে। আর যদি হিংসা-বিদ্বেষ শুরু হয়, তাহলে তা শত্রুতা সৃষ্টি করে এবং জাতিকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে।’^{৪৮২}

এটি একজন পরম ধার্মিক ও একনিষ্ঠ ঈমানদারের দূরদর্শিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জাগতিক প্রাপ্তিতে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে, এই আশঙ্কা তার মনকে এত তীব্রভাবে ব্যথিত করে যে, তিনি নিজের অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। এটি খুবই আশ্চর্যজনক যে, এত বড় ইসলামী রাষ্ট্রনায়ক, যাকে সবাই ভীষণভাবে ভয় পায়—মুসলিম, কাফের ও মুনাফিক একই ভাবে যার ভয়ে সন্ত্রস্ত—তিনি কাঁদছেন! আল্লাহ তাদের অন্তরে এতটাই ঈমানের দৌলত দিয়েছিলেন যেন তারা কুরআনের আয়াতের বাস্তব প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠেন :

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي
وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي
الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْطَهُ فَازْرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سَوْقِهِ
يُغِيبُ الزَّرْعَ لِيَغِیْظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি

তাদের রুকুকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায়ে সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মতো, যে তার কচিপাতা উদ্গত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্থায়ী কাণ্ডের ওপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদের ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।^{৪৮৩}

২.৮। রামহরমুয বিজয়

এত কিছু পরেও পারসিকরা তাদের রাজা ইয়াযদগিরদকে কেন্দ্র করে পুনরায় একত্র হওয়া শুরু করে। তারা সেনাপতি হরমুযের নেতৃত্বে রামহরমুযে জমা হয়। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু পারসিকদের এই জমা হওয়ার সংবাদ খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। খলীফা তাকে নুমান ইবনে মুকাররিনের নেতৃত্বে কুফাবাসীদের মধ্য থেকে একটি বাহিনী প্রস্তুত করতে বলেন। তিনি বসরায় আবু মূসা আশআরীকে সাহল ইবনে আদিয়ির নেতৃত্বে আরেকটি বাহিনী প্রস্তুত করতে বলেন। যখন এই দুই বাহিনী একত্র হবে, তখন সম্মিলিত বাহিনীর সেনাপতি হিসাবে আবু সাবরাহ ইবনে আবি রুহম দায়িত্বভার গ্রহণ করবে এবং এরপর যারাই এ বাহিনীতে যোগ দেবে, তারা তার সাহায্য-সৈন্য হিসাবে গণ্য হবে।

নুমান ইবনে মুকাররিন কুফা থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে রামহরমুযে অবস্থানরত সেনাপতি হরমুযানের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। এ সংবাদ পেয়ে হরমুযান নুমানের বাহিনীকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা নেয়। এতে নুমানের বাহিনীকে মুসলমানদের অন্য বাহিনীর সঙ্গে মিলে শক্তি বৃদ্ধির আগেই পরাস্ত করা সম্ভব হবে। হরমুযান তার বাহিনী গঠনে সদ্য যোগ দেওয়া পারসিকদের সাহায্য নেয়। হরমুযান এবং নুমান আরবাক নামক

স্থানে মুখোমুখি হয় এবং উভয়পক্ষ মারাত্মক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তা‘আলা নুমানকে বিজয় দান করেন। হরমুয রামহরমুয ত্যাগ করে তাসতারে পালিয়ে যায়।

অন্যদিকে সাহল ইবনে আদিয়্যির নেতৃত্বে রামহরমুযের দিকে এগিয়ে আসা বসরার মুসলিম বাহিনী এ বিজয়ের সংবাদ লাভ করে। সুতরাং তারা হরমুযানের উদ্দেশ্যে তাসতারের দিকে গতিপথ পরিবর্তন করেন।^{৪৮৪}

২.৯। তাসতার বিজয়

নুমান এবং সাহলের সৈন্যবাহিনী এসে তাসতারে একত্র হয়। এ সম্মিলিত বাহিনীর সেনাপতি হিসাবে আবু সাবরাহ ইবনে আবি রুহম দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আবু সাবরাহ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট সাহায্য-সৈন্য চেয়ে পাঠান। খলীফা তখন বসরার সামরিক বাহিনীর সেনাপতি আবু মূসা আশআরীকে প্রেরণ করেন। আবু সাবরাহ পুরো বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। মুসলিম বাহিনী তাসতার কয়েক মাস ধরে অবরোধ করে রাখে এবং এ-সময় তারা প্রায় আশিটি খণ্ডযুদ্ধ করে। দ্বৈতযুদ্ধে অনেক মুসলিম বীরের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাদের অনেকে এক শতেরও বেশি কাফেরকে মল্লযুদ্ধে হত্যা করে। এর পাশাপাশি খণ্ডযুদ্ধে শত্রু হত্যার ঘটনা তো আছেই। এসব বীরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : বারা ইবনে মালিক, মাযজাহ ইবনে সাওর, কাব ইবনে সুর এবং আবু তামীমা। তারা সবাই ছিলেন বসরার সৈন্য। আর কুফাবাসীদের থেকে হাবীন ইবনে কুররাহ, রাবা ইবনে আমির এবং আমির ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আসওয়াদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।^{৪৮৫}

পরিশেষে মুসলিম বাহিনী শত্রুদের সঙ্গে চূড়ান্ত লড়াইয়ের মুখোমুখি হন। যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। মুসলমানগণ বারা ইবনে মালিককে লক্ষ্য করে বলে, ‘হে বারা, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের বিজয় দান করেন।’ বারা বলেন, ‘হে আল্লাহ, আমাদের বিজয় দান করেন এবং আমাকে শহীদের মর্যাদা দান করুন।’ তারপর মুসলমানগণ শত্রুদের

^{৪৮৪} তারিখ আত-তাবারি, ৫/৬১-৬২।

^{৪৮৫} আত-তারিখুল ইসলামি, ১১/২০২।

ওপর প্রবল আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শত্রুরা এতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং পরাজয় বরণ করে। তারা তাদের পরিখা অতিক্রম করে দুর্গে আশ্রয় নেয় এবং মুসলিমরা তাদের ধাওয়া করে। পারসিকদের পক্ষে অবরোধ অসহনীয় হয়ে উঠলে তাদের দুজন আলাদাভাবে মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং শহর জয়ের পথ বলে দেয়; পানি নির্গমনের পথে প্রবেশ পথ রয়েছে বলে জানায়। নুমান এ সংবাদ পেয়ে লোকদের কিছু একটা করার জন্য অনুরোধ করে। কুফা এবং বসরার বীর সেনারা ওই স্থানে রাতের অন্ধকারে এসে সমবেত হয় এবং শহরে প্রবেশ করে। তারা শহরের গেইটের ভেতর থেকে তাকবীর-ধ্বনি দিতে থাকে এবং বাইরে থেকেও মুসলিম বাহিনী তাকবীর-ধ্বনি দিয়ে এর জবাব দেয়। তারপর ভেতর থেকে গেইট খুলে দিলে মুসলিম বাহিনী কোনো বাধা ছাড়াই শত্রুসেনাদের ওপর আক্রমণ করে এবং তাদের সমূলে ধ্বংস করে।^{৪৮৬}

এই যুদ্ধে হরমুযানের নিষ্কিণ্ত তিরের আঘাতে বারা ইবনে মালিক এবং মাযজাহ ইবনে সাওর শহীদ হন। তারা এমন এক সময় নিহত হন যখন মুসলমানরা যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন এবং হরমুযান দুর্গের ভেতর আশ্রয় নেয়। মুসলিম বীর সেনারা, যারা পানিপথে শহরে প্রবেশ করেছিল, তারা দুর্গটিকে ঘিরে ফেলে। তারা হরমুযকে দেখতে পেয়ে তার দিকে ছুটে যায়। তখন হরমুয তাদের লক্ষ্য করে বলে, ‘তোমরা কী চাও? তোমরা যদি মনে করো যে, আমি নিরুপায় হয়ে গেছি, তাহলে মনে রেখো, আমার থলেতে এক শ তির রয়েছে। আল্লাহর কসম, আমার কাছে একটি তিরও অবশিষ্ট থাকতে তোমার আমার নিকট আসতে পারবে না এবং একটি তিরও আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না। তোমাদের এক শ জনকে হত্যা কিংবা আহত করার চাইতে আমাকে বন্দী করা তোমাদের জন্য উত্তম নয় কি?’ মুসলমানগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি কী চাও?’ হরমুয বলল, ‘আমি চাই, তোমার আমাকে বন্দী করে খলীফা উমরের কাছে নিয়ে যাও। তারপর তিনি যা ইচ্ছা করবেন।’ তারা বলল, ‘ঠিক আছে। তা-ই হবে।’ তারপর হরমুয তার তিরের ভান্ডার ছুড়ে ফেলে দিয়ে নিজেকে মুসলমানদের হাতে সোপর্দ করল। তারা তাকে শেকলে আবদ্ধ করে কঠিন সতর্কতার মধ্যে খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট প্রেরণ করল। তারপর তারা শহরের ধন-সম্পদ জমা করল। এর এক-পঞ্চমাংশ

খলীফার নিকট প্রেরণ করে বাকি সম্পদ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল।
তাতে প্রত্যেক অশ্বারোহী সৈনিক তিন হাজার দিরহাম এবং পদাতিক
সৈনিক এক হাজার দিরহাম লাভ করল।^{৪৮৭}

তাসতার যুদ্ধ থেকে নিম্নলিখিত শিক্ষাসমূহ লাভ করা যায় :

আমি এক ওয়াক্ত নামাযের পরিবর্তে দুনিয়া এবং এর মধ্যস্থিত যাবতীয়
বস্তুও কামনা করি না।

আনাস ইবনে মালিক, বারাআ ইবনে মালিকের ভাই, বলেন, ‘আমি
তাসতার অবরোধে ছিলাম। প্রত্যুষে যখন লড়াই তীব্র হয়ে ওঠে তখন
মুসলিম সেনারা নামায পড়ার সুযোগ পায়নি। সূর্য ওঠার পূর্ব পর্যন্ত আমরা
নামায পড়তে পারিনি। তারপর আমরা ফজরের নামায আদায় করি।
আমরা আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ছিলাম এবং আল্লাহ
আমাদের বিজয় দান করেন। আনাস ইবনে মালিক আল-আনসারী বলেন,
‘আমি এক ওয়াক্ত নামাযের পরিবর্তে দুনিয়া এবং এর মধ্যস্থিত যাবতীয়
বস্তুও কামনা করি না।’^{৪৮৮}

বারাআ ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবন ছিল প্রশংসিত জীবন।
তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে যা বলেছেন,
এর চেয়ে উত্তম আর কিছু হতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম বলেন, ‘মাথায় উশকোখুশকো চুল ও দেহে ধূলিমলিন দু-খানা
পুরোনো কাপড় পরিহিত এরূপ অনেক ব্যক্তি রয়েছে, যার প্রতি লোকেরা
দৃষ্টিপাত করে না। অথচ সে আল্লাহর নামে শপথ করে ওয়াদা করলে
তিনি তা সত্যে পরিণত করেন। আল-বারাআ ইবনে মালিক তাদের
দলভুক্ত।’^{৪৮৯}

আল-বারাআ এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যার দুআ কবুল করা হতো
(মুসতাজাবুদ দাওয়াত)। বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

^{৪৮৭} তারিখ আত-তাবারি, ৫/৬৩-৬৪।

^{৪৮৮} আল-আনসার ফি আল-আসর আর-রাশিদা, পৃ. ২২৩।

^{৪৮৯} সুনান, আত-তিরমিযী, ৫/৬৫০, হাদীস নং ৩৮৫৪।

এই হাদীসের কারণেই সবাই জানত। এ জন্য এই যুদ্ধে লোকেরা তাকে শত্রুর পরাজয়ের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে বলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে এ রকম সম্মানসূচক কথা শোনার পরও তার মধ্যে কোনো অহংকার কিংবা ঔদ্ধত্য ছিল না; বরং তিনি ছিলেন বিনয়ী, যে কিনা যুদ্ধে প্রচণ্ড ঝুঁকি গ্রহণ করতেন এবং অবিশ্বাস্য সাফল্য ছিনিয়ে আনতেন। আর তিনি কখনো নেতৃত্বের জন্য লালায়িত ছিলেন না। তিনি আল্লাহর নিকট বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করেন, যা মুসলমানদের জন্য অনেক কল্যাণের কারণ হবে, তখনো তিনি নিজের অবস্থান ভুলে যাননি। তিনি একজন মুসলমানের জন্য পরম পাওয়া, শাহাদাত আকাজক্ষা করেন। প্রচণ্ড ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান না হলে এ রকম দুআ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা তার দুআ মঞ্জুর করেন; তিনি মুসলমানদের শত্রুদের পরাজিত করেন এবং একই সঙ্গে তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন।^{৪৯০}

২.৯.১। খলীফা উমর রা. এবং হরমুয

আবু সাবরাহ ইবনে আবি রুহম, ওই যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতি, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে হরমুযকে প্রেরণ করেন। মদীনায প্রবেশের পূর্বে তারা হরমুযকে তার ব্যবহৃত পোশাকে সজ্জিত করেন। স্বর্ণের কারুকাজমণ্ডিত পোশাকের সঙ্গে মণিমুক্তাখচিত শিরস্ত্রাণও পরিধান করান যাতে খলীফা ও মদীনার লোকেরা তাকে তার স্বাভাবিক পোশাকে দেখতে পান। তারপর তারা তাকে খলীফার বাড়িতে নিয়ে যান। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বাড়িতে ছিলেন না। তারা জানতে পারে, উমর রা, মসজিদে কুফা থেকে আগত একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন। তারপর তারা মসজিদে এসেও তার দেখা পাননি। মসজিদ থেকে ফেরার পথে তারা কিছু শিশুকে খেলায় মত্ত দেখতে পান। শিশুরা জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনারা কাকে খুঁজছেন? আপনারা কি আমীরুল মুমিনীনকে খুঁজছেন? তিনি মসজিদের ডান দিকে তার পাগড়িতে মাথা রেখে শুয়ে আছেন।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মাথায় একটি বিশেষ পাগড়ি পরিধান করে কুফার প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হয়েছিলেন। প্রতিনিধিদল বিদায় নিলে তিনি পাগড়িটিকে

^{৪৯০} আত-তারিখুল ইসলামি, ১১/২০৪।

পেঁচিয়ে বালিশ বানিয়ে তাতে মাথা রেখে শুয়ে পড়েন। তারা আরও লোকজনসহ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গিয়ে হাজির হন। মসজিদে তিনি ছাড়া আর কোনো লোক ছিল না; ঘুমন্ত অথবা জাগ্রত। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে তার লাঠিটি ধরা ছিল। হরমুয জিজ্ঞাসা করল, ‘উমর কোথায়?’ তারা বলল, ‘তিনিই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু।’

প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সবাইকে নীরবতা অবলম্বন করার জন্য ইশারা করেন। সবাই চুপচাপ বসে আছে। এ-সময় হরমুয জিজ্ঞাসা করে, ‘খলীফার নিরাপত্তা বাহিনী ও প্রহরী দল কোথায়?’ তারা বলল, ‘তার কোনো পাহারা কিংবা প্রহরী নেই। এমনকি তার কোনো সেক্রেটারিও নেই।’ হরমুয বলল, ‘তাহলে কি তিনি নবী?’ তারা বলল, ‘তিনি নবীদের কাজ করেন।’

চারপাশের আওয়াজে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি সোজা উঠে বসেন। তারপর তিনি হরমুযের দিকে তাকান এবং বলেন, ‘এ ব্যক্তিই কি হরমুয?’ তারা বলল, ‘হ্যাঁ।’ খলীফা হরমুযের দিকে ভালো করে লক্ষ করল। তার পোশাক-আশাক দেখে বললেন, ‘আমি জাহান্নামের আগুন থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই এবং আমি তার সাহায্য আশা করি।’ তিনি আরও বলেন, ‘আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি ইসলামের মাধ্যমে এই ব্যক্তি ও তার অনুসারীদের লাঞ্ছিত করেছেন। হে মুসলমান, ইসলামকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো, তোমাদের রাসূলের প্রদর্শিত পথে চলো এবং এ দুনিয়ার চাকচিক্যে প্রতারিত হোয়ো না। কারণ, দুনিয়া মানেই ধোঁকা।’

প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বলল, ‘ইনি হচ্ছেন আল-আহওয়ায রাষ্ট্রের শাসক। তার সঙ্গে কথা বলুন।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘কখনোই না। যতক্ষণ তার দেহ থেকে এই শানদার পোশাক অপসারণ না করা হবে, ততক্ষণ এই ব্যক্তির সঙ্গে কোনো কথা নেই।’ সুতরাং হরমুযের দেহ থেকে ছতর ঢাকার মতো সামান্য কিছু ছাড়া সবই খুলে ফেলা হলো এবং তাকে একটা চাদরে আবৃত করা হলো। তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হে হরমুয, এখন বলো, বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি এবং আল্লাহর শাস্তি কেমন দেখলে?’ সে বলল, ‘হে উমর, জাহেলী যুগে

আমাদের মধ্যে বিরোধ-মীমাংসায় কারও পক্ষেই আল্লাহর সাহায্য ছিল না। আমরা তোমাদের পরাজিত করেছি; কারণ, তিনি কোনো পক্ষেই ছিলেন না। এখন আল্লাহ তোমাদের পক্ষে। এ জন্য তোমরা আমাদের পরাজিত করেছ।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘জাহেলী যুগে তোমরা আমাদের পরাজিত করতে পেরেছিলে কারণ, তোমরা ছিলে ঐক্যবদ্ধ, আর আমরা ছিলাম বিভক্ত।’

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘বার বার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার কারণ কী?’ সে বলল, ‘আমার ভয় হচ্ছে, আমি আমার কথা শেষ করার আগেই হয়তো তুমি আমাকে হত্যা করে ফেলবে।’ তিনি বললেন, ‘ভয় পেয়ো না। তুমি কথা শেষ না করা পর্যন্ত তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।’ তখন হরমুয পানি পান করতে চায়। তাকে একটা অমসৃণ পাত্রে পানি দেওয়া হলো। সে বলল, ‘পিপাসায় মারা গেলেও আমি এ গ্লাসে পানি পান করতে পারব না।’ তারপর সুন্দর এক পাত্রে তার জন্য পানি আনা হলো। এবার সে খুশি হলো। তার হাত কাঁপা শুরু করল এবং সে বলল, ‘আমার ভয় হচ্ছে, আমি পানি পান করা অবস্থায় তুমি আমাকে মেরে ফেলবে।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তুমি পানি পান না করা পর্যন্ত তোমার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।’ তখন হরমুয পাত্রের পানি মাটিতে নিক্ষেপ করে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, ‘তাকে আরও কিছু পানি দাও। পিপাসার্ত অবস্থায় তাকে হত্যা করো না।’ সে বলল, ‘আমার আর পানির প্রয়োজন নেই। আমি কেবল আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, ‘আমি তোমাকে হত্যা করব।’ সে বলল, ‘তুমি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছ।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তুমি মিথ্যা বলছ।’ আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বলে উঠলেন, ‘হে আমীরুল মুমিনীন, সে সত্য বলেছে। আপনি তাকে নিরাপত্তার ঘোষণা দিয়েছেন।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমি বারাতা ইবনে মালিক ও মায়জাহ ইবনে সাওরের খুনিকে কীভাবে রেহাই দেব? আল্লাহর কসম, তুমি তোমার স্বপক্ষে কোনো সাক্ষী উপস্থিত করতে না পার, তবে আমি তোমাকে শাস্তি দেব।’ আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আপনি তাকে বলেছেন—‘তুমি কথা শেষ না করা পর্যন্ত তোমার কোনো ক্ষতি হবে না’ এবং ‘তুমি পানি পান না করা পর্যন্ত তোমার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।’ চারিদিকে

উপস্থিত লোকেরাও একই কথা বলল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হরমুযের দিকে তাকালেন এবং বললেন, ‘তুমি আমাকে প্রতারিত করেছ এবং কোনো মুসলমান যদি তোমার স্বপক্ষে কথা না বলত, তাহলে আমি এ প্রতারণা মেনে নিতাম না।’ এ ঘটনায় হরমুয মুসলমান হয়ে যায়। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার জন্য দুই হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করে দেন এবং তাকে মদীনায় থাকার অনুমতি প্রদান করেন।^{৪৯১}

২.১০। যুন্দাইসাবুর বিজয়

আবু সাবরাহ ইবনে আবি রুহম আশ-শূস এলাকা জয় করার পর তিনি সৈন্যসহ যুন্দাইসাবুরের দিকে অগ্রসর হন। যুন্দাইসাবুর ইতিমধ্যে জার ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে কুলাইব অবরোধ করে রেখেছিলেন। তারা সেখানে অবস্থান করতে থাকেন এবং শত্রুদের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। একসময় মুসলমানদের পক্ষ থেকে একজন তাদের নিরাপত্তা দেয়। এই শহরের বিজয় এবং নাহাওয়ান্দ অভিযানের মধ্যে সময়ের পার্থক্য ছিল দুই মাস।

মুসলমানরা হঠাৎ করেই দেখে, যুন্দাইসাবুরের দুর্গের সব গেইটগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে এবং লোকজন তাদের বেড়ার পাল নিয়ে, কেউ-বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দ্রব্যাদি নিয়ে বের হয়ে আসছে। মুসলিম বাহিনীর সৈন্যরা তাদের নিকট এর কারণ জিজ্ঞাসা করে। তারা বলে, ‘আপনারা আমাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন এবং আমরা তা মেনে নিয়েছি। আপনাদের নিরাপত্তার বিপরীতে আমরা জিযিয়া কর দেব।’ তারা বলল, ‘আমরা এ রকম কিছু বলিনি।’ লোকেরা বলল, ‘আমরা মিথ্যা বলছি না।’ তখন মুসলমানগণ নিজেদের মধ্যে অনুসন্ধান করে আসল ঘটনা বের করল। একজন মুসলিম গোলাম তাদের নিকট চিঠি লিখেছে। তার নাম মাকনাফ এবং এ শহরের অধিবাসী ছিল। তখন সৈন্যরা বলল, ‘সে তো একজন গোলাম।’ তারা বলল, ‘আমরা জানি না তোমাদের মধ্যে কে গোলাম আর কে স্বাধীন ব্যক্তি। আমরা এ রকম নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেয়েছি এবং আমরা তা অনুসরণ করব। আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত

^{৪৯১} তারিখ আত-তাবারি, ৫/৬৬।

পরিবর্তন করব না। যদি তোমরা তা না মানতে চাও, তাহলে যা ইচ্ছা, করো।’

মুসলিম বাহিনী তাদের ছেড়ে দিল এবং এ বিষয়ে চিঠিতে খলীফাকে অবহিত করল। তিনি তাদের লিখে পাঠালেন : আল্লাহ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তোমরা যদি তা না করো, তাহলে একনিষ্ঠ মুসলিম হতে পারবে না। যদি তোমাদের এ ব্যাপারে সন্দেহও হয়, তবু তোমরা এ চুক্তি মেনে নাও এবং তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করো।’ সুতরাং মুসলিম বাহিনী তাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে এবং তাদের ছেড়ে চলে আসে।^{৪৯২}

এ ঘটনা থেকে কাফের শত্রুদের সঙ্গেও মুসলমানদের ন্যায়সংগত আচরণ করতে দেখা যায়। নিঃসেন্দহে তাদের এই মহান আচরণ কাফেরদের দলে দলে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।^{৪৯৩}

২.১০.১। নুমান ইবনে মুকাররিন এবং কাসকার শহর

নুমান ইবনে মুকাররিন কাসকার শহরের গভর্নর ছিলেন। তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট একটি চিঠি প্রেরণ করেন। তিনি লেখেন : আমার এবং কাসকারের মধ্যে সম্পর্ক একজন যুবকের পাশে সুন্দরী ও আকর্ষণীয় বেশ্যার মতোই। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এ পদ থেকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে কোনো মুসলিম সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণের সুযোগ দিন।’ তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে জবাবে লেখেন, ‘যাও, নাহাওয়ান্দে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগ দাও এবং তুমিই তাদের সেনাপতি।’^{৪৯৪}

^{৪৯২} তারিখ আত-তাবারি, ৫/৭২।

^{৪৯৩} আত-তারিখুল ইসলামি, ১১/২১৭।

^{৪৯৪} তারিখ আত-তাবারি, ৫/১০৯।

❀ তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাহাওয়ান্দ যুদ্ধ—চতুর্থ পর্যায়, ২১ হি. (বিজয়ের বিজয়)

পারসিক বাহিনীর ওপর মুসলমানগণ একের পর এক অসংখ্য যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। তারা পালিয়ে যাওয়া শত্রুদের পেছনে এমনভাবে ধাওয়া করেছে যাতে শত্রুরা কোথাও গিয়ে স্থির হতে পারেনি। কাদেসিয়া যুদ্ধে মুসলমানদের ঐতিহাসিক বিজয়ের পর নাহাওয়ান্দ অভিযান প্রায় চার বছর পরে সংঘটিত হয়। মুসলিম বাহিনী হয়তো পারসিক সম্রাটের সর্বশেষ সৈন্যকেও পাকড়াও করতে সক্ষম হতো, যদি-না উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের অভিযান জাগহারুস (জাগরুস) পর্বত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখতে না বলতেন। মুসলিম বাহিনীকে পুনর্গঠন এবং বিজিত এলাকায় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার জনই এ রকম আদেশ জারি করা হয়েছিল।^{৪৯৫}

কাদেসিয়ার পর একের পর এক যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে পরাজয়ের গ্লানি পারসিকদের উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ করে তোলে। মনে হচ্ছিল, তারা এখনো নিঃশেষ হয়ে যাবেনি। তাদের নেতৃবৃন্দ এবং সেনাপতিরা পারস্য সম্রাট ইয়াযদগিরদের নিকট পত্র প্রেরণ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ করার আহ্বান জানায়। সম্রাট তাতে রাজি হন। সৈন্য-সামন্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি—যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তিনি তাই নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পুনরায় লড়াই করতে মনস্থ করেন। তিনি আল-বাব থেকে সাযিস্তান এবং খোরাসান পর্যন্ত পাহাড়ি এলাকার অধিবাসীদের চিঠি দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে নির্দেশ দেন। সবাইকে নাহাওয়ান্দ শহরে এসে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি এ স্থানটিকেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য নির্দিষ্ট করেন। এটি ছিল সুরক্ষিত। এর চারিদিকে পাহাড় এবং কঠিন

^{৪৯৫} দেখুন : আল-ফানুল আসকারিল ইসলামি, পৃ. ২৫৫।

গিরিপথ অতিক্রম না করে এতে প্রবেশ করার উপায় ছিল না। পারসিকরা এখানে এসে সমবেত হয়। ইয়াযদগিরদ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য জমা করতে সমর্থ হন; এর মধ্যে তিরিশ হাজার ছিল আল-বাব ও হুলওয়ান এলাকার মধ্যবর্তী অঞ্চলের, ষাট হাজার ছিল খোরাসান ও হুলওয়ানের মধ্যবর্তী অঞ্চলের এবং একই সংখ্যক সৈন্য সাযিস্তান ও হুলওয়ান এলাকার। ইয়াযদগিরত এ বাহিনীর সেনাপতি হিসাবে ফাইরাযানকে মনোনীত করেন।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পারসিকদের এই নতুন তৎপরতা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে জানানো হয়। তাকে ওই অঞ্চলের পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কেও অবহিত করা হয়। মুসলমানগণ তার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ বিষয়ে মদীনার বড় বড় সাহাবী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে পরামর্শ করেন। তারপর তিনি পারসিকদের সর্বশেষ ঘাঁটি নাহাওয়ান্দে আক্রমণ করার জন্য মুসলিম বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ওই সময় নুমান ইবনে মুকাররিন কাসকারের গভর্নর ছিলেন। তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এক চিঠিতে লেখেন : আমার এবং কাসকারের মধ্যে সম্পর্ক একজন যুবকের পাশে সুন্দরী ও আকর্ষণীয় বেশ্যার মতোই। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এ পদ থেকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে কোনো মুসলিম সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণের সুযোগ দিন।^{৪৯৬} তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু শূরা কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে নুমান ইবনে মুকাররিনকেই নাহাওয়ান্দে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি হিসাবে নিয়োগ দেন। নাহাওয়ান্দে সমর-পরিকল্পনা প্রণয়নে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন :

- ✓ নুমান ইবনে মুকাররিন (কাসকারের গভর্নর) মুসলিম সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক।
- ✓ হুযাইফা ইবনে আল-ইয়ামিন কুফার বিয়োজিত বাহিনীর সেনাপতি।
- ✓ আবু মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু (বসরার গভর্নর) বসরার বিয়োজিত বাহিনীর সেনাপতি।
- ✓ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাতাব রাযিয়াল্লাহু আনহু মুহাজির ও আনসারদের নিয়ে গঠিত বাহিনীর সেনাপতি।

- ✓ সালমা ইবনে আল-কায্যিন, হারমালা ইবনে মুরাইতা, জার ইবনে কুলাইব, আসওয়াদ ইবনে রাবিআ এং আল-আহওয়ায ও পারস্যের অন্যান্য মুসলিম সেনাপতি নিজ নিজ এলাকায় সৈন্য সমাবেশ করবে, যাতে শত্রুদের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু গভর্নর ও সেনাপতিদের উদ্দেশে যুদ্ধের বিস্তারিত নির্দেশ লিখে পাঠান এবং তিনি প্রায় তিরিশ হাজার সৈন্যের এক সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হন।^{৪৯৭} নুমান ইবনে মুকাররিন মুসলিম বাহিনী নিয়ে নাহাওয়ান্দের দিকে রওনা হন। তারা সেখানে পৌঁছে দেখেন, জায়গাটি সত্যিই খুব দুর্গম। চারিদিকে গভীর পরিখা রয়েছে। আর পরিখার সম্মুখভাগে ধারালো পেরেক পুঁতে রাখা হয়েছে, যা আক্রমণকারীদের জন্য অতিক্রম করা কঠিন। আর এতে ঘোড়াগুলোও আহত হয়ে যাবে এবং তারা আর অগ্রসর হতে পারবে না। দেয়াল ঘেরা শহরের অভ্যন্তরে পারসিক বাহিনী পুরোপুরি প্রস্তুত অবস্থায় অবস্থান করছে। কাদেসিয়া যুদ্ধে যারা উপস্থিত ছিল না তারা নাহাওয়ান্দ সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয় এবং মুসলমানদের সম্ভাব্য আক্রমণ পথে ফাইয়ান তার তিরন্দায়দের অবস্থান নিতে বলে, যাতে মুসলমানরা অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলেই তাদের তিরের আঘাতে কারু করা সম্ভব হয়।^{৪৯৮} মুসলমানদের অগ্রগামী দল অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ধারালো পেরেকে তারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ইতিমধ্যে পারসিকরা তির নিক্ষেপ করতে থাকে। তারা কোনোমতে শহরের দেয়ালের আড়ালে আশ্রয় নেয়।

এভাবে দু-দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। নুমান বাহিনীর সকল সেনাপতিকে নিয়ে পরামর্শ-সভা ডাকলেন। পরিস্থিতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সবাই তাদের অভিমত ব্যক্ত করলেন। তুলাইহা ইবনে খুওয়ালিদ আল-আসদি এক চমৎকার পরিকল্পনার প্রস্তাব করলেন, যাতে সবাই সম্মত হলেন। পরিকল্পনাটি হলো : মুসলমানদের অগ্রগামী দল অগ্রসর হয়ে পারসিক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করবে এবং শত্রুদের পাল্টা আক্রমণে উৎসাহিত করবে, যাতে তারা তাদের দেয়ালের বাইরে বের হয়ে আসে। যখন পারসিকরা বাইরে বের হয়ে আসবে, তখন মুসলমানদের অগ্রগামী দলটি

^{৪৯৭} দেখুন : আল-ফানুল আসকারিল ইসলামি।

^{৪৯৮} প্রাপ্ত।

পেছনে সরে আসবে যেন শত্রুরা মনে করতে থাকে দুর্বলতার কারণেই তারা পশ্চাতে পলায়ন করছে। এতে তারা বিজয়ের আশা করে মুসলমানদের ধাওয়া করবে। এই সুযোগে মুসলমানদের অপর দল গোপন জায়গা থেকে বের হয়ে পারসিকদের ওপর অকস্মাৎ আক্রমণ করবে। আর এটি ঘটবে তাদের দুর্গ থেকে অনেক দূরে।^{৪৯৯}

নুমান এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে তার বাহিনীকে ছোট ছোট দলে এভাবে বিভক্ত করেন :

- ✓ প্রথমে অগ্রগামী দল এবং এ দলের নেতৃত্ব থাকবে কাকা ইবনে আমরের হাতে; তাদের মূল লক্ষ্য শত্রুকে ধোঁকা দেওয়া, যা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে—তারা প্রথমে শত্রু-শহরের দেয়ালের ওপর আক্রমণ করবে যাতে যুদ্ধ শুরু করা যায়।
- ✓ দ্বিতীয় দল থাকবে স্বয়ং সর্বাধিনায়কের হাতে। তারা গোপন জায়গায় লুকিয়ে থাকবে এবং পরসিক সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করবে। হাতের নাগালে এলেই শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং মুখোমুখি লড়াই করবে।
- ✓ তৃতীয় দলটি অগ্রগামী দলেরই আরেকটি অংশ, যা বাহিনীর সেরা ও চৌকশ সেনাদের সমন্বয়ে গঠিত। তারাও গোপন জায়গায় লুকিয়ে থাকবে এবং শত্রুরা হাতে নাগালে এলেই দু-দিক থেকে আক্রমণ করবে।

নুমান মুসলমানদের তাদের নির্দিষ্ট গোপন জায়গায় লুকিয়ে থাকার নির্দেশ দেন এবং তার অনুমতি ছাড়া আক্রমণ করতে নিষেধ করেন।^{৫০০} মুসলিম সেনারা তার আদেশ মেনে চলে এবং আক্রমণের জন্য তার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগামী দল নিয়ে কাকা ইবনে আমর শত্রুদের ধোঁকা দিতে শুরু করেন এবং অবিশ্বাস্যভাবে তিনি তাতে সফল হন। শত্রুরা

^{৪৯৯} দেখুন : তারিখ আত-তাবারি, ৫/১১৩।

^{৫০০} তারিখ আত-তাবারি, ৫/১১৪।

মুসলমানদের পশ্চাদপসরণে ধাওয়া করতে এলে মুসলিম বাহিনী চারিদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলে। এ দৃশ্য দেখে শত্রুরা বিস্মিত হয়ে যায়। তারা তাদের দুর্গের দিকে পালাতে থাকে। কিন্তু তারা তাদের খনন করা পরিখায় আর ধারালো পেরেকে পড়তে থাকে। মুসলিম বাহিনী তাদের ধাওয়া করে এবং পেছন থেকে শত্রুদের তরবারির আঘাতে হত্যা করতে থাকে। এর মধ্যে হাজার হাজার মুশরিক পরিখায় পড়ে আত্মাহুতি দেয়। কাকা পারসিক সেনাপতি ফাইরাযানকে ধাওয়া করে ধরে ফেলে এবং তাকে হত্যা করে। এই যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনী প্রথমে নাহাওয়ান্দ এবং পরে হামাযানে প্রবেশ করে। তারপর তারা পুরো পারসিক এলাকার বাকি অংশে অভিযান পরিচালনা করে। বলার অপেক্ষা রাখে না, তারা এতে তেমন কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি। নাহাওয়ান্দের পর পারসিকরা আর কখনো ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি এবং মুসলমানগণ তাদের পুরো সাম্রাজ্য দখল করে নেন। এ জন্য নাহাওয়ান্দ যুদ্ধকে ‘বিজয়ের বিজয়’ বলা হয়।^{৫০১}

এই যুদ্ধে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিভিন্ন ক্ষেত্রে দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়; মুসলমানদের সৈন্য সমাবেশ করা এবং শত্রুদের সৈন্য সমাবেশে বাধা প্রদান; উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার কুফা, বসরা ও আরবে গভর্নরদের পারসিক বাহিনীর মোকাবিলায় সৈন্য সমাবেশ করার আদেশ প্রত্যাহার করেননি, অধিকন্তু তিনি আল-আহওয়ায এবং মুসলমানদের নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য পারসিক এলাকায় সেনাপতিদের শত্রুদের সৈন্য সমাবেশ করতে বাধা প্রদান করতে বলেন। তিনি সালমা ইনে কায়িন, হারমালা ইবনে মুরাইতা, জার ইবনে কুলাইব, আল-আসওয়াদ ইবনে রাবিআ এবং অন্যান্যদের পারসিক এবং আল-আহওয়াযের সীমান্ত এলাকায় নাহাওয়ান্দে শত্রু সেনাদের আগমনে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বলেন। সুতরাং এভাবে সেনাপতিরা সীমান্ত এলাকায় পাহারা-চৌকি স্থাপন করে নাহাওয়ান্দে শত্রুদের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রতিরোধ করেন।^{৫০২}

৩.১। যুদ্ধে সেনাপতি মৃত্যুবরণ করলে তার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ

মুতার লড়াইতে (৮ হি. / ৬২৯ খ্রি.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়েদ ইবনে হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সেনাপতি নিয়োগ

^{৫০১} দেখুন : আল-ফানুল আসকারিল ইসলামি।

^{৫০২} প্রাপ্ত।

করেন। তারপর তিনি বলেন, যদি যায়েদ শহীদ হয়ে যায়, তাহলে সেনাপতি হবে জাফর ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু। আর যদি জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়ে যায়, তাহলে সেনাপতি হবে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহু। নাহাওয়ান্দ যুদ্ধে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু একই কাজ করেন। তিনি এ যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক হিসাবে নুমান ইবনে মুকাররিনকে নিযুক্ত করেন। যদি নুমান শহীদ হয়ে যায়, তাহলে তার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে হুযাইফা ইবনে আল-ইয়ামানকে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে বলেন। আর যদি হুযাইফা শহীদ হয়ে যান, তাহলে সর্বাধিনায়ক হবেন নুআইম ইবনে মুকাররিন।

সামরিক বাহিনী পরিচালনায় নুমান ইবনে মুকাররিন অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। নিচে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

৩.১.১। যুদ্ধ শুরু করার আগেই লড়াই করার জন্য অগ্রগামী দল প্রেরণ

নাহাওয়ান্দে সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওনা হওয়ার আগেই (যা বিশেষ অধিক প্যারাসাং দূরে) তুলাইহা ইবনে খুওয়ালিদ আল-আসদি, আমর ইবনে আবি সালমা আল-আনযি এবং আমর ইবনে মাদি ইয়াকরিবকে অগ্রবাহিনী হিসাবে প্রেরণ করেন। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল, পথের নিরাপত্তা ও সম্মুখভাগে কোনো শত্রু-ছাউনি থাকলে তা খুঁজে বের করা। এই তিন জন এক দিন ও এক রাত সফর করেন। তারপর নিজ বাহিনীতে ফিরে আসেন এবং সর্বাধিনায়ককে অবহিত করেন যে নাহাওয়ান্দ পর্যন্ত শত্রুদের কোনো পাহারা বা ঘাঁটি নেই। আধুনিক সমরবিদ্যায় এটি রিকনেইসেন্স (প্রাথমিক নিরীক্ষণ) নামে পরিচিত, যেখানে সামরিক বহরের গতিপথে অগ্রগামী দল প্রেরণ করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। অধিকন্তু তিনি সামরিক বাহিনীকে যেকোনো সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেই নাহাওয়ান্দের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।

৩.১.২। শত্রুদের ধোঁকা দেওয়ার কৌশল

নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী শত্রুদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য এমন এক চমৎকার রণকৌশল ব্যবহার করেন, যা ইতিপূর্বে পৃথিবীর ইতিহাসে

আর কোনো দেশ বা জাতি ব্যবহার করেনি—প্রাচীন কিংবা আধুনিককালেও না। মুসলিম বাহিনী দেখল, পারসিকদের দুর্গের প্রাচীর ভেদ করা সম্ভব হচ্ছে না—এটি পরিখা, ধারালো পেরেক ও অব্যর্থ তিরন্দাজ বাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত এবং তাদের নিকট পর্যাপ্ত রসদপত্র মজুদ থাকাতে অবরোধ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। তখন তারা এমন এক কৌশল অবলম্বন করতে চাইল, যাতে শত্রুরা তাদের সীমানা ছেড়ে বাইরে বের হয়ে আসতে বাধ্য হয় এবং নিজেদের সুবিধামতো জায়গায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া যায়। বস্তুত মুসলিম বাহিনীর পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ীই সবকিছু সংঘটিত হয়। তারা পারসিকদের দুর্গ থেকে বের হয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করে এবং নিজেদের সুবিধামতো জায়গায় এনে তাদের ওপর অকস্মাৎ আক্রমণ পরিচালনা করে। এতে তারা বিস্মিত ও হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। উপায়ান্তর না দেখে পেছনে পালাতে থাকে। এভাবে কোনো শত্রু বাহিনীকে কৌশলে তাদের সুরক্ষিত স্থান থেকে বের করে হঠাৎ আক্রমণে পর্যুদস্ত করা এবং তাদের ওপর বিজয়ী হতে আর কোনো জাতিকে দেখা যায় না।^{৫০৩}

৩.১.৩। আক্রমণের সময় নির্ধারণ

নুমান ইবনে মুকাররিন এবং তার বীর সেনারা সুবিধামতো স্থান ও সময়ে শত্রুর ওপর আক্রমণের ক্ষেত্রে চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন, যা ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। তাদের এই সময় নির্ধারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতকে অনুসরণ করা হয়—ঠিক মধ্যবেলায় যখন ছায়া দীর্ঘ হতে শুরু করে এবং বাতাসের ক্ষীণ প্রবাহ থাকে। নুমান ইবনে মুকাররিন এই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তার মৃত্যুর সংবাদ জেনে উমর রাযিরাল্লাহু আনহু বলে ওঠেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন। তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং খুবই দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি আরও যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের নাম জানতে চান। তাকে বলা হলে তিনি তাদের চিনতে পারেননি। তিনি বললেন, ‘যারা মুসলিম বাহিনীতে দুর্বল ও নিগৃহীত, কিন্তু যিনি তাদের শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করেছেন, তিনি তাদের চেহারা ও বংশপরিচয় খুব ভালো করেই জানেন; উমরের জানা বা অজানায় কী আসে-যায়!’^{৫০৪}

^{৫০৩} দেখুন : আল-ফানুল আসকারিল ইসলামি, পৃ. ২৯৫-২৯৬।

^{৫০৪} দেখুন : আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/১১৩।

বলা বাহুল্য, নাহাওয়ান্দ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী যে গনীমতের লাভ করেছিল, তাতে দুটি সিন্দুক বোঝাই স্বর্ণ-রুপা ও মণি-মুক্তা ছিল। এগুলো সশ্রী কিসরার ভান্ডার থেকে পাওয়া গিয়েছিল। মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হুযাইফা সেগুলো সাইব ইবনে আকরার মাধ্যমে খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। যখন সাইব ইবনে আকরা এগুলো উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট হাজির করলেন, তখন তিনি বললেন, ‘এগুলো বাইতুল মালে রেখে দাও এবং তুমি তোমার ডিভিশনে গিয়ে যোগ দাও।’ তিনি ফিরে যান। তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আরেকজনকে তার খোঁজে প্রেরণ করেন এবং তাকে কুফায় গিয়ে নাগাল পেয়ে মদীনায় ফেরত নিয়ে আসেন।^{৫০৫} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে দেখে বললেন, ‘তুমি আমার নিকট কী নিয়ে এসেছ? যেদিন তুমি চলে গেলে, সেদিন সারা রাত আমি একই স্বপ্ন দেখলাম : ফেরেশতারা আমাকে ওইসব সিন্দুকের নিয়ে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে, যা আগুনে ভর্তি। তারা আমাকে সতর্ক করছে, আমি যদি সেগুলো বিলিয়ে না দিই, তাহলে তারা আমাকে আগুনে জ্বালাবে। সেগুলো নিয়ে যাও, বিক্রি করো এবং মুসলিম বাহিনীর প্রয়োজনে খরচ করো।’ সুতরাং তিনি সেগুলো কুফার বাজারে বিক্রি করে দেন।

আল্লাহ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওপর সন্তুষ্ট হোন—তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদাঙ্কের পরিপূর্ণ অনুসরণকারী ছিলেন এবং আল্লাহ তাকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছিলেন। তার মাধ্যমে তিনি ইসলাম ও মুসলমানদেরও সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়েছেন। হে আল্লাহ, আমাদেরকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার তাওফিক নসীব করুন এবং সকল বাতিল ফিরকা থেকে হেফাজত করুন।^{৫০৬}

নাহাওয়ান্দ যুদ্ধের পরপরই হামাযান, তাবারিস্তান এবং ইসফাহানে পারসিক নেতারা দ্রুত মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে এগিয়ে আসে—একের পর এক।^{৫০৭}

^{৫০৫} প্রাগুক্ত, ৭/১১৪।

^{৫০৬} দেখুন : ইতমামুল ওয়াফা।

^{৫০৭} প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১০১।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পারস্যের অভ্যন্তরে অভিযান (পঞ্চম পর্যায়)

নাহাওয়ান্দ যুদ্ধে পরাজয়ের পর পারসিকরা মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে আর কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের পারসিক রাজ্যের অভ্যন্তরে অভিযান পরিচালনা করার অনুমতি প্রদান করেন। নাহাওয়ান্দের পরে মুসলিম বাহিনী ইসফাহান শহরে পৌঁছেন। সেখানে এক দীর্ঘ লড়াই শেষে পারসিকরা মুসলমানদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ তাদের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে চুক্তি লিখে দেন। তবে তিরিশ জন ব্যক্তি ইসফাহান এলাকা থেকে পালিয়ে কারমান এলাকায় গমন করে এবং তারা মুসলমানদের সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে রাজি হয়নি। ২১ হিজরীতে আবু মূসা কোম এবং কাসহান এলাকা জয় করেন। আর সুহাইল ইবনে আদিয়্যি কারমান শহর জয় করেন।

৪.১। দ্বিতীয়বারের মতো হামাযান শহর জয় (২২ হি.)

নাহাওয়ান্দের পরে মুসলিম বাহিনী হুলওয়ান এবং হামাযান জয় করেন। তবে হামাযানবাসীরা কাকা ইবনে আমরের সঙ্গে কৃত শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নাইম ইবনে মুকাররিনকে হামাযানের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি সেখানে পৌঁছে সানিয়াত আল-আসল এলাকায় তাঁবু গাড়েন। তারপর তিনি হামাযানের দিকে অগ্রসর হয়ে এর আশেপাশের এলাকা দখল করেন এবং হামাযান অবরোধ করেন। তারা তার সঙ্গে শান্তিচুক্তি করতে সম্মত হয়। তিনি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে বারো হাজার মুসলিম বাহিনী নিয়ে হামাযান শহরে প্রবেশ করেন। হামাযানে অবস্থানকালেই দাইলাম এবং

আজারবাইযানের নেতাদের চিঠি আদান-প্রদান হয় যারা তার বিরুদ্ধে বিশাল বাহিনী সমবেত করে। তিনি তার বাহিনী নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং ওয়ায আর-রুয়ায এলাকায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তারা নাহাওয়ান্দের মতোই এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করেন। দাইলামের শাসকসহ অসংখ্য মুশরিক এ যুদ্ধে নিহত হয়। আর যারা নিহত হয়নি, তারা রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যায়।

দাইলামের সঙ্গে নাইম ইবনে মুকাররিনই প্রথম যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।^{৫০৮} নাইম চিঠিতে খলীফাকে তার প্রতিপক্ষ সম্পর্কে জানালে তিনি খুব চিন্তিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু শীঘ্রই তার নিকট খুশির সংবাদ গিয়ে পৌঁছে। তিনি বার্তাবাহককে জিজ্ঞাসা করেন, ‘তুমি কি বাশির (শুভসংবাদ বহনকারী)? বার্তাবাহক বুঝতে না পেরে জবাব দেয়, ‘না। আমি উরওয়া।’ খলীফা তাকে আবার একই প্রশ্ন করেন। এবার বার্তাবাহক বুঝতে পেরে জবাব দেয়, ‘হ্যাঁ। আমি শুভ সংবাদ নিয়ে এসেছি।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি কি নাইম ইবনে মুকাররিন না সাম্মাক ইবনে উবাইদের পক্ষ থেকে এসেছ?’ সে বলে, ‘নাইম ইবনে মুকাররিন।’ তিনি বলেন, ‘কী খবর?’ সে বলল, ‘বিজয়ের সংবাদ গ্রহণ করুন।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং জনগণের সম্মুখে চিঠিটি পড়ে শোনাতে বললেন এবং লোকেরাও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল।

সাম্মাক ইবনে মাখরামা, সাম্মাক ইবনে উবাইদ এবং সাম্মাক ইবনে খারাসা কুফা থেকে প্রতিনিধিদল নিয়ে মদীনায় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট খুমস (যুদ্ধলব্ধ গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ) নিয়ে আসেন। তিনি তাদের বংশপরিচয় জিজ্ঞাসা করেন এবং তারা তা বলেন। তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আল্লাহ আপনাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ, আপনি তাদের দ্বারা ইসলামকে সাহায্য করুন এবং ইসলাম দ্বারা তাদের সাহায্য করুন।’^{৫০৯}

^{৫০৮} তারতিব ওয়া তাহযিব আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃ. ১৬০।

^{৫০৯} তারিখ আত-তাবারি, ৫/১৩৪।

৪.২। আর-রয়্যি বিজয় (২২ হি.)

নাইম ইবনে মুকাররিন হামাযানে ইয়াজিদ ইবনে কাইসকে স্থলাভিষিক্ত করে মুসলিম বাহিনী নিয়ে আর-রয়্যির উদ্দেশে রওনা হন। সেখানে তারা বিশালসংখ্যক মুশরিক বাহিনীর মোকাবিলা করেন। রয়্যি পাহাড়ের পাদদেশে এ লড়াই সংঘটিত হয়। ইসলামের শত্রুরা ভীষণভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তবে শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হয়। নাইম ইবনে মুকাররিন নিজেই অনেক মুশরিককে হত্যা করেন। তারা এ যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ গনীমত লাভ করেন। এর পরিমাণ মাদাইন বিজয়ে প্রাপ্ত গনীমতের মতোই ছিল। তারপর নাইম ইবনে মুকাররিন এ বিজয়ের সংবাদ খলীফাকে অবহিত করেন এবং তার নিকট খুমস প্রেরণ করেন। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা।^{৫১০}

৪.৩। কুমীস ও যুরযান বিজয় (২২ হি.)

রয়্যি শহরের বিজয়-সংবাদ ও খুমস লাভ করে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নাইম ইবনে মুকাররিনকে পরবর্তী নির্দেশনাসহ চিঠি প্রেরণ করেন। তিনি তার ভাই সুওয়াইদ ইবনে মুকাররিনকে কুমীসের দিকে পাঠানোর নির্দেশ দেন। সুতরাং সুওয়াইদ সেখানে যান এবং তিনি তেমন কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হননি। তিনি শান্তিপূর্ণভাবেই কুমীস শহরের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হন। তিনি সেখানে অবস্থান করেন এবং লোকজনকে শান্তিচুক্তির আওতায় নিয়ে আসেন; তাদের জন্য নিরাপত্তার অঙ্গীকার করেন। এখানে অবস্থানকালেই তার নিকট বিভিন্ন শহরের লোকজন জিযিয়া কর প্রদানের মাধ্যমে শান্তিচুক্তির প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি যুরযান, তাবারিস্তানসহ সকলের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করেন এবং সবার জন্য পৃথক চুক্তিপত্র লিখে দেন।^{৫১১}

৪.৪। আজারবাইযান বিজয় (২২ হি.)

হামাযান এবং রয়্যি বিজয়ের পর নাইম ইবনে মুকাররিন অগ্রবর্তী দল হিসাবে বুকাইর ইবনে আব্দুল্লাহকে হামাযান থেকে আজারবাইযানে প্রেরণ করেন এবং তার পশ্চাতে সাম্মাক ইবনে খারাসাকে প্রেরণ করেন। উমর

^{৫১০} তারিখ আত-তাবারি, ৫/১৩৬-১৩৭।

^{৫১১} তারতিব ওয়া তাহযিব আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃ. ১৬১।

রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশ অনুযায়ীই এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তবে এই সাম্রাজ্যে মানেন তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু দুয়ানা নন। সাম্রাজ্যে যোগ দেওয়ার আগেই বুকাইর তার বাহিনী নিয়ে আসফানদিয়া ইবনে ফারুকজাযকে প্রতিরোধ করেন। মুশরিকরা পরাজয় বরণ করে এবং আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় দান করেন। মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি বুকাইর আসফানদিয়াকে বন্দী করেন। তিনি তাকে বলেন, ‘তোমার কাছে যুদ্ধ নাকি শান্তিচুক্তি বেশি প্রিয়?’ আসফানদিয়া বলল, ‘শান্তি।’ তারপর সে তাকে তার সঙ্গে রাখার অনুরোধ করে। বুকাইর তাকে সঙ্গে রাখেন। সেখান থেকে তিনি আজারবাইয়ানে একের পর এক শহর দখল করতে থাকেন। উতবা ইবনে ফারকাদ আজারবাইয়ানের আরেক প্রান্তে একই ভাবে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশ আসে। তিনি বুকাইরকে আল-বাবের দিকে অগ্রসর হতে বলেন। বুকাইর সাম্রাজ্যকে নিজের স্বাভিষিক্ত করে উতবা ইবনে ফারকাদের সহকারী হিসাবে মনোনয়ন দেন। আজারবাইয়ানের সকল বিজিত অঞ্চল উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেনাপতি উতবা ইবনে ফারকাদের হাতে অর্পণ করেন। বুকাইর আসফানদিয়াকে তার হাতে সোপর্দ করেন। বাহরাম ইবনে ফারুকজায এগিয়ে এসে উতবা ইবনে ফারকাদের গতিরোধ করেন। তাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। উতবা বাহরামকে পরাজিত করেন এবং বাহরাম পালিয়ে যায়। আসফানদিয়া এ খবর শুনে বলল, ‘এখন আর কোনো যুদ্ধ নয়, এখন শান্তির সময়।’ সুতরাং শান্তিচুক্তিতে সবাই সম্মত হলো এবং আজারবাইয়ানের অধিবাসীদের মধ্যে শান্তি ফিরে এল। উতবা এবং বুকাইর খুমসসহ এ সংবাদ খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। আজারবাইয়ানের গভর্নর হয়ে উতবা এ অঞ্চলের লোকদের জন্য শান্তিচুক্তি লিখে দিলেন।^{৫১২}

৪.৫। আল-বাব বিজয় (২২ হি.)

আল-বাব অভিযানে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু পত্র মারফত সুরাকা ইবনে আমর (যু আন-নুর নামে পরিচিত)-কে সেনাপতি নির্বাচন করেন এবং খলীফার নির্দেশ অনুযায়ী সুরাকা তার বাহিনী নিয়ে রওনা হন। মুসলিম বাহিনীর অগ্রগামী দল ছিল আব্দুর রহমান ইবনে রাবিআর নেতৃত্বে।

^{৫১২} তারিখ আত-তাবারি, ৫/১৪১-১৪২।

আরমেনিয়ার রাজা শাহরাবারাজ, বনী ইসরাইলদের হত্যাকারীদের উত্তরসূরি এবং প্রাচীনকালে সিরিয়া বিজয়ী, আল-বাবে অবস্থান করছিলেন। আব্দুর রহমান ইবনে রাবিআ তার নিকট পৌঁছে যান। তখন শাহরাবারাজ নিরাপত্তা চেয়ে আব্দুর রহমানের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। রাজা নিজেই এগিয়ে এসে আব্দুর রহমানের নিকট ধরা দেন। নিজেকে মুসলমানদের হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে পরিচয় দেন এবং এ ব্যাপারে নিজের আগ্রহ ব্যক্ত করেন। তিনি তাকে বলেন, ‘আমার ওপরে কর্তৃত্বশীল আরেকজন আছেন। আপনি তার নিকট যান।’ আব্দুর রহমানের তাকে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি সুরাকা ইবনে আমরের নিকট প্রেরণ করেন। শাহরাবারাজ সুরাকার নিকট নিরাপত্তা চাইলে তিনি তার জন্য একটি চুক্তিনামা লিখে দেন, যাতে তার জন্য তখন থেকেই নিরাপত্তার আওতায় আনা হয়।

সুরাকা তারপর বুকাইর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-লাইসি, হাবীব ইবনে মাসলামাহ, হুযাইফা ইবনে উসাইদ এবং সালমান ইবনে রাবিআকে আরমেনিয়ার পর্বত ঘেরা অঞ্চলে (আল-লান, তাফিলিস এবং মুকান) প্রেরণ করেন। বুকাইর মুকান বিজয় করেন এবং তাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করেন। তখন ওই অঞ্চলে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি সুরাকা ইবনে আমর ইত্তেকাল করেন। তার স্থলাভিষিক্ত নির্বাচিত হন আব্দুর রহমান ইবনে রাবিআ। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ খবর পেয়ে তা মেনে নেন এবং তাকে তুর্কীদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করার নির্দেশ দেন।^{৫১৩}

৪.৬। তুর্কীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু

আব্দুর রহমান ইবনে রাবিআ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশ অনুযায়ী তুর্কীদের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হন এবং আল-বাব অতিক্রম করছিলেন। এ-সময় শাহরাবারায় তাকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘কোথায় যাচ্ছেন?’ তিনি জবাব দেন, ‘আমি তুর্কীদের রাজার খোঁজে বালানযারে যাচ্ছি।’ শাহরাবারায় তাকে বলেন, ‘আমরা যদি তাদের নিয়ে মাথা না ঘামাই এবং তারাও আমাদের থেকে বিমুখ থাকে, তাহলেই ভালো হয়।’ আব্দুর রহমান বললেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা আমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ

^{৫১৩} তারিখ আত-তাবারি, ৫/১৪৫।

করেছেন এবং তিনি নিজে বলে গিয়েছেন যে, ইসলাম বিজয়ী হবে। সুতরাং আমরা এ লক্ষ্যে কাজ করে যাব।’ সুতরাং তিনি তুর্কীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন এবং বালানযারের অভ্যন্তরে দু শ প্যারাসাং দূরত্ব অতিক্রম করেন। অনেক খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ করে এগিয়ে যেতে থাকেন। পরবর্তীকালে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে তুর্কীদের সঙ্গে মুসলমানদের বিশাল ও কঠিন যুদ্ধ সংঘটিত হয়।^{৫১৪}

৪.৭। খোরাসান অভিযান (২২ হি.)

আহনাফ ইবনে কাইস আমীরুল মুমিনীন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পারসিক রাজ্যের আরও গভীরে অভিযান পরিচালনা করার পরামর্শ দেন যাতে পারসিক সম্রাট ইয়াযদগিরদকে দমন করা যায়। কারণ, ইয়াযদগিরদ এখনো পারসিক সাধারণ জনগণ ও সৈন্যদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উস্কানি দিচ্ছে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আহনাফ ইবনে কাইসের এ পরামর্শের ভিত্তিতে অভিযানের অনুমতি প্রদান করেন। তিনি মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি হিসাবে আহনাফ ইবনে কাইসকে নিয়োগ দেন এবং তাকে খোরাসান আক্রমণ করার নির্দেশ দেন।

বিশাল এক বাহিনী নিয়ে আহনাফ ইবনে কাইস খোরাসানের উদ্দেশে রওনা হন। তার মূল লক্ষ্য ছিল ইয়াযদগিরদকে মোকাবিলা করা। তিনি খোরাসানে প্রবেশ করে হেরাত দখল করে নেন এবং সুহার ইবনে ফুলান আল-আবদিকে সেখানকার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। তারপর তিনি মারভ শাহযানের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। সেখানেই ইয়াযদগিরদের অবস্থান ছিল। আহনাফ ইবনে কাইস অগ্রগামী দল হিসাবে মুতাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আস-সাখিরকে নিশাপুর এবং হারিস ইবনে হাসানকে সারখাসের দিকে প্রেরণ করেন। আহনাফ মুসলিম বাহিনী নিয়ে মারভ শাহযানের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে ইয়াযদগিরদ শহর ছেড়ে মারভ রুয়ে পালিয়ে যায়। আহনাফ মারভ শাহযান বিজয় করেন এবং সেখানে অবস্থান করেন।

ইয়াযদগিরদ মারভ রুয়ে পৌঁছে তিনি তুর্কী, আস-সাগদ এবং চীনের রাজাদের নিকট পত্র প্রেরণ করে সাহায্যের আবেদন করে। আহনাফ

^{৫১৪} প্রাগুক্ত, ৫/১৪২-১৪৭।

ইবনে কাইস মারভ শাহযানে হারিসা ইবনে নুমানকে দায়িত্ব দিয়ে মারভ রুয়ের দিকে ইয়াযদগিরদকে ধাওয়া করেন। এ-সময় মুসলমানদের সাহায্যে চার জন সেনাপতিসহ এক বিশাল সৈন্যবহর এসে আহনাফের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়। এ সংবাদ পেয়ে ইয়াযদগিরদ বালখে পালিয়ে যায়। মুসলিম বাহিনী বালখে গিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ শত্রুদের পরাজিত করেন। ইয়াযদগিরদ কিছু সঙ্গীসহ নদী পার হয়ে পালিয়ে যান। এভাবে পুরো খোরাসান অঞ্চল আহনাফের অধীনে চলে আসে। তিনি এর প্রত্যেক শহরের জন্য একজন গভর্নর নিযুক্ত করেন। তারপর তিনি মারভ রুয়ে ফিরে যান এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এ পত্র-মারফত বিজয়ের সংবাদ অবহিত করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে তাকে নদী অতিক্রম করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, ‘খোরাসানেই তোমাদের নিয়ন্ত্রণ মজবুত করো।’

ইয়াযদগিরদ যখন নিকটস্থ রাষ্ট্রসমূহের রাজাদের নিকট সাহায্যের আবেদন করে, তখন তারা এতে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। কিন্তু যখন সে নদী অতিক্রম করে তাদের রাজ্যে প্রবেশ করে, তখন প্রচলিত রাষ্ট্রীয় নিয়ম অনুযায়ী তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তুর্কী রাজা খাকান তার সঙ্গে বালখ পর্যন্ত আসেন এবং তারা মারভ রুয়ে তাঁবু গাড়েন। আর আহনাফ ইবনে কাইসও এখানেই অবস্থান করছিলেন। বসরা ও কুফার প্রায় বিশ হাজার মুসলিম সৈন্য তার সঙ্গে ছিল। তিনি রাতে তাদের অবস্থার খোঁজখবর নিতেন। তখন এক ব্যক্তিকে বলতে শোনেন : সেনাপতি যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে তার উচিত হবে পাহাড়কে পেছনে রেখে যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান গ্রহণ করা। আর তার সম্মুখভাগে থাকবে নদী, যা পরিখার মতো শত্রুর জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এতে শত্রুরা কেবল একদিক থেকেই রণক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারবে।’

পরের দিন আহনাফ এভাবেই তার সৈন্যদের অবস্থান গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন এবং এটি ছিল উপযুক্ত রণকৌশল ও বিজয়ের পূর্বাভাস। তুর্কী ও পারসিকদের সমন্বয়ে এমন এক বিশাল বাহিনী সমবেত হয়, যা ভীতি সঞ্চার করার জন্য যথেষ্ট। আহনাফ সেনাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক ভাষণে বলেন, ‘তোমরা সংখ্যায় কম এবং তোমাদের শত্রুরা অসংখ্য। কিন্তু এতে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহ বলেন,

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবিলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তাদের সঙ্গে রয়েছেন।^{৫১৫}

তুর্কীরা দিনে যুদ্ধ করত এবং রাতে তারা কোথায় চলে যেত, আহনাফ তা জানতেন না। এ জন্য একরাতে তিনি একজন সেনাকে সঙ্গে নিয়ে খাকানের খোঁজে বের হলেন। রাত প্রায় শেষ দিকে। তখন এক তার্কিশ অশ্বারোহীকে ঢোল বাজিয়ে অগ্রসর হতে দেখেন। তার গলায় ছিল নেকলেস। আহনাফ তার দিকে এগিয়ে যান এবং তাকে চ্যালেঞ্জ করেন। দুজনের মধ্যে লড়াই শুরু হলে আহনাফ তাকে হত্যা করতে সক্ষম হন। তারপর আহনাফ তার নেকলেসটি নিয়ে নেন এবং তার স্থানে অপেক্ষা করতে থাকেন। আরেকজন তার্কিশ একই ভাবে গলায় নেকলেস পরে ড্রাম পিটিয়ে এগিয়ে আসে। আহনাফ তাকে হত্যা করেন এবং তার নেকলেসটি নিয়ে নেন। তৃতীয় আরেকজন একইভাবে নিহত হয় এবং আহনাফ তার নেকলেস নিয়ে নেন। তারপর আহনাফ দ্রুত বাহিনীর নিকট ফিরে আসেন। তুর্কীরা এ ঘটনার কিছুই টের পায়নি।

তুর্কীদের নিয়ম ছিল, সর্বাগ্রে তিন জন অশ্বারোহী পরপর ড্রাম পিটিয়ে বের না হওয়া পর্যন্ত তারা করে হতো না। তারপর যখন তুর্কীরা বের হয়ে এল, তখন তারা তাদের মৃত অশ্বারোহী সৈন্যদের দেখতে পেল এবং তুর্কীদের রাজা এ ঘটনাকে অশুভ সংকেত মনে করলেন। তিনি তার সৈন্যদের বললেন, ‘আমরা দীর্ঘ সময় ধরে বাইরে রয়েছি এবং এই তিন জন এমন এক জায়গায় নিহত হয়েছে, যা ইতিপূর্বে ঘটেনি। এই লোকদের সঙ্গে লড়াই করে লাভ নেই; চলো, আমরা ফিরে যাই।’ সুতরাং তারা তাদের দেশে ফিরে গেল।^{৫১৬}

মুসলিম সৈন্যরা আহনাফকে জিজ্ঞাসা করল, ‘আমরা কি অগ্রসর হয়ে তাদের ধাওয়া করব?’ তিনি বললে, ‘যেখানে আছ, সেখানেই থাকো। আর তাদের ছেড়ে দাও।’ আহনাফ সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। কারণ,

^{৫১৫} সূরা আল-বাকারা, ২ : ২৪৯।

^{৫১৬} তারিখ আত-তাবারি, ৫/১৫৯।

হাদীসে এসেছে, ‘তুর্কীদের তাদের মতো থাকতে দাও যতক্ষণ তারা তোমাদের ওপর আক্রমণ না করে।’^{৫১৭}

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٥١٨﴾

আল্লাহ কাফিরদের ত্রুদ্বাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। কোনো কল্যাণ তারা লাভ করেনি। যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।^{৫১৮}

ইয়াযদগিরদ চরম হতাশ হয়ে পড়লেন। তিনি যা চেয়েছিলেন বা যাদের নিকট থেকে সাহায্যের আশা করেছিলেন তা অর্জন করতে পারেননি। সবাই তাকে ত্যাগ করেছে এবং আশাহত করেছে যখন তার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল খুব বেশি।

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনো তার জন্য কোনো পথ পাবে না।^{৫১৯}

তিনি পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। এখন তার কী করা উচিত, কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। তারপর তিনি চীনের রাজার নিকট সাহায্যের আবেদন করেন। চীনের রাজা বার্তাবাহকের নিকট যারা তাদের দেশ দখল করেছে, তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলেন। বার্তাবাহক রাজাকে মুসলমানদের যাবতীয় বিষয়াদি তুলে ধরে; তারা কীভাবে ঘোড়া ও উট পরিচালনা করে, তারা কী করেছে এবং কীভাবে নামায পড়ে ইত্যাদি। রাজা সবকিছু শোনার পর ইয়াযদগিরদের নিকট চিঠি প্রেরণ করেন এবং তাতে লেখেন : আমি আপনার সাহায্যে কোনো সৈন্যবাহিনী এ জন্য প্রেরণ করিনি যে, আমি আসলে জানি না আপনার প্রতি আমার

^{৫১৭} আত-তাবারি, আল-কাবির।

^{৫১৮} সূরা আহযাব, ৩৩ : ২৫।

^{৫১৯} সূরা আন-নিসা, ৪ : ৮৮।

দায়িত্ব কতটুকু; বরং এর কারণ হলো, যারা আপনার সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে, তারা যদি কোনো পাহাড়ের সঙ্গেও লড়াই করে, তাহলে সেটিকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে সক্ষম। আমি যদি আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসি, তাহলে তারা আমাকেও পরাজিত করবে। সুতরাং তাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করাই যুক্তিসংগত।' পারসিক সম্রাট এবং তার পরিবার অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে কোনো এক অজানা স্থানে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। তিনি সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন যতদিন না উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে নিহত হন।^{৫২০}

আহনাফ চিঠিতে বিজয়ের সংবাদ ও খুমস মদীনায়ে প্রেরণ করেন। তিনি চিঠিতে বিস্তারিতভাবে যুদ্ধের বর্ণনা তুলে ধরেন; কীভাবে আল্লাহ তুর্কীদের সম্পদ মুসলমানদের হাতে অর্পণ করলেন, কীভাবে মুসলিম বাহিনী তাদের অনেককে হত্যা করল, কীভাবে আল্লাহ মুশরিকদের সাহায্যে এগিয়ে আসা সৈন্যদলকে ফিরিয়ে দিলেন এবং তারা সেখান থেকে কোনো সুবিধাই অর্জন করতে পারেনি। এ চিঠি পেয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মিশরে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন : আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যিকার দীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿١٧﴾

তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দীনসহকারে, যেন এ দীনকে অপরাপর দ্বীনের ওপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।^{৫২১}

আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন এবং তাঁর সৈন্যদের বিজয় দান করেছেন। আল্লাহ পারসিক সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করেছেন, তাদের ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন এবং এক মুষ্টি পরিমাণ জায়গাও তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই, যা মুসলমানদের ওপর সামান্যতম প্রভাব

^{৫২০} তারিখ আত-তাবারি, ৫/১৬০।

^{৫২১} সূরা আত-তাওবা, ৯ : ৩৩।

বিস্তার করতে পারে। আল্লাহ তা‘আলা তাদের বাড়ি-ঘর, ধন-সম্পদ ও লোকজনকে তোমাদের হাতে অর্পণ করেছেন। তিনি দেখতে চান, তোমরা এসব নিয়ে কী করো। সুতরাং তাঁর নির্দেশ মেনে চলো এবং তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন। তোমাদের আচরণে যেন কোনো পরিবর্তন সাধিত না হয়; আর নতুবা আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে তা অর্পণ করবেন। আমার ভয় হয়, এই উম্মতের যদি কোনো অকল্যাণ হয়, তাহলে তা তোমাদের কারণেই হবে।’^{৫২২}

৪.৮। ইসতাখার বিজয় (২৩ হি.)

মুসলিম বাহিনী ২৩ হিজরীতে দ্বিতীয়বারের মতো ইসতাখার বিজয় করে। আল-আলআ ইবনে আল-হাদরামির বাহিনী এটি প্রথম বিজয় করে। তখন তারা বাহরাইন থেকে নদী পার হয়ে ইসতাখারে পৌঁছেছিলেন। তারা তাউস নামক স্থানে পারসিকদের দেখা পান। পরে আল-হিরবাযা জিযিয়া কর প্রদানের শর্তে মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি করে। পরবর্তীকালে শাহরাক চুক্তি ভঙ্গ করে এবং পারসিকদেরও একই কাজ করার জন্য উশ্কানি দিতে থাকে। উসমান ইবনে আবি আল-আস তার ছেলে এবং ভাই আল-হাকামকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রেরণ করেন। আল্লাহ মুশরিক বাহিনীকে পরাজিত করেন। আল হাকাম ইবনে আবি আল-আস শাহরাককে হত্যা করেন।^{৫২৩}

৪.৯। ফাসাউদারা বাযরুদ বিজয় (২৩ হি.)

সারিয়া ইবনে জুনাইম ফাসাউদারা বাযরুদ এলাকার দিকে অগ্রসর হন। তিনি সেখানে বিশালসংখ্যক পারসিক ও কুর্দীদের দেখা পান। মুসলমানদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ওই রাতে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের যুদ্ধ ও শত্রু সংখ্যাধিক্যের ব্যাপারে স্বপ্ন দেখেন; যুদ্ধটি দিনের বেলায় সংঘটিত হচ্ছে এবং তারা কোনো এক মরুপ্রান্তরে লড়াই করছেন। সেখানে পাহাড়ও ছিল। মুসলমানরা যদি পাহাড়কে পেছনে রাখে, তাহলে শত্রুরা শুধু একদিক থেকে আক্রমণের সুযোগ পাবে।

^{৫২২} তারিখ আত-তাবারি, ৫/১৬২-১৬৩।

^{৫২৩} প্রাগুক্ত, ৫/১৬৬।

পরের দিন তিনি আযান (আস-সালাতু জামিয়াহ—নামায শুরু হতে যাচ্ছে) দিতে নির্দেশ দিলেন। আর তিনি স্বপ্নে যে সময় যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেখেছিলেন, সে সময়ও ঘনিয়ে এল। লোকজন জমা হলে তিনি মিস্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন এবং স্বপ্নের কথা সবাইকে জানালেন। তখন তিনি হঠাৎ করেই বলে উঠলেন, ‘হে সারিয়া, পেছনে পাহাড়!’ তারপর লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আল্লাহর নিজস্ব সৈন্য (ফেরেশতা) রয়েছে এবং সম্ভবত তাদের কেউ আমার এই কথাকে তাদের নিকট পৌঁছে দেবে।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যা বলেছিলেন, মুসলিম বাহিনী তা-ই করেছিল এবং তাদের শত্রুদের ওপর বিজয় দান করেছিলেন। মুসলমানগণ ফাসাউদারা বায়রুদ দখল করে নেন।^{৫২৪}

৪.১০। কারমান এবং সাজিস্তান বিজয় (২৩ হি.)

সুহাইল ইবনে আদিয়্য ২৩ হিজরীতে কারমান বিজয় করেন^{৫২৫}; এটিও প্রসিদ্ধ যে, আব্দুল্লাহ ইবনে বুদাইল ইবনে ওয়াকারা এটি বিজয় করেন।^{৫২৬} কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন যে, আসিম ইবনে আমর প্রচণ্ড যুদ্ধ করে সাজিস্তান বিজয় করেছিলেন। এতে অসংখ্য দুর্গ ছিল। আর বালখ নদী ও বাঁধের মধ্যে শহরগুলো একটি থেকে আরেকটি বেশ দূরে ছিল। মুসলমানগণ কান্দাহার ও তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।^{৫২৭}

৪.১১। মুকরান বিজয় (২৩ হি.)

আল-হাকাম ইবনে আমর ২৩ হিজরীতে মুকরান বিজয় করেন। শিহাব ইবনে আল-মাখারিক সাহায্য সৈন্য নিয়ে আসেন এবং তার সঙ্গে সুহাইল ইবনে আদিয়্য ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ এসে যোগ দেন। তারা সিন্দের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। আল্লাহ সিন্দের বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং মুসলমানগণ বিরাট অঙ্কের গণীমত লাভ করেন। আল-হাকাম ইবনে আমর বিজয়ের সংবাদ জানিয়ে খলীফার নিকট চিঠি প্রেরণ করেন। সুহার আল-আবদির মাধ্যমে তিনি খুমসসহ চিঠিটি পাঠান। তিনি মদীনায

^{৫২৪} তারিখ আত-তাবারি, ৫/১৬৮-১৬৯।

^{৫২৫} তারতিব ওয়া তাহযিব আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃ. ১৭১।

^{৫২৬} প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।

^{৫২৭} প্রাগুক্ত।

এলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার নিকট মুকরান এলাকা সম্পর্কে জানতে চান। সুহার বলেন, ‘হে আমীরুল মুমিনীন, এটি একটি পর্বতময় এলাকা। এখানে পানির খুব সংকট, ফলমূল খুব নিম্নমানের, শত্রুরা খুব শক্তিশালী, এর খারাপই বেশি এবং ভালো বলতে তেমন কিছু নেই। সম্পদের প্রাচুর্য খুব কম এবং তাও পরিত্যক্ত। এ বাইরে যা কিছু আছে, সেগুলো এ চেয়ে আরও খারাপ।’ উমর রা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি কি কবি হতে চাচ্ছ?’ তিনি বললেন, ‘না। এটি কেবল একটি সংবাদ।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আল-হাকামকে মুকরানেই অবস্থান করার নির্দেশ দিলেন এবং নদীর এ পাড়েই থাকতে বললেন।^{৫২৮}

৪.১২। কুদীদের বিরুদ্ধে অভিযান

ইবনে জারির উল্লেখ করেন, কিছু কুদী কিছু পারসিকদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। তারা একত্রে জমা হয়। তিরা নদীর নিকটে বাইরুয এলাকায় তারা আবু মূসার মুখোমুখি হয়।^{৫২৯} তারপর আবু মূসা ইসফাহানে চলে যান। আল-মুহাজির ইবনে যিয়াদ নিহত হলে তার ভাই আর-রাবি ইবনে যিয়াদকে আবু মূসা তার স্থলাভিষিক্ত করে যান। তিনি যুদ্ধের দায়িত্ব নেন এবং শত্রুদের ব্যুহ তছনছ করে দেন। আল্লাহ শত্রুদের পরাজিত করেন। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। এভাবেই তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের সঙ্গে থাকেন, যারা ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন অনুসারী। তারপর খুমসসহ বিজয়ের সংবাদ খলীফার নিকট প্রেরণ করা হয়।^{৫৩০} এভাবে ইরাক ও ইরান উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আমলে বিজিত হয়। মুসলমানগণ পুরো এলাকায় শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তোলে। পারসিকদের পক্ষ থেকে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা ছিল। পূর্বাঞ্চলের বিজয় বেশ কষ্টসাধ্য ছিল এবং মুসলিম বাহিনীকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। কারণ, এর অধিবাসীদের সঙ্গে আরবদের কৃষ্টিগত পার্থক্য ছিল অনেক। ইরানের অধিবাসীরা ছিল পারসিয়ান, যারা ভাষা, আচার-আচরণ ও সংস্কৃতিতে আরবদের থেকে পুরোপুরিই ভিন্ন। আর জাতিগতভাবে ইরানীরা খুব

^{৫২৮} তারিখ আত-তাবারি, ৫/১৭২-১৭৪।

^{৫২৯} বাইরুয এবং তিরা নদী আল-আহওয়াযের নিকটবর্তী স্থান।

^{৫৩০} তারতিব ওয়া তাহযিব আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃ. ১৭২।

ঐক্যবদ্ধ ছিল। তাদের ছিল দীর্ঘ ইতিহাস ও আদি সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত। অধিকন্তু এসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে ইরানীদের কেন্দ্রীয় ভূমিতে এবং পারসিক পুরোহিতরা এর অধিবাসীদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উৎসাহ জুগিয়েছে। আরও একটি কঠিন দিক হচ্ছে, এসব রণক্ষেত্র ছিল মুসলমানদের বসরা ও কুফার সামরিক ঘাঁটি থেকে অনেক দূরে। পর্বতময় এলাকা হওয়ায় এর অধিবাসীরা মুসলমানদের জন্য মারাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। এ জন্য দেখা যায়, বেশির ভাগ এলাকা মুসলমানদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে এবং সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে পুনরায় অভিযান পরিচালনা করতে হয়।^{৫৩১}

^{৫৩১} আসর আল=খিলাফা আর-রাশিদাহ, পৃ. ৩৩৯-৩৪০।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাসমূহ

৫.১। মুজাহিদদের ওপর কুরআন ও হাদীসের প্রভাব

কুরআনের যেসব আয়াত ও হাদীসে জিহাদের ফযীলত সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেগুলো মুজাহিদদের মনোবল বৃদ্ধিতে খুবই প্রভাব ফেলত। আল্লাহ মুজাহিদদের প্রতিটি কাজের বিনিময়েই পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ
ظَمًا وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ
الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا
يَقْطَعُونَ أَوْدِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۝

মদীনার অধিবাসী ও তার আশপাশের মরুবাসীদের জন্য সংগত নয় যে, রাসূলুল্লাহ থেকে পেছনে থেকে যাবে এবং রাসূলের জীবন অপেক্ষা নিজেদের জীবনকে অধিক প্রিয় মনে করবে। এর কারণ এই যে, আল্লাহর পথে তাদের যে পিপাসা, ক্লান্তি আর ক্ষুধা পায় এবং তাদের এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করায় কাফিরদের যে ক্রোধের কারণ হয়ে থাকে, আর দুশমনদের হতে তারা যা কিছু

প্রাপ্ত হয়—এর প্রত্যেকটি সৎ কাজ বলে গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। আর তারা স্বল্প কিংবা অধিক যা-ই ব্যয় করে এবং অতিক্রম করে যে প্রাপ্তরই, তা তাদের জন্য লিখে দেওয়া হয়, যাতে তারা যা আমল করত, আল্লাহ তাদের তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেন।^{৫৩২}

প্রথম যুগের মুসলমানগণ নিশ্চিতভাবেই জানতেন, জিহাদ একটি সফলতম ব্যবসা। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝^{১১} يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ
يُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ
عَدْنٍ ۖ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝^{১২} وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ
قَرِيبٌ ۖ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝^{১৩}

হে ঈমানদারগণ, আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব, যা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর তোমাদের এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে উত্তম আবাসগুলোতেও (প্রবেশ করবেন)। এটাই মহাসাফল্য। এবং আরও একটি (অর্জন) যা তোমরা খুব পছন্দ করো। (অর্থাৎ) আল্লাহর পক্ষ ভেসভথকে সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়। আর মুমিনদের তুমি সুসংবাদ দাও।^{৫৩৩}

^{৫৩২} সূরা আত-তাওবা, ৯ : ১২০-১২১।

^{৫৩৩} সূরা আস-সফ, ৬১ : ১০-১৩।

তারা এটিও জানতেন, হাজীদের পানি পান করান ও মসজিদুল হারাম আবাদ করার চাইতে জিহাদ শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ বলেন,

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑥ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ⑦ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ⑧ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ⑨

তোমরা কি হাজীদের পানি পান করান ও মসজিদুল হারাম আবাদ করাকে ওই ব্যক্তির মতো বিবেচনা করো, যে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারা আল্লাহর কাছে বরাবর নয়। আর আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না। যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আর আল্লাহর পথে নিজদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে তারা বড়ই মর্যাদাবান আর তারাই সফলকাম। তাদের প্রতিপালক তাদের নিজের পক্ষ থেকে সুসংবাদ দিচ্ছেন রহমত ও সন্তুষ্টির এবং এমন জান্নাতসমূহের যাতে রয়েছে তাদের জন্য স্থায়ী নিয়ামত। তথায় তারা থাকবে চিরকাল। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।^{৫৩৪}

তারা বিশ্বাস করতেন, সর্বক্ষেত্রেই জিহাদ মানেই বিজয়। আল্লাহ বলেন,

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُونَ ⑤

বলো : তোমরা তো আমাদের জন্য দুটি কল্যাণের মধ্যে একটি কল্যাণের প্রতীক্ষায় রয়েছ; আর আমরা তোমাদের জন্য এই প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনো শাস্তি সংঘটন

করবেন—নিজের পক্ষ হতে অথবা আমাদের দ্বারা; অতএব তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ রইলাম।^{৫৩৫}

শহীদদের মৃত্যু নেই; বরং তারা জীবিত। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٥٧﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۖ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٥٨﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ ۚ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٩﴾

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের মৃত ভেবো না; বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে থেকে তারা রিযকপ্রাপ্ত হচ্ছে। আল্লাহ তাদের স্বীয় অনুগ্রহ হতে যা দান করেছেন তাতেই তারা পরিতুষ্ট; এবং তাদের ভাইয়েরা যারা এখনো তাদের সাথে সম্মিলিত হয়নি তাদের এই অবস্থার প্রতিও তারা সন্তুষ্ট হয় যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত ও অনুগ্রহ লাভে খুশি হয়। আর নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।^{৫৩৬}

তারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই জিহাদ করতেন। আল্লাহ বলেন,

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٠﴾ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۚ وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ

^{৫৩৫} সূরা আত-তাওবা, ৯ : ৫২।

^{৫৩৬} সূরা আল-ইমরান, ৩ : ১৬৯-১৭১।

نَصِيرًا ۝ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ
الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝

অতএব যারা দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাত ক্রয় করে, তারা যেন আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে; এবং যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর নিহত অথবা বিজয়ী হয়, তাহলে আমি তাকে মহা প্রতিদান প্রদান করব। তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছ না? অথচ নারী, পুরুষ এবং শিশুদের মধ্যে যারা দুর্বল তারা বলে : হে আমাদের রব, আমাদের অত্যাচারী এই নগর হতে নিষ্কৃতি দিন এবং স্বীয় সন্নিধান হতে আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও নিজের নিকট হতে আমাদের জন্য সাহায্যকারী প্রেরণ করুন। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা কাফির তারা শায়তানের পক্ষে যুদ্ধ করে; সুতরাং তোমরা শায়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল দুর্বল।^{৫৩৭}

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের নিকট জিহাদের ফযীলত বর্ণনা করেছেন এবং তার কথায় মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক জযবা সৃষ্টি হয়। এসব হাদীসের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হাদীস : ﴿আবু সাঈদ খুদরী রায়িয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘হে আল্লাহর রাসূল, মানুষের মধ্যে কে উত্তম?’ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘সে-ই মুমিন, যে নিজ জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে।’^{৫৩৮} রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুজাহিদদের মর্যাদা নিয়েও কথা বলেছেন। তিনি বলেন : ﴿আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতে এক শটি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দুটি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের মতো। তোমরা আল্লাহর নিকট চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা, এটাই হলো সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত।^{৫৩৯}﴾

^{৫৩৭} সূরা আন-নিসা, ৪ : ৭৪-৭৬।

^{৫৩৮} সহীহ, বুখারী, হাদীস নং ২৭৮৬।

^{৫৩৯} সহীহ, বুখারী, হাদীস নং ২৭৯০।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদদের গুণাবলি ব্যাখ্যা করে বলেন : ﴿যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদে বের হয়, তাদের জন্য আল্লাহ ঘোষণা করেন, যদি সে কেবল আল্লাহ ও তার রাসূলগণের ওপর ঈমানের কারণে জিহাদে বের হয়ে থাকে, তাহলে আমি তাকে নেকী ও গনীমতসহ (ঘরে) ফিরিয়ে আনব অথবা তাকে জান্নাতে দাখিল করব। যদি আমার উম্মতের জন্য কঠিন মনে না হতো, তাহলে আমি সব অভিযানেই সশরীরে অংশগ্রহণ করতাম। আমার মনের ইচ্ছা হলো, আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, তারপর আবার জীবিত হই, আবার নিহত হই, আবার জীবিত হই, আবার নিহত হই।﴾^{৫৪০} রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, ﴿জান্নাতে প্রবেশের পর আর কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে না, যদিও দুনিয়ার সকল জিনিস তাকে দেওয়া হয়—একমাত্র শহীদ ব্যতীত; সে দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে যেন দশবার শহীদ হয়। কেননা, সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখেছে।﴾^{৫৪১}

এমন আরও অনেক হাদীস রয়েছে, যা প্রথম যুগের মুসলিম ও তাদের অনুসারীদের অনুপ্রাণিত করত। প্রবীণ সাহাবায়ে কেরাম বৃদ্ধ বয়সেও জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। লোকেরা তাদের জন্য দুঃখ অনুভব করতেন এবং তাদের জিহাদে না যাওয়ার অনুরোধ করতেন; কারণ, তাদের বার্ধক্যের কারণে না যাওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু তারা সূরা তাওবার আয়াত দিয়ে দলীল দিতেন, যা তাদের থামাতে পারেনি। তারা মনে করতেন, জিহাদে অংশগ্রহণ না করলে হয়তো তারা মুনাফিকদের দলভুক্ত হয়ে যাবেন! ^{৫৪২}

৫.২। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদের বিভিন্ন ফলপ্রসূ দিক

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবয়ীগণ মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে আল্লাহর পথে জিহাদকে অপরিহার্য মনে করতেন। তারা ইরাক, পূর্বাঞ্চল, সিরিয়া, মিসর এবং উত্তর আফ্রিকা বিজয়ে এই বাধ্যবাধকতাকে নিজেদের কর্তব্য স্থির করেছিলেন। আর এ কারণে

^{৫৪০} সহীহ, মুসলিম, ৩/১৪৯৭।

^{৫৪১} সহীহ, বুখারী, হাদীস নং ২৮১৭।

^{৫৪২} আল-জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ, আল-কাদিরি, ১/১৪৫।

মুসলিম জাতি অনেক ফলপ্রসূ দিকের সম্মান লাভ করে; মানবজাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন, কুফর ও শিরকের শক্তি ও ক্ষমতাকে দমন, তাদের অবমাননাকর পরিণতির স্বীকার করা ও তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করা এবং ইসলামের দাওয়াতের সত্যতাকে দিবালোকের মতো বাস্তবে পরিণত করা, যাতে দলে দলে লোক ইসলামে দাখিল হাতে থাকে। এভাবে মুসলমানগণ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হন এবং মুশরিকদের লাঞ্ছনার পরিমাণকে বাড়িয়েছে। মুসলিম জাতি তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং তারা মানবজাতির জন্য হেদায়েত, ন্যায়বিচার ও ইসলামের কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত করেছে।^{৫৪৩}

৫.৩। ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়ে আল্লাহর বিধানের বাস্তব নির্দশন

ইরাক ও পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন দেশ ও ভূখণ্ড বিজয়ের অভিযান খুব ভালোভাবে অধ্যয়ন করলে গবেষকগণ সহজেই সমাজ, জনগণ এবং রাষ্ট্রের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার স্বতঃসিদ্ধ কিছু নীতির প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবেন।

৫.৩.১। উপায়-উপকরণ ব্যবহারে নিয়ম-নীতি

আল্লাহ বলেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ⑤

আর প্রস্তুত করো তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা-ই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি-সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের ওপর এবং তোমাদের শত্রুদের ওপর আর তাদের ছাড়া অন্যান্যদের ওপর ও যাদের তোমরা জানো না; আল্লাহ তাদের চেনেন। ব্যয় যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোনো হক অপূর্ণ থাকবে না।^{৫৪৪}

^{৫৪৩} প্রাণ্ডক, ২/৪১১-৪৮২।

^{৫৪৪} সূরা আল-আনফাল, ৮ : ৬০।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই আয়াতের শিক্ষাকে তার রাজ্যে প্রয়োগ করেন। জাগতিক ও আত্মিক উপায়-উপকরণ ব্যবহার করার ব্যাপারে তার নীতি ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

৫.৩.২। একজনের মাধ্যমে অন্যকে দমন করার নীতি

আল্লাহ বলেন,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেত। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়।^{৫৪৫}

সকল অভিযানেই এ নীতির বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। এটা আল্লাহর সৃষ্টিজগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। মুসলিম জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সোনালি যুগের মুসলমানরা এ নীতি সঠিকভাবেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং এর ভিত্তিতেই কাজ করেছেন। তারা জানতেন, সত্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন সংকল্প, সাহায্য করার দৃঢ় পদক্ষেপ; এটিকে জয়ী করার অদম্য কর্মস্পৃহা, ভালোবাসার মতো হৃদয় ও আবেগ—যা এটিকে অন্তরে গেঁথে রাখবে। এতে মানুষের ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রয়োজন; কারণ, এ দুনিয়ায় এটিই আল্লাহর নিয়ম এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা বহাল থাকবে।^{৫৪৬}

৫.৩.৩। বিপদ-আপদের মাধ্যমে পরীক্ষার নীতি

আল্লাহ বলেন,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ ۚ الْآنَ نَصُرُ اللَّهُ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾

^{৫৪৫} সূরা আল-বাকারা, ২ : ২৫১।

^{৫৪৬} লিকা আল-মুমিনীন, আদনান আন-নাহওয়া, ২/১১৭।

তোমরা কি এমন ধারণা পোষণ করো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের নিকট তাদের মতো কিছু আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে; তাদের বিপদ ও দুঃখ স্পর্শ করেছিল এবং তাদের প্রকম্পিত করা হয়েছিল; এমনকি রাসূল ও তৎসহ বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বলেছিল : কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? সতর্ক হও, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।^{৫৪৭}

ইরাক অভিযানের সময় বিপদ ও পরীক্ষা মুসলমানদের ওপর আপতিত হয়েছিল; বিশেষ করে আবু উবাইদের সেতুযুদ্ধ, যেখান হাজার হাজার মুসলমান শাহাদাত বরণ করেছিল এবং তাদের বাহিনী পরাজিত হয়েছিল। তারপর তারা পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয় এবং পারসিকদের বিরুদ্ধে বিরাট বিজয় লাভ করে। আল্লাহ বলেন,

لَتُبْلَوْنَ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

অবশ্যই ধন-সম্পদ ও নিজ জীবন সম্পর্কে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে।^{৫৪৮}

এখানে উল্লেখ্য, আয়াতে যেভাবে মুসলিম উম্মাহকে পরীক্ষা করার কথা বলা হয়েছে, তা জোরালোভাবেই ব্যক্ত করা হয়েছে। এটাই ঈমানদার ও ঈমানের দিকে আহ্বানকারীদের জন্য আল্লাহর নীতি; জীবনে অবশ্যই কিছু বিপদ আসবে, নিজের ও সম্পদের কিছু ক্ষতি সাধিত হবে এবং এতে সবর করাই প্রকৃত মুমিনের অন্যতম কাজ।^{৫৪৯}

৫.৩.৪। অত্যাচারী ও অত্যাচারিতদের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন,

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرٰى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَ حَصِيْدٌ ۝ وَّمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَمَا اَغْنَتْ عَنْهُمْ اِلٰهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتٰبٍ ۝

^{৫৪৭} সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২১৪।

^{৫৪৮} সূরা আল-ইমরান, ৩ : ১৮৬।

^{৫৪৯} তাবসির আল-মুমিনীন বি ফিকহ আন-নাসর ওয়া আত-তামকিন, আস-সাল্লাবী, পৃ. ৪৫৬।

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ
شَدِيدٌ ⑤

এ হচ্ছে জনপদসমূহের কিছু সংবাদ, যা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি। তা থেকে কিছু আছে বিদ্যমান এবং কিছু হয়েছে বিলুপ্ত। আর আমি তাদের ওপর যুলম করিনি; বরং তারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে। তারপর যখন তোমার রবের নির্দেশ এল, তখন আল্লাহ ছাড়া যেসব উপাস্যকে তারা ডাকত, তারা তাদের কোনো উপকার করেনি এবং তারা ধ্বংস ছাড়া তাদের আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি। আর এরূপই হয় তোমার রবের পাকড়াও, যখন তিনি পাকড়াও করেন অত্যাচারী জনপদসমূহকে। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, কঠোর।^{৫৫০}

আল্লাহর নীতি বাস্তবায়িত হবেই; অত্যাচারী জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। পারস্যের শাসকরা তাদের জনগণের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন করেছে এবং আল্লাহর নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সুতরাং আল্লাহর শাস্ত নীতিই তাদের ওপর বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আল্লাহ তাদের শাসনক্ষমতা মুসলমানদের হাতে দিয়েছেন। আর পারসিকরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।^{৫৫১}

৫.৩.৫। বিদ্রোহীদের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا
الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ⑥

আমি যখন কোনো জনবসতিকে ধ্বংস করতে চাই তখন তাদের সম্ভ্রম ব্যক্তিদের আদেশ করি (আমার আদেশ মেনে চলার জন্য)। কিন্তু তারা অবাধ্যতা করতে থাকে। তখন সে জনবসতির প্রতি আমার আযাবের ফায়সালা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তখন আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দিই।^{৫৫২}

^{৫৫০} সূরা আল-হুদ, ১১ : ১০০-১০২।

^{৫৫১} আস-সুনান আল-ইলাহিয়া ফিল উমাম ওয়াল জামাআত ওয়াল আফরাদ, পৃ. ১১৯-১২১।

^{৫৫২} সূরা বনি ইসরাইল, ১৭ : ১৬।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়, যখন কোনো জনপদ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়, তখন সেখানকার বিত্তবান, তাদের স্বেচ্ছাচারী শাসকশ্রেণি ও রাজাকে আল্লাহর আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তারা সীমালঙ্ঘন করে এবং তাদের ওপর আযাব অবধারিত হয়ে যায়। যদিও এখানে আল্লাহর আনুগত্যের আদেশ সবার জন্যই দেওয়া হয়েছে, তবু আল্লাহ সমাজের বিত্তবানদের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন; কারণ, তারাই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও গোমরাহীর মূল হোতা; আর বাকিরা তাদের অনুসরণ করার মাধ্যমেই গোমরাহী ও অপরাধে লিপ্ত হয় এবং এতে সচ্ছল ব্যক্তিরা তাদের উৎসাহিতও করে। সুতরাং তাদের সম্বোধন করাই অধিক যুক্তিসংগত।^{৫৫৩}

পারস্যের শাসকবর্গের ওপর আল্লাহর এই নীতি বাস্তবায়িত হয়েছিল।

৫.৩.৬। স্বেচ্ছাচারী শাসকদের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি

আল্লাহ বলেন,

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿٥٥٨﴾

তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন (যেমন ঘাঁটিতে শত্রুর প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়)।^{৫৫৪}

এ আয়াতে গোনাহগারদের সাধারণভাবে সতর্ক করা হয়েছে; অনেকের মতে, এ আয়াতটি কাফেরদের জন্য সতর্কবার্তা, অথবা গোনাহগার ও অন্যান্যদের জন্য সতর্কবার্তা।^{৫৫৫} তাফসীরে আল-কুরতুবীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ প্রত্যেকের ওপরই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন যতক্ষণ না তিনি তাকে পুরস্কৃত অথবা শাস্তি প্রদান করেন। তাফসীরবিদদের মতে, এ আয়াতে আল্লাহর একটি শাস্ত নীতির কথা বলা হয়েছে, স্বেচ্ছাচারী শাসকদের ওপর দুনিয়াতেই আল্লাহর আযাব পতিত হয়। এটি আল্লাহর একটি চিরন্তন নিয়ম, যা আগেও ঘটেছে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্বেচ্ছাচারী শাসকদের বেলায়ও ঘটবে। তাদের কেউই দুনিয়াতে আল্লাহর শাস্তিকে

^{৫৫৩} তাফসীর আল-আলুসী, ১৫/৪২।

^{৫৫৪} সূরা ফজর, ৮৯ : ১৪।

^{৫৫৫} আস-সুনান আল-ইলাহিয়া, পৃ. ১৯৩।

এড়িয়ে যেতে পারবে না, যেমন কিনা তারা আখেরাতে আল্লাহর শাস্তিকে এড়াতে পারবে না।^{৫৫৬}

স্বেচ্ছাচারী শাসকশ্রেণির ওপর দুনিয়াতেই শাস্তি প্রয়োগে আল্লাহর যে শাস্ত বিধান, তাতে অনেক শিক্ষা রয়েছে। এসব শিক্ষা কেবল তারাই গ্রহণ করতে পারে, যারা আল্লাহ ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে চলে। আর নিশ্চিতভাবেই জানে যে, আল্লাহর নীতি অবধারিত এবং কোনো কিছুই এর বাস্তবায়ন রোধ করতে সক্ষম নয়। আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে স্বেচ্ছাচারী শাসকদের শাস্তি প্রদানের এই নীতি যারা বুঝেছিলেন এবং ফিরআউনের মন্দ পরিণতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ۝

অতঃপর আল্লাহ তাকে পরকালের ও ইহকালের শাস্তি দিলেন। যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে।^{৫৫৭}

পারস্যের শাসকবর্গের জন্য আল্লাহর এই নীতিও বাস্তবায়িত হয়েছিল।

৫.৩.৭। ক্রমাগত উন্নতির নীতি

ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়ের পটভূমি এ নীতিতেই অগ্রসর হয়েছে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে এর প্রথম পর্বের সূচনা হয়েছে। তখন খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে আল-হেরা মুসলমানদের অধীন হয়। আর এর দ্বিতীয় পর্বের শুরু হয় যখন আবু উবাইদ আস-সাকাফি ইরাকে মুসলিম সেনাবাহিনীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং আল-বুওয়াইব যুদ্ধ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। তৃতীয় পর্বের শুরু হয় যখন সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ইরাকে জিহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং নাহাওয়ান্দ যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। নাহাওয়ান্দ যুদ্ধের মাধ্যমে এর চতুর্থ পর্বের শুরু হয়। মুসলিম বাহিনী যখন পারস্যের অনেক ভেতরে পৌঁছে যায়, তখন শুরু হয় এর পঞ্চম পর্ব। এ উদাহরণ একজন মুসলমানকে আল্লাহর দীনকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে ক্রমাগত উন্নতিতে

^{৫৫৬} আস-সুনান আল-ইলাহিয়া, পৃ. ১৯৪।

^{৫৫৭} সূরা আন-নাযিয়াত, ৭৯ : ২৫-২৬।

আল্লাহর যে বিধান রয়েছে, তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে শেখায়। এ নীতির সারবস্তু হলো, পথ অনেক দীর্ঘ। সুতরাং ইসলামে যারা দাওয়াতের কাজ করছে, তাদের এ নীতি ভালো করেই বোঝা উচিত। ইরাক ও পূর্বাঞ্চলে ইসলামী শাসন একদিনেই কায়েম হয়ে যায়নি; বরং এটি এ নীতিকে অনুসরণ করেছে।

৫.৩.৪। নিজেকে পরিবর্তন করার নীতি

আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।^{৫৫৮}

সাহাবায়ে কেরাম এ নীতির আলোকেই ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয় শুরু করেন। বিজিত অঞ্চলে যারা ইসলাম কবুল করেছে, সাহাবায়ে কেরাম তাদের আগে কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দিয়েছেন; ঈমান ও একিন এবং চরিত্রের মহান গুণাবলি তাদের অন্তরে বদ্ধমূল করেছেন।

৫.৩.৯। গোনাহ ও মন্দকর্মের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি

আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نَكُنْ لَكُمْ وَ أَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَ جَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ أَوْثَقْنَا مِنْ بُعْدِهِمْ قُرْنَا ۚ
 ① أَخْرَيْنَ

তারা কি দেখে না, আমি তাদের পূর্বে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি? যাদের যমীনে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেভাবে তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করিনি। আর তাদের ওপর বৃষ্টি পাঠিয়েছিলাম মুষলধারে এবং সৃষ্টি করেছিলাম নদীসমূহ, যা

তাদের নীচে প্রবাহিত হতো। অতঃপর তাদের পাপের কারণে তাদের ধ্বংস করেছি এবং তাদের পরে অন্য প্রজন্মকে সৃষ্টি করেছি।^{৫৫৯}

আল্লাহ পারসিকদের কৃত গোনাহের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর তাদের সবচেয়ে বড় গোনাহ ছিল কুফর ও শিরক। এই আয়াতে একটি শাস্ত ও চিরন্তন নীতির কথা বলা হয়েছে : যারা গোনাহ করে, গোনাহই তাদের ধ্বংস করে। আর আল্লাহ গোনাহের জন্য গোনাহগারদের ধ্বংস করেন।^{৫৬০} বিজয়ের জন্য সকল শর্ত ও আল্লাহর নীতির প্রতি অবিচল থাকার জন্যই তিনি মুসলমানদের পারসিক সাম্রাজ্যের শাসনক্ষমতা লাভ করার সুযোগ দিয়েছেন।

৫.৪। আল-আহনাফ ইবনে কাইসড়্ইতিহাস পরিবর্তনকারী

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু পারস্য জয় পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি পূর্বাঞ্চলে বেশি ভেতরে অভিযান পরিচালনা করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন, বিশেষ করে আল-হরমুযানের পতন এবং আল-আহওয়ায বিজয়ের পর।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘বসরাবাসীদের জন্য দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল এবং আল-আহওয়ায যথেষ্ট। আমি মনে করি, আমাদের ও পারস্যের মধ্যে একটি আগুনের পাহাড় রয়েছে, যা তাদের আমাদের দিকে এবং আমাদের তাদের দিকে অগ্রসর হতে বাধা হয়ে থাকবে।’ তিনি কুফাবাসীকে বলেন, ‘তাদের ও পাহাড়ের মধ্যে একটি আগুনের পাহাড় রয়েছে, যা তাদের আমাদের দিকে এবং আমাদের তাদের দিকে অগ্রসর হতে বাধা হয়ে থাকবে।’

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। তখন আল-আহনাফ বলেন, ‘হে আমীরুল মুমিনীন, আমাকে আপনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আমরা যেন পারস্যের অভ্যন্তরে আর কোনো

^{৫৫৯} সূরা আনফাল, ৬ : ৬।

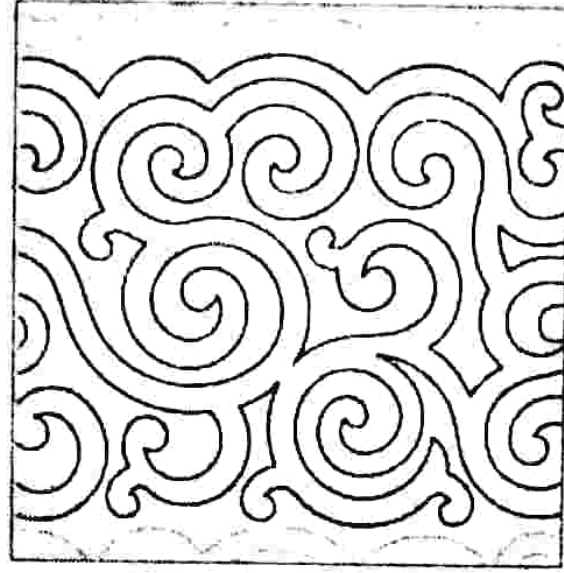
^{৫৬০} আস-সুনান আল-ইলাহিয়া, পৃ. ২১০।

অভিযান পরিচালনা না করি। আর আপনি আমাদের বিজিত এলাকার মধ্যেই সীমিত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু পারস্যের সম্রাট এখনো তাদের মধ্যে রাজত্ব করছে। যতদিন রাজা বেঁচে আছেন, ততদিন তারা আমাদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করেই যাবে। দুজন রাজা কখনো একসঙ্গে রাজত্ব করতে পারে না যতক্ষণ না একজন অন্যজনকে বহিস্কার করে। সম্ভবত আমরা কেবল তাদের আত্মসনের বিরুদ্ধেই এতদিন যুদ্ধ করেছি। পারস্যের সম্রাট তার জনগণকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে চলেছে। আমরা যতদিন না তাদের সমগ্র ভূখণ্ডে অভিযান চালাব এবং তাকে বিতাড়িত করব, ততদিন এ হীন প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আর এটা করা সম্ভব হলে পারসিকরা বিফল হবে এবং আত্মসমর্পণ করবে।^{৫৬১}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আহনাফকে বললেন, ‘তুমি ঠিকই বলেছ। আল্লাহর কসম, তুমি যথার্থভাবেই বিষয়টি আমার সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছ।’ সুতরাং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু পারস্যের অভ্যন্তরে অভিযানের অনুমতি প্রদান করলেন। তিনি আহনাফের মতকে গ্রহণ করে এর যথাযথ মূল্যায়ন করলেন। তারপর মুসলিম বাহিনী পারস্যের অভ্যন্তরে লড়াই শুরু করে। আহনাফ খোরাসান অভিযানে সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হন। অন্যান্য মুসলিম বীর সেনাপতিরা বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযানের দায়িত্ব পেলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের জন্য রণকৌশল নির্ধারণ করে দিলেন এবং পেছন থেকে সাহায্য-সৈন্য সরবরাহ করে তাদের শক্তিশালী করলেন।^{৫৬২}

^{৫৬১} আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/১৩০।

^{৫৬২} মাআর রাযিলিল আউয়াল, মুহিব্বুদ্দিন আল-খতীব, পৃ. ১৪৬।



সপ্তম অধ্যায়



সিরিয়া, মিসর ও লিবিয়া
বিজয়



প্রথম পরিচ্ছেদ

সিরিয়া বিজয়

প্রথম যে চিঠি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ায় প্রেরণ করেন, তাতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুসংবাদ এবং আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সিরিয়ার গভর্নর হিসাবে নিয়োগের কথা লেখা ছিল। তিনি সেই চিঠিতে লেখেন :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিষিক্ত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইত্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন। আল্লাহ আবু বকর আস-সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওপর রহম করুন। নিশ্চিতভাবেই তিনি ছিলেন সত্যের অনুসারী, সৎ কাজে অগ্রগামী। তিনি ছিলেন ভদ্র, বিনয়ী, শান্ত, কোমল, বন্ধুভাবাপন্ন এবং জ্ঞানী। তার তিরোধানে মুসলিম উম্মাহর যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, আল্লাহ আমাদের তা কাটিয়ে ওঠার তাওফীক দেন। আমি দুআ করি, আল্লাহ যেন আমাদের তাকওয়া-পরহেজগারী ও তার অনুগ্রহ দ্বারা রক্ষা করেন। আমরা যেন আমৃত্যু তাকে মেনে চলতে পারি এবং মৃত্যুর পর তিনি আমাদের জান্নাত নসীব করেন। তিনি সর্বময় ক্ষমতার মালিক।

আমি খবর পেয়েছি, তোমরা দামেস্ক অবরোধ করে রেখেছ। আমি তোমাকে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করলাম। তোমার অগ্রগামী বাহিনীদের হিমস, দামেস্ক ও সিরিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে প্রেরণ করো। আর যা তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা ভালো মনে করো, সেভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করো। আমি যা বলেছি তাতে মনে কোরো না যে, আমি মুসলিম সেনাদের শত্রুর সম্মুখে গিয়ে ধরা দিতে বলেছি অথবা তাদের বিপদে ফেলতে চেয়েছি অথবা শত্রুদের মনে এই আশা দিতে চেয়েছি যে, তারা

তোমাদের পরাজিত করবে; বরং এমন সেনাদের পাঠাও যাদের তোমার এ মুহূর্তে প্রয়োজন নেই। অবরোধ অব্যাহত রাখার জন্য যাদের প্রয়োজন, তাদের প্রেরণ কোরো না। তুমি অবশ্যই খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে নিজের সঙ্গে রাখবে। তাকে ছাড়া তোমার চলবে না।^{৫৬৩}

চিঠিটি হস্তগত হওয়ার পর আবু উবাইদা মুআয ইবনে জাবালকে ডেকে তার সামনে সেটি পড়ে শোনান। পত্রবাহক বলল, ‘হে আবু উবাইদা, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আপনাকে বলেছেন : আমাকে ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান এবং আমার ইবনুল আস সম্পর্কে জানাও। তারা কেমন আছে এবং তাদের আচরণের অবস্থাই-বা কী? তারা কি মুসলমানদের প্রতি একনিষ্ঠ? আবু উবাইদা পত্রবাহককে এ ব্যাপারে অবগত করলেন। তিনি এবং মুআয ইবনে জাবাল মিলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট একটি পত্র লেখলেন। তাতে তারা বলেন : ‘

আবু উবাইদা এবং মুআয ইবনে জাবালের পক্ষ থেকে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা যার কোনো শরীক নেই। আমরা আপনার খোঁজখবর সম্পর্কে জানি। এখন, হে উমর, আপনি মুসলিম উম্মাহর যিম্মাদার—কালো কিংবা সাদা। শত্রু বা মিত্র, জ্ঞানী বা মূর্খ, শক্তিশালী বা দুর্বল—সবারই আপনার নিকট ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সুতরাং আপনাকেই বিচার করতে হবে কেমন করে আপনি তাদের নিয়ন্ত্রণ করবেন, হে উমর। আমরা আপনাকে ওইদিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যেদিন মানুষের অন্তরের সবকিছু প্রকাশ পাবে এবং সকল গোপন বিষয় উন্মুক্ত হয়ে পড়বে, সকল মানুষ আল্লাহর সামনে নীত হবে—প্রবল প্রতাপশালী সেই সত্তা, যিনি তার প্রবল শক্তির প্রতাপে সকলকে প্রভাবিত করবেন; লোকেরা নিজেদের সমর্পণ করবে, বিচারের অপেক্ষায় থাকবে, তার শাস্তিকে ভয় করবে এবং তার ক্ষমার আশা করবে। আমরা শুনেছি, এই উম্মতের কিছু মানুষ বাইরে বন্ধু, কিন্তু ভেতরে শত্রু। আমরা আল্লাহর নিকট তাদের থেকে আশ্রয় চাই। আমাদের চিঠিকে ভুল বুঝবেন না অথবা আমরা যা নিয়ত করিনি, তেমনভাবে বিষয়টি নেবেন না। আপনার ওপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।’^{৫৬৪}

^{৫৬৩} তারিখ দিমাশক, ২/১২৫।

^{৫৬৪} ফুতুহুশ শাম, ৯৯-১০২; আত-তারিখুল ইসলামি, ৯/২৭৪।

খালিদ রা. এবং আবু উবাইদা রা.-এর মধ্যে কথোপকথন

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সর্বাধিনায়কের পদ থেকে নিজের পদচ্যুতির সংবাদ জানলেন। তিনি আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গিয়ে বললেন, ‘আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। খলীফা আপনাকে মুসলিম সেনাবাহিনীর দায়িত্ব নিতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এটি আপনি আমাকে জানাননি; আপনি নিজেই সর্বাধিনায়ক হওয়া সত্ত্বেও আমার পেছনে নামায আদায় করেছেন।’ আবু উবাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহ আপনাকেও ক্ষমা করুন। অন্য কারও নিকট শোনার আগ পর্যন্ত আমি আপনাকে তা জানাতেও চাইনি। আমি আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে চাইনি। যুদ্ধ সমাপ্ত হলে আমি আপনাকে ডেকে নিজেই বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমি ক্ষমতালোভী নই। আর দুনিয়ার সম্পদ অর্জনেও জিহাদ করছি না। যা-ই দেখা যায়, এর সবই একদিন শেষ হয়ে যাবে। আমরা পরস্পর ভাই। আল্লাহর বিধান কার্যকর করতেই একসঙ্গে লড়াই করছি। যদি ভাইদের একজনকে আরেকজনের ওপর নেতৃত্ব দেওয়া হয়, তাতে তার আধ্যাত্মিক কিংবা জাগতিক কোনো ক্ষতি হয় না; বরং যাকে নেতৃত্ব দেওয়া হলো, সে-ই অধিক পরীক্ষায় আপতিত হয়। তার মধ্যে অহংকার কিংবা গোনাহের ঝুঁকি বাড়ে। আল্লাহ যাদের রক্ষা করেন, তারাই কেবল এ পরীক্ষায় পাশ করতে পারে। আর এ সংখ্যা খুবই কম।’ তারপর আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু আমীরুল মুমিনীন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর চিঠিটি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে অর্পণ করেন।^{৫৬৫}

আবু উবাইদা এবং মুআযের পত্রের বিপরীতে উমর রা.-এর উত্তর

শাদাদ ইবনে আউস, হাসা ইবনে সাবিতের ভাই, আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুর চিঠি নিয়ে খলীফার দরবারে হাজির হন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর জবাবে লেখেন : আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহকে ভয় করুন। এতেই তার সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় এবং সেটিই সর্বোচ্চ প্রাপ্তি; এ জন্যই খাঁটি বান্দারা এর জন্যই চেষ্টা করে এবং দুর্ভাগারা বঞ্চিত

থাকে। আপনাদের চিঠি আমার হস্তগত হয়েছে। সেখানে আপনারা আপনাদের ধারণা অনুযায়ী বলেছেন, আমি বিষয়াদির খোঁজখবর রাখি। এখানে আসলে আমার প্রশংসা করা হয়েছে। আপনারা আমাকে স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আমি মুসলিম উম্মাহর যিহাদার—কালো কিংবা সাদা। শত্রু বা মিত্র, জ্ঞানী বা মূর্খ, শক্তিশালী বা দুর্বল—সবারই আমার নিকট ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সুতরাং আমি তাদের কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করব তা জানতে চেয়েছেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কোনো শক্তি বা ক্ষমতা নেই। আপনারা আমাকে এমন দিনের ভয় করে চলতে বলেছেন, যা আসবেই; দিন-রাত্রির পরিবর্তনে সব নতুন ক্ষয় করে ফেলে, দূরকে কাছে টেনে আনে এবং প্রতিশ্রুত সব বিষয় বাস্তবায়িত হতে থাকে। এ রকম চলতেই থাকবে যতদিন না কিয়ামত সংঘটিত হয়। সেটি এমন এক দিন, যেদিন মানুষের অন্তরের সবকিছু প্রকাশ পাবে এবং সকল গোপন বিষয় উন্মুক্ত হয়ে পড়বে, সকল মানুষ আল্লাহর সামনে নীত হবে—প্রবল প্রতাপশালী সেই সত্তা, যিনি তার প্রবল শক্তির প্রতাপে সকলকে প্রভাবিত করবেন; লোকেরা নিজেদের সমর্পণ করবে, বিচারের অপেক্ষায় থাকবে, তার শাস্তিকে ভয় করবে এবং তার ক্ষমার আশা করবে। আপনারা বলেছেন, আপনারা শুনেছেন, এই উম্মাহর কিছু মানুষ বাইরে বন্ধু, কিন্তু ভেতরে শত্রু। এ জন্য সময় এখনো আসেনি; পৃথিবী ধ্বংসের আগে এ রকম ঘটবে। তখন দুনিয়াতে বিরাজ করবে আশা এবং ভয়; মানুষজন আশা করবে এবং একে অন্যকে ভয় করবে। আল্লাহ আমাকে আপনাদের ওপর নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছেন। আমি আল্লাহর নিকট সাহায্য চাই এবং তিনি যেন আমাকে গোমরাহ হওয়া থেকে রক্ষা করেন, যেমন তিনি অন্যদের রক্ষা করেছেন। আমি একজন সাধারণ মুসলমান এবং আল্লাহর সাহায্য ছাড়া খুবই দুর্বল। খলীফার পদের কারণে আমার আচরণে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হবে না ইনশাআল্লাহ। সকল ক্ষমতা ও বড়ত্ব কেবল আল্লাহর। বান্দার এতে কিছুই করার নেই। আপনাদের কেউ এই কথা বলার সুযোগ পাবে না—খলীফা হয়ে উমর পাল্টে গেছে। আমি যা সত্য, তা-ই অনুসরণ করি। আমি আপনাদের সামনে আমার অবস্থান ব্যক্ত করছি মাত্র। যদি কারও কোনো প্রয়োজন কিংবা কারও প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়, আমি তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করব এবং এ বিষয়ে কোনো আপস করব না। আপনাদের সহযোগিতা আমি খুব পছন্দ করি। আপনারা যদি আমার ওপর নাখোশ হয়ে যান, তাহলে আমি তা বরদাস্ত

করতে পারব না। আমাদের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমি তা যথাযথ পালনের সচেষ্ট থাকব। আর আমি প্রতিটি জরুরি বিষয়ই নিজে দেখভাল করব ইনশাআল্লাহ এবং এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব কারও হাতে অর্পণ করে বসে থাকব না। তারপর আমি বিশৃঙ্খল ও আস্থাভাজন ছাড়া অন্য কারও পরামর্শ গ্রহণ করব না। তাদের ছাড়া আমি অন্য কাউকে কোনো দায়িত্বও দেব না। দুনিয়ার এই ক্ষমতা-বাহাদুরি, যা আপনারা দেখছেন, তা একদিন শেষ হয়ে যাবে। আমরা পরস্পর ভাই-ভাই। আর নামাযে আমাদের যে কেউ অন্যদের ইমাম হতে পারে অথবা তাকে পরিচালনার দায়িত্ব পেতে পারে। এটি কখনোই তার আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বিষয়াদিকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করবে না; বরং যাকে নেতৃত্ব দেওয়া হলো, সে-ই অধিক পরীক্ষায় আপতিত হয়। তার মধ্যে অহংকার কিংবা গোনাহের ঝুঁকি বাড়ে। আল্লাহ যাদের রক্ষা করেন, তারাই কেবল এ পরীক্ষায় পাশ করতে পারে। আর এ সংখ্যা খুবই কম।’^{৫৬৬}

১.১। দামেস্ক বিজয়

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে সিরিয়া অভিযুখে পরিচালিত অভিযানসমূহ সিরিয়া বিজয়ের দ্বিতীয় পর্ব হিসাবে গণ্য করা হয়। আর এর প্রথম পর্বটি সম্পন্ন হয়েছিল আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে। ইয়ারমুক যুদ্ধে বাইজেন্টাইনদের শোচনীয় পরাজয়ের পর আবু উবাইদা ইবনে আল-জাররা রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়ারমুকের শাসনকর্তা হিসাবে বাশির ইবনে কাব আল-হিমাইরিকে নিয়োগ দেন। তিনি জানতে পারেন, পরাজিত বাইজেন্টাইনরা জর্ডানের ফিহল নামক স্থানে পুনরায় জমা হচ্ছে এবং তাদের সাহায্যে হিমস থেকে রোমান সৈন্যরা ইতিমধ্যে দামেস্ক এসে পৌঁছেছে। মুসলিম বাহিনী এখন ফিহল, নাকি দামেস্কে অভিযান পরিচালনা করা উচিত, এ বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। সুতরাং তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এ বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে চিঠি প্রেরণ করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে লেখেন : দামেস্কের দিকে অগ্রসর হোন। কারণ, এটি সিরিয়ার দুর্গ এবং তাদের রাজত্বের কেন্দ্র। তবে একটি অশ্বারোহী দল প্রেরণ করে ফিহলে বাইজেন্টাইনদের ধোঁকায়

ফেলুন। এতে প্যালেস্টাইন ও হিমসের শত্রুরাও ধোঁকায় পড়বে। আল্লাহ হয়তো আমাদের দামেস্ক জয়ের আগেই ফিহল জয় করার তাওফীক দেবেন। আর যদি ফিহল জয়ে দেরি হয় এবং এর মধ্যে আমরা দামেস্ক জয় করতে সমর্থ হই, তাহলে কিছু সৈন্যকে দামেস্কে রেখে ফিহলের দিকে অগ্রসর হবেন। এ অভিযান সম্পন্ন হলে খালিদ বিন ওয়ালিদের সঙ্গে হিমসের দিকে যাবেন।^{৫৬৭}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ নির্দেশ থেকে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি এমনভাবে তার সেনাপ্রধানের দায়িত্ব বণ্টন করেন, যাতে সবচেয়ে কম পরিশ্রমে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয়। এ থেকে বলা যায়, মুসলিম বাহিনীর প্রধান লক্ষ্যস্থল হলো দামেস্ক, যদিও ক্ষুদ্র একটি সেনাদলকে ফিহলে প্রেরণ করা হয়েছিল। আর দ্বিতীয় লক্ষ্যস্থল হলো ফিহল যখন পুরো বাহিনীকেই সেখানে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তৃতীয় লক্ষ্যস্থল হলো হিমস। খলীফার নির্দেশের আলোকে আবু উবাইদা ইবনে জাররা রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি অশ্বারোহী বাহিনীকে ফিহলে প্রেরণ করেন। এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের নেতৃত্বে ছিলেন আবু আল-আওয়ার আস-সুলামি আমির ইবনে হাতমাহ, আমর ইবনে কুলাইব, আবদ উমর ইবনে ইয়াজিদ ইবনে আমির, আম্মারাহ ইবনে আস-সাক ইবনে কাব, সাফি ইবনে আলীইয়া ইবনে শামিল, উমর ইবনে আল-হাবিব ইবনে উমর, লাদাহ ইবনে আমির, বাশির ইবনে আসমাহ এবং আমারাহ ইবনে মুখসিন।^{৫৬৮}

আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু দামেস্কের দিকে অগ্রসর হন। পথে তিনি তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য বাধার সম্মুখীন হননি। বাইজেন্টাইনদের আশা ছিল, স্থানীয় জনগণ মুসলমানদের অগ্রসরতায় বাধা প্রদান করবে। কিন্তু বাইজেন্টাইনদের আচরণে স্থানীয় জনগণ পূর্ব থেকেই অসন্তুষ্ট ছিল, বিশেষ করে ছোট ছোট গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার ক্ষেত্রে তেমন আগ্রহবোধ করেনি।^{৫৬৯}

^{৫৬৭} আদদাওয়াতুল ইসলামিয়া ফি আহদি আমীরিল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব, পৃ. ২৭৬; তারতিব ওয়া তাহযিব আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃ. ৫২।

^{৫৬৮} আল-আমালিয়াত আত-তায়ারুজিয়া আদ-দিফাইয়া ইনদাল মুসলিমিন, পৃ. ১৮২।

^{৫৬৯} আল-হানদাসাতুল আসকারিয়া ফিল ফুতুহাতিল ইসলামিয়া, ড. কাসিই আব্দুর রউফ, পৃ. ১৮৮।

মুসলিম বাহিনী দামেস্কের উর্বর মরুদ্যানে প্রবেশ করে যেখানে বাইজেন্টাইনদের সুরম্য প্রাসাদ ও বাড়ি-ঘর অবস্থিত। কিন্তু এসবই ছিল জনশূন্য। এর অধিবাসীরা পালিয়ে দামেস্কের মূল শহরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। হিরাক্লিয়াস হিমস থেকে দামেস্কে ৫০০ সাহায্য সৈন্য প্রেরণ করে যা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না। আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু দামেস্কের উত্তর দিকে মুসলিম বাহিনী মোতায়েন করেন এবং এর নেতৃত্বে যু আল-কিলাকে নিয়োগ করেন। যু আল-কিলা হিরাক্লিয়াসের বাহিনীর মোকাবিলা করেন। উভয় বাহিনীর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা হয় এবং এতে বাইজেন্টাইনরা পরাজয় বরণ করে।^{৫৭০} দামেস্ক অধিবাসীরা হিরাক্লিয়াসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনি তাদের প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও যুদ্ধ অব্যাহত রাখার ব্যাপারে দৃঢ়পদ থাকতে আহ্বান করেন এবং সাহায্য সৈন্য প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেন। এভাবে তাদের মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে।^{৫৭১}

১.১.১। উভয় বাহিনীর সেনাবিন্যাস

বাইজেন্টাইন বাহিনী

- ✓ সর্বাধিনায়ক : হিরাক্লিয়াস
- ✓ দামেস্কের গভর্নর : নাসতাস ইবনে বাস্তোরাস
- ✓ দামেস্ক বাহিনীর সেনাপতি : বাহান, ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং পরবর্তী সময়ে রণক্ষেত্র থেকে পলাতক; তার ডাকনাম ওয়ারদিয়ান।
- ✓ বাইজেন্টাইন সেনাদের মোট সংখ্যা ৬০০০০; হিমস থেকে সাহায্য সৈন্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে ২০০০০ সৈন্য। আরও ৪০০০০ সৈন্য প্রয়োজনে যুদ্ধে যোগ দিতে প্রস্তুত করা হয়। বাইজেন্টাইন সেনারা দামেস্কে অবস্থান গ্রহণ করে। তবে তারা দামেস্কের বাড়ি-ঘর, দুর্গ ও দেয়ালের আড়ালে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলে। তারা বাহির থেকে সাহায্য-সৈন্যের আশা করে।

^{৫৭০} আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/২০।

^{৫৭১} আল-হানদাসাভুল আসকারিয়া ফিল ফুতুহাতিল ইসলামিয়া, পৃ. ১৮৮।

- ✓ ফিহলে বাইজেন্টাইন বাহিনী মজুদ রয়েছে। শহর রক্ষার কাজে নিয়োজিত এবং ইয়ারমুক যুদ্ধে বেঁচে যাওয়া সৈন্যদের নিয়ে এ বাহিনী গঠন করা হয় যাদের মনোবল খুব দুর্বল। কারণ, তারা মুসলমানদের নিকট পরাজয় বরণ করেছিল এবং রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে বেঁচে এসেছিল। তাদের মানসিক অবস্থা খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত।

মুসলিম বাহিনী

- ✓ মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক : উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ✓ সিরিয়ায় রণাঙ্গনে মুসলিম সেনাপতি (অপারেশন) : আবু উবাইদা ইবনুল জাররা রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ✓ আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার অধীন দশ জন জেনারেলকে আবু আল-আওয়ারের নেতৃত্বে এক নির্দিষ্টসংখ্যক সেনাসহ—ইতিহাসে এর সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায় না—বিসান এলাকা (বর্তমানে স্থানটি খারবাত ফিহল নামে পরিচিত) পর্যন্ত দামেস্কের রাস্তা-ঘাটের নিয়ন্ত্রণ নিতে প্রেরণ করেন।^{৫৭২}
- ✓ আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু আলকামাহ ইবনে হাকিম এবং মাসরুকের নেতৃত্বে দুটি বাহিনী প্যালেস্টাইনের দু-দিকে প্রেরণ করেন, যাতে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক থেকে শত্রুর সাহায্য-সৈন্য আসা প্রতিরোধ করা যায়।^{৫৭৩}
- ✓ আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু যু আল-কিলার নেতৃত্বে একটি বিচ্ছিন্ন অশ্বারোহী দল দামেস্কের উত্তর দিকে প্রেরণ করেন যাতে হিমস থেকে আগত সৈন্যদের ওপর নজরদারি এবং বাইজেন্টাইনদের শক্তি বৃদ্ধিতে কোনো সৈন্যই যেন দামেস্ক পৌঁছতে না পারে, তা নিশ্চিত করা যায়।^{৫৭৪}
- ✓ ইয়ারমুক যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৪০০০০, যারা ছিল খুবই সুসংগঠিত এবং ইয়ারমুক যুদ্ধে বিজয়ের কারণে তাদের মনোবলও ছিল খুবই দৃঢ়।^{৫৭৫}

^{৫৭২} প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

^{৫৭৩} প্রাগুক্ত।

^{৫৭৪} দেখুন : তারিখ আত-তাবারি, ৪/২৫৮; আল-হানদাসাতুল আসকারিয়া, পৃ. ১৮৯।

^{৫৭৫} আল-ইয়ারমুক ওয়া তাহরির দিয়ারিশ শাম, শাকির মাহমুদ রামিজ, পৃ. ১০৩।

- ✓ দামেস্ক শহর অবরোধে ২০০০০ মুসলিম সৈন্য অংশগ্রহণ করে। বাকি সৈন্যদের ফিহলে প্রেরণ করা হয়; প্রয়োজনে ওইসব সৈন্যদেরও দামেস্কে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।^{৫৭৬}

১.১.২। দামেস্ক শহরের বর্ণনা

দামেস্ক একটি বিখ্যাত শহর। শহরটির নামকরণ করা হয় এর প্রতিষ্ঠাতা দিমসাক ইবনে কিনান-এর নামানুসারে। মিসরের রাজপরিবারের ১৮তম শাসকের শাসনামলে এটি মিসরের অধীন হয়। এটি ইতিহাসের প্রাচীনতম শহর এবং মূর্তিপূজার কেন্দ্রভূমি ছিল। এর রাজত্ব খ্রিস্টানদের হাতে চলে গেলে তারা মন্দিরগুলোকে গির্জায় পরিণত করে। এগুলোর সৌন্দর্য ও চাকচিক্য ছিল নজরকাড়া। আনতাকিয়ার গির্জার পরেই এগুলোর অবস্থান ছিল। দামেস্কের উত্তরে আল-বালাকার শস্যভূমি এবং দক্ষিণে পর্বতময় জুলান এলাকা—এতে ছিল ঝরনা ও চাষাবাদযোগ্য ভূমি।

দামেস্ক ছিল আরব অধ্যুষিত একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক শহর। ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরে মুসলমানগণ এ শহর সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। এ শহরের নিরাপত্তায় চারিদিকে রয়েছে বিশাল প্রাচীর। এসব প্রাচীর পাথরের তৈরি এবং এর উচ্চতা ৬ মিটার ও প্রস্থ ৩ মিটার। আর শহরের প্রবেশের জন্য এসব প্রাচীরের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে বড় বড় মজবুত গেইট। পারসিকদের সঙ্গে দামেস্কের সংঘর্ষের পর হিরাক্লিয়াস শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা আরও জোরদার করেন। এতে গেইটগুলো দৃঢ়ভাবে বন্ধ করা এবং প্রাচীরের পাশ ঘেঁষে তিন মিটার গভীর খাল খনন করা হয়। আর এ খালে বারাদা নদীর পানি প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করা হয়। দামেস্ক এভাবে এক সুরক্ষিত নগরীতে পরিণত হয়, যাতে বহিরাগতরা চাইলেই সহজে প্রবেশ করতে পারত না।^{৫৭৭} মোটকথা, দামেস্কে বাইজেন্টাইনদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা খুব শক্তিশালী ছিল। দামেস্কের এই দৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থেকে নিম্নলিখিত বিষয়াদির ইশারা পাওয়া যায় :

দামেস্ক শহরের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা তাড়াহুড়া করে তৈরি করা হয়নি; কারণ, এ শহর ছিল সামরিক দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। বাইজেন্টাইনরা

^{৫৭৬} আল-হানদাসাতুল আসকারিয়া ফিল ফুতুহাতিল ইসলামিয়া, পৃ. ১৮৯।

^{৫৭৭} প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।

পারস্য কর্তৃক এটি বেহাত হওয়ার আশঙ্কা করত। এ কারণে বাইজেন্টাইনদের বিজ্ঞ সামরিক প্রকৌশলীরা শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা দৃঢ়ভাবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ক্ষেত্রে তারা তাদের সামরিক অভিজ্ঞতা ও প্রচলিত ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতা প্রয়োগ করে।

দামেস্ক শহরের চারিদিকে যে দৃঢ় প্রাচীর রয়েছে, এর নির্মাণশিল্প থেকে বাইজেন্টাইন প্রকৌশলীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তারা এর ভৌগোলিক অবস্থানকেও বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছে। তারা বারাদা নদীর পানিকে প্রাচীরের পাশ ঘেঁষে নির্মিত পরিখার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করেছে। ভিন্নভাবে বলা যায়, তারা উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য একটি প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

বাইজেন্টাইন নেতৃবৃন্দ শহরের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার উপর খুবই আস্থাশীল ও নিশ্চিত ছিল। তারা এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিল যে, তারা তাদের সেনাবাহিনীকে শহরের অভ্যন্তরে জমা করে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করে। এদিকে তারা হিমস থেকে আগত বাইজেন্টাইন বাহিনী কর্তৃক মুসলমানদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করার আশা করতে থাকে। সুতরাং সামরিক প্রকৌশলীদের কর্তৃক নির্মিত শহর প্রতিরক্ষা প্রাচীরই বাইজেন্টাইন সেনাপতিদের আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিতে বাধ্য করে। এভাবে সামরিক প্রকৌশলীরা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরাসরি প্রভাব ফেলে। সুতরাং যুদ্ধে সামরিক প্রকৌশলীদের গুরুত্ব অনুধাবন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অপরদিকে, এ সুরক্ষিত প্রাচীর মুসলিম বাহিনীর শহরে প্রবেশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং তারা বাধ্য হয়েই শহরটিকে অবরোধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, মুসলিম বাহিনী সত্তর দিন শহরটি অবরোধ করে রাখে। এটি ছিল একটি কঠিন অবরোধ, যাতে প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র এবং অন্যান্য সমরাস্ত্র ব্যবহার করা হয়।^{৫৭৮}

^{৫৭৮} আল-হানদাসাতুল আসকারিয়া ফিল ফুতুহাতিল ইসলামিয়া, পৃ. ১৯০-১৯১।

১.১.৩। যুদ্ধের অগ্রগতি

আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বাহিনীকে সুসংগঠিত করে নিম্নলিখিতভাবে দামেস্কে প্রেরণ করেন :

কেন্দ্রীয় বাহিনী : খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু
ডান ও বাম বাহু : আমর ইবনে আল-আস রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং
আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু
অশ্বারোহী বাহিনী : ইয়ায ইবনে গানাম
পদাতিক বাহিনী : শুরাহবিল ইবনে হাসানাহ

প্রাচীরে সংযুক্ত গেইট দিয়েই দামেস্ক শহরে প্রবেশ ও বের হতে হতো। এ জন্য এসব গেইটসমূহে মুসলিম সেনাপতি নিম্নলিখিতভাবে বিশেষ বাহিনী মোতায়েন করে :

পূর্ব গেইট : এর দায়িত্বে ছিলেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু।

আল-জাবিয়াহ গেইট : আবু উবাইদা ইবনুল জাররা রাযিয়াল্লাহু আনহু

তুমা গেইট : আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু

আল-ফারাদিস গেইট : শুরাহবিল ইবনে হাসানাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু

ছোট গেইট (আল-বাব আস-সগীর) : ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান

বাইজেন্টাইনরা মনে করেছিল মুসলমানগণ, বিশেষ করে শীতকালে, এত দীর্ঘ সময় ধরে অবরোধ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবেন না। কিন্তু তারা ছিলেন ধৈর্য ও দৃঢ় ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান, যাদের নিকট আবহাওয়ার এই পরিবর্তনও কোনো বাধা ছিল না। মুসলমানগণ বাইজেন্টাইনদের পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘর ও চার্চে মুজাহিদদের বিশ্রামাগার গড়ে তোলে। তারা নিয়মিত সপ্তাহান্তে সৈন্যদের পালাবদল করে অবরোধ অব্যাহত রাখে। আর গেইটে অবস্থানরত সৈন্যরা পশ্চাৎ বাহিনীর সঙ্গে পালাবদল করত যাতে অবরোধে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে; সময়ের দীর্ঘসূত্রিতা কোনো ব্যাপার ছিল না।^{৫৭৯}

^{৫৭৯} আল-হানদাসাতুল আসকারিয়া, পৃ. ১৯২।

মুসলমানগণ এখানেই থেমে থাকেননি; তারা শত্রুদের সম্পর্কে আরও তথ্য এবং প্রতিরোধের ধরন জানার চেষ্টা করতে থাকেন। এভাবে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এমন একটি গেইট নির্বাচন করতে সক্ষম হন যেখান দিয়ে দামেস্ক শহরে সহজেই ঢোকা সম্ভব। তিনি সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থান নির্বাচন করেন যেখানে পানি ছিল প্রচুর^{৫৮০} এবং দড়ির সিঁড়ি বানিয়ে দেয়াল টপকানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু খবর পেয়েছেন যে, দামেস্কের এক সেনাপতির পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং এ উপলক্ষ্যে বিরাট ভোজ-উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে; বাজেন্টাইনরা খাওয়া-দাওয়া এবং আমোদ-ফুর্তিতে মেতে উঠেছে। তারা তাদের দায়িত্বও ভুলে গেছে। এমনকি মুসলমানদের দিকে নজর রাখা ও গেইটসমূহ পাহারা দেওয়ার ব্যাপারেও তারা শিথিলতা প্রদর্শন করে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনী নিয়ে বের হয়ে পড়েন। এ বাহিনীর অগ্রভাগে ছিলেন খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু, কাকা ইবনে আমর এবং মাজউর ইবনে আদিয়্য। তারা অন্যান্য সৈন্যদের বললেন, ‘তাকবীর শোনার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা দেয়াল টপকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে এবং গেইটের দিকে অগ্রসর হবে।’^{৫৮১}

খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার প্রথম দল চামড়ার তৈরি দুটি মটকার সাহায্যে পরিখা পার হয়ে দেয়ালে পৌঁছে গেলেন।^{৫৮২} তারপর তারা দেয়ালে দড়ির মই স্থাপন করলেন। প্রথমে কাকা এবং মাজউর দড়ি বেয়ে দেয়ালের ওপরে উঠলেন এবং আরও দড়ি স্থাপন করলেন। তারপর দ্বিতীয় দল মই বেয়ে দেয়ালের ওপর উঠল। তখন প্রথম দল নিচে নেমে গেইটের কাছে অবস্থান নেয় এবং তারা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হন। তারা দেয়ালের ওপর থেকেই প্রথম তাকবীর-ধ্বনি দেন। তখন দ্বিতীয় দল দেয়াল টপকে গেইটের দিকে অগ্রসর হয় এবং তরবারির আঘাতে গেইটের সকল তালা ভেঙে দামেস্কে মুসলিম বাহিনীর প্রবেশপথ উন্মুক্ত করে দেন।^{৫৮৩}

^{৫৮০} তারিখ আত-তাবারি, ৪/২৫৯।

^{৫৮১} আল-হানদাসাতুল আসকারিয়া, পৃ. ১৯২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/২০।

^{৫৮২} আল-হানদাসাতুল আসকারিয়া, পৃ. ১৯২-১৯৩।

^{৫৮৩} প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।

দামেস্ক বিজয় সন্ধির মাধ্যমে, নাকি বল প্রয়োগে?

সন্ধির মাধ্যমে নাকি বল প্রয়োগে এ বিজয় অর্জিত হয়েছিল— ইতিহাসবিদগণ এই ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। বেশির ভাগ মনে করেন, সন্ধিচুক্তির মাধ্যমেই এই বিজয় নিশ্চিত হয়। কারণ, তারা নিশ্চিত নন কোনটি আগে সংঘটিত হয়েছিল : বল প্রয়োগে বাধ্য হয়ে বাইজেন্টাইনরা সন্ধিচুক্তি করেছিল, নাকি দামেস্কের এক অংশ সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে এবং অপর অংশ বল প্রয়োগে মুসলমানদের অধীন হয়েছিল? কিছু কিছু বিজ্ঞ ইতিহাসবিদ মনে করেন, দামেস্কের অর্ধেক সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে এবং বাকি অর্ধেক বল প্রয়োগে মুসলমানরা দখল করে। এটিই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি; কারণ, সাহাবায়ে কেরামের একটি কাজ সেদিকেই ইঙ্গিত করে। তারা খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় গির্জার অর্ধেক নিজেদের দখলে রাখেন এবং বাকি অর্ধেক খ্রিস্টানদের জন্য ছেড়ে দেন।^{৫৮৪} আল্লাহই ভালো জানেন।

বিজয়ের তারিখ

ইবনে কাসির বলেন, ‘সাইফ ইবনে উমর দামেস্কের যে কাহিনি বর্ণনা করেন, তাতে দেখা যায়, দামেস্ক বিজয় হয়েছিল ১৩ হিজরীতে। কিন্তু বেশির ভাগ বিজ্ঞদের মতের সঙ্গে মিল রেখে সাইফ এও বলেন, দামেস্ক বিজয় সংঘটিত হয়েছিল ১৪ হিজরীর রজব মাসে।^{৫৮৫} খালীফা ইবনে খাইয়্যাৎ বলেন, আবু উবাইদা রজব, শাবান, রমযান এবং শাওয়াল মাসে দামেস্ক অবরোধ করেন।^{৫৮৬} তারপর যু আল-কাযাতে সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হয়। তবে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো ইয়ারমুকের যুদ্ধের পরেই দামেস্ক বিজিত হয়েছিল।^{৫৮৭}

^{৫৮৪} তারতিব ওয়া তাহযিব আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃ. ৫৬।

^{৫৮৫} প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

^{৫৮৬} তারিখ খলীফা, পৃ. ১২৬।

^{৫৮৭} আল-হানদাসাতুল আসকারিয়া, পৃ. ১৯৩।

কিছু রণকৌশল প্রয়োগ

দামেস্ক বিজয়ে মুসলিম সেনাবাহিনী বেশ কয়েকটি যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করেন; সারপ্রাইজ, যুদ্ধের সূচনা, যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োজিত ফিল্ড কমান্ডারদের সুযোগের সদ্যবহার ও উদ্ভাবনী চিন্তা-চেতনার ব্যবহার ইত্যাদি। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু কাজ-কর্মে এসব কৌশলের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তিনি স্কাউট প্রেরণ করে দামেস্ক শহরের প্রবেশের সবচেয়ে দুর্বল পয়েন্ট খুঁজে বের করেন এবং এটিই পরবর্তী সময়ে সবচেয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ হয়ে ওঠে, যাতে অবরোধ আক্রমণের রূপ লাভ করে। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর দড়ির মইয়ের সঙ্গে—তিনি যেভাবে তা ব্যবহার করে দামেস্কের সুরক্ষিত প্রাচীর অতিক্রম করেন—আমরা যদি ১৯৭৩ সালে মিসরীয় আর্মির যুদ্ধকে তুলনা করি—যখন তারা ইসরায়েলের বারলেভ লাইন দড়ির মইয়ের সাহায্যে অতিক্রম করে শত্রুর আত্মরক্ষা ব্যূহে পৌঁছে যায়, তাহলে আমরা বুঝতে পারব, দুটি একই রণকৌশল। ইসলামের বিজয় অভিযানে যেসব অভিনব ও ফলপ্রসূ যুদ্ধকৌশল ব্যবহৃত হয়েছিল, আধুনিক যুদ্ধে তারই প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।^{৫৮৮}

দামেস্ক বিজয়ের পর সিরিয়ার অন্যান্য অংশ বিজয়

দামেস্ক বিজয়ের পর আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আল-বিকা (বেকা)-এর দিকে প্রেরণ করেন^{৫৮৯} এবং যুদ্ধ করেই সেটি মুসলিম শাসনের অধীন হয়। আয়ান মিসনুন-এর দিকেও তিনি একটি অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করেন, যারা সেখানে বাইজেন্টাইনদের সাক্ষাৎ পান। বাইজেন্টাইনদের নেতৃত্বে ছিল সিনান নামে এক ব্যক্তি, যে আকাবাত বৈরুত থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করে। ওইদিন অনেক মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। এ জন্য আয়ান মিসনুন আয়ান আশ-শুহাদা (শহীদদের ঝরনা) নামে পরিচিতি লাভ করে।

আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার অনুপস্থিতিতে ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ানকে দামেস্কের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং ইয়াজিদ তাদমুরের

^{৫৮৮} প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

^{৫৮৯} তারতিব ওয়া তাহযিব আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃ. ৫৮-৫৯।

দিকে দিহয়াহ ইবনে খালীফাকে একদল সৈন্যসহ প্রেরণ করে তা জয় করতে নির্দেশ দেন। তিনি আবু আল-জাহরা আল-কুশাইরিকে আল-বাসানিয়াহ ও হাওরানের দিকে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পন্ন করেন। শুরাহবিল ইবনে হাসানা পুরো জর্ডানই লড়াই করে জয় করেন; কেবল তাবারিয়াহ অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেন। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আল-বিকা দখল করেন এবং সেখানকার লোকজন তাকে সন্ধিচুক্তি করতে অনুরোধ করেন। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের জন্য চুক্তি লিখে দেন।

১.২। ফিহলের যুদ্ধ

মুসলিম বাহিনীর যে অংশকে ফিহলের দিকে আক্রমণের জন্য পাঠানো হয়েছিল, তারা দক্ষিণ দিকে তাদের যাত্রা শুরু করে। বাইজেন্টাইন সৈন্যদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। এদের বেশির ভাগ হিমস থেকে এসে এখানে যোগ দিয়েছে। তা ছাড়া মুসলমানদের নিকট পরাজিত অন্যান্য শহরের সৈন্যরাও এসেছে। মুসলিম বাহিনী আম্মার ইবনে মুখসিনের নেতৃত্বে ফিহল শহর অবরোধের জন্য এগিয়ে গেলে বাইজেন্টাইন সৈন্যদের মুখোমুখি হয়। কিন্তু বাইজেন্টাইনরা এর আগেই তিবেরিস লেকের বাঁধ খুলে দেয় এবং এতে ফিহল শহরের চারিদিকে পানি প্রবাহিত হয়ে পুরো এলাকাকে কদমাক্ত করে তোলে। এতে তারা মুসলিম বাহিনী—বিশেষ করে অশ্বারোহী সেনাদের—ঠেকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়। আধুনিক যুদ্ধ-বিগ্রহে সাঁজোয়া গাড়ির অনুপ্রবেশ ঠেকাতে এই কৌশল প্রয়োগ করতে দেখা যায়।

এভাবে মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বাইজেন্টাইনরা এই কদমাক্ত ভূমিকেই নিজেদের প্রতিরক্ষা লাইন হিসাবে ব্যবহার করে এবং তারা আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করে। আর যদি ভূমি শুকনো হতো, তাহলে মুসলিম বাহিনী খুব সহজেই তাদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করতে পারত। কারণ, তারা মরুভূমির সমতল ভূমিতে যুদ্ধ করেই অভ্যস্ত। আমারাহ ইবনে মুখসিন মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণের পরিবর্তে ফিহলকে অবরোধ করার নির্দেশ দেন। কারণ, দু-দলের সৈন্যসংখ্যায় ছিল বিস্তর ফারাক এবং বাইজেন্টাইনদের তৈরি করা কদমাক্ত ভূমিও

অতিক্রম করে আক্রমণ পরিচালনা করা ছিল কঠিন। দামেস্ক বিজিত হওয়ার আগ পর্যন্ত মুসলমানগণ ফিহল অবরোধ করে রাখে। তারপর আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনী নিয়ে আবু আল-আওয়ারের সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হন। তিনি পুরো বাহিনীকে নতুন করে সজ্জিত করেন :

- ✓ অগ্রগামী দল—খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু।
- ✓ ডান বাহু—আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু।
- ✓ বাম বাহু—আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ✓ অশ্বারোহী বাহিনী—দিরার ইবনে আল-আজুর।
- ✓ পদাতিক বাহিনী—আয়ায ইবনে গানাম।
- ✓ সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ রাখা হয় শুরাহবিল ইবনে হাসানা রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে। কারণ, যে স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে, এ এলাকা ছিল তার নিয়ন্ত্রণাধীন। শুরাহবিল দায়িত্ব নিয়ে সৈন্যদের সুসংগঠিত করেন। রসদ সরবরাহসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করেন। দিনে কিংবা রাতে যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় তিনি তাদের প্রস্তুত করে রাখেন।^{৫৯০}

ফিহল অবরোধ দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে। এক পর্যায়ে বাইজেন্টাইনরা মনে করে, তারা অকস্মাৎ মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে তাদের তছনছ করে দিতে পারবে। এ জন্য তারা একরাতে আক্রমণ করে বসে। সাকলাব ইবনে মিখরাকের নেতৃত্বে বাইজেন্টাইনরা আক্রমণ পরিচালনা করে। মুসলিম বাহিনী একত্রে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, কারণ, তারা সর্বক্ষণ যেকোনো পরিস্থিতির জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলেন। রাত থেকে সকাল এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি যুদ্ধ চলতে থাকে। রাতের অন্ধকার বেড়ে গেলে বাইজেন্টাইনরা পলায়ন করে এবং তাদের সেনাপতি নিহত হয়। মুসলমানগণ তাদের তাড়িয়ে কদামক্ত জায়গায় নিয়ে যায়, যা তারা মুসলমানদের জন্য প্রস্তুত করেছিল এবং তাদের পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে। বাইজেন্টাইন সৈন্যরা খুব কমই সেদিন প্রাণে রক্ষা পায়। তারা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর মুসলিম বাহিনী তাদের মূল পরিকল্পনা এগিয়ে নেয়। তারা শুরাহবিল ইবনে হাসানাকে

^{৫৯০} আল-আমালিয়াত আত-তায়ারুজিয়া আদ-দিফাইয়া ইনদাল মুসলিমিন, পৃ. ১৮৮।

জর্ডান এবং আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্যালেস্টাইনে প্রেরণ করে।

আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হিমসের দিকে অগ্রসর হন। তারা মারয আর-রুম এলাকায় পৌঁছার পর এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূচনা হয়। সেখানকার ভূমি রক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী একটি গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশল প্রয়োগ করে—যখন বাইজেন্টাইন অগ্রগামী দল মুসলিম অগ্রগামী দলের ওপর আক্রমণ করে। বাইজেন্টাইন সেনাপতি তুযরা যখন বুঝতে পারে তার অগ্রগামী দল মুসলিম বাহিনীর অগ্রগামী দলের ওপর আক্রমণ করেছে, তখন সে দামেস্কের দিকে রওনা হয়। মুসলিম বাহিনী দ্রুত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বাইজেন্টাইনদের মতি-গতি বুঝতে সক্ষম হন। তখন আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে একটি অশ্বারোহী বাহিনী তুযরাকে পেছন থেকে আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন এবং তিনি নিজে স্বস্থানে অবস্থান করেন। ওই সময় মুসলিম স্কাউটরা তুযরা গতিবিধি শনাক্ত করতে সক্ষম হয় এবং ইয়াজিদ ইবনে সুফিয়ানের সৈন্যরা তার গতিরোধ করে দাঁড়ায়। এ দু-দলের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু পেছন থেকে অকস্মাৎ তুযরার ওপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। আর এতে তুযরার বাহিনী পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়।^{৫৯১}

১.৩। বাইসান এবং তাবারিয়া বিজয়

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশ অনুযায়ী আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হিমসের দিকে রওনা হন। আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু জর্ডানের শাসনভার শুরাহবিল ইবনে হাসানা রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে অর্পণ করেন। শুরাহবিল রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্মিলিতভাবে বাইসান অবরোধ করেন। বাইসান অধিবাসীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসে এবং শুরাহবিল একাই তাদের অনেককে হত্যা করেন। তারপর তারা তার সঙ্গে দামেস্কের অনুরূপ শান্তিচুক্তি করে। তিনি তাদের ওপর জিযিয়া আরোপ

^{৫৯১} আল-আমালিয়াত আত-তায়ারুজিয়া আদ-দিফাইয়া ইনদাল মুসলিমিন, পৃ. ১৮৯।

করেন এবং কৃষিজাত পণ্যের ওপর খারায় নির্ধারণ করেন। আবু আল-আওয়ার আস-সুলামি তাবারিয়া জনগণের সঙ্গে একই পদ্ধতি অবলম্বন করেন।^{৫৯২}

১.৪। হিমসের যুদ্ধ (১৫ হি.)

আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু পলাতক বাইজেন্টাইন সৈন্যদের হিমস পর্যন্ত ধাওয়া করে নিয়ে যান। তারপর তিনি হিমস নগরী অবরোধ করেন। তার সঙ্গে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এসে যোগ দেন এবং তারা খুব কঠিন অবরোধ গড়ে তোলেন। ওই সময় ছিল শীতকাল। আবহাওয়া ছিল খুব ঠান্ডা। শহরের লোকেরা এই আশায় ছিল, এ রকম কঠিন শীতে মুসলমানরা টিকতে পারবে না এবং তারা অবরোধ উঠিয়ে নেবে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম পরম ধৈর্য অবলম্বন করেন। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, কতক রোমান ঠান্ডায় ফিরে গিয়েছিল, কিন্তু সাহাবীদের কেউ স্থান ত্যাগ করেননি। ঠান্ডায় রোমানদের কারও কারও পা খসে পড়েছিল। অথচ ওদের পা ছিল মোজার মধ্যে। সাহাবীদের পায়ে জুতা ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। তা সত্ত্বেও তাদের কারও পায়ে কোনো সমস্যা হয়নি। এমনকি কোনো আঙুলেও নয়। হিমস অধিবাসীদের নেতৃস্থানীয় লোকজন মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু সক্রিয় নাগরিকরা তা গ্রহণ করেনি। তারা বলেছিল, আমরা সমঝোতায় যাব কেন? আমাদের সশ্রুট তো আমাদের কাছেই অবস্থান করছেন।

কথিত আছে, সেদিন সাহাবীগণ এমন জোরে তাকবীর-ধ্বনি দিয়েছিলেন যে, তাতে পুরো শহর থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। কতক প্রাচীর ফেটে গিয়েছিল। এরপর আরেকবার তাকবীর-ধ্বনি দিলে কতক ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ে। এবার ওদের সাধারণ নাগরিকরা শীর্ষস্থানীয় ও সক্রিয় নাগরিকদের নিকট এসে বলল, ‘আমাদের অবস্থা কি আপনারা অবগত নন? আপনারা কেন মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করছেন না?’ তারপর তারা সেসব শর্তে সন্ধি স্থাপন করল, যেসব শর্তে দামেস্কের অধিবাসীগণ সন্ধি করেছিল যে, অর্ধেক ঘরবাড়ি মুসলমানদের দখলে যাবে। ভূমির খাজনা পরিশোধ করতে হবে এবং ধনী-গরিব অনুপাতে প্রত্যেককে জিযিয়া কর

^{৫৯২} তারতিব ওয়া তাহযিব আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃ. ৬১।

পরিশোধ করতে হবে। আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বিজয়ের সংবাদসহ যুদ্ধলব্ধ গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। সেনাপতি আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু অনেক সৈন্যের সমন্বয়ে সেখানে একটি সেনা ক্যাম্প স্থাপন করেন। সৈনিকদের সঙ্গে কয়েকজন সেনাপতিও নিযুক্ত করে দেন। তারা হলেন বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফাকে অবহিত করেন যে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস জাযিরা অঞ্চলের পানি বন্ধ করে দিয়েছেন এবং সম্রাট কখনো বাইরে বের হন, আবার কখনো লুকিয়ে থাকেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে আপাতত ওই শহরে অবস্থান করার নির্দেশ দেন।^{৫৯৩}

১.৫। কিন্নাসরীনের যুদ্ধ

আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কিন্নাসরীন অভিযানে প্রেরণ করেন।^{৫৯৪} তিনি সেখানে পৌঁছলে স্থানীয় জনগণ এবং আরব-খ্রিস্টানরা তাকে প্রতিরোধ করে। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু করেন। তাতে তাদের অনেক লোক নিহত হয়। বিশেষ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সকল বাইজেন্টাইন সৈন্যকে হত্যা করা হয়। তাদের আমীর ও সেনাপতি মীতাস নিহত হয়। তারপর গ্রাম্য বেদুইনরা এসে আত্মসমর্পণ করে এবং ওযর পেশ করে বলে, ‘এই যুদ্ধে আমাদের কোনো সম্মতি ছিল না; বরং খ্রিস্টানদের প্ররোচনায় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। সেনাপতি খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের ওযর মঞ্জুর করেন এবং যুদ্ধ বন্ধ করেন। তিনি শহরে প্রবেশ করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের উদ্দেশে বলেন, ‘তোমরা যদি আকাশেও থাক, তবে মহান আল্লাহ আমাদের তোমাদের নিকট তুলে নেবেন অথবা তোমাদের আমাদের নিকট নামিয়ে আনবেন।’ তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। শেষ পর্যন্ত পুরো কিন্নাসরীন মুসলমানদের অধিকারে আসে। এই যুদ্ধে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর দূরদর্শিতা ও কৃতিত্বের সংবাদ খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু অবগত হয়ে বলেন,

^{৫৯৩} তারতিব ওয়া তাহযিব আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, পৃ. ৬২ (ইফা, ৭/১০১ দৃষ্টব্য)।

^{৫৯৪} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪২৭।

‘মহান আল্লাহ আবু বকরের প্রতি দয়া করুন। তিনি আমার চেয়ে বেশি মানুষ চিনতেন। আল্লাহর কসম, কোনো দোষ কিংবা অপরাধের কারণে আমি খালিদকে বরখাস্ত করেছিলাম, তা নয়; বরং আমি এ আশঙ্কা করেছিলাম যে, মানুষ তার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে যায়।’^{৫৯৫}

১.৬। কায়সারিয়ার যুদ্ধ (১৫ হি.)

একই বছর খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ানকে কায়সারিয়া অভিযানের সেনাপতি নিয়োগ করেন।^{৫৯৬} তিনি তার নিকট প্রেরিত চিঠিতে লেখেন : আমি আপনাকে কায়সারিয়া অভিযানের সেনাপতির দায়িত্ব দিয়েছি। আপনি সেখানে গমন করুন এবং ওদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করুন। আর বেশি বেশি করে এই কালিমা পাঠ করুন :

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُ رَبُّنَا وَثِقَتُنَا وَرَجَاؤُنَا
وَمَوْلَانَا فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

মহার আল্লাহর দেওয়া শক্তি-সামর্থ্য ছাড়া আমাদের কোনো শক্তি নেই। মহান আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা, আমাদের ভরসা, আমাদের আশা এবং তিনি আমাদের প্রভু। কত উত্তম সেই প্রভু! কত উত্তম সেই সাহায্যকারী!

সুতরাং মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু কায়সারিয়ার দিকে রওনা হন। তিনি সেখানে পৌঁছে শহরটি অবরোধ করলেন। সেখানকার নাগরিক ও অধিবাসীগণ একাধিকবার মুসলিম অবরোধকারীদের ওপর হামলা করে। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুআবিয়া তাদের ওপর চূড়ান্ত ও কঠোরতম আঘাত হানেন। তিনি বিজয়ের জন্য অবিরাম চেষ্টা চালান। অবশেষে আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় দান করেন। ওই যুদ্ধে প্রায় আশি হাজার শত্রু-সৈন্য নিহত হয়। যারা যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়েছে তারাসহ মোট সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ। সেনাপতি মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বিধি মোতাবেক গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ এবং বিজয়ের সংবাদ খলীফার নিকট প্রেরণ করেন।^{৫৯৭}

^{৫৯৫} তারতিব ওয়া তাহযিব আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃ. ৬৩।

^{৫৯৬} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪৩১।

^{৫৯৭} তারতিব ওয়া তাহযিব আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃ. ৬৩-৬৪।

ড. আব্দুর রহমান আশ-শূয়া মনে করেন, সিরিয়ায় একের পর এক মুসলমানদের অধীনে আসতে থাকে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, বাইজেন্টাইনদের মনোবল এত বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, তারা কখনো প্রতিরোধের চিন্তা করেনি। এভাবে বৈরুত, সিদন, নাবলুস, লদ, আলেপ্পো এবং আন্তিয়কের পতন ঘটে। কায়সারিয়া ছিল সিরিয়ার সর্বশেষ শহর, যা মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে মুসলমানদের অধীনে আসে। আর এটি জেরুযালেম বিজয়ের পরেই সংঘটিত হয়।^{৫৯৮}

১.৭। জেরুযালেম বিজয় (১৬ হি.)

ফিলিস্তিনের দায়িত্বে এক বাইজেন্টাইন নেতা নিয়োজিত ছিল। তার নাম আরতাবুন; একজন সিনিয়র সেনাপতি, সম্রাটের পরেই তার মর্যাদা। সে ছিল বাইজেন্টাইনদের মধ্যে সবচেয়ে ধূর্ত ও বুদ্ধিমান, দূরদর্শী ও চরম বিশ্বাসঘাতক। রামলা এবং ইলিয়া (জেরুযালেম)^{৫৯৯}-এ সে প্রচুর সৈন্য মোতায়েন করে রাখে। আমরা ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণসহ খলীফার নিকট পরামর্শ ও নির্দেশনা চেয়ে চিঠি প্রেরণ করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বিখ্যাত উক্তি করেন : আমরা বাইজেন্টাইন আতরাবুনের বিরুদ্ধে আরবের আতরাবুনকে প্রেরণ করেছি। দেখি কীভাবে এর মীমাংসা হয়।^{৬০০} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সত্যিকার অর্থে তা-ই বোঝাতে চেয়েছেন। উভয়েই তাদের নিজস্ব লোকজনের নিকট সবচেয়ে চালাক এবং বুদ্ধিমান হিসাবে পরিচিত। ১৫ হিজরীতে আজনাদাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে আমরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বাইজেন্টাইনদের পরাজিত করেন এবং ফিলিস্তিন বিজয়ের পথ সুগম করেন।^{৬০১} জেরুযালেম যুদ্ধ আজনাদাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের আগেই শুরু হয়ে যায় যখন আতরাবুন বিপুলসংখ্যক সৈন্য রামলা ও আইলিয়াতে প্রেরণ করে যেমন আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, রামলা ও ইলিয়ায় আমরা ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে মুসলমানদের যেকোনো আক্রমণ প্রতিহত করা। কারণ, রামলা ও ইলিয়া ছিল ফিলিস্তিনের দুটি প্রধান শহর; রামলা ছিল ফিলিস্তিনের রাজধানী এবং

^{৫৯৮} দিরাসাত ফি আহদ আন-নুবুওয়া ওয়াল খিলাফা আর-রাশিদাহ, পৃ. ৩৫৫।

^{৫৯৯} হুরুবুর কুদসি ফিত তারিখিল ইসলামি ওয়াল আরাবি, ড. ইয়াসীন সুওয়াইদ, পৃ. ৩৫।

^{৬০০} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪৩১।

^{৬০১} হুরুবুর কুদসি ফিত তারিখিল ইসলামি ওয়াল আরাবি, ড. ইয়াসীন সুওয়াইদ, পৃ. ৩৫।

ইলিয়া এর সবচেয়ে বড় শহর। আর এই দুই শহরের দূরত্ব ছিল আঠারো মাইল।^{৬০২} আরতাবুর নিজেই ইলিয়া শাসন করত। সে আজনাদাইনের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করার পর সৈন্য-সামন্তসহ পালিয়ে এসে ইলিয়ায় আশ্রয় নেয়। তখন রামলার গভর্নর ছিল তাজারুক।^{৬০৩} জেরুযালেম বিজয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ নিচে বর্ণনা করা হলো :

১.৭.১। শত্রুকে ধোঁকা দেওয়া

খলীফার পরিকল্পনা ছিল বাইজেন্টাইন সৈন্যদের ফিলিস্তিনে অবস্থানরত আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে রাখা, যতক্ষণ-না আজনাদাইনে মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হয়। তাতে মুসলমানগণ জেরুযালেমসহ সিরিয়ার বাকি অংশ বিজয়ে বেশি মনোযোগ দিতে সক্ষম হবে। এ জন্য তিনি মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে কায়সারিয়ার দিকে অগ্রসর হতে বলেন, যাতে শত্রুবহর আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বিমুখ থাকে। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফার মতোই ভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হন। তিনি বাইজেন্টাইন সেনাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য আলকামা ইবনে হাকিম আল-ফিরাসি এবং মুসরুক ইবনে ফুলান আল-মাক্কীর নেতৃত্বে দুটি বাহিনী ইলিয়ায় প্রেরণ করেন; তারা ইলিয়ায় গমন করে বাইজেন্টাইনদের আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বিমুখ করতে সমর্থ হয়।^{৬০৪} একই ভাবে রামলায় বাইজেন্টাইন বাহিনীকে ব্যস্ত রাখার জন্য তিনি আবু আইয়ুব আল-মালিকীর নেতৃত্বে আরেকটি বাহিনী প্রেরণ করেন। অতিরিক্ত সাহায্য-সৈন্য এসে পৌঁছলে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু দ্রুত মুহাম্মাদ ইবনে আমরের নেতৃত্বে সাহায্য সৈন্য ইলিয়ায় প্রেরণ করেন। সেখানে যুদ্ধরত মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে গিয়ে তারা মিলিত হয়। অন্য দিকে রামলায় মুসলিম বাহিনীর সাহায্যে আম্মারা ইবনে আমর ইবনে উমাইয়্যার নেতৃত্বে আরেকটি দল প্রেরণ করেন। তিনি নিজে আজনাদাইনে অবস্থান করেন এবং আতরাবুনের সঙ্গে চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রতীক্ষায় থাকেন।

^{৬০২} প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬।

^{৬০৩} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪৩২।

^{৬০৪} হুস্রুবুর কুদসি ফিত তারিখিল ইসলামি ওয়াল আরাবি, ড. ইয়াসীন সুওয়াইদ, পৃ. ৩৬।

এ-সময় ইলিয়ায় শত্রুবাহিনী মুসলমানদের শহরের দেয়াল থেকে তাড়িয়ে দিতে মরিয়া হয়ে ওঠে এবং পবিত্র শহরের চারিদিকে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। বাইজেন্টাইন ও মুসলিম বাহিনী আজনাদাইনে যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে থাকে। আজনাদাইনে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়।^{৬০৫} এ ব্যাপারে আত-তাবারি বলেন, ‘মুসলিম এবং বাইজেন্টাইন বাহিনী ইয়ারমুকের যুদ্ধের ন্যায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। উভয় পক্ষে প্রচুর সৈন্য হতাহত হয়।’^{৬০৬} এটি ছিল বাইজেন্টাইন আতরাবুন এবং আরব আতরাবুনের শক্তির প্রদর্শনী। এতে রোমান সেনাপতি পরাজিত হয় এবং সে তার সৈন্যদের নিয়ে পালিয়ে একটি সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করে নিরাপদ অবস্থান গ্রহণ করে। মুসলিম বাহিনীও তাদের অবকাশ দেয়।^{৬০৭} আত-তাবারি বলেন, ‘আলকামা, মাসরুক, মুহাম্মাদ ইবনে আমর এবং আবু আইয়ুবসহ সবাই এসে আজনাদাইনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীতে যোগ দেয়। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু পুরো বাহিনী নিয়ে ইলিয়া অবরোধে অগ্রসর হন।’^{৬০৮}

মুসলিম সৈন্যগণ ইলিয়ায় আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট সমবেত হয় এবং তিনি ইলিয়া অবরোধ করেন। ইলিয়া শহর ছিল খুবই সুরক্ষিত। আল-ওয়াকিদির বর্ণনা অনুযায়ী এ শহরের দেয়াল ক্যাটাপ্লাটস (ভারী পাথর নিক্ষেপের প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র), তরবারি, বর্ম ও চেইন মেইল দ্বারা পাহারা দেওয়া হতো। তিনি বলেন, তিন দিন অবরোধ অব্যাহত থাকার পর যুদ্ধ শুরু হয়। মুসলিম বাহিনী শহরের দেয়ালের দিকে অগ্রসর হয়। আর অপরদিক থেকে তাদের ওপর বৃষ্টির মতো তির বর্ষিত হতে থাকে। মুসলমানগণ বর্ম দিয়ে সেই তির বৃষ্টি প্রতিহত করেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে এবং এ রকম কয়েকদিন অব্যাহত থাকে। এগারোতম দিনে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকর, মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী এবং তাওহীদের ঝান্ডাবাহক^{৬০৯} অনেক মুজাহিদসহ আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু ইলিয়ায় এসে হাজির হন। এতে ইলিয়ার জনগণের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে।

^{৬০৫} হুরুবুর কুদসি ফিত তারিখিল ইসলামি ওয়াল আরাবি, ড. ইয়াসীন সুওয়াইদ, পৃ. ৩৬।

^{৬০৬} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪৩৩।

^{৬০৭} প্রাগুক্ত।

^{৬০৮} হুরুবুর কুদসি ফিত তারিখিল ইসলামি ওয়াল আরাবি, ড. ইয়াসীন সুওয়াইদ, পৃ. ৩৭।

^{৬০৯} প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

চার মাস ধরে অবরোধ চলতে থাকে। এতে এমন কোনো দিন অতিবাহিত হয়নি যেদিন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়নি। মুসলমানগণ প্রচণ্ড শীত, বরফ এবং ঠান্ডা বৃষ্টি চরম ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবিলা করেন।^{৬১০} একসময় বাইজেন্টাইনরা মুসলমানদের অবরোধে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাদের পুরোহিত সিস্ফোনিস সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসাবে মুসলিম সেনাপতি আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট চিঠি প্রেরণ করে। সেখানে সিস্ফোনিস লেখেন, ‘অবরোধ উঠিয়ে নিন। কারণ, আপনাদের পক্ষে এ শহর বিজয় করা কখনো সম্ভব হবে না।’

১.৭.২। আত্মসমর্পণ

বাইজেন্টাইন আরতাবুন আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট চিঠি লিখল : আপনি আমার বন্ধু ও সমকক্ষ। আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার যে মর্যাদা আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে আপনার একই মর্যাদা। আল্লাহর কসম, আপনি কোনোকালেই আজনাদাইন অতিক্রম করে ফিলিস্তিন জয় করতে পারবেন না। সুতরাং আপনি ফিরে যান। সম্মুখে অগ্রসর হবেন না। তাহলে কিন্তু আপনার পূর্ববর্তীগণ যেমন পরাজিত হয়েছে আপনিও পরাজয়ের মুখোমুখি হবেন।^{৬১১} আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে লেখেন, ‘আমি এই শহর জয় করবই।’ আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রোমান ভাষা জানে এমন এক লোককে ডেকে এনে আরতাবুনের নিকট পাঠান এবং তাকে ফিরে এসে আরতাবুনের প্রতিক্রিয়া জানাতে নির্দেশ দেন। আরতাবুন আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর চিঠি পড়ে অবজ্ঞায় হেসে ওঠে এবং বলে, ‘যে ব্যক্তি বাইতুল মাকদিস জয় করবে, তার নাম উমর।’ দূত ফিরে এসে আমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আরতাবুনের কথোপকথন অবহিত করে। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পারেন যে, আরতাবুন খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথাই বলেছে।^{৬১২}

আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফার নিকট আরতাবুন যা বলেছে, তা উল্লেখ করে চিঠি প্রেরণ করেন। তিনি লেখেন : আমি প্রচণ্ড যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি।

^{৬১০} প্রাগুক্ত।

^{৬১১} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪৩৩।

^{৬১২} প্রাগুক্ত।

তবে কতক শহরের বিজয় আপনার জন্য রেখে দিয়েছি। এখন আপনার সিদ্ধান্ত যা হয়।”^{৬১৩} সভাসদদের সঙ্গে পরামর্শ করে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাহায্য-সৈন্যসহ সিরিয়া প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার অনুপস্থিতিতে মদীনার শাসনভার আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে অর্পণ করেন। তিনি জাবিয়ায় তাঁবু গাড়েন। সেখানে ইলিয়া থেকে লোকজন এসে তার সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করে যে, তারা জিযিয়া কর প্রদান করবে। তারপর তারা মুসলমানদের জন্য শহরের দরজা খুলে দেয়।^{৬১৪}

১.৭.৩। জেরুযালেম অবরোধ সম্পর্কে বিভিন্ন মত ও বিশ্লেষণ

আত-তাবারি একের অধিক সূত্র থেকে জেরুযালেম অবরোধ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই জেরুযালেম অবরোধ করেছিলেন। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, সিরিয়ায় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আসার মূল কারণ হচ্ছে আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু জেরুযালেম অবরোধ করেছিলেন। এর জনগণ সিরিয়ার অন্যান্য শহরের মতো একই শর্তসাপেক্ষে তাদের সঙ্গেও শান্তিচুক্তি করার আহ্বান জানায়। তবে তারা এ চুক্তি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে করতে রাজি হয়নি। এ জন্য আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানান। তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দায়িত্ব দিয়ে সাহায্য-সৈন্যসহ সিরিয়ায় আগমন করেন।

ইবনে আসির থেকেও দুটি বর্ণনা রয়েছে যা আত-তাবারির বর্ণনার অনুরূপ।^{৬১৫} আল-ওয়াকিদী জেরুযালেম অবরোধ, খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে পরামর্শ এবং বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক হয়েছিল বলে মনে করেন। তিনি বলেন, আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বাইতুল মাকদিসে পঁয়ত্রিশ হাজার মুজাহিদ সাত জন সেনাপতির নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। প্রত্যেক সেনাপতির অধীনে পাঁচ হাজার সৈন্য ছিল। তারা হলেন খালিদ

^{৬১৩} প্রাগুক্ত।

^{৬১৪} প্রাগুক্ত, ৪/৪৩৪।

^{৬১৫} হুসবুর কুদসি ফিত তারিখিল ইসলামি ওয়াল আরাবি, পৃ. ৪০।

ইবনে ওয়ালিদ, ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান, শুরাহবিল ইবনে হাসানা, আল-মিরকাল কাইস ইবনে হুবাইরা আল-মুরাদি এবং উরওয়া ইবনে আল-মুহাল্লাল ইবনে ইয়াজিদ। তিনি তাদের পরপর সাত দিন ধরে প্রেরণ করেন; প্রতিদিন একজন সেনাপতি। এর কয়েকদিন পর যুদ্ধ হয়ে গেলে তিনি নিজে গিয়ে যোগ দেন।^{৬১৬}

আল-ওয়াকিদি আরও অগ্রসর হয়ে বলেন, ইলিয়ার জনগণ আবু উবাইদার নিকট এসে তাকে শান্তিপূর্ণভাবে শহরের প্রবেশের অনুরোধ করে। তবে তারা একটি শর্তারোপ করে যে, শান্তিচুক্তি অবশ্যই মুসলমানদের খলীফা কর্তৃক সম্পাদিত হতে হবে। তারপর তিনি আত-তাবারি ও ইবনে কাসিরের অনুরূপ বর্ণনা করেন। অতিরিক্ত তিনি এ কথা বলেন, আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফাকে বিস্তারিত জানিয়ে চিঠি প্রেরণ করেন।

খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বাইতুল মাকদিসে আগমন করেন এবং শহরের দেয়ালের পাশে তাঁর গাড়েন। শহরের পুরোহিত তার সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং বলে, ‘আল্লাহর কসম, আমাদের কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী আপনিই সেই ব্যক্তি, যার হাতে আমাদের ভূমি বিজিত হবে।’^{৬১৭} তারপর পুরোহিত তার লোকজনের কাছে ফিরে গিয়ে ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করে। তখন লোকজন—যারা অবরোধের কারণে দুর্বিসহ জীবন যাপন করছিল—বের হয়ে আসে এবং গেইট খুলে দেয়। তারা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এসে শান্তিচুক্তি ও নিরাপত্তার আহ্বান জানায় এবং জিযিয়া কর দিতে সম্মত হয়।^{৬১৮}

তবে আমরা আল-ওয়াকিদির এই বর্ণনা সঠিক বলে মনে করি না। কারণ, আমরা বিশ্বাস করি আমরা ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই জেরুযালেম অবরোধ করেছিলেন। আর তখন তার সহযোগী মুসলিম কমান্ডাররা ইয়ারমুক যুদ্ধের পরে দামেস্ক, ফিহলসহ সিরিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে বিজয়ের অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ

^{৬১৬} ফুতুহুশ শাম, ১/২১৩-২১৬।

^{৬১৭} প্রাগুক্ত, ১/২২৫।

^{৬১৮} হুরুরু কুদসি ফিত তারিখিল ইসলামি ওয়াল আরাবি, ড. ইয়াসীন সুওয়াইদ, পৃ. ৪০।

ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সঙ্গে নিয়ে হিমস, হামা, কিন্নাসরীন ও আলেপ্পো বিজয় করেন। তারপর তারা সিরিয়ার উপকূলীয় এলাকার দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে আন্তাকিয়া, লাটাকিয়া এবং আরকাহ বিজয় করেন। ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান বৈরুত থেকে সিদন এবং উত্তরে আসকালান থেকে টাইরি পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন।^{৬১৯}

কিন্তু আল-বালায়ুরির বর্ণনামতে, রাফাহ বিজয়ের পর আমর ইবনুল আস জেরুযালেম অবরোধ করেন। আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু কিন্নাসরীন ও আশপাশের এলাকা বিজয়ের পর তার সঙ্গে যোগ দেন। ঘটনাটি ঘটে ১৬ হিজরীতে। আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই ইলিয়া অবরোধ করে রাখেন এবং ইলিয়াই বাইতুল মাকদিসের শহর (জেরুযালেম)।^{৬২০} ইলিয়ার অধিবাসীরা আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট নিরাপত্তা ও সিরিয়ার অন্যান্য শহরের ন্যায় শান্তিচুক্তির আবেদন করে। তবে তারা চুক্তিটি স্বয়ং মুসলিম জাহানের খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সম্পন্ন হতে হবে বলে শর্তারোপ করে। আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু আমীরুল মুমিনীন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বিষয়টি অবহিত করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ উপলক্ষ্যে সিরিয়ায় প্রবেশ করেন এবং দামেস্কের নিকটে জাবিয়া নামক স্থানে তাঁর গাড়েন। তারপর সেখান থেকে ইলিয়া গমন করেন এবং ইলিয়াবাসীদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পন্ন করেন। ইলিয়া বিজয় সাধিত হয় ১৭ হিজরীতে। আল-বালায়ুরি এ বিষয়ে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।^{৬২১}

তবে আমরা প্রথম বর্ণনাটি অধিক সত্য বলে বিশ্বাস করি, যা আত-তাবারি উল্লেখ করেছেন। এই বর্ণনানুসারে জেরুযালেম আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই অবরোধ করেছিলেন, আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু নয়। আমরা মনে করি, এটা হওয়া অসম্ভব নয় যে, আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফার সঙ্গে দেখা করার জন্য জাবিয়ায় আগমন করেছিলেন এবং সেখানে তিনি জেরুযালেম বিজয়ের ব্যাপারে পরামর্শ

^{৬১৯} প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

^{৬২০} ফুতুহুল বুলদান, ১/১৮৮-১৮৯।

^{৬২১} প্রাগুক্ত, ১/১৮৯।

করেন। কারণ, তিনি পুরো সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। আমরা এটিও জানি যে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জাবিয়ায় পদার্পণের পর ইয়াজিদ সর্বপ্রথম তার সঙ্গে দেখা করেন। তারপর আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফার সাক্ষাতে আসেন এবং সিরিয়ায় যুদ্ধরত সকল কমান্ডারদের পরামর্শের জন্য ডেকে পাঠান।^{৬২২} চুক্তি-স্বাক্ষর ও শহর হস্তান্তরের সময় ইয়াজিদ, শুরাহবিলসহ অন্যান্য কমান্ডারের সঙ্গে আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুও হাজির ছিলেন। অবশ্য শান্তিচুক্তিতে সাক্ষী হিসাবে আবু উবাইদার নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল না^{৬২৩} যেমনটি ছিল আমর ইবনুল আস, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান এবং খালিদ ইবনে ওয়ালিদ। চুক্তির বক্তব্যে এদিকেই ইশারা রয়েছে। সুতরাং আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বাইতুল মাকদিস অবরোধকারী নন; বরং আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই সেটি অবরোধ করেছিলেন।^{৬২৪}

১.৭.৪। চুক্তির বক্তব্য

আত-তাবারির বর্ণনামতে চুক্তির বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ :

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দা, আমীরুল মুমিনীন উমর ইলিয়ার অধিবাসীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছে : তিনি তাদের জান-মাল, চার্চ, ক্রুশ, শহরের সুস্থ-অসুস্থ এবং অন্যান্য সকল ধর্মীয় কৃষ্টি-কালচারের নিরাপত্তা দিয়েছেন। তাদের চার্চকে বাড়ি বানানো যাবে না, ধ্বংসও করা যাবে না। তাদের ও তাদের চারিপার্শ্বের কোনো কিছুই ক্ষতিসাধন করা যাবে না। তাদের ক্রুশ অথবা তাদের সম্পদের কোনো কিছুই ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না। তাদের ধর্মের জন্য অপমান করা যাবে না এবং জোর করে ধর্মান্তরিত করা যাবে না। ইলিয়ায় কোনো ইহুদী বসবাস করতে পারবে না।

ইলিয়ার অধিবাসীদের অন্যান্য শহরের নাগরিকদের মতোই জিযিয়া (কর) প্রদান করতে হবে। তাদের অবশ্যই বাইজেন্টাইন

^{৬২২} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪৩১-৪৩৬।

^{৬২৩} হুরুবুর কুদসি ফিত তারিখিল ইসলামি ওয়াল আরাবি, পৃ. ৪১।

^{৬২৪} প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

ও সন্ত্রাসীদের বিতাড়িত করতে হবে। যারা ইলিয়া ছেড়ে যাবে, তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত জান-মালের নিরাপত্তা দেওয়া হবে। আর যারা ইলিয়ায় থাকতে ইচ্ছুক, তাদের অবশ্যই অন্যান্য নাগরিকদের মতো জিযিয়া দিতে হবে।

ইলিয়াবাসীদের কেউ যদি বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে শহর ছেড়ে চলে যেতে চায় এবং তাদের মালামাল সাথে নিতে চায়, তাহলে তারা এবং তাদের জান-মাল, চার্চ ও ক্রুশ নিরাপদ স্থানে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত নিরাপত্তা পাবে। গ্রামাঞ্চলের লোকেরা ইচ্ছে করলে ইলিয়া শহরে এসে বসবাস করতে পারবে, তবে তাদের অবশ্যই ইলিয়ার নাগরিকদের মতো জিযিয়া দিতে হবে। যে কেউ চাইলে বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে ফিরে যেতে পারবে অথবা তাদের মূল ভূখণ্ডেও ফিরে যেতে পারবে। সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত কারও নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করা হবে না।

মহান আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী খলীফা এবং মুমিনগণ এই চুক্তি মেনে চলবে যতদিন এখানকার লোকজন জিযিয়া প্রদান করবে। এই চুক্তিনামার সাক্ষীগণ হচ্ছেন আমর ইবনুল আস, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ এবং মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান।^{৬২৫}

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাসমূহ

ওয়াসিলা ইবনে আসকার আত্মোৎসর্গকারী আচরণ

ওয়াসিলা বলেন : দামেস্ক শহরের জাবিয়া নামক একটি গেইটে আমি খুব গণ্ডগোল শুনতে পেলাম। আমি অপেক্ষা করলাম। তারপর সেখানে একটি বিরাট অশ্বারোহী বাহিনীকে দেখলাম। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তাকবীর-ধ্বনি দিয়ে তাদের নিকট ছুটে গেলাম। তারা ভাবল মুসলমানরা তাদের ঘিরে ফেলেছে। এ জন্য তারা তাদের নেতাকে ত্যাগ করে শহরের দিকে পিছু হটল। আমি দ্রুত তার দিকে বর্শা ছুড়ে মারলাম এবং তাকে

ঘোড়া থেকে ফেলে দিলাম। তারপর তার ঘোড়ায় আরোহণ করে লাগাম হাতে নিয়ে ছুটতে লাগলাম। শত্রুরা যখন দেখল আমি একা, তখন তারা আমার পিছু নিল। আমার নিকটে চলে আসা একজনকে বর্শা দিয়ে হত্যা করলাম। তারপর আরেকজন এগিয়ে এলে তাকেও হত্যা করে ফেললাম। পরে আমি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এসে ঘটনার বৃত্তান্ত জানালাম। তখন দেখি বাইজেন্টাইনদের এক দলনেতা তার নিকট দামেস্কবাসীদের জন্য নিরাপত্তার অনুরোধ করছে।^{৬২৬}

**ফিহল যুদ্ধের আগে বাইজেন্টাইনদের নিকট মুআয ইবনে জাবাল রা.-
এর মধ্যস্থতা**

ফিহলে মুসলিম ও বাইজেন্টাইন বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে সংঘর্ষ চলাকালীন বাইজেন্টাইনদের সেনাপতি মুসলমানদের নিকট একজন দূত পাঠানোর অনুরোধ করে : ‘তাহলে আমরা তার নিকট থেকে মুসলমানদের দাবি-দাওয়া জানতে পারব এবং একই সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার কথাও ব্যক্ত করতে পারব।’ আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু এ লক্ষ্যে মুআয ইবনে জাবাল আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দূত হিসাবে প্রেরণ করেন যাতে তিনি মুসলমানদের পক্ষে মধ্যস্থতা করতে পারেন। বাইজেন্টাইনরা তাকে বরণ করে নিতে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়। তারা তাদের চমৎকার অলংকারাদি ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র বের করে। সবচেয়ে চাকচিক্যময় ও দামি কার্পেটে বৈঠকখানা সজ্জিত করে। বিলাসী আসনের ব্যবস্থা করে। তারা মুআযকে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত, অথবা ভীত বা মানসিকভাবে দমিয়ে ফেলার পরিকল্পনা করে। কিন্তু মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের অবাক করে দিলেন। তিনি তাদের সকল আড়ম্বরপূর্ণ ও প্রলুব্ধকারী আপ্যায়ন পরিত্যাগ করেন। তিনি বিনয়ের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। বস্তুত তিনি পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেন এবং এটিকে বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন। তিনি ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখেন এবং তা বাইজেন্টাইন সৈনিকের কাছে হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বাইজেন্টাইনদের জাঁকজমকপূর্ণ আসনে বসতেও রাজি হননি এবং বলেন, ‘আমি এমন আসনে বসি না যা দরিদ্র লোকদের বঞ্চিত করে তৈরি করা হয়েছে।’ বরং তিনি মাটিতে বসে পড়েন এং

^{৬২৬} সিয়রু আলামিন নুবালা, ৩/৩৮৬-৩৮৭; আত-তারিখুল ইসলামি, ১০/৩১৯।

বলেন, ‘আমি আল্লাহর একজন দাস এবং আমি আল্লাহর জমিনে বসতেই পছন্দ করি। আমি আমাদের ভাইদের বঞ্চিত করে আল্লাহর কোনো নেয়ামত একা ভোগ করব না।’^{৬২৭}

তাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হলো। তারা তার নিকট ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি তা বলেন। তারা তাকে আল্লাহর নবী ঈসা আ. সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তখন তিনি কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করেন :

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতো, তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে বললেন, ‘হও’, ফলে সে হয়ে গেল।^{৬২৮}

তিনি তাদের নিকট মুসলমানদের দাবি বিস্তারিত তুলে ধরেন এবং এই আয়াত তিলাওয়াত করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٦٠﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখো, আল্লাহ মুতাকীদের সাথে আছেন।^{৬২৯}

তারা পার্সিয়ানদের ওপর মুসলমানদের বিজয়ের কারণ হিসাবে তাদের রাজার মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘আমাদের সম্রাট দুনিয়ার সকল সম্রাটদের সম্রাট এবং তার সৈন্যসংখ্যা অগণিত।’ তিনি তাদের বলেন, ‘তোমাদের রাজা হিরাক্লিয়াস। কিন্তু আমাদের রাজা আল্লাহ। আর আমাদের সেনাপতি আমাদের মতোই একজন। যদি তিনি আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিধান অনুযায়ী আমাদের শাসন

^{৬২৭} আল-ইকতিফা, আল-কালানি, ৩/১৯৪।

^{৬২৮} সূরা আল-ইমরান, ৩ : ৫৯।

^{৬২৯} সূরা আত-তাওবা, ৯ : ১২৩।

করেন, তাহলে আমরা তাকে অনুসরণ করব। নতুবা আমরা তাকে পরিত্যাগ করব। তিনি নিজেকে আমাদের থেকে আলাদা মনে করেন না। তিনি অহংকারী নন এবং আমাদের সঙ্গে বড়ত্বের আচরণও করেন না।^{৬৩০} আর অগণিত সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে তিনি নিচের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবিলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল, আল্লাহ তাদের সঙ্গে রয়েছেন।^{৬৩১}

বাইজেন্টাইনরা জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন করেও মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রলুব্ধ করতে ব্যর্থ হয়। তখন তারা বাস্তবে ফিরে আসে এবং তার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করে এই শর্তে যে, তারা বালকা ও এর পাশ্ববর্তী এলাকা মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দেবে। মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু এর জবাবে জানান, তিনি মুসলমানদের সেনাপতি নন এবং তাদের জন্য ইসলাম গ্রহণ অথবা জিযিয়া প্রদান বা যুদ্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এতে বাইজেন্টাইনরা খ্যাপে যায় এবং বলে, ‘যাও, তুমি তোমার সাথীদের নিকট ফিরে যাও। শীঘ্রই আমরা তোমাদের শেকল দিয়ে বন্দী করব।’ মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘কক্ষনো না। আল্লাহর কসম, আমাদের সকলকে হত্যা করা ছাড়া তোমরা এ কাজ কখনো করতে সক্ষম হবে না, আর নতুবা আমরা তোমাদের অপদস্থ করে ছাড়ব।’ তারপর তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করেন।^{৬৩২}

এই মধ্যস্থতা করার কাজে মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়; যেভাবে তিনি লোকজনকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন ও অপর পক্ষের যুক্তি খণ্ডন করেছেন, তাদের ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন ও তাদের দুর্বলদের প্রতি শাসকদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের বিবরণ দিয়েছেন, তাদের ধর্মের শিক্ষা তুলে ধরেছেন এবং সর্বোপরি তাদের ইসলামের দিকে ডেকেছেন।

^{৬৩০} আল-ইকতিফা, আল-কালানি, ৩/১৯৪।

^{৬৩১} সূরা আল-বাকারা, ২ : ২৪৯।

^{৬৩২} প্রাপ্ত।

বাড়াবাড়ি ও মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ে তাদের পদক্ষেপের বিপরীতে তিরি বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন এবং এতে তার মধ্যে কোনো বাড়াবাড়ি কিংবা ভীতি কাজ করেনি। তারপর তিনি নিজের নেতার কাছে ফিরে এসেছেন এবং তাকে সবিস্তারে সবকিছু জানিয়েছেন, যার কোনোকিছুই অগ্রহণযোগ্য ছিল না।^{৬৩৩} মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের পূর্বে শত্রুবাহিনীকে সব সময় ইসলামের দাওয়াত দিতেন।

কায়সারিয়া বিজয়ে উবাদা ইবনে আস-সামিতের বীরত্ব

কায়সারিয়া অবরোধের সময় উবাদা ইবনে সামিত ডান বাহুতে যুদ্ধরত ছিলেন। তিনি তার অধীন সৈন্যদের গোনাহ করার ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। তারপর তিনি বাইজেন্টাইনদের ওপর একটি আক্রমণ পরিচালনা করেন। তাতে অনেক শত্রু নিহত হলেও তিনি তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারেননি। তিনি যেখান থেকে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন, আবার সেখানে ফিরে যান এবং সৈন্যদের যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। তিনি তাদের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ার ব্যাপারে তার বেদনার কথাও জানান। তিনি বলেন : হে মুসলমানগণ, আমি খুব ছোট বয়সেই ইসলামে প্রবেশ করেছি এবং দীর্ঘ হায়াত লাভ করেছি। এই শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করা পর্যন্ত আল্লাহ আমার হায়াত নির্ধারিত করে রেখেছেন...ওই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি মুসলিম বাহিনী নিয়ে যত শত্রুবাহিনীর ওপর আক্রমণ পরিচালনা করেছি, তাতে শত্রুরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছে এবং আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করেছেন। এখন তোমাদের কী হলো, তোমরা এই শত্রুদের ওপর আক্রমণ করলে, অথচ তারা পলায়ন করেনি?’^{৬৩৪} তারপর তিনি তাদের কাছে নিজের আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করে বললেন, ‘আল্লাহর কসম, আমি দুটি জিনিসের আশঙ্কা করছি; তোমরা হয়তো গনীমতের মাল চুরি করেছ অথবা তোমরা শত্রুদের ওপর আক্রমণ করার সময় সত্যনিষ্ঠ ছিলে না।’^{৬৩৫} তিনি তাদের সত্যিকার অর্থে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করতে বললেন। আরও বললেন, তিনি সর্বাত্মক অবস্থান করবেন এবং কখনো আর পিছপা হবেন না, যতক্ষণ না আল্লাহ

^{৬৩৩} আল-আনসার ফিল আসরির রাশিদি, পৃ. ২০৭।

^{৬৩৪} প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯।

^{৬৩৫} প্রাগুক্ত।

তাদের বিজয় দান করেন অথবা শাহাদাত নসীব করেন।^{৬৩৬} যখন তারা বাইজেন্টাইনদের মুখোমুখি হলো, তখন উবাইদা ঘোড়া থেকে নেমে পদব্রজে শত্রুর দিকে এগিয়ে গেলেন। উমাইর ইবনে সাদ আল-আনসারি এই দৃশ্য দেখে সঙ্গীদের সেনাপতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বললেন। তারপর এমন ভয়াবহ আক্রমণ পরিচালনা করলেন, যাতে বাইজেন্টাইনরা পলায়ন করতে বাধ্য হলো।^{৬৩৭}

মারয আস-সুফর যুদ্ধে উম্মে হাকিম বিনতে আল-হারিস ইবনে হিশামের বীরত্ব

উম্মে হাকিম বিনতে আল-হারিস ইবনে হিশাম ছিলেন ইকরিমা ইবনে আবি জাহেলের স্ত্রী। ইকরিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ায় এক যুদ্ধে শহীদ হন। উম্মে হাকিমের ইদতকাল পার হওয়ার পর ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু ইতিপূর্বে খালিদ ইবনে সাঈদও তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি খালিদ ইবনে সাঈদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। খালিদ ইবনে সাঈদ আজনাদাইন, ফিলহ ও মারয আস-সুফর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যখন মুসলিম বাহিনী মারয আস-সুফরে তাঁবু গাড়েন, তখন খালিদ ইবনে সাঈদ তার বাসর রাত উদ্যাপন করতে আগ্রহী হন। উম্মে হাকিম বলেন, ‘আপনি যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছেন না কেন?’ খালিদ বললেন, ‘আমার মনে হয়, আমি এই যুদ্ধে শহীদ হব।’ উম্মে হাকিম বললেন, ‘তাহলে ঠিক আছে।’ সুতরাং তারা আস-সুফরের সেতুর ওপর বাসর রাত উদ্যাপন করেন। তখন থেকে সেতুটির নাম হয়ে যায় উম্মে হাকিম সেতু। খালিদ ওলীমার আয়োজন করেন এবং সকলকে দাওয়াত দেন। খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ হতেই বাইজেন্টাইনরা যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। খালিদ ইবনে সাঈদ দ্বৈত লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে যান এবং তিনি শহীদ হয়ে যান। উম্মে হাকিম তার পোশাক ঠিক-ঠাক করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তার শরীর থেকে বিয়ের সুগন্ধী তখনো সুবাস ছড়াচ্ছিল। উভয়পক্ষে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়। নদীর তীর ঘেঁষে যুদ্ধ তীব্রতর হতে থাকে। উভয়পক্ষই চরম ধৈর্যের পরিচয় দেয়। তরবারির ঝংকারে

^{৬৩৬} প্রাগুক্ত।

^{৬৩৭} প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯।

মুখোরিত হতে থাকে চারিদিক। ওই রাতে তাঁবুর খুঁটি দিয়ে উন্মে হাকিম সাত জনকে হত্যা করেন, খুঁটিটি ছিল সেই তাঁবুর, যে তাঁবুতে তিনি তার বাসর উদ্‌যাপন করেছিলেন।^{৬৩৮}

বাইজেন্টাইন সম্রাটের সিরিয়া ত্যাগ

১৫ হিজরীতে (মতান্তরে ১৬ হি.)^{৬৩৯} হিরাক্লিয়াস সৈন্য-সামন্তসহ পালিয়ে সিরিয়া থেকে বাইজান্টিয়ামে^{৬৪০} গিয়ে আশ্রয় নেন।^{৬৪১} প্রতিবারই যখন তিনি জেরুযালেমে ধর্মীয় উৎসবে আসতেন, তখনই বলতেন, ‘হে সিরিয়া, বিদায়! আমি তোমাকে বিদায় জানাচ্ছি। তবে আমি তোমাতে এখনো পরিতৃপ্ত নই এবং আমি আবার ফিরে আসব।’ অবশেষে তিনি সিরিয়া থেকে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি আর-রুহা এলাকায় পৌঁছে সেখানকার লোকজনকে তার সঙ্গী হওয়ার আহ্বান জানালেন। তার বলল, ‘আমরা যদি এখানে থাকি, তাহলে সেটি আপনার জন্য ভালো হবে।’ সুতরাং তিনি তাদের ছেড়ে গেলেন। তারপর তিনি শিমসাতে পৌঁছলেন। সেখানে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে জেরুযালেমের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘বিদায় হে সিরিয়া, আমাদের আর হয়তো দেখা হবে না।’^{৬৪২} তারপর হিরাক্লিয়াস কন্সটান্টিনোপলে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। তিনি মুসলমানদের হাতে বন্দী ছিল এমন একজনকে মুসলমানকে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। সে বলল, ‘আমি আপনাকে এমনভাবে তাদের বর্ণনা দেব যেন আপনি স্বচক্ষে তাদের দেখতে পান। তারা দিনে বীর যোদ্ধা এবং রাতে সাধক। তারা কারও নিকট থেকে কোনো কিছুই অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেয় না। তারা সালাম না দিয়ে কোনো ঘরে প্রবেশ করে না। তাদের সঙ্গে যারা লড়াই করতে আসে, তাদের তারা সমূলে ধ্বংস করে ছাড়েন।’ হিরাক্লিয়াস বললেন, ‘যদি তুমি সত্য বলে থাকো, তাহলে তারা শীঘ্রই আমার পায়ের নিচের মাটিও দখল করে নেবে।’^{৬৪৩}

^{৬৩৮} আল-ইসতিয়াব, ৪/৪৮৬।

^{৬৩৯} তারতিব ওয়া তাহযিব আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃ. ৬৬।

^{৬৪০} অনেকের মতে রোমান সম্রাট প্রথম কন্সট্যান্টাইন (রাজত্বকাল: ৩০৬ - ৩৩৭ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন প্রথম বাইজেন্টাইন সম্রাট। সম্রাট কন্সট্যান্টিনই ৩৩০ খ্রিস্টাব্দে রোম থেকে তার রাজধানী বাইজান্টিয়ামে সরিয়ে আনেন এবং এই শহরকে কন্সটান্টিনোপল নামে পুনর্গঠিত করেন যাকে অনেকেই নতুন রোম নামে অভিহিত করে থাকেন। (অনুবাদক)

^{৬৪১} তারখি আত-তাবারি, ৪/৪২৮।

^{৬৪২} প্রাগুক্ত, ৪/৪২৯।

^{৬৪৩} প্রাগুক্ত।

আল্লাহ আপনাদের ইসলামের কারণে সম্মানিত করেছেন

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ায় একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে প্রবেশ করেন। এ-সময় গাধার একদিকে তার পা মাটিতে হেঁচড়াচ্ছিল। আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, ‘হে আমীরুল মুমিনীন, এখনই শহরের নেতৃস্থানীয় লোকেরা সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাতে আসবে।’ এ কথায় আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইশারা ছিল খলীফা যেন একটু পরিপাটি হয়ে গাধার পিঠে বসেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহ আপনাদের ইসলামের কারণে সম্মানিত করেছেন। এর বাইরে অন্য কোথাও যদি আপনি সম্মান খুঁজতে চান, তাহলে লাঞ্ছিত হবেন।’^{৬৪৪}

জাবিয়ায় উমর রা.-এর ভাষণ

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জাবিয়াতে একটি দীর্ঘ, গুরুত্বপূর্ণ ও সুন্দর ভাষণ দেন। তিনি বলেন : আমি আজ এখন যেভাবে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও একবার এমনভাবে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আমার সাহাবীদের সঙ্গে ভালো আচরণ করবে। তারপর যারা আসবে এবং তাদের পরে যারা আসবে, তাদের সঙ্গেও সদাচরণ করবে। তারপর এমন লোকদের আবির্ভাব হবে, যারা বলার আগেই কসম খাবে এবং চাওয়ার আগেই সাক্ষী দেবে। সুতরাং যে ব্যক্তি জান্নাতের পথ পেতে চায়, সে যেন দলবদ্ধ থাকে। কারণ, কেউ একা থাকলে শয়তান তাকে যতটুকু বিভ্রান্ত করতে পারে দুজন থাকলে ততটুকু করতে পারে না। কোনো পুরুষ যদি কোনো মহিলার সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ করে, সেখানে তৃতীয় জন হিসাবে শয়তান থাকে। যার সৎকাজ তাকে খুশি করে এবং অসৎ কাজ তাকে অসন্তুষ্ট করে, সে ঈমানদার ও মুমিন।’^{৬৪৫}

^{৬৪৪} মাহযুস সাওয়াব, ২/৫৯০; এর সনদ সহীহ।

^{৬৪৫} মুসনাদ, আহমাদ ইবনে হাম্বল, হাদীস নং ১৭৭।

হে আবু ওবাইদা, দুনিয়া আমাদের সকলকে বদলে দিয়েছে, কিন্তু আপনাকে পারেনি

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়া এসে আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘চলুন আপনার বাড়িতে যাই।’ তিনি বললেন, ‘আমার বাড়িতে গিয়ে আপনি কী করবেন? আমার জন্য কাঁদা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না আপনার।’ তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে কিছুই দেখতে পেলেন না। তিনি বললেন, ‘আপনার আসবাবপত্র কোথায়? আমি তো কেবল একটি উটের রশি, একটি বাসন এবং একটি পানির পাত্র ছাড়া আর কিছুই দেখছি না। অথচ আপনি একজন গভর্নর! আপনার নিকট কি কোনো খাবার আছে?’ আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি ঝুড়ি থেকে কিছু শুকনো রুটি বের করলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, ‘হে আমীরুল মুনিীন, আমি বলেছিলাম, আমার জন্য আপনাকে কাঁদতে হবে। গন্তব্যে পৌঁছার জন্য এটুকুই যথেষ্ট।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হে আবু ওবাইদা, দুনিয়া আমাদের সকলকে বদলে দিয়েছে, কিন্তু আপনাকে পারেনি।’^{৬৪৬} আয-যাহাবি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, ‘আল্লাহর কসম, এটিই সত্যিকার বৈরাগ্য; এটি এমন কোনো ব্যক্তির বৈরাগ্য নয়, যে সম্পূর্ণভাবে অসহায়।’^{৬৪৭}

হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে এ বর্ণনায় পাওয়া যায়, তার পিতা বলেন, ‘উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়া এসে তার সেনাপতি ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করেন, ‘আমার ভাই কোথায়?’, তারা বলল, ‘কে?’ তিনি বললেন, ‘আবু উবাইদা ইবনুল জাররা।’ তারা বলল, ‘তিনি এখনই আসছেন।’ আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু উটে সওয়ার হয়ে এলেন এবং সালাম বিনিময় করলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকদের বললেন, ‘আমাদের একটু একা থাকতে দাও।’ তারপর তিনি আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে গেলেন এবং তার সঙ্গে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। তিনি তখন তার ঘরে একটি তরবারি, বর্ম এবং উটের হাওদা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি।^{৬৪৮}

^{৬৪৬} সিয়রু আলামিন নুবালা, ১/১৭।

^{৬৪৭} প্রাগুক্ত, ১/১৭।

^{৬৪৮} মাহযুস সাওয়াব, ২/৫৮৯-৫৯০; এর সনদ উরওয়া পর্যন্ত সহীহ।

জেরুযালেমের অধিবাসীদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তির ব্যাপারে মন্তব্য

জেরুযালেমের অধিবাসীদের সঙ্গে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যে সন্ধিচুক্তি করেন, তা থেকে এটি স্পষ্ট যে, ইসলাম একটি চরম সহনীয় ধর্ম এবং এখানে কোনো জোরজবস্তি নেই। এ চুক্তির মাধ্যমে মুসলমানগণ খ্রিস্টানদের সঙ্গে এমন সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করেন তা তাদের ধারণায়ও ছিল না। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যিনি ছিলেন বিজয়ী দলের অধিপতি, চাইলেই তাদের ওপর যা ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে পারতেন এবং তাদের তা মেনে চলতে বাধ্য করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ, তিনি ছিলেন ইসলামের মূর্ত প্রতীক। আর ইসলাম কাউকে জোর করে দীন গ্রহণে বাধ্য করে না এবং কারও নিকট থেকে তা গ্রহণও করে না, যতক্ষণ-না সে স্বেচ্ছায় ঈমান আনে ও আল্লাহর নিকট নিজেকে সোপর্দ করে। ঈমান জোরজবরদস্তির জিনিস নয়। এটি অন্তরের বিষয়। আর আল্লাহ ছাড়া কেউ কারও অন্তরের খবর জানে না। একজন মানুষকে বাহ্যিকভাবে ঈমানদার মনে হতে পারে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে সে হয়তো তা নয়। এ ধরনের মানুষ মুসলমানদের জন্য প্রকাশ্য মুশরিক ও কাফের থেকে আরও বেশি ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে। এ জন্য ইসলাম মানুষকে তার নিজস্ব ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীনতা দেয় এবং সে যা পছন্দ করে, তাতে পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়। ফলে একজন বিধর্মীও ইসলামী রাজ্যে জিযিয়া (কর) প্রদান করে সাধারণ নাগরিক হিসাবে বসবাস করতে পারে এবং এর বিনিময়ে সে তার জ্ঞান-মালের নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। এ রকম শান্তিপূর্ণ বসবাস ও ন্যায়পরায়ণ শাসন ও নিরাপত্তার বেষ্টনীতে থেকে বিধর্মীরা ইসলামের সৌন্দর্য, সহনশীলতা, স্বচ্ছতা ও সদাচরণ অবলোকন করার সুযোগ পায়। আর এতে তাদের অন্তরে সত্য প্রতিভাত হতে থাকে, যা থেকে তারা যোজন যোজন দূরে ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে তারা হয়তো দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে—যা মুসলমানদের বিজিত ভূখণ্ডসমূহে বাস্তব রূপ লাভ করে।^{৬৪৯}

আল-আকসা মসজিদে উমর রা.-এর নামায

আবু সালমান বলেন : আবু সিনান আমাকে বলেন, উবাইদ ইবনে আদম বলেন : আমি শুনেছি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কাব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন, বলুন তো আমি কোন স্থানে নামায পড়ব? কাব রাযিয়াল্লাহু

^{৬৪৯} জাওলাতুন ফি আসরিল খুলাইফাইর রাশিদিন, মুহাম্মাদ সাইয়িদ ওয়াকিল, পৃ. ২০০-২০১।

আনহু বললেন, ‘আপনি যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করেন, তবে সাখরার পেছনে নামায পড়ুন। তাহলে পুরো বাইতুল মাকদিস আপনার সম্মুখে থাকবে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘ইয়াহুদী ধর্মের তো অবসান হয়েছে, না—আমি বরং সেখানেই নামায পড়ব, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে নামায পড়েছেন।’ তারপর তিনি বাইতুল মাকদিসের মধ্যে কিবলার দিকে অর্থাৎ সামনের দিকে অগ্রসর হলেন এবং সেখানে নামায পড়লেন। তারপর তার চাদর বিছিয়ে সাখরা থেকে ময়লা-আবর্জনা সরিয়ে নিতে লাগলেন। লোকজনও তা পরিষ্কার করতে লেগে গেল।^{৬৫০}

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন : মসজিদ আল-আকসা বলতে পুরো মসজিদকেই বোঝায়। কিছু মানুষ কেবল নামাযের জায়গাটুকুকে আল-আকসা মনে করে, যা মসজিদের সম্মুখভাগে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নির্মাণ করেছিলেন। এই স্থানে নামায পড়া অন্যান্য স্থান থেকে উত্তম। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন জেরুযালেম বিজয় করেন, তখন সেখানে ময়লার ডিপো ছিল। কারণ, খ্রিস্টানরা ওই জায়গাকে খুব অসম্মানের চোখে দেখত; কারণ, ইহুদীরা ওইদিকে ফিরে নামায পড়ত। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ওই স্থানের সব ময়লা-আবর্জনা সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেন এবং কাব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, ‘কোথায় মুসলমানদের জন্য নামাযের জায়গা বানানো উচিত বলে আপনি মনে করেন?’ তিনি তখন বলেন, ‘বিশেষ পাথর বা সাখরার পেছনে।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘হে ইহুদী মায়ের সন্তান, আপনি তো ইহুদীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গেলেন! বরং আমি সম্মুখভাগে মসজিদ নির্মাণ করব। সেই মসজিদ হবে আমাদের।’^{৬৫১}

এ ঘটনা থেকে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আরেকটি মহান চরিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি প্রমাণ করেছেন, ইসলাম সকল ঐশী ধর্মকে এবং তাদের পবিত্র স্থানসমূহকে একই ভাবে সম্মানিত মনে করে। এই বিশেষ পাথর (সাখরা)—যার ওপর থেকে ময়লা-আবর্জনা তিনি নিজ হাতে পরিষ্কার করেন এবং নিজের চাদরে সেগুলো বহন করে অপসারণ

^{৬৫০} আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/৫৭; এর সনদ যাব্বিদ।

^{৬৫১} মাজমুআতুর রাসাইলিল কুবরা, ২/৫৭-৫৮।

করেন— ইহুদীদের কিবলা ছিল। আর তাদের নিকট পাথরের এই সম্মানের কারণ হলো, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী এখানে দাঁড়িয়েই মুসা আ. আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। একই ভাবে তিনি খ্রিস্টানদের সঙ্গেও উত্তম আচরণ করেছেন। তিনি তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন এবং তাদের ক্রুশ ও গির্জার নিরাপত্তা দিয়েছেন। তিনি ইহুদীদের থেকেও তাদের ধর্মের অবমাননা করেননি যদিও তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম হীন ষড়যন্ত্র করেছে। তিনি তাদের পাথরের যত্ন নিয়ে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন।^{৬৫২}

হোমস পুনর্দখলে বাইজেন্টাইনদের চেষ্টা

গোয়েন্দাদের থেকে আবু উবাইদা এ তথ্য পান যে, বাইজেন্টাইনরা আবার জমা হচ্ছে। হিরাক্লিয়াস তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিয়ে তার দিকে প্রেরণ করেছেন। আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বিষয়টি নিয়ে সৈনিকদের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইলেন। তিনি তার সেনাপতি এবং মুসলমানদের প্রসিদ্ধ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে জমা করলেন।^{৬৫৩} মুআয বিন জাবাল মনে করলেন, তাদের ফিরিয়ে আনা ঠিক হবে না। তিনি বললেন, ‘আপনি কি মনে করেন, বাইজেন্টাইনরা তাদের শত্রুর যে ক্ষতি করতে চাচ্ছে, আপনি যা করতে চাচ্ছেন তা থেকে সেটি বেশি? তাদের বড় বড় সেনাপতি ও সৈন্যরা নিহত হয়েছে। এ অবস্থায় আল্লাহ আপনাকে যে ভূখণ্ডে বিজয় দান করতে চান, তা শত্রুদের দিয়ে দিতে চান? আল্লাহর কসম, আপনি যদি তা করেন, তবে সেটি হবে খুবই কঠিন সিদ্ধান্ত।’ আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তিনি খুবই যৌক্তিক কথা বলেছেন এবং তা মঙ্গলের নিয়তেই বলেছেন।’^{৬৫৪}

তবে ঘটনা ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। হিমসের লোকজন থেকে মুসলমানগণ যা কিছু গ্রহণ করেছিল, তা তাদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হাবীব ইবনে মাসরামাকে নির্দেশ দেন, ‘স্থানীয় লোকদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তির কারণে আমরা যে সম্পদ নিয়েছিলাম, তা

^{৬৫২} জাওসাতুন ফি আসরির খুলাইফাইর রাশিদিন, পৃ. ২০৩-২০৪।

^{৬৫৩} আত-তারিক ইলা দিমাশক, পৃ. ৪০৮-৪০৯।

^{৬৫৪} আল-আনসার ফিল আসরির রাশিদি, পৃ. ২০৭।

তাদের নিকট ফিরিয়ে দাও। কারণ, তাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হলে তাদের সম্পদ নেওয়ার অধিকার আমাদের নেই।’ তিনি লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘আমরাও একই চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তোমরা তা লঙ্ঘন না করলে আমরাও তা থেকে বিচ্যুত হব না। তোমাদের সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার কারণ একটিই। আর তা হলো, আমরা যেহেতু তোমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছি না, এ জন্য তোমাদের মাল ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমরা সাময়িকভাবে অন্য স্থানে যাচ্ছি। আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হলে আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হব। যদি আল্লাহ আমাদের বিজয়ী করেন, তাহলে আমরা চুক্তি বাস্তবায়ন করব যদি না তোমরা তোমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করো।’

পরদিন আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম বহিনীকে দামেস্কের দিকে অগ্রসর হতে বললেন। হাবিব ইবনে মাসলামা লোকদের ডেকে তাদের সম্পদ (জিযিয়া হিসাবে তাদের নিকট থেকে যা সংগ্রহ করা হয়েছিল) ফেরত দিয়ে দিলেন। তিনি তাদের আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু যা বলেছেন, তা শুনিয়ে দেন। তখন হিমসের লোকজন বলা শুরু করল, ‘আল্লাহ আপনাদের আবার আমাদের নিকট ফিরিয়ে আনবেন এবং আল্লাহ বাইজেন্টাইনদের ধ্বংস করে দেবেন যারা আমাদের ওপর রাজত্ব করত। আল্লাহর কসম, তারা কখনো আমাদের সম্পদ ফিরিয়ে দিত না; বরং তারা এগুলো ভোগ করত এবং আরও যা পারত, নিয়ে নিত। আমরা যেভাবে অত্যাচারিত হয়েছি, সেটি থেকে আপনাদের ন্যায়পরায়ণ শাসন আমাদের নিকট অনেক প্রিয়।’^{৬৫৫}

যে রাতে মুসলিম বাহিনী হিমস থেকে দামেস্কে রওনা হয়, সে রাতেই আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু সুফিয়ান ইবনে আওফকে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট প্রেরণ করেন। আর বলেন, ‘খলীফার নিকট গিয়ে আমার সালাম দেবে। তোমরা যা দেখেছ, গোয়েন্দারা যা বলেছে এবং শত্রুদের বিশাল সংখ্যা সম্পর্কে যা জানো, সবই তার নিকট বিস্তারিতভাবে তুলে ধরবে। আর মুসলমানগণ এ ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাও জানাবে। আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সঙ্গে একটি চিঠিও প্রেরণ করেন। সেটিতে তিনি লেখেন : বাইজেন্টাইন সম্রাট যেখানে

এখন অবস্থান করছে, সেখান থেকে আমার গোয়েন্দারা তথ্য সংগ্রহ করেছে। তারা আমাকে জানিয়েছে যে, শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে, যা তারা ইতিপূর্বে কোনো দলের বিরুদ্ধে সমবেত করেনি। আর তারা আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমি মুসলমানদের ডেকে তাদের এই তথ্য জানিয়েছি এবং আমি তাদের সঙ্গে পরামর্শও করেছি। তারা আপাতত এখান থেকে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে যতক্ষণ না আপনার পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ পাওয়া যায়। আমি এমন একজনকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছি যে এখানকার যাবতীয় খবরাখবর জানে। তাকে আপনি যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। সে আমাদের বিশ্বস্ত এবং এ বিষয়ে জ্ঞান রাখে। আমরা আল্লাহর সাহায্য চাই। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং সর্বোত্তম কার্যনির্বাহক।’^{৬৫৬}

আবু উবাইদা রা.-এর নিরাপত্তার জন্য উমর রা.-এর অবিশ্বাস্য সমর-পরিকল্পনা

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই সংবাদ অবগত হয়েই সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট চিঠি প্রেরণ করেন। তাতে লেখেন : আবু উবাইদা বিপদের সম্মুখীন। এই চিঠি পাওয়ামাত্রই কাকা ইবনে আমরের নেতৃত্বে একটি সেনাদল তার নিকট প্রেরণ করুন।’ এর বাইরে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যেক অঞ্চলে একটি অশ্বারোহী দল প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন যাতে অকস্মাৎ যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়। কুফায় জিহাদের জন্য চার হাজার ঘোড়া মজুদ ছিল। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সেগুলো ব্যবহার করে সেনাদল প্রস্তুত করে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আরও লেখেন : সুহাইল ইবনে আদিয়েকে সৈন্যসহ আল-জাযিরাহতে পাঠাবেন এবং সে যেন রাক্বা অভিযুখে অগ্রসর হয়। কারণ, জাযিরাহর লোকজন বাইজেন্টাইনদের হিমস অধিবাসীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে। আর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবানকে নাসিবিনে প্রেরণ করুন, যাতে হাররান ও আর-রাহাতে কোনো শত্রু মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে ওয়ালিদ ইবনে উকবাহকে আল-

^{৬৫৬} আ-তারিক ইলাশ শাম, পৃ. ৪১১; তারিখ আত-তাবারি, ৪/২৩, ২৫।

জাযিরাহর রাবিআ ও তুন্খ গোত্রের আরব সৈন্যসহ এবং ইয়াযকে প্রেরণ করুন। তারা সবাই ইয়ায ইবনে ঘানামের নেতৃত্বে লড়াই করবে।

চিঠি পাওয়ামাত্রই কাকা ইবনে আমর চার হাজার সৈন্য নিয়ে হিমসের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। ইয়ায ইবনে ঘানাম এবং আল-জাযিরাহর মুজাহিদরা তাদের লক্ষ্যে অগ্রসর হতে থাকে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেও আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাহায্যার্থে মদীনা থেকে হিমসের উদ্দেশে বের হয়ে পড়েন এবং আল-জাবিয়ায় গিয়ে তাঁরু গাড়েন। বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে আল-জাযিরাহর যেসব লোকজন হিমস অবরোধ করেছিল, তারা জানতে পারল যে, মুসলিম বাহিনী ইরাক থেকে যাত্রা শুরু করেছে। কিন্তু তারা নিশ্চিত ছিল না, ওই বাহিনী হিমসের দিকে আসছে নাকি তাদের নিজেদের মূল ভূখণ্ডের দিকে যাচ্ছে। সুতরাং তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। তারা নিজেদের ভূখণ্ড ও আত্মীয়-স্বজনদের রক্ষায় রণক্ষেত্র ত্যাগ করে। এভাবে তারা নিজেদের সিদ্ধান্তেই বাইজেন্টাইনদের ত্যাগ করে সম্মুখ যুদ্ধ থেকে সরে পড়ে। বাইজেন্টাইনদের পক্ষে আল-জাযিরাহর সমর্থকদের সরে পড়ার দৃশ্য দেখে আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে শত্রুদের আক্রমণ করার ব্যাপারে পরামর্শ করেন। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এতে একমত পোষণ করেন। তারপর তারা অগ্রসর হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেন এবং আল্লাহ তাদের বিজয়ী করেন। যুদ্ধের তিন দিন পর কাকা ইবনে আমর কুফা থেকে তার বাহিনীসহ রণক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হন এবং একই সময় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আল-জাবিয়ায় এসে পৌঁছেন। আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফাকে চিঠিতে যুদ্ধে বিজয়ের ব্যাপারে অবহিত করেন এবং তিন দিন পর সাহায্য-সৈন্য এসে পৌঁছাতে গনীমতের মাল বণ্টনে তার সিদ্ধান্ত জানতে চান। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে লেখেন : তাদের (সাহায্য-সৈন্যদের) গনীমতের অংশ প্রদান করুন। কারণ, তারা আপনাদের সাহায্যেই এসেছে এবং তাদের কারণেই শত্রুরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দলত্যাগ করেছে।^{৬৫৭} তিনি আরও বলেন, ‘আল্লাহ কুফার ওপর তার রহমত বর্ষণ করুন। কারণ, তারা নিজেদের ভূমির নিরাপত্তার পাশাপাশি অন্য অঞ্চলে মুসলিম বাহিনীর সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ করেছে।’^{৬৫৮}

^{৬৫৭} তারিখ আত-তারারি, ৫/২৪-২৫।

^{৬৫৮} প্রাগুক্ত, ৫/২৫।

আমরা যদি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই বিস্ময়কর সমর-পরিকল্পনাকে পর্যালোচনা করি—শত্রুকে দ্বিধাবিভক্ত করা ও বিচ্ছিন্ন করে তোলা, তাহলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অসামান্য সামরিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমানদের সাহায্যার্থে তিনি দ্রুত কুফা থেকে হিমসের দিকে সেনাবাহিনী প্রেরণের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিজেও এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে বের হন। সবকিছু বাহ্যিকভাবে স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, তিনি শত্রুদের নিজেদের এলাকায় একটি বাহিনী প্রেরণ করার নির্দেশ দেন যাতে শত্রুরা রণক্ষেত্র ত্যাগ করে নিজেদের ভূমির নিরাপত্তায় ছুটে আসে। এ পরিকল্পনা সফল হয় এবং তারা বাইজেন্টাইনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন মুসলমানদের জন্য বাইজেন্টাইনদের শেষ করে দিতে সহজ হয়।^{৬৫৯}

আল-জাযিরাহ বিজয় (মেসপটোমিয়া), ১৭ হি.

আমরা ওপরে বাইজেন্টাইন ও আল-জাযিরাহর লোকজন মিলে হিমস আক্রমণ ও আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু-সহ শহরে অবস্থানরত অন্যান্য মুসলমানদের অবরোধ করার কথা আলোচনা করেছি। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ পরিপ্রেক্ষিতে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কুফা থেকে মুসলমানদের সাহায্যে হিমসে এবং আল-জাযিরাহতে সৈন্য পাঠাতে নির্দেশ দেন। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু কাকা ইবনে আমরের নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী হিমসের উদ্দেশে এবং আরেকটি বাহিনী ইয়ায ইবনে ঘানামের নেতৃত্বে আল-জাযিরাহতে প্রেরণ করেন। সুহাইল ইবনে আদীয়্য তার বাহিনী নিয়ে ইউফ্রেটিসের পথ ধরে রাক্বা অভিমুখে রওনা হন। রাক্বায় পৌঁছে তিনি এর অধিবাসীদের অবরোধ করেন। রাক্বাবাসীরা নিজেদের দুটি মুসলিম বাহিনীর মধ্যে অসহায় অবস্থায় দেখতে পায়; ইরাক ও সিরিয়া। এ জন্য তারা মুসলমানদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পন্ন করে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা তার বাহিনী নিয়ে টাইগ্রিসের পথে নাসিবিনে পৌঁছেন। সেখানকার জনগণ তার সঙ্গে শান্তিচুক্তির প্রস্তাব দেয় এবং মুসলমানগণ তা মেনে নেন। যখন রাক্বা ও নাসিবিনের জনগণ মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়, তখন সুহাইল ও আব্দুল্লাহ তাদের বাহিনী নিয়ে ইয়াযের সঙ্গে মিলিত হন। তারপর তারা

সম্মিলিতভাবে হাররানের দিকে অগ্রসর হন। এ পথের সকল শহরেই তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। তারা হাররানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার জনগণ সন্ধিচুক্তি করার জন্য এগিয়ে আসে এবং তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জিযিয়া দিতে সম্মত হয়। এভাবে সমগ্র জাযিরাহ শান্তিপূর্ণভাবে মুসলমানদের অধীনে চলে আসে। আর এটাই ছিল সবচেয়ে সহজ বিজয়।^{৬৬০}

❖ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মিসর ও লিবিয়া বিজয়

মিসরে সামরিক অভিযান পরিচালনায় মুসলমানদের যথেষ্ট কারণ ছিল। তারা ইসলামের বাণীকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। আর ফিলিস্তিনের পরেই ছিল মিসরের অবস্থান। এ জন্য এটা খুব স্বাভাবিক যে, মুসলমানগণ ফিলিস্তিন বিজয়ের পরেই তার সংলগ্ন এলাকা মিসরের দিকে দৃষ্টি দেবেন। সিরিয়া বিজয়ের মাধ্যমে মুসলিম বাহিনী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। তাদের মধ্যে সমুদ্র-পথ ছাড়া যোগাযোগের আর কোনো মাধ্যম ছিল না। মিসর এবং উত্তর আফ্রিকায় বাইজেন্টাইন সামরিক বাহিনী ও ঘাঁটি ছিল। আর তাদের ছিল শক্তিশালী নৌবাহিনী। মিসর বাইজেন্টাইনদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় সিরিয়ায় মুসলমানগণ নিজেদের পরিপূর্ণভাবে নিরাপদ মনে করতে পারেনি। মিসর ছিল একটি ধনী দেশ, কন্সটেন্টিনোপলে খাদ্য সরবরাহের অন্যতম উৎস। মুসলমানগণ যদি মিসর বিজয় করতে সক্ষম হয়, তাহলে সিরিয়া ও হিজায়ে তারা আরও বেশি নিরাপদ অনুভব করবে। আর নতুবা বাইজেন্টাইনদের জন্য মিসর ব্যবহার করে হিজায়ে আক্রমণ পরিচালনা করা সহজ হয়ে উঠবে।^{৬৬১}

আরেকটি কারণ হলো, মিসরের আদি অধিবাসী কিবতিরা বাইজেন্টাইনদের শাসনে এক দুর্বিসহ জীবন কাটাচ্ছিল; তাদের কেবল সামরিক বাহিনীর সদস্য হিসাবে ঘাঁটি পাহারার কাজে নিয়োজিত রাখা হতো। সুতরাং এ সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক নয়, যেখানে তাদের কাছে ইতিমধ্যে মুসলমানদের ন্যায়পরায়ণতার কথা পৌঁছে গিয়েছে।^{৬৬২} আর বাইজেন্টাইন সৈন্যদের অন্তরও ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে আছে।^{৬৬৩} তারা

^{৬৬১} আসরুল খিলাফতির রাশিদা, আল-উমারি, পৃ. ৩৪৮।

^{৬৬২} দিরাসাতু ফি আহদিন নবুওয়াতি ওয়াল খিলাফতির রাশিদাহ, পৃ. ৩৫৭।

^{৬৬৩} ফুতুহুশ শাম, পৃ. ১১৮।

তাদের সশ্রুটকে দেখেছে সিরিয়া ছেড়ে পালিয়ে যেতে, যা মুসলমানদের দখলে চলে গেছে।

আমর ইবনুল আস এ সবই খুব গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হলেন। তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, মিসরবাসী মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু যদি মিসর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে না আসে, তাহলে সেটি এ অঞ্চলের জন্য হুমকি হিসাবে থেকে যাবে। এটিই আমর ইবনুল আস বর্ণনা করেছেন।^{৬৬৪} পাশাপাশি আরও অনেক বর্ণনা রয়েছে। অনেকে বলেছেন মিসর বিজয়ে সর্বপ্রথম আমর ইবনুল আস অথবা খলীফা নিজেই চিন্তা করেছিলেন। আর খলীফার সিদ্ধান্তে আমর ইবনুল আসের কোনো ভূমিকা ছিল না অথবা আমর ইবনুল আসের চাপে পড়ে খলীফা এ অভিযানে রাজি হয়েছিলেন।^{৬৬৫} এসব ভিন্নতা সত্ত্বেও মিসর অভিযান কেবল আমর ইবনুল আসের চিন্তাপ্রসূত পরিকল্পনা ছিল না, যা খলীফা অনুমোদন দেননি, অথবা মিসরের পরিপূর্ণ প্রেক্ষাপট, ভৌগোলিক চিত্র ও শত্রুসৈন্যের পরিসংখ্যান তাদের নিকট ছিল না। আমি যা বলেছি তা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। ইবনে আব্দুল হাকাম বলেন, সিরিয়া বিজয়ের পর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমর ইবনুল আসের নিকট প্রেরিত চিঠিতে লেখেন : আপনি লোকদের মিসরের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন এবং যে কেউ যেতে ইচ্ছুক, তাকে সঙ্গে নিন।^{৬৬৬} আত-তাবারি বলেন, ‘উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আলিয়ায় কিছুদিন অবস্থান করেন। তিনি সেখানকার জনগণের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করার পর শহরে প্রবেশ করেন। তারপর তিনি আমর ইবনুল আসকে মিসরে প্রেরণ করেন এবং যদি আল্লাহ তার হাতে মিসরের বিজয় দান করেন, তাহলে তাকেই সেখানকার গভর্নর হতে বলেন। তারপর তিনি যুবায়ের ইবনে আওয়ামকে সাহায্য-সৈন্যসহ তার নিকট প্রেরণ করেন। এ থেকেই এ তথ্যের সত্যতা প্রমাণিত হয় যে, সাহায্য-সৈন্য মিলিত হওয়ার পর মিসরে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য-সংখ্যা বারো হাজারে পৌঁছায়। তিনি তাকে আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় করারও নির্দেশ দেন এবং এতে কোনো দ্বিমত নেই।^{৬৬৭}

^{৬৬৪} দিরাসাতু ফি আহদিন নবুওয়াতি ওয়াল খিলাফাতির রাশিদাহ, পৃ. ৩৫৭।

^{৬৬৫} আননুজ্জুমুল জাহিরা, ১/৪-৭।

^{৬৬৬} ফুতুহ মিসর, পৃ. ৫৭।

^{৬৬৭} তারিখ আত-তাবারি, ৫/৮৪-৯৩।

খলীফার অনুমোদন ছাড়া আমর ইবনুল আসের পক্ষে মিসরের অভ্যন্তরে অভিযান পরিচালনা করা কি সম্ভব? আমরা জানি, সাধারণ মুসলমান অথবা সেনাপতি—সবাই ছিলেন চরম অনুগত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ। সুতরাং এ কথা নির্দিধায় বলা যায় যে, মিসর অভিযান ছিল খলীফা ও তার সেনাপতিদের যৌথ পরিকল্পনা; এটি সময়ের স্রোতে তাৎক্ষণিক কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না।^{৬৬৮}

২.১। মিসরে ইসলামের বিজয়

রোমানদের প্রসিদ্ধ অঞ্চলসমূহ বিজয়ের ক্ষেত্রে মিসর বিজয়কে তৃতীয় ধাপ হিসাবে ধরা হয়। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সমুদ্রের সমান্তরাল পথ ধরে ফিলিস্তিন থেকে মিসর অভিমুখে রওনা হন। তিনি রাফাহ থেকে প্রথমে আরিস হয়ে ফারমা (পেলুসিয়াম) পৌঁছেন। তারপর তিনি কায়রো হয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় যান। এখান থেকে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামরিক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এমন এক পথ অনুসরণ করেন যেখানে বাইজেন্টাইনদের শক্তিশালী কোনো সামরিক ঘাঁটি না থাকারই সম্ভাবনা ছিল যেমনটি সিরিয়ায় ছিল; অথবা এ পথের ব্যাপারে তিনি সম্যক জ্ঞান রাখতেন। বিজয়ের ধাপগুলো পর্যায়ক্রমে নিচে বর্ণনা করা হলো।^{৬৬৯}

২.১.১। ফারমা বিজয়

আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং ফারমা এলাকায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কোনো বাইজেন্টাইন সেনাবাহিনীর দেখা পাননি। তিনি যে এলাকাই অতিক্রম করেছেন, সেখানকার জনগণ তার সঙ্গে স্বপ্রণোদিত হয়ে দেখা করেছে এবং তাকে স্বাগত জানিয়েছে। ফারমায় পৌঁছার পরই মুসলিম বাহিনী প্রথম রোমান সেনাদের মুখোমুখি হয়। বাইজেন্টাইন বাহিনী শহরে নিজেদের অবস্থান মজবুত করে। তারা মুসলমানদের প্রতিহত করা এবং শহর রক্ষায় নিজেদের সামর্থ্যের ব্যাপারে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী ছিল। তাদের মনে এ আত্মবিশ্বাস আরও দৃঢ়

^{৬৬৮} দিরাসাতু ফি আহদিন নবুওয়াতি ওয়াল খিলাফাতির রাশিদাহ, পৃ. ৩৫৮।

^{৬৬৯} আমর ইবনুল আস আল-কাইদ ওয়াস সিয়াসি, ড. আব্দুর রাহীম মুহাম্মাদ, পৃ. ৭৯।

হয় যখন তারা জানতে পারে মুসলমানদের সৈন্য-সংখ্যা তাদের তুলনায় অনেক কম, অস্ত্রশস্ত্র অপরিপূর্ণ এবং অবরোধ অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামেরও অভাব রয়েছে। অন্যদিকে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু শত্রুদের সৈন্য-সংখ্যা ও তাদের পূর্ণ প্রস্তুতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন। বাইজেন্টাইন সৈন্য-সংখ্যা ছিল মুসলমানদের তুলনায় অনেক বেশি। তার নিকট ফারমা বিজয়ের দুটি উপায় ছিল : হয় সরাসরি আক্রমণ ও গেইট উন্মুক্তকরণ অথবা অবরোধ অব্যাহত রেখে ধৈর্য ধারণ করা, যতক্ষণ না ক্ষুধার তাড়নায় তারা বাইরে বেরিয়ে আসে। সুতরাং মুসলিম বাহিনী ফারমা শহর অবরোধ করল এবং বাইজেন্টাইনদের জেদও বাড়তে লাগল। কয়েক মাস পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত থাকল। এর মধ্যে বাইজেন্টাইনদের কিছু সেনাদল মুসলমানদের সঙ্গে বিভিন্ন সময় যুদ্ধ করার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসে, তবে মুসলিম বাহিনী তাদের সকলকে হত্যা করে ফেলে। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের আবেগময় ভাষণ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। তিনি বলেন, ‘হে ইসলাম ও ঈমানের ঝাড়াবহনকারী, হে কুরআনের বাহক, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম! ধৈর্যধারণ করুন এবং দৃঢ়পদ থাকুন; পেছনে সরে আসবেন না। বর্শা আরও ধারালো করুন এবং বর্মে নিজেকে রক্ষা করুন এবং আল্লাহর স্মরণে অবিচল থাকুন। আমার নির্দেশ ছাড়া কোনো কিছু করার চেষ্টা করবেন না।’^{৬৭০}

একদিন একদল বাইজেন্টাইন সৈন্য মুসলমানদের ধাওয়া করতে বের হয় এবং মুসলিম বাহিনী তাদের পরাজিত করে। বাইজেন্টাইনরা তখন শহরের দিকে পালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু মুসলমানদের গতি ছিল তাদের চেয়ে বেশি। তারা দ্রুত গিয়ে গেইটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। আসমিকা প্রথম মুজাহিদ হিসাবে শহরে প্রবেশ করে এবং এটি ছিল স্পষ্ট বিজয়। এটি বলা আবশ্যিক যে, মিসরীয় কিবতিরা মুসলমানদের সাহায্য করে এবং রোমানদের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে দেয়। তারা আত্মমিদায় মুসলমানদের স্বাগত জানায়। ফারমায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম বাহিনী শহরের দেয়াল ও দুর্গগুলো ভেঙে দেয়। কারণ, আল্লাহ না করুন, যদি কোনো কারণে বাইজেন্টাইনরা আবার এ শহরে জমা হয়, তাহলে

^{৬৭০} ফুতুহ মিসর, সুবহি নাদা, পৃ. ১৯-২০।

এসব যেন তাদের কোনো কাজে না লাগে। তারপর আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সৈন্যদের উদ্দেশে বলেন :

হে লোকসকল, আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আমাদের বিজয় দান করেছেন। আল্লাহ অতি মহান, তিনি আমাদের ইসলাম দিয়ে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু সতর্ক থাকুন, এ কথা মনে করবেন না যে, আমরা যা চেয়েছি, তার সবই অর্জন করে ফেলেছি। এ বিজয় যেন আপনাদের প্রসন্ন না করে তোলে। আমাদের সামনে এখনো বিস্তর বন্ধুর পথ এবং খলীফা যে লক্ষ্যে আমাদের প্রেরণ করেছেন, সেটি সম্পন্ন করতে এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। আপনাদের ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং সেনাপতিদের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। এখানকার লোকজনকে বুঝাতে দিতে হবে যে, আমরা শান্তিকামী সেনা। সুতরাং আমাদের দ্বারা যেন কোনো অন্যায় না হয়; বরং আমরা অন্যায় প্রতিরোধ করব এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করব।^{৬৭১}

আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিশ্চিত হলেন যে, আশ্রয় গ্রহণকারীদের জন্য এই শহর আর নিরাপদ নয়। তিনি এ যুদ্ধে কী হারিয়েছেন, তার হিসেব-নিকেশ করলেন। যখন দেখলেন যে, এমন কিছু মুজাহিদ এ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছেন, যারা মিসর বিজয়ে খুব আগ্রহী ছিলেন। তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছার আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি আশঙ্কা করলেন, এভাবে যদি একের পর এক লড়াই অব্যাহত থাকে, তাহলে তিনি তার লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবেন না। তবে যাদের তিনি হারিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে তাদের পরিবর্তে নতুন মুজাহিদ দান করেন। জাবাল আল-হিলালে বসবাসরত আরব গোত্র রাশিদা ও লাখম থেকে অনেক মুজাহিদ তার বাহিনীতে যোগদান করে।^{৬৭২} আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনী নিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। বাইজেন্টাইনদের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই তিনি আল-কাওয়াসিরে পৌঁছেন। সেখান থেকে দক্ষিণে যাত্রা করে ওয়াদি আত-তামবালানে এসে তাঁর গাড়েন। এটি ছিল আত-তেল আল-কাবিরের

^{৬৭১} প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

^{৬৭২} জাওলাতু ফি আসরিল খুলাফায়ির রাশিদিন, পৃ. ২১৪।

নিকটবর্তী এলাকা। তারপর তিনি দক্ষিণ দিকেই অগ্রসর হতে থাকেন এবং বালবিসে এসে পৌঁছেন। আন-নুযুম আজ-যাহিরাহ কিতাবের লেখক বলেন, ‘আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বালবিসে পৌঁছা পর্যন্ত খুব কমই প্রতিরোধের সম্মুখীন হন।’^{৬৭৩}

২.১.২। বালবিস বিজয়

বালবিসে বাইজেন্টাইনরা বিশাল বাহিনী নিয়ে আবির্ভূত হয়। তাদের লক্ষ্য ছিল, আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ব্যবলিয়নের দিকে সুরক্ষিত দুর্গের দিকে অগ্রসর হতে বাধা দেওয়া এবং তাদের যুদ্ধ করতে বাধ্য করা। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের বললেন, ‘যুদ্ধের জন্য তাড়াহুড়া কোরো না। আগে আমাদের বক্তব্য শোনো। আবু মারইয়াম ও আবু মিরইয়ামকে আমাদের নিকট পাঠাও।’ তখন তারা যুদ্ধ করার ইচ্ছা থেকে বিরত হয় এবং ওই দুজন মুসলমানদের সেনাপতির সঙ্গে দেখা করার জন্য যায়। তিনি তাদের ইসলামের দিকে আহ্বান করেন, অথবা জিযিয়া দিতে বলেন। আরও বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গিয়েছেন, ইসমাইল আ.-এর মা হাজেরা আ.-এর জন্য মিসরের জনগণের সঙ্গে সদাচরণ করবে। সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَى فِيهَا الْقِيَرَاظُ فَإِذَا
فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا . أَوْ قَالَ "
ذِمَّةً وَصِهْرًا

তোমরা শীঘ্রই মিসর বিজয় করবে যেখানে কিরাত প্রচলন করবে। যখন তোমরা তা বিজয় করবে তখন সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করবে। কারণ, তোমাদের ওপর তাদের অধিকার রয়েছে এবং তারা তোমাদের আত্মীয়ও। অথবা তিনি বলেছেন, তোমাদের ওপর তাদের অধিকার রয়েছে এবং তারা তোমাদের শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়ও।^{৬৭৪}

^{৬৭৩} আন-নুযুম আজ-যাহিরাহ, ১/৭-৮।

^{৬৭৪} সহীহ, মুসলিম, হাদীস নং ২৫৪৩।

তারা বলল, ‘এটি খুব দূরবর্তী আত্মীয়তা; নবী ছাড়া অন্য কেউই এই আত্মীয়তার বন্ধনে সাড়া দেবে না। আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত আমাদের নিরাপত্তা দিন।’ আমরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমার মতো লোক কখনো ধোঁকা দেবে না। আমি তোমাদের তিন দিন সময় দিলাম।’ তারা বলল, ‘আমাদের আরও সময় দিন।’ তখন তিনি তাদের আরও এক দিন সময় বাড়িয়ে দিলেন। তারা মিসরের শাসনকর্তা আল-মুকাওকিস^{৬৭৫} এবং বাইজেন্টাইন গভর্নর আরতাবুনের নিকট গিয়ে মুসলমানদের অভিপ্রায় জানায়। আরতাবুন মুসলমানদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং যুদ্ধের জন্য তাগিদ দেয়। মুসলিম বাহিনী তাদের পরাজিত করে এবং আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যায়।^{৬৭৬} উল্লেখ্য, এ ঘটনায় মুসলমানদের মহান চরিত্র ও দুঃসাহসিকতা ফুটে ওঠে। আল্লাহ তা‘আলা বালবিসে মুসলমানদের বিজয় দান করলে তারা আল-মুকাওকিসের কন্যা আরমানুসাহকে বন্দী করে। তিনি তার পিতার কাছেই ছিলেন। রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল, যা তিনি পছন্দ করেননি। এ বিয়ে এড়ানোর জন্য তিনি তার দাসী বারবারার সঙ্গে বালবিস ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। যখন কয়েকজন মুসলমান আরমানুসাহকে বন্দী করতে সক্ষম হয়, তখন আমরা রাযিয়াল্লাহু আনহু সাহাবীদের জমা করে আল্লাহর বাণী শ্রবণ করিয়ে দেন :

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۝

সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কী হতে পারে?^{৬৭৭}

তারপর তিনি বলেন, ‘আল-মুকাওকিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপহার প্রেরণ করেছিলেন; আমার মনে হয়, তার কন্যাসহ যাদের আমরা বন্দী করেছি এবং তাদের যত সম্পদ আমরা অধিগ্রহণ করেছি, সবই তার নিকট আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।’ সাহাবায়ে কেরাম এতে রাজি হন।^{৬৭৮} সুতরাং আমরা রাযিয়াল্লাহু আনহু আরমানুসাহকে তার দাস-দাসী ও অলংকারাদিসহ সম্মানের সঙ্গে তার পিতার নিকট প্রেরণ করেন। তার দাসী বারবারা ফিরে যাওয়ার সময়

^{৬৭৫} আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/১০০।

^{৬৭৬} ফাতহু মিসর, পৃ. ২৪।

^{৬৭৭} সূরা আর-রহমান, ৫৫ : ৬০।

^{৬৭৮} আদ দুয়াকুস সিয়াসি ফি সাদরিল ইসলাম, আস-সাফওয়া, পৃ. ৪৩১।

আরমানুসাহকে বলল, ‘হে আমার মনিব, আরবরা আমাদের চারিদিকে ঘিরে ফেলেছে।’ আরমানুসাহ জবাবে বলল, ‘আরবদের তাঁবুতেই আমি আমার সম্মান ও ইয্যত বেশি নিরাপদ মনে করি। তবে আমি আমার পিতার প্রাসাদে তা নিরাপদ মনে করি না।’ যখন তিনি তার পিতার নিকট ফিরে গেলেন, তিনি তার কন্যার সঙ্গে মুসলমানদের শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণে খুব সন্তোষ প্রকাশ করলেন।^{৬৭৯}

২.১.৩। উম্মে দানিনের যুদ্ধ

ইবনে আব্দুল হাকিম বর্ণনা করেন, আমরা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনী নিয়ে প্রায় এক মাস যুদ্ধ করে বালবিস বিজয় করেন। তারপর তিনি উম্মে দানিনের দিকে অগ্রসর হন। জায়গাটি মুকাসসাস নামেও পরিচিত। এটি নীল নদের তীরে অবস্থিত। এ এলাকায় মুসলিম বাহিনী কঠিন যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং আমরা রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফার নিকট সাহায্য-সৈন্য চেয়ে পাঠান। খলীফা তার সাহায্যার্থে চার হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। আর প্রতি এক হাজারের জন্য এমন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেন, যারা এক হাজার লোকেরই সমকক্ষ ছিল। তারা হলেন যুবায়ের ইবনে আওয়াম, মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ, উবাদা ইবনে সামিত এবং মাসলামাহ ইবনে মুখাল্লাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু (অন্য এক বর্ণনামতে চতুর্থ জন ছিলেন খারিয়া ইবনে হুযাফা রাযিয়াল্লাহু আনহু)। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার নিকট প্রেরিত চিঠিতে বলেন : মনে রেখো, তোমার সঙ্গে বারো হাজার সৈন্য রয়েছে। আর বারো হাজার সৈন্য কখনো স্বল্পতার অজুহাতে পরাজিত হতে পারে না।^{৬৮০} বাইজেন্টাইনরা মিসরীয়দের সঙ্গে নিয়ে মুসলমানদের মোকাবিলায় বের হয়ে আসে। এ যুদ্ধে আমরা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সামরিক অভিজ্ঞতাকে সুনিপুণভাবে কাজে লাগান, যেমনটি কাজে লাগিয়েছিলেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইরাক যুদ্ধে। তিনি তার বাহিনীকে তিনটি দলে বিভক্ত করেন; এক দলকে শত্রুর জন্য আল-জাবাল আল-আহমারে এবং আরেক দলকে উম্মে দানিনের নিকটে নীল নদের তীরে অপেক্ষায় রাখেন। বাকি এক দল শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। যখন উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়, তখন

^{৬৭৯} ফাতহু মিসর, পৃ. ২৪।

^{৬৮০} আদ-দাওলাহ ইসলামিয়া ফি আসরিল খুলাফা আর-রাশিদিন, পৃ. ২১৮।

আলজাবাল আল-আহমারে অপেক্ষারত দলটি রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসলিম বাহিনী শত্রুর লাইন ভেঙে ফেলে এবং শত্রুরা উন্মে দানিনের দিকে পালিয়ে যেতে থাকে। সেখানে গিয়ে তারা মুসলমানদের আরেকদলের মুখোমুখি হয় যারা পূর্ব থেকেই সেখানে শত্রুর প্রতীক্ষায় ছিল। এভাবে তারা মুসলমানদের তিন দলের হাতে অসহায় অবস্থায় দেখতে পায় এবং অনিবার্যভাবে তারা পরাজয় বরণ করে। শত্রুবাহিনী সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং কিছু শত্রুসেনা পালিয়ে ব্যবলিয়নে গিয়ে আশ্রয় নেয়।^{৬৮১} এভাবে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে এবং আল্লাহ তা'আলা তার বিশেষ অনুগ্রহে মুসলমানদের শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন। আর এটি সম্ভব হয়েছিল মুসলমানদের সেনাপতির বিস্ময়কর সামরিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কারণে; যা শত্রুকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।^{৬৮২}

২.১.৪। ব্যবলিয়ন দুর্গের যুদ্ধ

আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনী নিয়ে ব্যবলিয়ন দুর্গের দিকে অগ্রসর হন এবং তা অবরোধ করেন। অবরোধ সাত মাস ধরে অব্যাহত থাকে। এ সময়ের মধ্যে মুকাওকিস সমঝোতার জন্য আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট দূত প্রেরণ করে। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু পরিকারভাবে তাদের বলেন, হয় মুসলমান হয়ে যাও, অথবা জিযিয়া প্রদান করতে সম্মত হও, আর নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। মুকাওকিস জিযিয়া প্রদান করতে সম্মত হয় এবং বাইজেন্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট তা করার অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু হিরাক্লিয়াস এর অনুমোদন দিতে অস্বীকার করেন; বরং তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং তীব্রভাবে তিরস্কার করে তাকে কঙ্গটান্টিনোপলে ডেকে পাঠান। তারপর তাকে দেশান্তরিত করেন। ব্যবলিয়ন দুর্গ জয়ে দেরি হওয়াতে যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমি আল্লাহর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে যাচ্ছি এবং আমি আশা করি, এতে আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় দান করবেন।’^{৬৮৩} আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু ব্যবলিয়ন দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন। তারপর তারা রাতে দুর্গের দেয়াল বেয়ে ওপরে ওঠেন এবং

^{৬৮১} প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।

^{৬৮২} প্রাগুক্ত।

^{৬৮৩} আল-ফুতুহাতুল ইসলামিয়া, ড. আব্দুল আজিজ আশ-শানাবি, পৃ. ৯১।

শত্রুসেনাদের সঙ্গে এক ভয়াবহ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। প্রথম যিনি দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠেছিলেন, তিনি হলেন যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বার্ড মার্কেটের নিকটস্থ দেয়ালে সিঁড়ি লাগিয়ে ওপরে ওঠেন। তিনি সঙ্গীদের বলেন, ‘আমি তাকবীর-ধ্বনি দিলে তোমরা দুর্গে ঢোকার চেষ্টা করবে।’ সুতরাং যখনই যুবায়ের ইবনে আওয়াম তরবারি হাতে নিয়ে দুর্গের দেয়ালে উঠে তাকবীর-ধ্বনি দিলেন, তখন দুর্গের বাইরে থাকা মুসলমানরাও তাকবীর-ধ্বনি দিয়ে উঠল। দুর্গের ভেতরে থাকা শত্রুসেনারা এতে ভয় পেয়ে গেল এবং তারা ধরে নিল যে, মুসলমানরা দুর্গ দখল করে নিয়েছে। সুতরাং তারা পলায়ন করল। যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গীদের নিয়ে দুর্গের গেইট খুলে দিলেন। আর সঙ্গে মুসলিম বাহিনী দুর্গে প্রবেশ করে পুরো নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। তবে আমার ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু দুর্গের অধিবাসীদের এই শর্তে নিরাপত্তা দিলেন যে, বাইজেন্টাইন সেনাদের কয়েকদিনের খাবার নিয়ে বের হয়ে যাবে; আর ব্যবলিয়ন দুর্গের যাবতীয় সম্পদ ও যুদ্ধাস্ত্র মুসলমানদের গণীমত হিসাবে থাকবে। তারপর আবু আব্দুল্লাহ দুর্গের টাওয়ার ও দেয়াল ধ্বংস করে দেন।^{৬৮৪}

২.২। আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়

আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার বাহিনী ব্যবলিয়ন দুর্গে কয়েক মাস অবস্থান করেন। এতে সৈন্যদের পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোগ হয়। এদিকে আলেকজান্দ্রিয়া অভিযানে খলীফার অনুমতিরও অপেক্ষায় থাকেন। অনুমতি লাভ করার পর আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ব্যবলিয়ন দুর্গে একটি শক্তিশালী মুসলিম বাহিনী রেখে বাকিদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তিনি ব্যবলিয়ন থেকে ৬৪১ সালের মে মাসে (জমাদাল আখেরাহ, ২১ হি.) আলেকজান্দ্রিয়ার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। তার সঙ্গে অনেক মিসরীয় নেতৃবৃন্দও যোগ দেয়, যারা মুসলিম বাহিনীকে নিজেদের স্বার্থে সাহায্য করা অপরিহার্য মনে করেছিল। তারা মুসলমানদের সুবিধার্থে রাস্তা-ঘাট, সেতু, বাজার-হাট ইত্যাদি মেরামত করে দেয়। বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের লক্ষ্য অর্জনে মিসরীয়রা আনসারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।^{৬৮৫} আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নীল নদের বাম দিক দিয়ে অগ্রসর হতে

^{৬৮৪} প্রাপ্ত।

^{৬৮৫} আদ-দাওলাহ ইসলামিয়া ফি আসরিল খুলাফা আর-রাশিদিন, পৃ. ২২৪।

থাকেন। বর্তমানে বুহাইরা প্রদেশ এদিকেই অবস্থিত। তা ছাড়া মরুভূমির বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘোড়া ও সৈন্যদের অবাধ বিচরণের সুযোগ করে দেয় এবং বাইজেন্টাইনদের সামরিক ঘাঁটি ও বাধা এড়িয়ে যেতে সক্ষম হন। তিনি যদি নীল নদের ব-দ্বীপ অঞ্চল দিয়ে অগ্রসর হতেন, তাহলে তার গতি বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। মারফুত অথবা আত-তারানায় (ঐতিহাসিকগণ জায়গাটির এর নামই বলে থাকেন) সামান্য প্রতিবন্ধকতা ছাড়া তিনি তেমন কোনো বাধার সম্মুখীন হননি।^{৬৮৬}

তারপর তিনি নীল নদ অতিক্রম করে এর পূর্বদিকে অবস্থিত প্রাচীর-ঘেরা নুকয়ুস শহরে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ, এখানে একটি শক্তিশালী দুর্গ রয়েছে, যা পেছনে রেখে সামনে অগ্রসর হলে বিপদের আশঙ্কা ছিল। তবে রোমানরা দুর্গে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরিবর্তে তারা নৌকা নিয়ে মুসলমানদের শহরে প্রবেশে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। তারা মুসলমানদের প্রতি তির ছুড়ে মারে, যাতে তারা নদীর কাছাকাছি না আসতে পারে। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং নৌকা নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে পালিয়ে যেতে থাকে। আর যারা দুর্গে অবস্থান করছিল, তারা দ্রুত মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। মুসলমানগণ বিজয়ীর বেশে তাদের শহরে প্রবেশ করে। তারা সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করে এবং নিজেদের আক্রমণ-পরিকল্পনা গুছিয়ে নেয়।^{৬৮৭} আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার এক সেনাপতি শারিক ইবনে সামিইকে পলায়নরত বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে ধাওয়া করতে পাঠান। তিনি যখন তাদের নাগাল পান, তখন তার সঙ্গে মুসলিম সৈন্যের সংখ্যা বেশি ছিল না। বাইজেন্টাইনরা এতে আশান্বিত হয়ে ওঠে এবং তাকে ঘিরে ফেলে। শারিক তখন এক পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট সাহায্য-সৈন্য চেয়ে পাঠান। বাইজেন্টাইনরা যখন বুঝতে পারে মুসলমানদের সাহায্যে আরও অনেক সৈন্য এগিয়ে আসছে, তখন তারা পালিয়ে যায়।^{৬৮৮}

দামানহুর থেকে ছয় মাইল দক্ষিণে সুলতাইস এলাকায় আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবার বাইজেন্টাইনদের মুখোমুখি হন। উভয়পক্ষে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এতে শত্রুরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে।^{৬৮৯}

^{৬৮৬} প্রাগুক্ত।

^{৬৮৭} প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫।

^{৬৮৮} প্রাগুক্ত।

^{৬৮৯} প্রাগুক্ত।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বাইজেন্টাইনদের বিশাল এক বাহিনীর মোকাবিলা করে, যেখানে তাদের সৈন্যসংখ্যা ও সমরাস্ত্রের মজুদ ছিল খুবই নগণ্য। কয়েকদিন ধরে এ যুদ্ধ চলতে থাকে। ঐতিহাসিকগণ এ যুদ্ধের ব্যাপারে কয়েক লাইন ব্যতীত তেমন কিছুই লিপিবদ্ধ করেননি, অথচ কাদিসিয়া, ইয়ারমুক ও নাহাওয়ান্দ যুদ্ধের ব্যাপারে শত শত পৃষ্ঠা লিখে গিয়েছেন।^{৬৯০} এ রকম আরেকটি যুদ্ধ, কিরন যুদ্ধ, সম্পর্কেও আরব ঐতিহাসিকগণ সঠিকভাবে বর্ণনা করেননি, যা ব্যবলিয়ন থেকে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত দুর্গের সর্বশেষ ঘাঁটি ছিল। বাইজেন্টাইন সেনাপতি থিওডোর নিজে সেই দুর্গে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং উভয়পক্ষের মধ্যে দশ দিন ধরে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতৎসত্ত্বেও ইবনে আব্দুল হাকিম এই যুদ্ধ সম্পর্কে কয়েক লাইন ব্যতীত আর তেমন কিছুই লিখে যাননি : মুসলমানগণ কিরনে বাইজেন্টাইনদের মুখোমুখি হয় এবং তারা সেখানে দশ দিন ধরে লড়াই করে। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর সম্মুখে থেকে যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন এবং ওয়ারদান (আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আযাদকৃত গোলাম) মুসলিম বাহিনীর পতাকা বহন করেন। তারপর আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেদিন সালাতে খাওফ আদায় করেন এবং আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় দান করেন। ওই সময় মুসলিম বাহিনী শত্রুদের অনেককে হত্যা করে এবং তাদের আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত ধাওয়া করে নিয়ে যায়। এ যুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর এবং ওয়ারদানের অনেক বীরত্বের বর্ণনা পাওয়া যায়।^{৬৯১}

মুসলমানদের হাতে পতনের সময় আলেকজান্দ্রিয়া ছিল মিসরের রাজধানী এবং কন্সটান্টিনোপলের পরে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর; এটি তখন সারা দুনিয়ার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়িক শহর হিসাবেও প্রসিদ্ধ ছিল। বাইজেন্টাইনরা জানত মুসলমানরা যদি এই শহর দখল করে নেয়, তাহলে এটি হবে তাদের জন্য চরম আঘাত। এ জন্য এ শহরের নিরাপত্তার ব্যাপারে তারা খুবই সতর্ক ছিল। হিরাক্লিয়াস বলেন, ‘মুসলিম বাহিনী যদি আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে নেয়, তাহলে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে।’^{৬৯২}

^{৬৯০} প্রাগুক্ত।

^{৬৯১} আদ-দাওলাহ ইসলামিয়া ফি আসরিল খুলাফা আর-রাশিদিন, হামদি শাহীন, পৃ. ২২৬।

^{৬৯২} প্রাগুক্ত।

ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তে এ কথা পাওয়া যায় যে, আলেকজান্দ্রিয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য হিরাক্লিয়াস স্বয়ং প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন তার প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন। এভাবে আল্লাহ তার বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করেন।^{৬৯৩} হিরাক্লিয়াসের মৃত্যুর পর বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তার দুই ছেলে, কন্সটান্টাইন ও হিরাক্লিয়াস-২, ক্ষমতা দখল করে। হিরাক্লিয়াস-২ এর মা মারতিনাও শাসনকার্যে ভূমিকা রাখে। হিরাক্লিয়াসের মৃত্যুর এক শ দিনের মধ্যেই কন্সটান্টাইন মৃত্যুবরণ করে। এ জন্য সবাই মারতিনাকে সন্দেহ করতে থাকে, যে কিনা তার সন্তানকে এককভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। ফলে মারতিনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়। এই অস্থিরতা ও দাঙ্গা কয়েক মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। একপর্যায়ে কন্সটান্টাইনের ছেলে কন্সটেনাস তার চাচার সঙ্গে ক্ষমতায় শরীক হলে দাঙ্গা বন্ধ হয়।^{৬৯৪}

আলেকজান্দ্রিয়া একটি সুরক্ষিত শহর। এর চারপাশে বিস্তৃত ও শক্তিশালী দেয়াল এবং যথোপযুক্ত প্রতিরোধ-ব্যবস্থা এর নিরাপত্তা আরও জোরদার করেছে। এর উত্তরে সমুদ্র এবং তখন সমুদ্রে বাইজেন্টাইনদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। আর দক্ষিণে মারয়ুত লেক প্রতিরক্ষার জন্য যথেষ্ট ছিল। কারণ, এটি পার হওয়া অসম্ভব না হলেও চরম কষ্টসাধ্য ছিল। ওই সময় নীল নদের একটি শাখা, নাযাত আস-সাওবান নামে প্রসিদ্ধ, শহরটির পশ্চিম দিক ঘিরে রেখেছিল। সুতরাং শহরে প্রবেশের জন্য একদিকই খোলা ছিল। আর সেটি হলো পূর্ব দিক দিয়ে, যা কিরয়ুনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।^{৬৯৫}

অবরোধ কয়েক মাস ধরে চলছিল। আমরা রাযিয়াল্লাহু আনহু আশঙ্কা করলেন, হয়তো তার বাহিনী পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে অথবা শত্রুদের পরাজিত করার আগেই পালিয়ে যেতে থাকবে। সুতরাং তিনি নীল নদের ব-দ্বীপ অঞ্চল এবং মিসরের ওপরের দিকে গ্রামাঞ্চলে অভিযান প্রেরণের

^{৬৯৩} প্রাগুক্ত, ইবনে আব্দুল হাকাম থেকে উদ্ধৃতি।

^{৬৯৪} প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

^{৬৯৫} প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫।

সিদ্ধান্ত নিলেন। এত দীর্ঘ সময় ধরে অবরোধ অব্যাহত থাকে যে, খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুও চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি মুসলিম বাহিনীর সৈনিকদের জীবন বাজি রেখে লড়াইয়ে আগ্রহ ও উৎসাহের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে গেলেন। তিনি মনে করলেন, নিশ্চয়ই মুসলমানগণ কোনো গোনাহের কারণে এ রকম কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন।^{৬৯৬} তিনি এ বিষয়টি জানিয়ে আমার ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট চিঠি প্রেরণ করেন : আমি খুবই দুশ্চিন্তিত যে, আর কত দিন লাগবে মিসর জয় করতে! আপনারা গত দুই বছর যাবৎ লড়ছেন। মুসলমানদের কৃত কোনো গোনাহের কারণে এমন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে অথবা শত্রুদের মতো আপনারাও দুনিয়ার ভালোবাসায় নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা কেবল তার প্রতি একনিষ্ঠ ও অবিচল বান্দাদের বিজয় দান করেন। আমি আপনার নিকট চার জন বীর যোদ্ধা (মানে যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার সঙ্গীগণ) পাঠাচ্ছি এবং আমি বলেছি যে, আমার জানামতে তারা একেক জন এক হাজার লোকের সমতুল্য। আমার চিঠি পাওয়ামাত্র আপনি লোকজনকে নসীহত করবেন এবং তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করবেন। তাদের ধৈর্যধারণে উৎসাহিত করবেন এবং নিয়ত ঠিক রাখতে বলবেন। আর আমার প্রেরিত চার জনকে নেতৃস্থানীয় পদমর্যাদায় নিযুক্ত করুন। আপনার অধীনদের বলুন, তারা যেন আমীরের নেতৃত্বে একসঙ্গে শত্রুর ওপর হামলা করে এবং সেটি করুন শুক্রবার দুপুরে। কারণ এ-সময় ঐশী রহমত নাযিল হয় এবং এ-সময় দুআও কবুল হয়ে থাকে। লোকজনকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করুন এবং তার নিকট শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য দুআ করতে বলুন।’

এই চিঠি পেয়ে আমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তার অধীন সবাইকে জমা করেন এবং তাদের সম্মুখে চিঠিটি পড়ে শোনান। তারপর তিনি ওই চার জনকে ডেকে এনে সবার সামনে বিভিন্ন উপদলের সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন। তিনি সবাইকে তাদের অন্তর পবিত্র করার নির্দেশ দেন। এ লক্ষ্যে সকলকে দুই রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর নিকট তাওবা-ইস্তেগফার করতে বলেন এবং তারপর তার নিকট বিজয়ের জন্য দুআ করতে বলেন। তারা তা-ই করেন এবং আল্লাহ তাদের বিজয় দান করেন।^{৬৯৭}

^{৬৯৬} প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

^{৬৯৭} প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮।

বর্ণিত আছে, আমার ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ‘এসব লোকদের সঙ্গে যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে আমাকে কিছু পরামর্শ দিন।’ মাসলামা বলেন, ‘আমার মনে হয়, সাহাবীদের মধ্য থেকে আপনি একজন সমরবিদ ও অভিজ্ঞ কাউকে নির্বাচন করুন এবং তাকে যুদ্ধ শুরু করা ও তা পরিচালনার দায়িত্ব দিন।’ আমার রাযিয়াল্লাহু আনহু আবার জিজ্ঞাসা করেন, ‘কাকে নির্বাচন করা যায়?’ তিনি বলেন, ‘উবাদা ইবনে আস-সামিত।’ আমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে ডেকে পাঠান এবং তিনি যখন নিকটে এসে হাজির হন, তখন বাহন থেকে নামার চেষ্টা করতেই আমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমি আপনাকে বাহন থেকে না নামার জন্য অনুরোধ করছি। আমাকে আপনার বর্শাটি দিন।’ তিনি সেটি আমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেন। তখন আমার রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের পাগড়ি খুলে বর্শাটির মাথায় বিদ্ধ করেন এবং তাকে বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। আল্লাহ তাকে বিজয় দান করেন এবং ওই দিনই আলেকজান্দ্রিয়া মুসলমানদের হাতে চলে আসে।^{৬৯৮}

আরেক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, ‘আমি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি। পরিশেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ইসলামের প্রথম যুগে যারা মুসলমানদের বিজয় অর্জনে সহায়তা করেছেন, তাদের ছাড়া অন্য কেউ এ যুদ্ধে বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারবে না। তিনি আনসারদের দিকে ইশারা করেছেন। তারপর তিনি উবাদা ইবনে আস-সামিতকে যুদ্ধের সেনাপতি হিসাবে নিয়োগ দেন এবং আল্লাহ তার হাতে মুসলমানদের বিজয় দান করেন।^{৬৯৯}

ইবনে আব্দুল হাকাম বর্ণনা করেন, আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ নয় মাস স্থায়ী হয় এবং ২০ হিজরীর মুহাররম মাসে (২১ ডিসেম্বর ৬৪০) বিজয় হয়।^{৭০০} তবে বাল্টার তার গবেষণায় বলেন, আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ শুরু হয় জুন ৬৪০ সালে এবং শহরবাসীরা ৮ নভেম্বর ৬৪১ সালে (৭ যিলহজ ২১ হি.) আত্মসমর্পণ করে। এই মতটি বেশি যুক্তিসংগত মনে

^{৬৯৮} আদ-দাওলাহ ইসলামিয়া ফি আসরিল খুলাফা আর-রাশিদিন, পৃ. ২২৮।

^{৬৯৯} আল-আনসার ফিল আসরির রাশিদি, পৃ. ২১২।

^{৭০০} আদ-দাওলাহ ইসলামিয়া ফি আসরিল খুলাফা আর-রাশিদিন, পৃ. ২২৯।

হয়। কারণ, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার চিঠিতে উল্লেখ করেন, ‘আপনারা গত দুই বছর ধরে যুদ্ধ করছেন।’ আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আল-আরিশে পদার্পণের তারিখ ডিসেম্বর ৬৩৯ এবং আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের তারিখ নভেম্বর ৬৪১ সাল—যাতে দুই বছর পূর্ণ হয়।

আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আলেকজান্দ্রিয়ার লোকজনের কোনো ক্ষতি করেননি; তিনি তাদের হত্যা করেননি এবং তাদের মহিলাদের বন্দীও করেননি। বরং তিনি তাদের সঙ্গে ব্যবলিয়নের অধিবাসীদের মতো আহলে যিম্মি হিসাবে আচরণ করেন। সবকিছু শান্ত হয়ে এলে তিনি একদন সেনাকে আলেকজান্দ্রিয়া রক্ষায় নিযুক্ত করেন এবং বাকি সৈন্য নিয়ে তিনি বাইজেন্টাইনদের অবশিষ্ট অঞ্চল ও গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। এভাবে মেডিটেরিয়ান তীরবর্তী এলাকায় মুসলমানগণ তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। বড় বড় শহরের মধ্যে রাশিদ, দিমাইত এবং অন্যান্য শহরও মুসলমানদের অধীনে আসে। ফলে মুসলমানগণ ব-দ্বীপ এলাকা ও মিসরের ওপরের অঞ্চলসমূহে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করেন।^{৭০১}

২.৩। বারকাহ এবং ত্রিপলী বিজয়

মিসরে পূর্ণ মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু পশ্চিম দিকে তার অভিযান অব্যাহত রাখেন। বারকাহ ও ত্রিপলীতে বাইজেন্টাইন সৈন্যদের ঘাঁটি ছিল। এ রকম আরও কিছু শহরে তারা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ২২ হি. আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনী নিয়ে বারকাহ অভিমুখে রওনা হন। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে বারকাহ যেতে পথের দু-ধারে ছিল বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তর ও ঘরবাড়ি। বারকাহ পর্যন্ত পৌঁছতে তিনি তেমন কোনো বাধার সম্মুখীন হননি। বারকাহতে পৌঁছে তিনি সেখানকার লোকজনের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করেন এবং তাদের জন্য জিয়িয়া (কর) ধার্য করে দেন। মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আসায় বারকাহর অধিবাসীরা স্বঃপ্রণোদিত হয়ে মিসরের গভর্নরের নিকট খারায় প্রেরণ করে। এ ব্যাপারে তাদের কেউ বাধ্য কিংবা নির্দেশও দেয়নি। তারা উত্তর আফ্রিকার সবচেয়ে ভদ্র জাতি এবং কখনো কোনো সমস্যা তৈরি করেনি।

^{৭০১} প্রাগুক্ত।

তারপর আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনী নিয়ে ত্রিপলীর দিকে অগ্রসর হন। সেখানে লোকজন সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং সেখানে বাইজেন্টাইন সৈন্য-সংখ্যাও ছিল প্রচুর। তারা শহরের গেইট বন্ধ করে দেয় এবং কয়েক মাস যাবৎ মুসলমানদের হাতে অবরুদ্ধ থাকে। এ সময়ের মধ্যে মুসলমানরা উল্লেখযোগ্য কিছু অর্জন করতে পারেনি। শহরের আরেক দিকে ছিল সমুদ্র। সমুদ্রের তীর ঘেঁষেই বাইজেন্টাইনরা তাদের বাড়ি-ঘর নির্মাণ করেছিল। সমুদ্র এবং শহরের মধ্যে কোনো দেয়াল ছিল না। মুসলিম সৈন্যরা যখন এটি জানতে পারে, তখন তাদের একটি দল সমুদ্রপথে শহরে প্রবেশ করে তাকবীর-ধ্বনি দেয়। জাহাজ ছাড়া আর অন্য কোনোভাবেই বাইজেন্টাইনদের শহর থেকে পালাবার পথ ছিল না। এদিকে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনী নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যারা নৌকায় উঠতে সক্ষম হয়, তারা ছাড়া আর কেউই মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। মুসলমানগণ শহরের সব সম্পদ গণীমত হিসাবে সংগ্রহ করেন এবং আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সৈন্যদের আশপাশের এলাকায় প্রেরণ করেন। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আরও পশ্চিমে তিউনিসিয়া এবং অন্যান্য উত্তর আফ্রিকার সুদূর অঞ্চলে অভিযান পরিচালনায় আগ্রহী ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি নিষেধ করেন। কারণ, নতুন অঞ্চল বিজয়ের পূর্বে বিজিত অঞ্চল সুরক্ষা করা বেশি প্রয়োজন ছিল। সুতরাং তিনি মুসলিম বাহিনীকে ত্রিপলী পর্যন্তই অভিযান সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এভাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আমলে ইসলামী সাম্রাজ্য পূর্ব দিকে জিজেন ও দরিয়ার সিন্ধ থেকে শুরু করে পশ্চিমে আফ্রিকার সীমান্ত পর্যন্ত, উত্তরে এশিয়ার কুচকে পাহাড়গুলো এবং আরমিনা থেকে দক্ষিণে কাহেল সমুদ্র ও নওবা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। এটি ছিল এক আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র যেখানে নানা ধর্ম-বর্ণ, কৃষ্টি-কালচার ও নানা জাতিগোষ্ঠীর সম্মিলন ঘটে। এ রাষ্ট্রের জনগণ ন্যায় বিচার ও শান্তি-সৌহার্দের মধ্যে বসবাস করে। আর ইসলাম তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে জাতিগত ভেদাভেদ থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকের সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান নিশ্চিত করে।^{৭০২}

^{৭০২} আদ-দাওলাহ ইসলামিয়া ফি আসরিল খুলাফা আর-রাশিদিন, পৃ. ২৩১।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিসর বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

৩.১। আল-মুকাওকিসের বিরুদ্ধে উবাদা ইবনে আস-সামিতের অভিযান

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু ব্যবলিয়ন দুর্গ অবরোধ করার পর মুকাওকিস তার নিকট এই চিঠি প্রেরণ করেন :

আপনারা আমাদের দেশে জোরজবরদস্তি প্রবেশ করেছেন এবং আমাদের যুদ্ধে প্রলুদ্ধ করছেন। আর অনেকদিন ধরেই আপনারা আমাদের দেশে অবস্থান করছেন। আপনারা একটি ক্ষুদ্র দলমাত্র। বাইজেন্টাইনরা বিরাট প্রস্তুতি গ্রহণ করছে এবং শীঘ্রই তারা আপনাদের ওপর আক্রমণ করবে; তাদের নিকট রয়েছে বিপুল যুদ্ধাস্ত্র ও জনবল। নীল নদ আপনাদেরও অবরোধ করে রেখেছে এবং আপনারা মূলত আমাদের দেশে বন্দী হয়ে আছেন। আমাদের নিকট আপনাদের পক্ষ থেকে দূত প্রেরণ করুন যাতে আমরা আপনাদের বক্তব্য শুনতে পারি। সম্ভবত আমরা আলোচনার মাধ্যমে সমূহ সংঘর্ষ এড়াতে পারব, যা উভয়পক্ষের জন্য কল্যাণকর হবে এবং বাইজেন্টাইনরা আক্রমণ করার পূর্বেই যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে। তারা একবার আক্রমণ করে বসলে আর আলোচনার সুযোগ থাকবে না। আপনাদের আশার বাইরে পরিণতির জন্য আমাদের আফসোস করা ছাড়া উপায় থাকবে না। আপনাদের দূত প্রেরণ করুন, যাতে আমরা একটা সমঝোতায় পৌঁছতে পারি যাতে উভয়পক্ষ স্বস্তি পেতে পারি।

মুকাওকিসের দূত এই চিঠি নিয়ে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট আগমন করলে তিনি তাদের দু-দিন ও দু-রাতের জন্য আটক করার নির্দেশ দেন। এক পর্যায়ে মুকাওকিস তাদের ব্যাপারে মন্দ কোনো

পরিণতির আশঙ্কায় অস্থির হয়ে ওঠে এবং তার সাথীদের জিজ্ঞাসা করেন, ‘তোমরা কি মনে করো মুসলমানরা আমাদের দূতদের হত্যা করে ফেলেছে অথবা আটকে রেখেছে? তাদের ধর্মে কি এর অনুমোদন রয়েছে?’ আর আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েছিলেন, দূতগণ যেন মুসলমানদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পায় এবং এই বোধে উন্নীত হয় যে, মুসলমানগণ দুনিয়াবি কোনো প্রাপ্তির দিকে লালায়িত নন; বরং তাদের এ রকম কোনো চিন্তাও নেই। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু দু-দিন পর দূতদের একটি চিঠি দিয়ে ফেরত পাঠালেন : আমার এবং আপনার মধ্যে কেবল তিনটি সুযোগ রয়েছে; হয় আপনারা ইসলাম গ্রহণ করবেন এবং একই অধিকার ও মর্যাদায় আমাদের ভাই হয়ে যাবেন; এটি না চাইলে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া (কর) প্রদান এবং নিজেকে পদানত মনে করতে হবে (কুরআন ৯ : ২৯ দ্রষ্টব্য); আর নতুবা আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব এবং আল্লাহর ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করব। আর তিনিই উত্তম ফায়সালাকারী (কুরআন ১০ : ১০৯ দ্রষ্টব্য)।^{৭০৩}

দূতেরা ফিরে এলে মুকাওকিস তাদের জিজ্ঞাসা করেন, ‘তোমরা তাদের কেমন দেখলে?’ তারা বলল, ‘আমরা এমন লোকদের দেখেছি যারা জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে বেশি ভালোবাসে এবং উঁচু মর্যাদা থেকে বিনয়কে বেশি ভালোবাসে। তাদের কারও মধ্যেই দুনিয়ার প্রতি কোনো লোভ বা আকাঙ্ক্ষা নেই; বরং তারা মাটিতে বসে এবং হাঁটু গেড়ে বসে আহার করে। তাদের নেতা তাদেরই একজন। উচ্চ ও নিম্ন পদবির লোকদের অথবা মনিব ও গোলামদের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। যখন নামাযের সময় হয়, তখন আর কেউ পেছনে পড়ে থাকে না। তারা অযু করে এবং একনিষ্ঠভাবে নামাযে দাঁড়ায়।’

তখন মুকাওকিস বললেন, ‘ওই সত্তার কসম, যার কসম করা হয়, তারা যদি পাহাড়ের সঙ্গেও লড়াই করতে চায়, তাহলে সেটিকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারবে। কেউই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সামর্থ্য রাখে না। আজকে আমরা যদি তাদের সঙ্গে কোনো সমঝোতায় পৌঁছতে না পারি, যেখানে তারা এখন নীল নদী দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আছে, তাহলে কাল যখন

^{৭০৩} উবাদা ইবনুস সামেত সাহাবি কাবির ওয়া ফাতিহ মুজাহিদপ্. ৯১।

তারা এ থেকে পরিত্রাণ পাবে, তখন আর সন্ধির সুযোগ থাকবে না। মুকাওকিস তার দূতদের আবার মুসলিম বাহিনীর সেনাপতির নিকট প্রেরণ করেন এবং বলেন : আপনি আমাদের নিকট আপনাদের পক্ষ থেকে কাউকে প্রেরণ করুন, যাতে তার সঙ্গে আমরা আলোচনা করে এমন একটি সমঝোতায় পৌঁছতে পারি, যা আমাদের উভয়ের জন্য কল্যাণকর হবে।’

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু দশ জনের একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করলেন। তাদের একজন ছিলেন উবাদা ইবনে আস-সামিত। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকেই মুসলমানদের পক্ষ থেকে কথা বলার নির্দেশ দিলেন। আর কঠোরভাবে তিনটির যেকোনো একটি ব্যতীত অন্য কোনো শর্তে রাজি হতে নিষেধ করলেন। কারণ, আমীরুল মুমিনীন এ রকমই নির্দেশ দিয়েছেন।

উবাদা ইবনে আস-সামিত দেখতে কালো ছিলেন। মুসলিম প্রতিনিধিদল নৌকায় চড়ে মুকাওকিসের দরবারে পৌঁছে। উবাদা ইবনে আস-সামিত কথা বলার জন্য অগ্রসর হলে তাকে দেখে মুকাওকিস ভয়ে আঁতকে ওঠেন। তিনি বলেন, ‘এই কালো রঙের লোকটাকে সরিয়ে নাও। অন্য কাউকে নিয়ে এসো, আমার সঙ্গে কথা বলুক।’ তখন মুসলিম প্রতিনিধিদলের বাকি সদস্যদের একজন বলল, ‘এই কালো লোকটিই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান। তিনি আমাদের নেতা এবং আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। আর তাকে আমাদের আমীর বানানো হয়েছে। আমরা সবাই তার পরামর্শ মেনে চলি এবং আমাদের সেনাপতি তাকেই আমাদের সর্দার নিযুক্ত করেছেন। আমরা তার নির্দেশের বাইরে যেতে পারব না।’

মুকাওকিস বলল, ‘কেমন করে তোমরা এই কালো লোকটাকে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম বলছ? বরং তার অবস্থান তো সবার নিচেই হওয়ার কথা।’ তারা বলল, ‘না। তাকে আপনি কালো দেখছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি আমাদের নিকট বেশি মর্যাদার অধিকারী। তিনি আমাদের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং আমাদের চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন। কালো হওয়া আমাদের নিকট দূষণীয় কিছু নয়।’

মুকাওকিস উবাদাকে বললেন, ‘হে কালো মানুষ, আমার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলবে। তোমার কালো রঙের কারণে আমি এমনিতেই ভীত-সন্ত্রস্ত। আর যদি কৰ্কশ ভাষায় কথা বলো, তাহলে আরও ভয় পেয়ে যাব।’

উবাদা এবার কথা বলা শুরু করলেন :

আপনি যা বলেছেন, তা আমি শুনেছি। মুসলিম বাহিনীতে আমার মতো হাজার হাজার কালো লোক রয়েছে; বরং আমার চেয়ে আরও বেশি কালো লোকও আছে। তারা দেখতে আরও ভয়াবহ। তাদের দেখলে আপানি আরও আতঙ্কিত হয়ে উঠবেন। আমার যৌবন শেষ হয়ে গেছে। এখন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি। তবু এখানো যদি এক হাজার শত্রুসেনা আমার সঙ্গে একসঙ্গে লড়তে আসে, আমি ভয় পাব না। এটি আমার সঙ্গীদের বেলায়ও সত্য। কারণ, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করছি। আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করার উদ্দেশ্য দুনিয়া কামাই করা নয় অথবা সম্পদ কুক্ষিগত করাও নয়; বরং আল্লাহ আমাদের জন্য যুদ্ধলব্ধ গণীমতের সম্পদ জায়েয করেছেন। কিন্তু কে কী পেল—স্বর্ণমুদ্রা নাকি দিরহাম—কেউ খেয়াল করে না। কারণ, আমরা এ দুনিয়ায় ক্ষুধা নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামান্য একটু খাবার এবং নিজের আব্রু ঢাকার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পোশাকই কামনা করি। আমাদের কেউ যদি তা পেয়ে যাই, তাতেই সন্তুষ্ট থাকি। আর যদি কেউ কিনতার বা স্বর্ণমুদ্রা পায়, তাহলে সে সেটি আল্লাহর পথেই ব্যয় করে এবং তার হাতে সামান্য সম্পদেই খুশি থাকে। কারণ, এ দুনিয়ার আনন্দ আসল আনন্দ নয় এবং এর ভোগ-বিলাস সত্যিকার ভোগ-বিলাস নয়; বরং আখেরাতের আনন্দ ও ভোগ-বিলাসই আসল। আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এ শিক্ষাই দিয়েছেন; তিনি বলেছেন, এ দুনিয়ায় ক্ষুধা নিবারণে প্রয়োজনীয় খাবার এবং নিজের আব্রু ঢাকার জন্য সামান্য একটু কাপড়ই যথেষ্ট। আমাদের আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং এ লক্ষ্যেই আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করা।’

এ কথা শুনে মুকাওকিস তার সভাসদদের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘এই লোক যা বলছে, এ রকম কোনো কথা কি তোমরা জীবনে কখনো শুনেছ? তার

বাহ্যিক অবয়ব দেখে আমি ভয় পেয়েছি। কিন্তু তার কথা আমাকে আরও বেশি ভীত করে তুলেছে। আল্লাহ এই লোক এবং সঙ্গীদের পুরো পৃথিবী ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেছেন। আমার মনে হয়, তারা সারা দুনিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে।’

তারপর মুকাওকিস উবাদার দিকে ফিরে বললেন, ‘হে দূত, তুমি নিজের ও তোমার সঙ্গীদের সম্পর্কে যা বলেছ, আমি শুনলাম। তোমরা তোমাদের মহান গুণাবলির জন্যই এ পর্যন্ত বিজয় অর্জন করে এসেছ। আর দুনিয়াদারদের ওপরই তোমরা প্রাধান্য বিস্তার করেছ। বাইজেন্টাইনদের অসংখ্য সৈন্য তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে আসছে। তারা বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য সুপরিচিত। তাদের কেউই শত্রুদের শক্তি-সামর্থ্যের পরোয়া করে না; বরং লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমরা জানি, তোমরা তাদের প্রতিরোধ করতে পারবে না; কারণ, তোমরা দুর্বল এবং সংখ্যায় নগণ্য। তোমরা আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান করছ। সংগত কারণেই তোমরা ক্লান্ত এবং ক্ষুধা ও কষ্টে জর্জরিত। আমরা তোমাদের দুর্বলতা ও সম্পদের স্বল্পতা দেখে দুঃখবোধ করছি। আমরা খুশি মনেই তোমাদের প্রত্যেককে দুই দিনার করে দিতে চাই; আর তোমাদের সেনাপতিকে এক শ দিনার এবং খলীফাকে এক হাজার দিনার। এগুলো নিয়ে তোমরা নিজেদের দেশে ফিরে যাও—তোমাদের ওপর এমন এক বাহিনী আক্রমণ করার আগেই, যা তোমরা মোকাবিলা করতে পারবে না।’

উবাদা ইবনে আস-সামিত বললেন, ‘নিজেকে এবং নিজের সঙ্গীদের ধোঁকা দেবেন না। বাইজেন্টাইন সৈন্যদের শক্তি-মত্তা ও সংখ্যাধিক্য এবং তাদের প্রতিরোধে আমাদের অক্ষমতার কথা বলে আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করবেন না। কারণ, এটি এমন কোনো বিষয় নয়, যা দিয়ে আপনি আমাদের ভয় দেখাতে পারেন অথবা আমাদের পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তন আনতে পারেন; বরং আপনি যা বলছেন, তা যদি সত্য হয়, তাহলে সেটিই তাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করার জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনার বিষয়। এটি আমাদের লড়াইকে আরও দৃঢ় করে তুলবে। কারণ, সেটি আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়। যদি আমরা তাতে নিহত হই, তাহলে সেটি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে এবং তিনি আমাদের জান্নাত

দান করবেন। আর এ থেকে অন্য কোনো কিছুই আমাদের নিকট বেশি প্রিয় নয়। যুদ্ধে ফলাফল যা-ই হোক, তা-ই আমাদের জন্য ভালো। আর যদি আমরা তোমাদের পরাজিত করতে সক্ষম হই, তাহলে দুনিয়ায় আমরা সফল হব; অথবা পরাজিত হলে আখেরাতে সফল হব। পরাজয়ের কারণে আখেরাতের সফলতাই আমাদের নিকট বেশি প্রিয় এবং এ জন্যই আমরা লড়াই করে যাচ্ছি। আল্লাহ বলেন,

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবিলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তাদের সঙ্গে রয়েছেন।^{৭০৪}

আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে সকাল-সন্ধ্যায় শাহাদাত লাভ ও পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে না যাওয়ার জন্য দুআ করে না। আমাদের কেউই পশ্চাতে কী ফেলে এসেছে, এ জন্য আফসোস করে না। সবাই তাদের পরিবার-পরিজন আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে এসেছে। আমরা সবাই সম্মুখপানে চেয়ে আছি। আপনি যে রকম বলেছেন, আমরা ক্ষুধা ও পরিশ্রমে কষ্টে আছি, বিষয়টি সে রকম নয়; বরং এতেই আমরা খুশি। পুরো দুনিয়াও যদি আমাদের করতলগত হয়, তাহলেও আমরা এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করি না। এখন চিন্তা করে দেখুন, আপনি কী করবেন। তিনটির বাইরে আপনার-আমাদের মধ্যে অন্য কোনো সমঝোতা সম্ভব নয়। সুতরাং এই তিনটির যেটি পছন্দ হয়, গ্রহণ করুন। নিজের মনমতো প্রস্তাব পেশ করবেন না। আমাদের সেনাপতি এই নির্দেশই দিয়েছেন। আর স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও একই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। হয় ইসলাম গ্রহণ করুন—আল্লাহর নিকট এটিই একমাত্র দীন। তার সকল নবী-রাসূল ও ফেরেশতাদের ধর্মও এই ইসলাম। আর যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ আমাদের যুদ্ধ করার হুকুম দিয়েছেন। আর যারা এতে প্রবেশ করে এবং তা ত্যাগ করে—পুনর্বীর তাতে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের সঙ্গেও লড়াই করার হুকুম দিয়েছেন। যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করবে, তার ওপর আমাদের মতো একই অধিকার ও দায়িত্ব বর্তাবে এবং আল্লাহর পথে আমাদের ভাই হিসাবে পরিগণিত হবে। যদি আপনি এবং আপনার লোকজন ইসলামে দাখিল হন, তাহলে

দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হবেন। আর আমরা যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকব এবং আপনাদের কোনো ক্ষতি করব না। আর যদি এটি না করেন, তাহলে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করে অবশ্যই জিযিয়া প্রদান করতে হবে এবং এবং নিজেকে পদানত মনে করতে হবে (কুরআন ৯ : ২৯ দ্রষ্টব্য) এবং আমরা এ জন্য আপনাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বার্ষিক হারে কর নির্ধারণ করে দেব। আর আমরা আপনাদের নিরাপত্তায় যেকোনো শত্রুর বিরুদ্ধে আপনাদের হয়ে লড়াই করব। আমরা এটি তখনই করব যখন আপনারা আমাদের নিরাপত্তায় বসবাস করবেন এবং এটি একটি চুক্তির মাধ্যমে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে সম্পন্ন করা হবে। আর যদি এটিও আপনার পছন্দ না হয়, তাহলে তরবারিই আপনাদের এবং আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবে—যতক্ষণ আমরা নিহত হই অথবা বিজয় অর্জন করি। এই তিনটি ছাড়া আপনাদের জন্য কোনো পথই খোলা নেই। এখন যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করুন।’

মুকাওকিস বললেন, ‘এটি কখনো সম্ভব নয়। তুমি যা বলেছে, তাতে আজীবন আমাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।’ উবাদা তাকে বললেন, ‘এটি আপনার বিষয়; তিনটির যেকোনো একটি গ্রহণ করতে পারেন।’ মুকাওকিস আবার জিজ্ঞাসা করেন, ‘আমরা এর বাইরে অন্য কিছু কেন বেছে নিতে পারি না?’ উবাদা হাত উঁচু করে বললেন, ‘না। আকাশ-যমীনসহ সবকিছুর পালনকর্তার শপথ, আপনাদের জন্য এই বাইরে কিছু নেই। পছন্দ আপনার।’

মুকাওকিস তার সভাসদদের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমরা কি সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছ কী করবে?’ তারা বলল, ‘কেউ কি এই অপমান মেনে নেবে? তারা আমাদের তাদের ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে চাচ্ছে—এটা তো কখনো সম্ভব নয়। আমরা যিশুর ধর্ম ত্যাগ করে এমন ধর্ম গ্রহণ করব না যেটি সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। আর তারা যে আমাদের পদানত করে সারা জীবনের জন্য গোলাম বানিয়ে রাখতে চাচ্ছে—এর থেকে মৃত্যুই শ্রেয়। তারা যদি আমাদের নিকট আরও বেশি ধন-দৌলত কামনা করে, তাহলে আমরা সেটি দিতে প্রস্তুত আছি। আর সেটিই উত্তম।’ মুকাওকিস উবাদাকে বললেন, ‘আমার লোকেরা তোমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। এখন তুমি কী করবে? তুমি তোমাদের সেনাপতির

নিকট ফিরে যাও এবং তাকে বলো, আমরা তোমাদের আশাতীত ধন-সম্পদ দিতে চাই এবং সেগুলো নিয়ে তোমরা বিদায় হও।’

উবাদা এবং তার সঙ্গীরা মুকাওকিসের দরবার থেকে বিদায় নেয়। তারা চলে গেলে মুকাওকিস তার লোকজনকে বললেন, ‘আমার কথা শোনো এবং লোকজনকে তিনটির যেকোনো একটি মেনে নিতে বলো। আল্লাহর কসম, কোনো শক্তিই তাদের মোকাবিলা করতে পারবে না। যদি তোমরা তাদের নিকট স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করো, তাহলে অনিচ্ছায় এর চেয়ে কঠিন বিপদ ডেকে আনবে।’ তারা জিজ্ঞাসা করল, ‘আমরা কোনটি গ্রহণ করব?’ তিনি বললেন, ‘আমি তোমাদের বলে দেব। ধর্মাস্তরিত হতে আমি বলব না। আর যুদ্ধের ক্ষেত্রে তোমরা তাদের কখনো পরাজিত করতে পারবে না। কারণ, তারা যা করে, তা তোমাদের করার যোগ্যতাই নেই। সুতরাং তৃতীয় উপায় ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই; জিযিয়া প্রদান।’ তারা বলল, ‘তাহলে কি আমরা চিরকাল তাদের দাস হয়ে থাকব?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ। দাস হবে ঠিকই, কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের পূর্ণ অধিকার ও রাজত্ব থাকবে। তোমাদের সম্পদ, পরিবার-পরিজন সবই নিরাপদ থাকবে। তোমাদের সকলের মৃত্যুবরণ অথবা যুদ্ধবন্দী হয়ে তুমি, তোমার স্ত্রী ও সন্তানসহ চিরকালের জন্য দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া থেকে এটি অনেক ভালো।’ তারা বলল, ‘এ থেকে মৃত্যুই শ্রেয়।’^{৭০৫}

উবাদা এবং মুকাওকিসের মধ্যে কথোপকথন থেকে উবাদার ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তার বিরোধী-পক্ষ তাকে যদিকে আহ্বান করছিল, তিনি তা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। তারা যে প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ভিন্নখাতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, তা তাকে প্রভাবিত করেনি। আলোচনার সময় উবাদা মুকাওকিসকে ইসলামের দিকে আহ্বান ও ঈমান আনার ক্ষেত্রে উৎসাহ দিতে ভুলে যাননি। তিনি তার সামনে অন্যান্য ধর্ম ও জাতির প্রতি ইসলামের উদারতাও ভুলে ধরেন। এতে মুকাওকিসের ওপর ভালো প্রভাব পড়ে এবং শান্তিচুক্তি করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন।^{৭০৬}

^{৭০৫} আন-নুযুম আজ-জাহিরা মূলুক মিসর ওয়াল কাহিরা, ১/১০-১৬।

^{৭০৬} আল-আনসার ফিল আসরির রাশিদি, পৃ. ২১১।

৩.২। মিসর বিজয়ে কিছু রণকৌশল

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু মিসর বিজয়ে অনেকগুলো রণকৌশল প্রয়োগ করেন। নিচে এর কয়েকটি আলোচনা করা হলো।

৩.২.১। মনস্তাত্ত্বিক লড়াই

মুকাওকিস ব্যবলিয়ন দুর্গের দেয়াল রক্ষায় নারীদের শহরের দিকে এবং সশস্ত্র লোকদের মুসলিম বাহিনীর দিকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর আদেশ জারি করেন, যাতে মুসলমানদের ভয় দেখানো যায়। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু দূত প্রেরণ করে তার উদ্দেশ্যে বলেন, ‘তোমরা যেসব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে, তা আমরা অবগত আছি। কিন্তু আমরা সংখ্যাধিক্যবলে কখনো শত্রুদের পরাজিত করিনি। আমরা তোমাদের সশ্রাটের মুখোমুখি হয়েছি এবং তোমরা জানো, তার কী পরিণতি হয়েছে।’ মুকাওকিস তার সঙ্গীদের বললেন, ‘এই লোকগুলো সত্য বলেছে। তারা আমাদের সশ্রাটকে তার রাজ্য থেকে উৎখাত করেছে এবং কসটান্টিনোপলে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। তাদের নিকট আমাদের আত্মসমর্পণ করাই উচিত।’^{৭০৭} আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এমন একজন সেনাপতি, যিনি শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য মনস্তাত্ত্বিক লড়াই করেছেন এবং ফলে তাদের যুদ্ধ করার আগ্রহই কমে গিয়েছে। যুদ্ধে তিনি প্রথমে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করতেন, তারপর নিজের বুদ্ধিমত্তা, রণকৌশল ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে একটি লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যেতেন। আর সেটি হলো নিশ্চিত বিজয়।^{৭০৮}

৩.২.২। এমবুশ এবং সারপ্রাইজ এট্যাক

আয়ান শামসের যুদ্ধে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এমবুশ ও সারপ্রাইজ এট্যাক পদ্ধতিও ব্যবহার করেছেন। তিনি এসব পদ্ধতি প্রয়োগের সময় পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন, যা সফলতা বয়ে আনে। তিনি এমবুশ টিমকে রাতেই সুনির্দিষ্ট স্থানে পাঠিয়ে দেন, যা তিনি ভালোভাবেই বেছে

^{৭০৭} আল-হারবুন নাফসিয়্যাহ, ড. আহমাদ নওফেল, পৃ. ১৭৪।

^{৭০৮} প্রাগুক্ত।

নিয়েছিলেন। তিনি তাদের জন্য আক্রমণের সময়ও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। যখন উভয়পক্ষ যুদ্ধে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছে, তখন ডান-বাম থেকে এমবুশ টিম হঠাৎ করে শত্রুদের ওপর আক্রমণ করে বসে। তিনি আক্রমণের জন্য সঠিক স্থান ও সময় নির্ধারণ করেছিলেন। এভাবে এমবুশ টিমকে সুনিপুণভাবে পরিচালিত করায় ইতিহাসে এটি সবচেয়ে সফল এমবুশ হিসাবে স্থান করে নেয়।^{৭০৯}

৩.২.৩। অবরোধের সময় এমবুশ

ব্যবলিয়ন দুর্গ অবরোধের সময়ও তিনি সফলভাবে এমবুশ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। বাইজেন্টাইনরা নিশ্চিত ছিল যে, সুদৃঢ় প্রাচীর ও কঠোর প্রতিরোধের মুখে মুসলিম বাহিনী তাদের কোনো ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। তাদের রসদ সরবরাহে কোনো ঘাটতি ছিল না, প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্রও মজুদ ছিল, নিরাপত্তা জোরদার করতে তারা প্রাচীরের গেইটগুলোর কাছে ধারালো পেরেক পুঁতে রেখেছিল এবং প্রাচীর ঘেঁষে নির্মাণ করেছিল গভীর পরিখা। তবে নীল নদীর পানির মাত্রা কমে গেলে পরিখায়ও পানি কমে যেত। এ রকম এক দিন হঠাৎ করেই যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু একদল সাহসী সেনাদল নিয়ে দেয়াল টপকে তাকবীর-ধ্বনি দিয়ে ওঠেন। শত্রুরা অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা পড়ে যায় এবং তরবারির আঘাতে নিহত হতে থাকে। গেইটের প্রহরীরা পরাজিত হয় এবং শান্তিচুক্তি করার জন্য অনুরোধ করে ও নিরাপত্তা চায়। আর এতে মুসলিম বাহিনী বিজয়ী বেশে শহরে প্রবেশ করে।^{৭১০}

৩.২.৪। অবরোধের সময় ধৈর্যধারণ

কিরয়ুন এবং আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধের সময় আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অন্যতম অস্ত্র ছিল ধৈর্য। কিরয়ুনে বাইজেন্টাইনরা নিজেদের দুর্গে প্রতিরোধ গড়ে তুললে বিজয় অর্জন কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি একবার আক্রমণ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সেটি ব্যর্থ হয়। এ জন্য তিনি খণ্ডযুদ্ধেই সীমাবদ্ধ ছিলেন এবং কালক্ষেপণ করছিলেন যাতে রসদ ও

^{৭০৯} আল-ফানুল আসকারিল ইসলামি, পৃ. ৩২০।

^{৭১০} প্রাপ্ত।

যুদ্ধান্ত্র সরবরাহ কমে গেলে শত্রুদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে। মূলত এ রকমই হয়েছিল। অবরোধ দশ দিন পর্যন্ত চলতে থাকলে বাইজেন্টাইনরা বুঝতে পারে যে, মুসলিম বাহিনী এটি অব্যাহত রাখার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর এবং তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে দুর্গ হস্তান্তর করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধের সময়ও একই ঘটনা ঘটে। তবে সেখানে অবরোধ আরও দীর্ঘ সময় ধরে চলে; তিন মাস। কারণ, বাইজেন্টাইনরা পুরোপুরি সজাগ ছিল যে, এটিই তাদের সেনাবাহিনী বা সাম্রাজ্যের সর্বশেষ বাঁচা-মরার লড়াই; যদি তারা আলেকজান্দ্রিয়া ধরে রাখতে না পারে, তাহলে পুরো মিসর ও উত্তর আফ্রিকা হাতছাড়া হয়ে যাবে। বস্তুত তা-ই হয়েছিল।^{৭১১}

৩.৩। খলীফার নিকট বিজয়ের সংবাদ প্রেরণ

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু মুআবিয়া ইবনে খাদিজকে বিজয়ের সংবাদ দিয়ে আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট প্রেরণ করেন। মুআবিয়া তাকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘আপনি তাকে চিঠি দিচ্ছেন না কেন?’ আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমি কেন চিঠি লেখব? তুমি কি আরব নও, যে কিনা এ খবর পৌঁছাতে পারবে? তুমি কি সবকিছু দেখেনি?’

মুআবিয়া ইবনে খাদিজ আমীরুল মুমিনীনের নিকট এসে আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের সকল ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেজদায় পড়ে যান এবং বলেন, ‘আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা।’ খলীফাকে বিজয়ের সংবাদ জানানোর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে মুআবিয়া ইবনে খারিজ বলেন : আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বিজয়ের সংবাদ দিয়ে খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। আমি মদীনায় মসজিদে নববীতে পৌঁছে গেলাম এবং সেখানেই বসে ছিলাম। তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ি থেকে একজন দাসী বের হয়ে আসে এবং আমার দেহে সফরের পোশাক ও চেহারায় ক্লান্তির ছাপ দেখতে পায়। সে কাছে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, ‘আপনি কে?’ আমি বললাম, ‘আমি মুআবিয়া ইবনে খারিজ, আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর দূত।’

^{৭১১} প্রাণ্ডু, পৃ. ৩২০।

তারপর সে চলে যায়। একটু পর সে আবার খুব দ্রুত আমার দিকে আসতে থাকে। আমি তার পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। সে এসে বলে, ‘চলুন। খলীফা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।’

আমি তাকে অনুসরণ করে পেছনে পেছনে গেলাম এবং ঘরে প্রবেশ করতেই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে পেলাম। তিনি তখন এক হাতে চাদর ধরে আছেন, আর আরেক হাতে নিজের লুঙ্গি বাঁধছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কী খবর নিয়ে এসেছ?’ আমি বললাম, ‘হে আমীরুল মুমিনীন, খুশির সংবাদ। আল্লাহ আমাদের আলেকজান্দ্রিয়ায় বিজয় দান করেছেন।’ তিনি আমাকে মসজিদে নিয়ে গেলেন। মুআযযিনকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন, ‘তুমি জোরে লোকজনকে নামাযের জন্য ডাকো।’

তারপর লোকজন জমা হলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বললেন, ‘দাঁড়াও। সকলকে বিজয়ের ঘটনা শোনাও।’ সুতরাং আমি দাঁড়িয়ে আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের পুরো ঘটনা তুলে ধরলাম। তারপর খলীফা নামায আদায় করলেন এবং নিজের ঘরে গিয়ে কিবলার দিকে ফিরে দুআ করলেন। তারপর তিনি বসে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে বাঁদি, খাওয়ার কিছু আছে?’ তখন সে কিছু রুটি ও তেল নিয়ে এল। খলীফা আমাকে সেখান থেকে খেতে বললেন। আমি সামান্যই খেলাম। কারণ, আমি লজ্জা পাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, ‘খাও। মুসাফিররা খাবার খেতে ভালোবাসে। আমার খাবারের প্রয়োজন থাকলে আমি তোমার সঙ্গে খেতাম।’ তারপরেও আমি লজ্জায় বেশি খেতে পারলাম না।

খলীফা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে মুআবিয়া, মসজিদে এসে তুমি কি বলেছ?’ আমি বললাম, ‘আমি ভেবেছি, সম্ভবত খলীফা বিশ্রাম নিচ্ছেন।’ তিনি বললেন, ‘এ রকম বলা ঠিক হয়নি। এ রকম চিন্তাও ঠিক নয়। আমি যদি দিনে ঘুমাই, তাহলে প্রজাদের অবহেলা করলাম। আর যদি রাতে ঘুমাই, তাহলে নিজের প্রতি যুলুম করলাম। এই দুটি অবস্থা সামনে রেখে আমি কীভাবে ঘুমাব, হে মুআবিয়া?’^{৭১২}

এই ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের স্বর্ণযুগে মসজিদই ছিল রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর আদান-প্রদানের কেন্দ্র। আযান (আসসালাতু

^{৭১২} ফুতুহ মিসর ওয়াল মাগরিব, পৃ. ১০৫।

জামিয়াতুন) শুনে মুসলমানগণ সেখানে জমা হতেন। এই আযানে বোঝানো হতো, মুসলমানদের অবগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোনো সংবাদ রয়েছে। তারা জমা হলে রাষ্ট্রের সামরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ফরমান পড়ে শোনানো হতো। এ ঘটনা থেকে খলীফা হিসাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবন-পদ্ধতি সম্পর্কেও জানা যায়; যেমনটি মুআবিয়া ইবনে খারিজ বলেন, ‘আমি যদি দিনে ঘুমাই, তাহলে প্রজাদের অবহেলা করলাম। আর যদি রাতে ঘুমাই, তাহলে নিজের প্রতি যুলুম করলাম। এই দুটি অবস্থা সামনে রেখে আমি কীভাবে ঘুমাব, হে মুআবিয়া?’ এ কথা থেকে প্রমাণিত হয়, তিনি নিজের হক এবং প্রজাদের হক সম্পর্কে পুরোপুরি যত্নবান ছিলেন। যদি কোনো মুসলমান এই দুটোর সম্মিলন ঘটাতে পারে, তাহলেই তিনি একজন সত্যিকার নেককার বান্দায় পরিণত হবেন।^{৭১৩}

০.৪। প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে উমর রা.-এর সর্বাত্মক চেষ্টা

বিজয়ী মুসলিম বাহিনী যখন বিলহীবে পৌঁছল, তখন তাদের হাতে যুদ্ধবন্দীরাও ইয়েমেনে গিয়ে পৌঁছে।^{৭১৪} এ-সময় আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক মুসলিম সেনাপতি আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট লিখে পাঠান : আমি আপনাদের চেয়ে ঘৃণিত শাসকদের জিযিয়া প্রদান করি; পার্সিয়ান এবং বাইজেন্টাইন। আমি আপনাদের জিযিয়া দিতেও রাজি আছি। তবে সেটি এই শর্তে যে, আমাদের দেশ থেকে যাদের আপনারা বন্দী করে নিয়ে গিয়েছেন, তাদের ফেরত দিতে হবে।’ আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ শর্ত পূরণ করার অনুমতি চেয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট চিঠি প্রেরণ করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জবাব না আসা পর্যন্ত উভয়পক্ষ যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে লেখেন : বস্তুত গনীমতের মালের চেয়ে জিযিয়া আমাদের নিকট বেশি প্রিয়। কারণ, গনীমতে মাল বণ্টন করার পর সেগুলোর অস্তিত্বই ছিল না। আর যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে এই শর্তারোপ করুন যে, তাদের সশ্রুট জিযিয়া প্রদান করতে চাইলে বন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তবে তাদের এই অধিকার থাকবে যে, তারা চাইলে ইসলাম গ্রহণ করতে পারবে, অথবা

^{৭১৩} আত-তারিখুল ইসলামি, আল-হামিদি, ১১-১২/৩৪৮-৩৪৯।

^{৭১৪} উল্লেখ্য, ইয়েমেনে তখন এ ধরনের বন্দীদের কেনা-বেচা হতো।

নিজেদের ধর্মে থাকতে পারবে। যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা মুসলিম হিসাবে সব অধিকার ভোগ করবে। আর যারা আগের ধর্মেই থাকবে, তাদের ওপর জিযিয়া আরোপ করবেন। তবে যারা দাস হিসাবে ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় চলে গিয়েছে, তাদের আমরা ফিরিয়ে দিতে পারব না।’

আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আলেকজান্দ্রিয়ার সশ্রাটের নিকট এই প্রস্তাব পেশ করেন এবং তিনি তা মেনে নেন। পরবর্তী সময়ে মুসলমানগণ বন্দীদের একত্র করেন। সেখানে খ্রিস্টানরাও এসে জমা হয়। তারা বন্দীদের এক করে সবাইকে সুযোগ দেওয়া হয়। যখনই কেউ ইসলাম পছন্দ করত, তখনই মুসলমানগণ তাকবীর দিয়ে উঠতেন। আর যখন কেউ খ্রিষ্টধর্মকেই বেছে নিত, তখন মুসলমানগণ আফসোস করতেন এবং তার ওপর জিযিয়া আরোপ করতেন।^{৭১৫}

এ ঘটনা থেকে সাহাবীদের দুনিয়ার প্রতি চরম বিমুখতার পরিচয় পাওয়া যায়। তারা কেবলই আখেরাতের দিকে ধাবিত ছিলেন। তারা একনিষ্ঠভাবে মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। কারণ, বন্দীদের ইসলাম গ্রহণ করাতে মুসলমানদের দুনিয়াবি কোনো সম্পদের মালিক হওয়ার সুযোগ ছিল না; বরং তারা যদি তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মে থেকে যেত, তাহলে তার নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করা সম্ভব হতো। এতৎসত্ত্বেও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বন্দীদের ইসলাম অথবা জিযিয়া বেছে নেওয়ার সুযোগ দিতে আদেশ দিয়েছেন। এ আদেশ যখন পালন করা হয়, তখন দেখা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য মুসলমানগণ বন্দীদের কেউ ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলে যুদ্ধ বিজয়ের আনন্দের চেয়েও অধিক জোরে তাকবীর-ধ্বনি দিয়েছেন। আর অন্যদিকে কেউ তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মে থেকে গেলে তারা অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

উল্লেখ্য, সাহাবায়ে কেরাম প্রতিশ্রুতি পালনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যেমন বলেছেন, ‘তবে যারা (দাস হিসাবে ইতিমধ্যে) বিভিন্ন জায়গায় চলে গিয়েছে, তাদের আমরা ফিরিয়ে দিতে পারব না।’ আরেক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেছেন, ‘আমরা তার সঙ্গে এমন শর্তে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করতে চাই না, যা আমরা পূরণ করতে সক্ষম নই।’^{৭১৬}

^{৭১৫} আল-কামিল ফিত তারিখ, ২/১৭৭।

^{৭১৬} আত-তারিখুল ইসলামি, ১২/৩৫১।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যেকোনো চুক্তি করার আগে তার শর্তসমূহের বাস্তবতা যাচাই করতেন যাতে পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের শর্তপূরণে অপরাগতা প্রদর্শন করতে না হয়। এ থেকেই তাদের সুউচ্চ ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়—যা বিজয়ের পূর্বশর্ত—কারণ, যদি কেউ কোনো কিছু নিজের ওপর আবশ্যক করে নেয় এবং পরে সেটি পূরণে অপারগ হয়ে ওঠে, তাহলে হয়তো সেটি ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু যদি পূর্ব থেকেই সতর্ক থাকে যেন তাকে পরে অপারগতা প্রকাশ করতে না হয়, তাহলে সেটি তার দূরদর্শিতা এবং দৃঢ় পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচ্য।^{৭১৭}

৩.৫। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.

আমরা রাযিয়াল্লাহু আনহু আলেকজান্দ্রিয়া অভিযানে অভিযান পরিচালনার সময় পথে বিভিন্ন জায়গায় শত্রুর মুখোমুখি হন এবং এতে বিজয় লাভ করেন। উল্লেখ্য, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কিরয়ুন যুদ্ধে বেশ কয়েকবার মারাত্মকভাবে আহত হন। তখন তার পিতার পক্ষ থেকে দূত এসে তার খোঁজখবর নিলে তিনি কবিতার মাধ্যমে এর জবাব দিতেন :

اقول اذا ما جاءت النفس اصبري فعيا قليل تحدى أو تلامي

যখন ব্যথা খুব বেশি বেড়ে যায়, তখন আমি নিজেকে বলি
ধৈর্যধারণ করো; কারণ, শীঘ্রই তুমি প্রশংসিত অথবা অপমানিত
হবে।

দূত ফিরে গিয়ে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এ কথা জানালে তিনি বলেন,
‘সত্যিই সে আমার ছেলে।’^{৭১৮}

এ রকমই ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত। তিনি তার জ্ঞান ও ইবাদতের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সাহস ও ধৈর্য দিয়ে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতেন।^{৭১৯}

^{৭১৭} প্রাগুক্ত, ১২/৩৫১।

^{৭১৮} ফুতুহ মিসর, পৃ. ৫৭।

^{৭১৯} আত-তারিখুল ইসলামি, ১২/৩৩০।

৩.৬। মিসরে খলীফার জন্য একটি বিশ্রামাগার নির্মাণ

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফাকে অবহিত করেন যে, ‘আমরা আপনার জন্য মসজিদের পাশে একটি বিশ্রামাগার নির্মাণ করেছি।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর জবাবে লেখেন, ‘আমি তো হেজাজে থাকি। মিসরে বাড়ি দিয়ে আমি কী করব?’ তিনি এতে আদেশ দেন, ‘ওই জায়গায় মানুষের জন্য হাট-বাজার বানিয়ে দাও।’^{৭২০}

এ ঘটনা থেকে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিজেকে সংযত করা এবং তার দুনিয়াবিরাগী মানসিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে। যদি কোনো নেতা বা শাসক নিজেকে দুনিয়ার লোভ-লালসার উর্ধ্বে রাখে, তাহলে তার অধীনদের জন্য এসব বিষয় থেকে আরও দূরে থাকা উচিত।^{৭২১}

৩.৭। মুসলমানদের কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি পুড়িয়ে ফেলার অর্থোডক্স দাবি

ড. আব্দুর রহীম মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ বলেন : আমরা নির্ভরযোগ্য এমন কোনো তথ্য-উপাত্ত বা বর্ণনা পাইনি যেখানে বলা হয়েছে যে, আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি পুড়িয়ে ফেলেছেন। কেবল ইবনে আল-কাফতির একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, যিনি ইবনে আল-আবারি (মৃ. ৬৮৫ হি./১২৮৬ খ্রি.) যেখানে বলা হয়েছে : ইয়াহইয়া আল-নাহাবিয়ে—মুসলমানদের হাতে পতনের পূর্ব পর্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী ছিল—আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে যান। ইয়াহইয়া তার জ্ঞানের জন্য পরিচিত ছিলেন। সুতরাং আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে সম্মান করেন এবং তার নিকট থেকে অনেক দার্শনিক কথা শোনেন, যেগুলোর সঙ্গে আরবরা পরিচিত ছিল না।’ ইবনে আল-কাফতি এ ঘটনার শেষে বলেন, ‘আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন, ‘আপনি আমাদের নিকট কী চান?’ তিনি বলেন, ‘রাজপ্রাসাদের লাইব্রেরিতে যেসব দর্শনের কিতাব রয়েছে, সেগুলো আমাকে দিয়ে দেন।’ তখন লাইব্রেরিতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার এক শ বিশটি কিতাব ছিল। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু

^{৭২০} ফুতুহ মিসর, পৃ. ৬৯।

^{৭২১} আত-তারিখুল ইসলামি, ১২/৩৫৬।

এই দাবিকে বাড়াবাড়ি মনে করে তিনি বলেন, ‘আমি খলীফার নির্দেশ ব্যতীত এ রকম আদেশ দিতে পারব না।’ তিনি খলীফার নিকট এ বিষয়ে চিঠি প্রেরণ করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর জবাবে লেখেন : তুমি কিতাবের ব্যাপারে তুমি যা লেখেছ, এসব কিতাবের বিষয়বস্তু যদি কুরআনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়, তাহলে সেগুলো রাখা যেতে পারে। আর যদি কোনো কিতাবের বিষয়বস্তু কুরআনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে সেগুলো আমাদের প্রয়োজন নেই। সুতরাং সেগুলো ধ্বংস করে ফেলো।’ এ নির্দেশ পাওয়ার পর আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ওইসব কিতাব আলেকজান্দ্রিয়ার গোসলখানায় প্রেরণ করতে শুরু করেন যাতে সেখানে পানি গরম করার কাজে কিতাবগুলো ব্যবহার করা যায়। আমি গোসলখানার সংখ্যা জানতাম, কিন্তু এখন ভুলে গিয়েছি। লোকজন আমাকে বলেছে, সবগুলো কিতাব পুড়িয়ে ফেলতে ছয় মাস সময় লেগেছে। এ ঘটনা শুনে আমি বিস্ময় প্রকাশ করলাম।^{৭২২}

তবে ইবনে আল-কাফতি এবং ইবনে আল-আবারির পূর্বেও এই কিতাব পোড়ানোর ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। আব্দুল লতীফ আল-বাগদাদী (মৃ. ৬৪৯ হি./১২৩১ খ্রি.) বলেন, ‘আলেকজান্দ্রিয়া শহর গড়ে তোলার সময়ই আলেকজেন্দার একটি বিশাল লাইব্রেরি নির্মাণ করেন। এই লাইব্রেরির সব কিতাব আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশে পুড়িয়ে ফেলেন।’^{৭২৩}

এসব বর্ণনা বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ লক্ষ করা যায় :

- ✓ ১। এই তিনটি বর্ণনা অথবা বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোনো যোগসূত্র নেই, যদিও তারা একই সময় দুনিয়াতে ছিলেন।
- ✓ ২। এসব বর্ণনায় কোনো রাবীর নাম উল্লেখিত হয়নি; বরং এটি পরিকার যে, এসব বর্ণনা স্বয়ং লেখকেরই কল্পনাপ্রসূত বর্ণনা।
- ✓ ৩। মিসর বিজয় ও আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগ থেকে অনেক পরে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং আমরা

^{৭২২} আমর ইবনুল আস আল-কাইদ ওয়াস সিয়াসি, পৃ. ১৩৩।

^{৭২৩} প্রাক্তক, পৃ. ১৩৪।

নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি এ ঘটনা পুরোটাই ভিত্তিহীন এবং এতে নিচের মন্তব্যসমূহ করা যায় :

- ✓ ৪। মিসর ও মিসর বিজয়ের ইতিহাস যারা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাদের কেউ এই ঘটনা বর্ণনা করেননি। এসব ইতিহাসবিদ উল্লেখিত তিনজন লেখকের কয়েক শতাব্দী আগেই দুনিয়াতে এসেছিলেন।
- ✓ ৫। আল-ওয়াকিদী, আত-তাবারি, ইবনে আসির কিংবা ইবনে খালদুন কেউই এ ঘটনা বর্ণনা করেননি। ইবনে আব্দুল হাকাম এবং এমনকি ইয়াকুত আল-হামাবিও আলেকজান্দ্রিয়ার বর্ণনায় এর উল্লেখ করেননি।
- ✓ ৬। ক্রুসেডের সময়ই বাগদাদীর মাধ্যমে এই ঘটনাটির সূত্রপাত। সম্ভবত তিনি চাপের মুখে এই ভিত্তিহীন ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন অথবা পরবর্তী সময়ে অন্য কেউ লিখে তার দিকে তা সম্পৃক্ত করেছে।
- ✓ ৭। আর যদি এ ধরনের কোনো লাইব্রেরির অস্তিত্ব থেকেই থাকে, তাহলে বাইজেন্টাইনরা আলেকজান্দ্রিয়া ত্যাগ করার সময় সেগুলো সঙ্গে নিয়ে গেছে এবং সম্ভবত তারা তা করেছে।
- ✓ ৮। দীর্ঘ ছয় মাস ধরে না পুড়িয়ে আমার রাযিয়াল্লাহু আনহু চাইলে মুহূর্তেই কিতাবগুলো সমুদ্রে ফেলে দিতে পারতেন। আর এটিই ঘটনাটি ভিত্তিহীন হওয়ার মূল কারণ। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আমার রাযিয়াল্লাহু আনহু এ ঘটনার ব্যাপারে কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট নন। এগুলো ওইসব লোকদের বানানো কিচ্ছাকাহিনি, যারা বাড়িয়ে বলতে পছন্দ করে এবং তারাই কল্পনাপ্রসূত এসব কাহিনি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছে যা আসলে কখনো ঘটেনি।^{৭২৪}

৩.৮। আমার ইবনুল আস রা. এবং পাদরি বিন ইয়ামিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ

ইতিহাসবিদ ইবনে আব্দুল হাকাম বলেন, আলেকজান্দ্রিয়ায় একজন কিবতি পাদরি বসবাস করতেন, যার নাম বিন ইয়ামিন। খ্রিস্টান বাইজেন্টাইনদের হাতে ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব হওয়ায় তিনি মরুভূমিতে

পালিয়ে গিয়েছিলেন। যখন তিনি শুনলেন যে, মুসলিম সেনাপতি আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু মিসরে আগমন করেছেন, তখন তিনি কিবতিদের নিকট একটি চিঠি প্রেরণ করেন। তাতে তিনি লেখেন যে, বাইজেন্টাইনরা আর তাদের ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে না এবং শীঘ্রই তাদের সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে। সুতরাং তিনি তাদের আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে স্বাগত জানানোর আহ্বান করেন।

বলা হয় যে, ফারমা যুদ্ধের দিন কিবতিরা আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য আনসারদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।^{৭২৫} ওই সময় কিবতি ইতিহাসবিদ সাবিরি ইবনে আল-মুকান্না কিবতিদের সর্দার ছিলেন এবং বিন ইয়ামিনের অনুপস্থিতিতে চার্চের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বিন ইয়ামিনের অজ্ঞাত স্থানের সন্ধান বলে দেন। এটিও বলেন, তিনি বাইজেন্টাইনদের ভয়েই পালিয়ে গিয়েছেন। তখন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার নিযুক্ত প্রশাসকদের লিখে পাঠালেন তারা যেন বিন ইয়ামিনকে খুঁজে বের করে এবং তাকে নিজ এলাকায় চার্চ ও লোকজনের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রেরণ করে। এতে তার ভয়ের কোনো কারণ নেই এবং তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তার অঙ্গীকার রয়েছে। এ খবর পেয়ে বিন ইয়ামিন তেরো বছরের স্বেচ্ছা নির্বাসনের অবসান ঘটিয়ে অত্যন্ত খুশিমনে আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরে আসেন। তখন সমগ্র শহরর লোকজন তাকে পেয়ে আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠে। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ফিরে আসার সংবাদ পেয়ে তাকে পূর্ণ সম্মান ও ইযযতের সঙ্গে তার সামনে হাজির করতে বলেন।

বিন ইয়ামিনকে দেখে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে তার প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করেন এবং সঙ্গীদের বলেন, ‘এ শহর অধিগ্রহণ পর থেকে তার মতো মানুষ আমি আর দেখিনি।’ বিন ইয়ামিন দেখতে খুব সুদর্শন ছিলেন। কথা-বার্তায়ও খুব মার্জিত ছিলেন। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে লক্ষ করে বলেন, ‘আপনার চার্চ ও লোকজনের দেখভাল করুন; তারা সবাই আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে এবং তাদের ব্যাপারাদির ব্যাপারে আপনিই দায়িত্বশীল।’

^{৭২৫} ফুতুহ মিসর ওয়া আখবারুহু, পৃ. ৭৩-৭৪।

প্রফেসর আশ-শারকাবি মন্তব্য করেন, ‘আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে সঙ্গে রাখেন, যতক্ষণ-না তাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় এবং মিসর বিজয়ী আরবরা প্রশান্তি অনুভব করে। তাদের গভর্নর আমর ইবনুল আস প্রথম জুমুআয় লোকজনের উদ্দেশে বক্তব্যে বলেন, ‘তোমাদের পড়শি কিবতিদের সঙ্গে ভালো আচরণ করবে। কারণ, তাদের নিরাপত্তা তোমাদের হাতে এবং বিবাহের সূত্রে তারা তোমাদের আত্মীয়ও বটে। সুতরাং তাদের কোনো ক্ষতি করবে না। তাদের মহিলাদের দিকে কোনো কুনজর দেবে না; বরং নজর নিচে রাখবে।’^{৭২৬}

উমর রা.-এর বিজয় অভিযানসমূহ থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

৪.১। ইসলামী বিজয়ের প্রকৃতি

অনেক প্রাচ্যবিদ ও খ্রিস্টান ইতিহাসবিদ খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সংঘটিত ইসলামী বিজয় অভিযানসমূহকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছে। তারা দাবি করে, এসব অভিযান ছিল ধর্মীয় যুদ্ধ। তারা নির্দিষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী হলেও ধর্মাত্মতার বশবর্তী হয়ে লোকজনকে জোর করে অধীন ও তাদের ধর্মীয় বিধান মানতে বাধ্য করে এবং নির্মম রক্তপাতে মেতে ওঠে। তারা আরও দাবি করে, মুসলমানগণ এক হাতে কুরআন এবং আরেক হাতে তরবারি বহন করত।^{৭২৭} যারা এসব ভ্রান্ত মতাদর্শ প্রচারে লিপ্ত ছিল, তাদের মধ্যে সিডিও, মুইর এবং নিপুর উল্লেখযোগ্য। মুইর নিপুরের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলে, ‘ইসলাম ধর্মের টিকে থাকার স্বার্থে একের পর এক আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অপরিহার্য ছিল এবং তারা তরবারির জোরে সব লোকজনকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে থাকে, অথবা নিদেনপক্ষে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রভাব বিস্তার করে। তবে যেকোনো ধর্মের অনুসারীদের জন্য এক পর্যায়ে যুদ্ধ এড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে এবং ইসলামের ক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছিল।’

কিন্তু তাদের এই দাবি—মুসলমানগণ জোরজবরদস্তি করে ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছে কিংবা তারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে বেশি আক্রমণাত্মক ছিল—সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অযৌক্তিক।^{৭২৮} কিছু প্রাচ্যবিদ এ

^{৭২৭} তারিখুল আরাবিলা আম, সিডিও, পৃ. ১৩৩।

^{৭২৮} ফাতহু মিসর বায়নার রুয়াতিল ইসলামিয়া ওয়ার রুয়াতিন নাসরানিয়াহ, পৃ. ১২৬।

দাবির অসারতা বর্ণনা করেছেন এবং তারা দেখিয়েছেন, ইসলামের বিজয়সমূহ ছিল মানবতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ভন ক্রিমার বলেন, ‘মুসলিম আরবগণ তাদের যুদ্ধে চমৎকার মানবিক আচরণ প্রদর্শন করেছেন। তাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাদরি, মহিলা, শিশু, অন্ধ কিংবা প্রতিবন্ধীদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি তাদের শস্য ও গাছ কেটে ফেলতেও নিষেধ করেছেন। মুসলমানগণ পরবর্তী সময়ে সকল যুদ্ধে এ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন। তারা কোনো পবিত্র স্থান কিংবা ফসলের ক্ষতি করেনি। তবে বাইজেন্টাইনরা মুসলমানদের দিকে বিষযুক্ত তির নিক্ষেপ করেছে। তারা শত্রুদের প্রতি বিন্দুমাত্র সহমর্মিতা প্রদর্শন করেনি। শহর লুটতরাজ করা এবং তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া বাইজেন্টাইনদের জন্য ছিল খুবই স্বাভাবিক কাজ, যা তারা অগ্রসর বা পালিয়ে যাওয়া—উভয় ক্ষেত্রেই করেছে। কিন্তু মুসলমানগণ তাদের আদর্শ মেনে চলেছে এবং এসব কর্মকাণ্ডের কোনোটি কখনো করার চেষ্টা করেনি।’^{৭২৯}

রোসেনথাল বলেন, ‘অন্য ভূখণ্ডে ইসলামের বিস্তৃতি, অন্যকে ইসলামের দিকে আহ্বান এবং ভিন্ন ধর্মের চিন্তাশীল জাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্তি-তর্ক করা—সবকিছুই ঘটেছে। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, ইসলামের বিজয় ভাষা ও কৃষ্টি-কালচারের প্রাচীন সব বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হয় এবং এটি সকল মানুষ ও সভ্যতার সামনে এক বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের দৃষ্টান্ত পেশ করে, যার ভিত্তি ছিল পরিপূর্ণ সাম্য ও স্বাধীনতা।’^{৭৩০}

ঐতিহাসিক বাস্তবতা হচ্ছে, মুসলিম জাতি কাউকে জোর করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেনি। কারণ, তারা আল্লাহর দেওয়া বিধান পরিপূর্ণভাবে মেনে চলেছে। আল্লাহ বলেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۚ لَا انْفِصَامَ
لَهَا ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

^{৭২৯} আল-ইসলাম ওয়াল হারকাতুত তারিখ, আনওয়ারুল জুনদ, পৃ. ৮৩।

^{৭৩০} ইলমুত তারিখ ইনদাল মুসলিমিন, সাগিহ আহমাদ আল-আলী-এর তরজমা, পৃ. ৪৬।

দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।^{৭৩১}

ইসলামের সৌন্দর্য দেখেই মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। এটি ছিল তাদের ওপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। তারা ইসলামের অনুশাসনে মুসলমানদের সদাচরণ প্রত্যক্ষ করেছে। তারা তাদের যাবতীয় আদেশ-নিষেধসহ ইসলামী শিক্ষার পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে দেখেছে। তারা মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি ও সৈনিকদের কথা ও আচরণে মিল খুঁজে পেয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে মুসলিম সৈনিকদের মতো মহান আচরণের দৃষ্টান্ত আর নেই। খলীফা এবং সেনাপতি তাদের সৈনিকদের আল্লাহর সাহায্য কামনা করা ও তার প্রতি ভয় ধারণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, দুনিয়া থেকে আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে বলেছেন, একনিষ্ঠভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছেন, যা কিছুই তারা করুক না কেন, তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ ও গোনাহ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। তারা জাতি ও ব্যক্তিকে অন্যের পূজা করা থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ছিলেন, যাতে তারা কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করতে পারে এবং তাদের দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন মুক্ত হয়ে চিরস্থায়ী জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারেন।

মুসলিম সেনাপতিরা বাহিনীর সর্বাঙ্গে থেকে লড়াই করেছেন, যুদ্ধের প্রথম আঘাত প্রতিহত করেছেন এবং তাদের অনেকে শাহাদাত বরণ করেছেন। আর শান্তির সময় সেনাপতিরা বাহিনীর পেছনে অবস্থান করেছেন, যাতে অন্যদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা যায়, দলের বোঝা বহন এবং দুর্বলদের সাহায্য করা যায়। দলের নেতারাই সর্বপ্রথম ও অগ্রগামী দাঁড়, যারা রণক্ষেত্রে ইসলামী যুদ্ধের বিধি-বিধান পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করেছেন। বস্তুত মুসলমানগণ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই জিহাদ করেছেন এবং জাগতিক কোনো তাড়নায় তারা অন্যান্য জাতির মতো যুদ্ধে লিপ্ত হননি।^{৭৩২}

^{৭৩১} সূরা আল-বাকারা, ২ : ২৫৬।

^{৭৩২} ফাতহু মিসর, ড. ইবরাহিম আল-মুতানাবি, পৃ. ১২৭।

৪.২। সেনাপতি নির্ধারণে উমর রা.-এর কর্মপন্থা

বিভিন্ন অভিযানে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি নির্বাচনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা ছিল। তিনি এ জন্য বেশ কিছু শর্ত ও যোগ্যতা নির্ধারণ করেছিলেন। নিচে এগুলো বর্ণনা করা হলো।

৪.২.১। ইসলামী বিধি-বিধানে অভিজ্ঞ, ধার্মিক ও নেককার হওয়া

তিনি বলতেন, ‘যদি কেউ জেনেশুনে কোনো সন্ত্রাসীকে কোনো পদে নিয়োগ দেয়, তাহলে সেও সন্ত্রাসী।’^{৭৩৩} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ার কিছু অংশের গভর্নর হিসাবে সাঈদ ইবনে আমরকে নিয়োগ দেন। তাকে এ সংবাদ জানানো হলে তিনি তা গ্রহণে অস্বীকার করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘না। ওই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আমার কাঁধে সব বোঝা চাপিয়ে নিজে ঘরে বসে থাকবেন না।’^{৭৩৪}

৪.২.২। ধীরস্থিরতা ও সতর্কতা অবলম্বন

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আরু উবাইদ আস-সাকাফিকে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে তাকে বলেন, ‘সুলাইতকে সেনাপতি নিয়োগ করতে আমাকে কেউ বাধা দিতে পারত না। যুদ্ধে তাড়াহুড়া করার মানসিকতার কারণেই আমি তা করিনি। পরিকার নিদর্শন ছাড়া রণক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করলে নিশ্চিত পরাজয় বরণ করতে হবে। আল্লাহর কসম, যদি তার মধ্যে তাড়াহুড়া করার মানসিকতা না থাকত, তাহলে তাকেই সেনাপতি নির্বাচন করতাম। যুদ্ধে ধীরস্থির থাকার চেয়ে সঠিক কোনো কাজ নেই।’^{৭৩৫}

৪.২.৩। সাহসী ও বীর এবং দক্ষ তিরন্দাজ

নাহাওয়ান্দ বিজয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম সেনাবাহিনীর একজন সেনাপতি নির্বাচন করতে চাইলেন। এ জন্য তিনি লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তারা বললেন, ‘হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি ইরাকের

^{৭৩৩} মাওসুয়াতু ফিকহি উমর, পৃ. ১০০; সিরাতে উমর, ইবনে আল-জাওযি থেকে উদ্ধৃতি।

^{৭৩৪} প্রাপ্ত।

^{৭৩৫} তারিখ আত-তাবারি, ৫/১০৯।

লোকজনের ব্যাপারে ভালো জানেন। আপনার সৈন্যরাও এখানে এসেছে। আপনি তাদের দেখেছেন এবং তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন।’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহর কসম, আমি তাদের জন্য এমন একজন সেনাপতি নিয়োগ করতে চাই, যে রণক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলায় প্রচণ্ড সাহসী ভূমিকা রাখতে পারবে।’ তারা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কে তিনি, হে আমীরুল মুমিনীন?’ তিনি বললেন, ‘আন-নুমান ইবনে মুকরিন আল-মুযানি।’ তারা বললেন, ‘তিনি এর যোগ্য।’

৪.২.৪। জ্ঞানী ও বিনয়ী হওয়া

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমার ওপর আপনাদের এই অধিকারও রয়েছে যে, আমি আপনাদের আত্মঘাতী কোনো অভিযানে পাঠাব না অথবা সীমান্ত চৌকিতে দীর্ঘদিন ধরে পাহারায় রাখব না।’^{৭৩৬} আজনাদিন যুদ্ধে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার সেনাবাহিনী বাইজেন্টাইনদের মোকাবিলা করছিল। বাইজেন্টাইন কমান্ডার ছিল আরতাবুন। সে ছিল বাইজেন্টাইনদের মধ্যে সবচেয়ে ধূর্ত ও বুদ্ধিমান, দূরদর্শী ও চরম বিশ্বাসঘাতক। রামলা এবং ইলিয়া (জেরুযালেম)-এ সে প্রচুর সৈন্য মোতায়েন করে রাখে। আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণসহ খলীফার নিকট পরামর্শ ও নির্দেশনা চেয়ে চিঠি প্রেরণ করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বিখ্যাত উক্তি করেন : আমরা বাইজেন্টাইন আরতাবুনের বিরুদ্ধে আরবের আরতাবুনকে প্রেরণ করেছি। দেখি আমরা কীভাবে এর মীমাংসা হয়।’^{৭৩৭} আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেই যখন আরতাবুন ও তার বাহিনী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে গমন করেন যাতে একটি জুতসই যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হন, তখন তিনি বাইজেন্টাইন নেতার ঘাঁটিতে প্রবেশ করেন। তিনি প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি পৌঁছে গিয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন। আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু আরতাবুনকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হন। এ সংবাদ পেয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমর তাকে পরাজিত করেছে। আমর কতই-না বিচক্ষণ ব্যক্তি!’^{৭৩৮}

^{৭৩৬} মাওসুয়াতু ফিকহি উমর, পৃ. ১০৯।

^{৭৩৭} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪৩১।

^{৭৩৮} প্রাগুক্ত, ৪/৪৩২।

৪.২.৫। সেনাপতিকে বিচক্ষণ ও বাগ্মী হতে হবে, যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে গভীর জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ হতে হবে

আল-মুগনির লেখক (ইবনে কুদামাহ আল-হাম্বলী) বলেন, ‘সামরিক নেতাকে হতে হবে বুদ্ধিমান, কৌশলী। শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে দূরদর্শী হওয়ার সঙ্গে তার যুদ্ধ সম্পর্কেও গভীর জ্ঞান রাখতে হবে। তাকে সৈন্যদের প্রতি বিশ্বস্ত, দয়ালু এবং একনিষ্ঠ হতে হবে।’^{৭৩৯} এ কারণেই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে ইরাক যুদ্ধে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সেনাপতি নির্বাচন করেন।

৪.২.৬। দায়িত্ব পালনে আন্তরিকতা

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনপদ্ধতির একটি নীতি ছিল, তিনি এমন কাউকে কোনো কাজের দায়িত্ব দিতেন না, যে কাজে ব্যক্তির কোনো আগ্রহ নেই এবং সংশ্লিষ্ট কাজের ব্যাপারে তার জ্ঞানও যথেষ্ট নয়। একান্ত অপারগ না হলে তিনি এর ব্যত্যয় ঘটাতেন না। তার মূল লক্ষ্যই ছিল প্রতিটি কাজ যেন সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়। একদিন তিনি লোকজনকে পার্সিয়ানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আহ্বান জানান। কিন্তু কেউই স্বেচ্ছায় রাজি হয়নি। পরের দিন তিনি আবার একই আহ্বান করেন, সেদিনও কেউ দাঁড়ায়নি। তৃতীয় দিনও একই ঘটনা ঘটে। চতুর্থ দিন প্রথম ব্যক্তি হিসাবে আবু উবাইদ ইবনে মাসউদ আস-সাকাফি উঠে দাঁড়ান। পরবর্তী সময়ে লোকজন তাকে অনুসরণ করে। তিনি আবু উবাইদকে দলের সেনাপতি নির্বাচন করেন। কারণ, তিনি এ কাজের যোগ্য বিবেচিত হন, যদিও তিনি সাহাবী ছিলেন না। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হলো, ‘আপনি সাহাবীদের মধ্য হতে একজনকে সেনাপতি নিয়োগ করলেন না কেন?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘আমি তাকে নিয়োগ দিয়েছি কারণ, সে-ই প্রথম জিহাদে সাড়া দিয়েছে।’^{৭৪০} এসব গুণ সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে সমুজ্জ্বল ছিল।

^{৭৩৯} আল-মুগনি, ইবনে কুদামা, ৮/৩৫২।

^{৭৪০} আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/২৬।

৪.৩। উমর রা.-এর প্রেরিত চিঠি থেকে আল্লাহ ও সেনাপতির
অধিকার

৪.৩.১। আল্লাহর হুকুম

চিঠি ও সকল আলাপ-আলোচনায় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সেনাপতি
ও সৈন্যদের সব সময় আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে সচেতন থাকতে নির্দেশ
দিয়েছেন। এসব হকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

সহায়তা ও ধৈর্য শত্রুর চেয়ে বেশি হওয়া

মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٩٨١﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ধরো ও ধৈর্যে অটল থাকো এবং
পাহারায় নিয়োজিত থাকো। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাতে
তোমরা সফল হও।^{৭৪১}

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ইরাকে প্রেরণের পূর্বে
উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে ধৈর্যধারণের গুরুত্ব মনে করিয়ে দেন এবং
বলেন : ‘মনে রাখবেন, প্রতিটি ভালো কাজের জন্যই কিছু গুণ থাকা
আবশ্যিক। ভালো কাজের জন্য প্রয়োজন ধৈর্য। আপনার ওপর আপতিত
সকল বিপদ ও ঘটনায় যদি ধৈর্যধারণ করতে পারেন, তাহলে আপনি
আল্লাহর ভয় অর্জন করতে সক্ষম হবেন।’^{৭৪২} তিনি সিরিয়ায় অবস্থানরত
আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে লেখেন : ‘ধৈর্যশীলদের
জন্যই আল্লাহর প্রশংসা। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخوانِهِمْ إِذَا
ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرًى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا

^{৭৪১} সূরা আল-ইমরান, ৩ : ২০০।

^{৭৪২} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩০৬।

لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۖ وَاللَّهُ يُخَيِّ وَيُيَسِّرُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝^{১৫৭} وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَیَغْفِرَ اللَّهُ مِّنْ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْعَلُونَ ۝^{১৫৮} وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُخْشَرُونَ ۝^{১৫৯}

আর কত নবী ছিল, যার সাথে থেকে অনেক আল্লাহওয়ালা লড়াই করেছে। তবে আল্লাহর পথে তাদের ওপর যা আপতিত হয়েছে তার জন্য তারা হতোদ্যম হয়নি। আর তারা দুর্বল হয়নি এবং তারা নত হয়নি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন। আর তাদের কথা শুধু এই ছিল যে, তারা বলল, ‘হে আমাদের রব, আমাদের পাপ ও আমাদের কর্মে আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করুন এবং অবিচল রাখুন আমাদের পা-সমূহকে, আর কাফির কওমের ওপর আমাদের সাহায্য করুন’। অতঃপর আল্লাহ তাদের দিলেন দুনিয়ার প্রতিদান এবং আখিরাতের উত্তম সওয়াব। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।^{৭৪৩}

এ দুনিয়ার পুরস্কার হচ্ছে বিজয় ও গনীমত। আর আখেরাতের পুরস্কার হচ্ছে ক্ষমা ও জান্নাত।’

আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু চিঠিটি সকলের সম্মুখে পড়ে শোনান। তিনি তাদের আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করতে বলেন এবং তাদের ধৈর্যধারণ করতে বলেন, যাতে আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের পুরস্কার দান করেন।^{৭৪৪}

আল্লাহর ধীনের সাহায্য করাই যুদ্ধের মূল লক্ষ্য

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব ভালোভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাকে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন : ‘আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য যে লড়াই করবে, তা মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই।’^{৭৪৫} এ জন্য

^{৭৪৩} সূরা আল-ইমরান, ৩ : ১৪৬-১৪৮।

^{৭৪৪} তারিখ ফুতুহ আশ-শাম, পৃ. ১৮৩।

^{৭৪৫} সহীহ, বুখারী, হাদীস নং ২৬৫৫।

আমরা দেখি, তার জীবন, তার উপদেশ এবং তার চিঠিপত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাই প্রতিফলিত হয়েছে।

আমানত রক্ষা করা

মহাকরুণাময় আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ ثُمَّ
تُؤْتَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

আর কোনো নবীর জন্য উচিত নয় যে, সে খিয়ানত করবে। আর যে খিয়ানত করবে, কিয়ামতের দিনে উপস্থিত হবে তা নিয়ে, যা সে খিয়ানত করেছে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুরোপুরি দেওয়া হবে, যা সে উপার্জন করেছে এবং তাদের ওপর যুলুম করা হবে না।^{৭৪৬}

সেনাপতি ও সৈন্যদের প্রতি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটি অন্যতম উপদেশ হলো, বণ্টন করার আগেই কেউ যেন গনীমতের মাল চুরি না করে। তিনি বলেন, ‘শত্রুর মোকাবিলায় পিছু হটে যেয়ো না এবং গনীমতের সম্পদ সংগ্রহের পর তা থেকে কোনো কিছু চুরি কোরো না।’^{৭৪৭}

আল্লাহর ধীনের সাহায্যে কারও প্রতি পক্ষপাত কোরো না

পক্ষপাত সম্পর্কে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রসিদ্ধ একটি উক্তি হচ্ছে : ‘যে কেউ কাউকে পক্ষপাতিত্ব করে কিংবা আত্মীয়তার কারণে নিয়োগ দেবে এবং এ ক্ষেত্রে অন্য কোনো কারণ থাকবে না, তাহলে সে আল্লাহ ও তার রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। আর যে কেউ পাপাচারী কোনো ব্যক্তিকে জেনেশুনে নিয়োগ দেবে, তাহলে সেও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’^{৭৪৮}

^{৭৪৬} সূরা আল-ইমরান, ৩ : ১৬১।

^{৭৪৭} আল-খারায়, আবু ইউসুফ, পৃ. ৮৫।

^{৭৪৮} আল-ইদারাতুল আসকারিয়া ফিদ দাওলাতিল ইসলামিয়া, ১/৬৬।

৪.৩.২। সেনাপতিদের হক

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার চিঠিপত্রে এবং আদেশ-নির্দেশে সেনাপতিদের হক সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন, যা নিচে দেওয়া হলো :

সম্পূর্ণ আনুগত্য

আবু উবাইদ ইবনে মাসউদ আস-সাকাফিকে ইরাক যুদ্ধে সেনাপতি হিসাবে প্রেরণের সময় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সঙ্গে সালামা ইবনে আসলাম আল-খায়রাযি রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং সুলাইত ইবনে কাইস আল-আনসারি রাযিয়াল্লাহু আনহুকেও প্রেরণ করেন। তিনি আবু উবাইদকে নির্দেশ দেন, তাদের পরামর্শ ছাড়া এককভাবে যেন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হয়। তাকে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তারা বদরী সাহাবী। তারপর আবু উবাইদ পারসিকদের সঙ্গে সেতুযুদ্ধে লিপ্ত হন। সুলাইত রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে সেতু ধ্বংস না করার এবং পারসিকরা যেখানে অবস্থান নিয়েছিল, সেখানে গমন না করার পরামর্শ দেন। কিন্তু আবু উবাইদ তার কথায় কর্ণপাত করেননি। পরিণতিতে মুসলমানগণ পরাজয় বরণ করে। সুলাইত রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমি তার অবাধ্য হতে চাইনি। আর নতুবা আমি লোকজনকে তার নির্দেশ অমান্য করতে বলতাম। কিন্তু আমি তার কথা শুনেছি এবং অনুসরণ করেছি।’^{৭৪৯}

অধীনরা সকল কাজে আর্মীরের ওপর আস্থা রাখবে

আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ
لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٥﴾

আর যখন তাদের নিকট কোনো শাস্তি অথবা ভীতিজনক বিষয় উপস্থিত হয় তখন তারা ওটা রটনা করতে থাকে এবং যদি তারা ওটা রাসূলের কিংবা তাদের আদেশদাতাদের প্রতি সমর্পণ করত তাহলে তাদের মধ্যে সঠিক তথ্য পেয়ে যেত এবং যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হতো তাহলে অগ্নিসংখ্যক ব্যতীত তোমরা শয়তানের অনুসরণ করতে।^{৭৫০}

এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা লোকদের যাবতীয় বিষয়াদি আমীরের ওপর ন্যস্ত করতে উৎসাহিত করেছেন, যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়। যদি তারা মনে করে, এর চেয়ে উত্তম সিদ্ধান্ত আমীরের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে, সে ক্ষেত্রে তারা তাকে সতর্ক করবে এবং সেটি অনুসরণ করার পরামর্শ দেবে। এ জন্য সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য পরামর্শ করা খুবই জরুরি একটি বিষয়। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সৈন্যদের জন্য একজন আমীর নিয়োগ করেছেন, যাতে তারা তাদের সকল বিষয়াদি তার ওপর সোপর্দ করে এবং তাদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী কোনো সিদ্ধান্তের কারণে বিভক্তি সৃষ্টি না হয়।^{৭৫১}

যে বছর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নাহাওয়ান্দে মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করেন এবং সেখানে সৈন্য সমাবেশ করতে বলেন, তখন সেখানে মদীনা, বসরা ও কুফার সেনাবাহিনী অংশগ্রহণ করে। মদীনার সৈন্যদের মধ্যে আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণও ছিলেন। তাদের সেনাপতি ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু। বসরার সেনাবাহিনী আবু মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে এবং কুফার সেনাবাহিনী হুযাইফা ইবনে আল-ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে এগিয়ে আসে। তারা সবাই নাহাওয়ান্দে জমা হওয়ার পর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নির্দেশ পাঠান : ‘সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ডার হবে নুমান ইবনে মুকরিন আল-মুজানি।’^{৭৫২}

^{৭৫০} সূরা আন-নিসা, ৪ : ৮৩।

^{৭৫১} আল-ইদারাতুল আসকারিয়া ফিদ দাওয়াতিল ইসলামিয়া নাশাতুহা ওয়াত-তাতাওউরুহা, ১/১০০।

^{৭৫২} প্রাপ্ত।

সেনাপতির নির্দেশ দ্রুত মান্য করা

খেলাফতের দায়িত্ব নিয়েই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকজনকে পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হতে বলেন। তিনি তিন দিন ধরে লোকজনকে আহ্বান করতে থাকেন, কিন্তু কেউই তাতে সাড়া দেয়নি। চতুর্থ দিন আবু উবাইদ ইবনে মাসউদ রহ. প্রথম সাড়া দেন এবং এ কারণেই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে এ যুদ্ধের সেনাপতি নির্বাচন করেন। পরবর্তী সময়ে অনেক সাহাবী এসে যুদ্ধে যোগ দেন। কিন্তু খলীফার আহ্বানে দ্রুত সাড়া দেওয়ায় আবু উবাইদ ইবনে মাসউদই সেনাপতি পদে বহাল থাকেন।^{৭৫৩}

উতবা ইবনে গাজওয়ানকে বসরায় প্রেরণের পূর্বে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে মনে করিয়ে দেন : আপনাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন এবং অহংকার থেকে বেঁচে থাকবেন। যদি অহংকারে পতিত হন, তাহলে তা আপনার ভাইদের থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী; চরম অপমান-অপদস্থের জীবন থেকে আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করেছেন এবং দুর্বল অবস্থা থেকে শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। আর এখন একটি বিশাল বাহিনীর সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন যাকে লোকজন মেনে চলবে। আপনার কথা তারা শুনবে এবং নির্দেশ দিলেই তা বাস্তবায়ন করা হবে। কতই-না বরকতময় জীবন! তবে নিজের অবস্থা ভুলে যাবেন না এবং কারও প্রতি হয়ে দৃষ্টি দেবেন না।^{৭৫৪}

গনীমতের সম্পদ বণ্টনে তর্ক করা যাবে না

গনীমতের সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘হে আল্লাহ, আপনি আমার গভর্নরদের জন্য সাক্ষী, আমি লোকজনকে আপনার দীন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ শেখানোর জন্যই প্রেরণ করেছি। আর যাতে তারা গনীমতের সম্পদ সুষ্ঠুভাবে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। তারা যদি কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে, তাহলে যেন সেটি আমার নিকট সোপর্দ করে।’^{৭৫৫}

^{৭৫৩} প্রাগুক্ত, ১/১১৩।

^{৭৫৪} প্রাগুক্ত, ১/১১৪।

^{৭৫৫} আল-খারায়, আবু ইউসুফ, পৃ. ৫০।

আল-আবলাহ^{৭৫৬} বিজয়ের পর গনীমতের মাল বণ্টন করতে গিয়ে দেখা গেল একজনের ভাগে একটি কপারের পাত্র পড়েছে। যখন সে পাত্রটি হাতে নিল, তখন দেখলে সেটি স্বর্ণের। পাশে আরেকজন সেটি দেখে সেনাপতির নিকট অভিযোগ পেশ করল।^{৭৫৭} সেনাপতি দ্বিধায় পড়ে গেলেন এবং সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করলেন। জবাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘যদি হস্তগত হওয়ার পূর্বে তার এটি জানা ছিল না বলে সে দাবি করে এবং এ ব্যাপারে কসম খায়, তাহলে পাত্রটি তাকে দিয়ে দাও। আর যদি এর ব্যতিক্রম হয়, তাহলে সেটি অন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দাও।’ তখন ওই সৈন্যটি কসম খায় এবং তাকে সেটি দিয়ে দেওয়া হয়।^{৭৫৮}

জালুলাহর যুদ্ধে বিজয়ের পর গনীমতের মাল জমা করা হলে জারির ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালি বলেন, এর চার ভাগের এক তার এবং তার লোকজনের। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এ বিষয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পত্র প্রেরণ করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বলেন, ‘জারির সত্য বলেছে। আমি তাকে বলেছিলাম যে, তার লোকজনের অন্তর নরম করার প্রয়োজনে যদি গনীমতের সম্পদ থেকে ওই পরিমাণ দেওয়া হয়, তাহলেও তারা মুসলমানদের পক্ষে শত্রুদের বিরুদ্ধে বীরদর্পে যুদ্ধ করতে পারে। আর যদি তারা কেবলই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং আখেরাতের পুরস্কারকে যথেষ্ট মনে করে লড়াই করে, তাহলে তাদের সঙ্গে অন্যান্য মুসলমানদের মতোই আচরণ করা হবে।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এই জবাব পেয়ে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তা জারির ইবনে আব্দুল্লাহকে অবহিত করেন। তখন জারির বলেন, ‘আমীরুল মুমিনীন সত্য বলেছেন। আমাদের এই সম্পদের প্রয়োজন নেই; বরং আমরা তো সাধারণ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।’

৪.৩.৩। সৈন্যদের অধিকার

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার চিঠিপত্রে এবং আদেশ-নির্দেশে সৈন্যদের প্রাপ্য হক সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন, যা নিচে দেওয়া হলো :

^{৭৫৬} আল-আবলাহ তাইগ্রিস নদীর তীরে অবস্থিত একটি শহর।

^{৭৫৭} আল-ইদারাতুল আসকারিয়া ফিদ দাওলাতিল ইসলামিয়া, ১/১২০।

^{৭৫৮} মানাকিব আমীর আল-মুমিনীন, ইবনে আল-জাওযি, পৃ. ১২৮।

সৈন্যদের নিয়মিত পরিদর্শন

বর্ণিত আছে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমি নামায পড়াকালীন সেনাবাহিনীর বিন্যাস পরিকল্পনা প্রণয়ন করি।’ এর কারণ, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হিসাবে জিহাদের অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে নির্দেশিত ছিলেন। মূলত তিনিই জিহাদের সর্বাধিনায়ক ছিলেন। সুতরাং তার এই নামায শত্রুদের মোকাবিলায় সালাতুল খাওফ নামাযের মতোই ছিল।^{৭৫৯} যখন তিনি কাউকে সেনাপতির দায়িত্ব দিতেন, তিনি তাকে বিদায় দেওয়ার আগে পরিদর্শন করতেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতেন। তিনি তার সেনাপতিদের যা বলতেন, তার মধ্যে এটিও বলতেন : ইজার ও রিদা পরে নাও, জুতা ও পোশাক ঠিকমতো পরো; নিশানা দেখে আঘাত করো এবং ভালোভাবে অশ্বচালনা শিখে নাও। আরবদের অনুসরণ করো এবং অনারবদের আমোদ-ফুর্তি ত্যাগ করো। তোমরা ততদিন শক্তিশালী থাকবে যতদিন অশ্বচালনা ও তির নিক্ষেপ প্রশিক্ষণ নিতে থাকবে।^{৭৬০}

এখান থেকে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করা ও তাদের যুদ্ধে পারদর্শী করে গড়ে তোলার ব্যাপারে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা বোঝা যায়। তার নিয়োগকৃত সেনাপতিরাও তার নির্দেশক্রমে সৈন্যদের লাইনে দাঁড় করিয়ে পরিদর্শন করতেন এবং শত্রুর সম্মুখে শক্তির প্রদর্শন করতেন; সেটি কোনো রণক্ষেত্র কিংবা প্রস্তুতিমূলক সমাবেশ—যা-ই হোক না কেন। আমার ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু জুমুআর দিনে তার সৈন্যদের উদ্দেশে ভাষণ দিতেন এবং তাদের বাহনগুলোকে শক্তভাবে তৈরি করতে নির্দেশ দিতেন; তিনি তাদের সতর্ক করতেন, যদি তারা তা না করে, তাহলে তারা বেতন পাবে না। তিনি বলেন, ‘আমি এ কথা শুনতে চাই না যে, কেউ তার দেহকে মোটাতাজা করেছে, কিন্তু তার ঘোড়াকে দুর্বল বানিয়ে ফেলেছে। মনে রেখো, আমি যেমন তোমাদের পরিদর্শন করি, তেমনি তোমাদের ঘোড়াগুলোও পরিদর্শন করব। যদি কেউ কোনো কারণ ছাড়াই তার ঘোড়াকে দুর্বল বানিয়ে ফেলবে, তাহলে আমি সে অনুযায়ী তার বেতন-ভাতা কেটে দেব।’^{৭৬১}

^{৭৫৯} আল-ফাতাওয়া, ২২/৬০৯।

^{৭৬০} নিহায়াতুল আরব, ৬/১৬৮।

^{৭৬১} ফুতুহ মিসর, ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ১৪১।

সিরিয়ায় মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন তাকে রাজার হালে দেখেন। তিনি তাকে এ জন্য তিরস্কার করে বলেন, ‘তুমি কি সশ্রুটি কিসরার মতো আচরণ করছ, হে মুআবিয়া?’ মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হে আমীরুল মুমিনীন, আমরা শত্রুর মোকাবিলায় সম্মুখ সারির যোদ্ধা এবং তাদের সঙ্গে আমাদের জিহাদের ময়দানে সাজ-সজ্জায়ও প্রতিযোগিতা করতে হয়।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু চুপ থাকলেন এবং তিনি এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি। কারণ, মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু যা কিছু করছেন, তা ঈমান ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই।^{৭৬২}

সফরে সেনাদের সঙ্গে নশ্র আচরণ

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে লেখেন : ‘সফরে দলের সকল সদস্যদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন। যাত্রাপথে তাদের বেশি কষ্ট দেবেন না, যেন তারা শত্রুর নিকটবর্তী হতেই দুর্বল হয়ে না পড়ে। তারা এমন এক শত্রুদলকে মোকাবিলা করতে যাচ্ছে যাদের সফরের প্রয়োজন নেই এবং তাদের রয়েছে শক্তিশালী ঘোড়া ও যোদ্ধা। আপনার এবং আপনার অধীন সব সৈন্যদের সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম নেওয়া উচিত যাতে সবাই পুনরায় শক্তি অর্জন করতে পারে, নিজেদের অস্ত্র ও মালামাল গুছিয়ে নিতে পারে। এমন কোনো জনবসতির নিকট যাত্রাবিরতি করবেন না, যারা আমাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তিতে বা নিরাপত্তায় রয়েছে।’^{৭৬৩}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাঈদ ইবনে আমরের নেতৃত্বে সিরিয়ায় সাহায্য-সৈন্য প্রেরণ করেন। এ-সময় তিনি তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ঘোড়া ও রসদ সরবরাহ করেন। রওনা হওয়ার প্রাক্কালে তিনি তাদের একটু অপেক্ষা করতে বলেন। তারপর তিনি পদব্রজে বাহিনীর দিকে অগ্রসর হন এবং সাঈদ ইবনে আমরের উদ্দেশে বলেন, ‘হে সাঈদ, আমি তোমাকে এই বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেছি। তবে তুমি মনে কোরো না যে, তুমি তাদের মধ্যে সেরা, যদি-না তুমি আল্লাহকে ভয় করো। যখন অগ্রসর

^{৭৬২}আল-ইদারাতুল আসকারিয়া ফিদ দাওলাতিল ইসলামিয়া, ১/১৩৭; মুকাদ্দিমা থেকে উদ্ধৃত।

^{৭৬৩}নিহায়াতুল আরব, ৬/১৬৯।

হবে পথে তাদের সঙ্গে নষ্ট আচরণ করবে, তাদের সম্মানে আঘাত করবে না এবং তাদের কাউকে বয়সে ছোট হওয়ার কারণে বাঁকা চোখে দেখবে না। আর শক্তিশালীদের প্রতি পক্ষপাত করবে না এবং তাদের কোনো গুহার ভেতর দিয়ে যাওয়ার আদেশ দেবে না। সমতল ভূমির ওপর দিয়ে অগ্রসর হবে এবং কোনো প্রসিদ্ধ রাস্তার ওপর তাঁবু গাড়বে না। আমি তোমাকে এবং তোমার বাহিনীকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করলাম।”^{৭৬৪}

বিদায়ের সময় পরিদর্শন করা

কোনো বাহিনী অভিযানে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের পরিদর্শন করতেন এবং তাদের ভালো আচরণ ও ইসলামী মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখার নির্দেশ দিতেন। তিনি সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শত্রুর প্রতিশ্রুতিকেও রক্ষা করতে বলেছেন, যখন তারা নিরাপত্তা প্রার্থনা করে এবং তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে নিষেধ করেছেন। ভুল করেও যদি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে তা পুরো বাহিনীর দুর্বলতা ও পরাজয়ের কারণ হবে এবং শত্রুর শক্তিকে বৃদ্ধি করবে। তিনি তাকে মুসলমানদের জন্য অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতীক না হওয়ার জন্য সতর্ক করেন।^{৭৬৫}

রণক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় নিজ বাহিনীর কারও অপরাধে শাস্তি প্রয়োগে নিষ্ক্রিয় থাকা

সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ কথাও বলেন, ‘যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো বাহিনী কিংবা অভিযানের সেনাপতির জন্য উচিত নয় যে, সে কারও ওপর হৃদ শাস্তি প্রয়োগ করবে। তখন তা করা হলে শয়তান তাকে কাফেরদের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করবে।’^{৭৬৬}

একবার এক অভিযানে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সালমান ইবনে রাবিআ আল-বাহিলিকে সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসাবে প্রেরণ করেন। তার সঙ্গে

^{৭৬৪} তারিখ ফুতুহ আশ-শাম, আল-আজদি, পৃ. ১৮৬।

^{৭৬৫} আল-ইদারাতুল আসকারিয়া, ১/১৭৯; তারিখ আত-তাবারি, ৩/৩৯৭।

^{৭৬৬} তারিখুল খুলাফা, আস-সুয়ুতি, পৃ. ১৩১।

আমর ইবনে মাযিকারিব এবং তুলাইহা ইবনে খুওয়ালিদও ছিলেন। আমর ইবনে মাযিকারিব এবং সালমান ইবনে রাবিআর মধ্যে একটি বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। বিষয়টি খলীফা পর্যন্ত গড়ায়। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন লিখে পাঠান : তুমি আমরের সঙ্গে যা করেছ, তা আমার কানে এসেছে এবং তুমি ঠিক করোনি। আমি যদি তোমার মতো যুদ্ধাবস্থায় থাকতাম, তাহলে আমি আমর ও তুলাইহার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতাম এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতাম। কারণ, সামরিক জ্ঞান ও যুদ্ধে তারা অভিজ্ঞ। মুসলিম প্রদেশে পৌঁছার পর তুমি তাদের অবস্থান অনুযায়ী মর্যাদা দেবে এবং ফিকহ ও কুরআনে পারদর্শীদের কাছে রাখবে।^{৭৬৭} আর তিনি আমর ইবনে মাযিকারিবকে লেখেন : সেনাপতির সঙ্গে তোমার বচসায় লিপ্ত হওয়ার কথা আমি শুনেছি। তুমি তাকে অপমানও করেছ। আমি জেনেছি যে, তোমার নিকট আস-সামসামাহ নামে একটি তরবারি রয়েছে। তাহলে শুনে রাখো, আমার নিকট আল-মুসামমিম নামে একটি তরবারি রয়েছে। আল্লাহর কসম, সেটি দিয়ে যদি আমি তোমাকে আঘাত করি, সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে।’ এই চিঠি পেয়ে আমর বলেন, ‘আল্লাহর কসম, যদি তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে সেটি অবশ্যই করবেন।’^{৭৬৮}

এ ঘটনা দুটি থেকে পরীক্ষার যে, শত্রুর ভূখণ্ডে একজন সেনাপতির কেমন আচরণ করা উচিত, এ ব্যাপারে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খুবই বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন। এ-সময় বাহিনীর সকল সদস্যদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখা জরুরি; বিশেষ করে যখন তারা শীঘ্রই শত্রুর মোকাবিলা করবে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এটিও ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, যুদ্ধাবস্থায় রণকৌশলে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞদের সঙ্গে সেনাপতির পরামর্শ করা উচিত এবং নিরাপদ স্থানে পৌঁছার পরও এ সম্পর্ক অটুট রাখতে হবে।

আর-রাহা^{৭৬৯} যুদ্ধের সময়—ইয়ায ইবনে গানামের হাতে যা বিজিত হয়েছিল—উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশে ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান সিরিয়া থেকে বিসর ইবনে আবি আরতাহার নেতৃত্বে সাহায্য-

^{৭৬৭}আল-আওয়াল, আল-আসকারি, ২/৪৫।

^{৭৬৮}প্রাপ্ত।

^{৭৬৯}আর-রাহা : মসুল এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী আল-জাযিরা অঞ্চলে একটি শহর।

সৈন্য প্রেরণ করেন। মুসলিম বাহিনী যখন শত্রু-এলাকায় অবস্থান করছিল, তখন ইয়ায ও বিসরের মধ্যে এক ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা দেয়। ইয়াযের সাহায্য-সৈন্যের কোনো প্রয়োজন ছিল না। এ জন্য তিনি ইয়াযকে সিরিয়ায় ফিরে যেতে বলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের ফিরে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে ইয়াযকে এর কারণ দর্শাতে বলেন। মূলত তারা তার সাহায্যেই এসেছিল যাতে শত্রুদের মনে এই ভয় ছড়িয়ে পড়ে যে, মুসলিম বাহিনীর সাহায্যে একের পর এক বাহিনী এসে যোগ দিচ্ছে। এতে শত্রুদের মনোবল দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তারা দ্রুত আত্মসমর্পণ করবে। ইয়ায জবাবে লেখলেন : আমি আমার সেনাদলের মধ্যে বিদ্রোহ ও অনৈক্যের আশঙ্কা করেছি। কারণ, আমার কোনো সাহায্য-সৈন্যের প্রয়োজন ছিল না। এ জন্য আমি তাকে অনুরোধ করেছি—তিনি যেন ফিরে যান। এ কারণেই আমি তাকে ফেরত পাঠিয়েছি।^{৭৭০} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার জবাব গ্রহণ করেন এবং তার জন্য দুআ করেন। যেহেতু তারা শত্রুর মোকাবিলা করছে, এ-সময় তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করলে তা পরাজয়কেই ত্বরান্বিত করবে।^{৭৭১}

বিরতি ও প্রস্থানের সময় সৈন্যদের পাহারায় রাখা

যেকোনো সামরিক ঘাঁটি কিংবা কোনো সেনাবাহিনীর জন্য উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু পাহারার খুব গুরুত্ব দিতেন। এ জন্য তিনি সৈন্যদের এক দলকে পাহারায় নিযুক্ত করতে সেনাপতিদের নির্দেশ দিতেন, যাতে শত্রুরা অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ করার সুযোগ না পায়। তিনি কোনো যাত্রাবিরতি কিংবা সেখান থেকে রওনা হওয়ার সময় প্রহরী নিযুক্ত করতে বলতেন। শত্রু-এলাকায় প্রবেশ করার পরপরই তিনি সেনাপতিদের চারিদিকে স্কাউট ও গোয়েন্দা পাঠাতে নির্দেশ দিতেন যাতে, শত্রু-এলাকার প্রকৃতি ও তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য জানা যায়। তিনি সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে লিখে পাঠান : ‘শত্রুর কাছকাছি পৌঁছে গুপ্তচর প্রেরণ করবেন। তাদের কর্মকাণ্ডের কোনো কিছুই যেন আপনার নিকট গোপন না থাকে। এ কাজে আরব এবং স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে যারা বিশ্বস্ত, তাদের প্রেরণ করবেন। কারণ,

^{৭৭০} ফুতুহ আশ-শাম, ইবনে আসাম, ১/২৫৩-২৫৫।

^{৭৭১} আল-ইদারাতুল আসকারিয়া, ১/১৮৮।

মিথ্যাবাদীর সংবাদ আপনার কোনো উপকারে আসবে না, যদিও সে ভুলে সত্য বলে ফেলে। অসৎ লোকেরা আপনার গুপ্তচর হতে পারে না; বরং তারা আপনার বিরুদ্ধে কাজ করবে। শত্রুদলের খুব নিকটে পৌঁছে গেলে আপনি অগ্রগামী ও সহসা আক্রমণকারী দল প্রেরণ করবেন, যাতে তারা শত্রুর রসদ সরবরাহ লাইন কেটে দিতে পারে এবং তাদের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করতে পারে। অভিজ্ঞ ও শক্তিশালী ব্যক্তিদের এ কাজে নিযুক্ত করবেন এবং তাদের দ্রুতগামী ঘোড়া সরবরাহ করবেন। যদি তারা শত্রুর মোকাবেলা করে, তাহলে তাদের প্রথম আঘাতেই যেন শত্রুর অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।^{৭৭২}

এই গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ থেকে এটি পরিষ্কার যে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কেবল শত্রুদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর প্রেরণ করার ব্যাপারেই সচেতন নন; বরং তিনি নিজেও গুপ্তচরের মাধ্যমে মুসলিম বাহিনীর প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের খোঁজখবর রাখতেন। গভর্নর, সেনাপতি, সেনাদল—সকলের ব্যাপারেই তিনি গুপ্তচর নিয়োগ করেছিলেন। তিনি সঠিকভাবেই জানতেন, কী ঘটেছে বা কী ঘটতে যাচ্ছে। প্রতিটি বাহিনী এবং ঘাঁটিতে তার গুপ্তচর তাকে সংবাদ প্রেরণ করত।^{৭৭৩}

উমাইর ইবনে সাদ আল-আনসারি খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট একটি অভিযোগ দায়ের করেন; তিনি সিরিয়ার এক দলের সঙ্গে মদীনায়ে এসে বলেন, ‘হে আমীরুল মুমিনীন, আমাদের এবং বাইজেন্টাইনদের মধ্যে আরবসুস নামে একটি শহর আছে। এর অধিবাসীরা মুসলমানদের সব দুর্বল দিক সম্পর্কে শত্রুকে অবহিত করে। কিন্তু তারা শত্রুদের সম্পর্কে আমাদের কোনো তথ্য দেয় না।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন, ‘তুমি সেখানে ফিরে গিয়ে সবাইকে শহর ত্যাগ করার শর্তে একটি ভেড়ার পরিবর্তে দুটি ভেড়া, একটি উটের বিনিময়ে দুটি উট, সবকিছুতেই একটির বিনিময়ে দুটি দেওয়ার ঘোষণা দেবে। যদি তারা রাজি হয়, তাহলে তা তাদের দিয়ে শহর ত্যাগ করতে বলবে। তারপর শহরটি ধ্বংস করে দেবে। আর যদি প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে তাদের এক বছর সুযোগ দিয়ে শহর ধ্বংস করে দেবে।’^{৭৭৪} উমাইর ইবনে সাদ

^{৭৭২}নিহায়াতুল আরব, ৬/১৬৯।

^{৭৭৩}আল-ইদারাতুল আসকারিয়া, ১/৩৯৬।

^{৭৭৪}ফুতুহুল বুলাদান, আল-বাল্‌যুরি, ১/১৮৫।

আরবাসুসে ফিরে শহরবাসীকে ওই সুযোগ দেয়। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং তিনি তাদের এক বছর ছাড় দিয়ে পুরো শহর ধ্বংস করে দেন।^{৭৭৫}

যুদ্ধে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপনে জায়গা নির্বাচন

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত লিপ্ত হতে নিষেধ করতেন যতক্ষণ না তিনি রণক্ষেত্রের অবস্থান ও প্রকৃতি সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হবেন। এ ছাড়া পানির ব্যবস্থা, পশুচারণের জন্য সবুজ ভূমিসহ আরও নানাদিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দিতেন। কাদিসিয়া যুদ্ধের পূর্বে তিনি তাকে নিজ ভূখণ্ডের কাছাকাছি অবস্থান করার জন্যও লিখে পাঠান। কারণ, এ এলাকা তাদের নিকট শত্রুদের থেকে বেশি পরিচিত। ফলে কোনো কারণে পিছু হটতে কিংবা নিজেদের বাঁচাতে চাইলে তা তাদের জন্য সহজ হবে। শত্রুরা তখন রাস্তা-ঘাট সম্পর্কে অনভিজ্ঞ থাকায় তাদের পিছু নিতে ভয় পাবে।^{৭৭৬}

এতৎসঙ্গে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু, সালমান ফারসি রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হুযাইফা ইবনে ইয়ামান বাহিনীর আগে গিয়ে রণক্ষেত্র ও সৈনিকদের অবস্থানস্থল নির্বাচন করতে বলেন।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড তার সেনাপতিদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন।^{৭৭৭} আর সৈনিকদের জন্য ক্যাম্প স্থাপনের পূর্বে সেনাপতিদের নির্ধারিত স্থান পরিদর্শন করতে বলতেন এবং তা যেন কোনোভাবেই সুপ্রিম হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন না করে। কারণ, হেডকোয়ার্টারের কাজই হলো রণকৌশল নির্ধারণ করা এবং সাহায্য-সৈন্য ও রসদপত্র সরবরাহ করা।^{৭৭৮} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে লেখেন : ‘আপনার

^{৭৭৫}আল-ইদারাতুল আসকারিয়া, ১/৩৯৫।

^{৭৭৬}আল-ইদারাতুল আসকারিয়া, ১/২০৫।

^{৭৭৭}প্রাগুক্ত, ১/২০৬।

^{৭৭৮}প্রাগুক্ত।

পরিদর্শনের আগে যেন তারা কোথাও ক্যাম্প না করে এবং আপনি তা পর্যবেক্ষণ করে দেখবেন সেটি উপযোগী কি না।^{৭৭৯}

সেনাবাহিনীর রসদপত্র সরবরাহ ও ঘোড়ার খাবারের ব্যবস্থা

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইরাকে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর রসদ হিসাবে মদীনা থেকে ছাগল ও উট পাঠাতেন।^{৭৮০} তা ছাড়া আন-নাকি ও আর-রাবযাহ সরকারি পশুচারণ ভূমি থেকে জিহাদে ব্যবহৃত পশুদের জন্য ঘাস প্রেরণ করতেন। এ ছাড়া তিনি প্রত্যেক অঞ্চলেই লোকজন থেকে অতিরিক্ত ঘোড়া সরকারি খাতে জমা করতেন এবং জিহাদের জন্য সেগুলো প্রস্তুত রাখতেন। কুফাতে এ রকম চার হাজার ঘোড়া ছিল। একই সংখ্যক ঘোড়া বসরায়ও ছিল। প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলিম প্রদেশেই ঘোড়া সংরক্ষণ করা হতো।^{৭৮১} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন জেরুযালেমের সঙ্গে চুক্তি করার জন্য সিরিয়া আগমন করেন, তখন সেখানে সৈন্যদের রসদ সরবরাহের নিমিত্তে একটি সাপ্লাই ডিপো নির্মাণ করেন। এর নাম ছিল আল-আহরা। আর সর্বপ্রথম আমর ইবনে আবাস এর দায়িত্ব লাভ করেন।^{৭৮২}

সৈনিকদের যুদ্ধে উৎসাহিত করা

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে চিঠি লেখেন : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দা উমর ইবনুল খাত্তাব থেকে মুসলিম বাহিনীর বিশ্বস্ত সেনাপতি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহর প্রতি। আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রকাশ্যে ও গোপনে মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি এবং আমি আপনাকে আল্লাহর অবাধ্যতার ব্যাপারে সতর্ক করছি। আমি আপনাকে ওইসব ব্যক্তিদের মতো হওয়া থেকে সতর্ক করছি, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

^{৭৭৯} আল-ইদারাতুল আসকারিয়া, ১/২০৭; তারিখ আত-তাবারি, ৩/৪৩৪ থেকে উদ্ধৃত।

^{৭৮০} ফুতুহুল বুলদান, আল-বালায়ুরি, ২/৩১৪।

^{৭৮১} আল-ইদারাতুল আসকারিয়া, ১/২১৭।

^{৭৮২} প্রাপ্ত।

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٧﴾

বলো, ‘তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ, যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা, যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা করো আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।^{৭৮৩}

আল্লাহ খাতামুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সেনাপতিদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি সকল জগতের পালনকর্তা।’^{৭৮৪}

এই চিঠি পেয়ে আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু সকলের সামনে তা পড়ে শোনান এবং তারা বুঝতে পারেন যে, খলীফা তাদের জিহাদে উৎসাহিত করেছেন। সৈন্যদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না, যে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর চিঠি পড়ে অশ্রুসিক্ত হননি।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইরাকে অবস্থানরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার সেনাবাহিনীকে চিঠি প্রেরণ করে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেন, তাদের অন্তরে ইসলামের মহান গুণাবলি ধারণ করতে বলেন এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেন।^{৭৮৫} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আমলে সেনাপতিদের প্রতিও একই নির্দেশ ছিল, যেন তারা সৈন্যদের জিহাদে উদ্বুদ্ধ করে।^{৭৮৬}

^{৭৮৩} সূরা আত-তাওবা, ৯ : ২৪।

^{৭৮৪} ফুতুহ আশ-শাম, আল-ওয়াকিদী, ১/১১৭।

^{৭৮৫} আল-ইদারাতুল আসকারিয়া, ১/২৩৯।

^{৭৮৬} প্রাপ্ত।

জিহাদে আল্লাহর পুরস্কার ও শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে মনে করিয়ে দেওয়া

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে কাদিসিয়া যুদ্ধের পূর্বে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা, সৈন্যদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের আল্লাহর পুরস্কারের কথা মনে করিয়ে দেন এবং তিনি তাদের বলেন, আল্লাহ তাদের জন্য আখেরাতে যা প্রস্তুত করে রেখেছেন, তার বিবরণ দেন। তিনি তাদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেন। আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্যের যে ওয়াদা করেছেন এবং ইসলামের বিজয় দান করবেন—তাও মনে করিয়ে দেন। তিনি তাদের বলেন, শত্রুর সকল সম্পদ, গণীমত ও তাদের ভূমি শীঘ্রই মুসলমানদের করতলগত হবে এবং তিনি কারীদের জিহাদের সূরা (সূরা আনফাল) তিলাওয়াত করতে বলেন।^{৭৮৭}

একই ভাবে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ায় তার সৈন্যদের উদ্দেশে জিহাদের ফযিলত তুলে ধরেন। তিনি আল্লাহর প্রতিশ্রুত পুরস্কার, রহমত ও বরকত কথা মনে করিয়ে দেন। তিনি তাদের বলেন, দুনিয়া ও এর যাবতীয় সবকিছু থেকে জিহাদ উত্তম।^{৭৮৮}

এটা খুব প্রসিদ্ধ যে, আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু ফিলিস্তিনে তার সৈন্যদের উদ্দেশে বলেন, ‘(জিহাদে) যে কেউ নিহত হবে, শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে। আর যারা বেঁচে থাকবে, তারা বরকতময় জীবন যাপন করার সুযোগ পাবে।’ তিনি তার সৈন্যদের কুরআন তিলাওয়াত এবং ধৈর্যধারণ ও দৃঢ়পদ থাকার আহ্বান করেন। আর তাদের আল্লাহর প্রতিশ্রুত পুরস্কার ও জান্নাত লাভে দুআ করতে উদ্বুদ্ধ করেন।^{৭৮৯}

আল্লাহর হুক আদায়ে সচেষ্ট হওয়া

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার বাহিনীকে এই উপদেশবাণী লিখে পাঠান : ‘আমি আপনাকে এবং আপনার অধীন সব সৈন্যদের সব পরিস্থিতিতে আল্লাহকে ভয় করার

^{৭৮৭} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৩৫৬।

^{৭৮৮} আল-ইদারাতুল আসকারিয়া, ১/২৪৩।

^{৭৮৯} ফুতুহ আশ-শাম, ১/১৮, ২০।

আদেশ করছি। কারণ, শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহর ভয়ই সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। আমি আপনাকে এবং আপনার অধীন সব সৈন্যদের শত্রুকে এড়ানোর চেয়ে গোনাহকে বেশি এড়িয়ে চলার আদেশ করছি। কারণ, শত্রুর চেয়ে গোনাহকে বেশি ভয় করা উচিত। শত্রুর কুফরীই মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের মূল কারণ।^{৭৯০}

ব্যবসা, চাষাবাদ ও এ-জাতীয় কাজ থেকে বিরত থাকা

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেনাপতিদের প্রতি এই ফরমান জারি করলেন, তারা তাদের অধীন সৈন্যদের মধ্যে ঘোষণা করবে যে, রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদের বেতন-ভাতা এবং তাদের পরিবারের প্রতি রেশন চালু করা হয়েছে। সুতরাং কেউ যেন চাষাবাদের লিপ্ত হয়ে না যায়; যারা এটি মেনে চলেনি, তিনি তাদের শাস্তিও দিয়েছেন।^{৭৯১} কারণ, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু চেয়েছিলেন, তার সৈন্যরা পরিপূর্ণভাবে জিহাদ ও ইসলাম প্রচার-প্রসারে মনোনিবেশ করবে। তারা চাষাবাদের কাজে মগ্ন হয়ে গেলে আসল লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হবে। এভাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এমন এক সেনাবাহিনী গঠন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যারা পুরোপুরিভাবে জিহাদের কাজেই মগ্ন ছিল এবং ডাক দেওয়ামাত্রই সাড়া দিতে সক্ষম ছিল। তিনি তাদের কঠোরভাবে ফলমূল সংগ্রহ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাষাবাদের কাজে জড়িত হতে নিষেধ করেছেন।^{৭৯২}

৪.৪। সীমান্ত রক্ষায় গুরুত্বারোপ

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষায় খুবই গুরুত্বারোপ করতেন। ক্রমশই ইসলামী রাষ্ট্র বিস্তার লাভ করছিল। তিনি বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে লড়াই করতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেন, ‘আল্লাহর কসম, আমি সন্তুষ্ট হতাম, যদি আমাদের এবং তাদের মধ্যে যদি আগুনের একটি প্রাচীর থাকত—তাহলে প্রাচীরের এ পাশে যা কিছু সব আমাদের হতো এবং বিপরীত দিকের সবকিছু বাইজেন্টাইনদের

^{৭৯০}আল-ফারুক উমর ইবনুল খাত্তাব, মুহাম্মাদ রাশিদ রিদা, পৃ. ১১৯।

^{৭৯১}আল-ইদারাতুল আসকারিয়া, ১/২৫৬।

^{৭৯২}প্রাগুক্ত, ১/২৫৭।

দখলে থাকত।^{৭৯৩} তিনি পারসিকদের সঙ্গে মুসলমানদের সীমান্ত নিয়ে একই কথা বলেছেন : আমি চাই আস-সাওয়াদ এবং পাহাড়ের মধ্যে এমন একটি প্রাচীর হতো, যাতে আমরা তাদের কাছে যেতে পারতাম না এবং তারাও আমাদের নিকট পৌঁছতে পারত না। আস-সাওয়াদ পর্যন্ত ভূখণ্ড আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর আমি গনীমতের সম্পদের চেয়ে মুসলমানদের নিরাপত্তা নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন।^{৭৯৪}

তিনি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করার নির্দেশ দেন। তাদের জন্য বিভিন্ন রকম কাজ বণ্টন করেন। আমরা ইতিপূর্বে এগুলোর কিছু উল্লেখ করেছি। এসব ঘাঁটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বা সেনা সদর দপ্তরের ভূমিকা পালন করবে। এগুলোর অবস্থান হবে ইসলামী রাষ্ট্র ও বিজিত দেশসমূহের সীমান্তের কাছাকাছি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে, যাতে যেকোনো বিদ্রোহ দ্রুত দমন করা যায় এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে সৈন্যসমাবেশের কেন্দ্র হিসাবেও ভূমিকা রাখতে পারে। এসব ঘাঁটির মধ্যে বসরা ও কুফার ঘাঁটি ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এ ঘাঁটি দুটির সীমানা পারসিক সাম্রাজ্য ও মিসরের আল-ফুসতাত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।^{৭৯৫} মিসর ও সিরিয়ার সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় কিছু ঘাঁটি নির্মাণ করা হয়েছিল, যাতে বাইজেন্টাইনদের সমুদ্র আক্রমণ প্রতিহত করা যায়।

পরবর্তী সময়ে তিনি চারটি ঘাঁটি স্থাপন করেন যেগুলো হিমসের বাহিনী, দামেস্ক বাহিনী, জর্ডান বাহিনী এবং ফিলিস্তিন বাহিনী হিসাবে পরিচিত ছিল। আর সৈন্যরা যে বাহিনীতে নিযুক্ত হতো, সে বাহিনীর নামেই পরিচিত হতো। বাহিনীর নাম তাদের নিজেদের নামের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হতো। ফলে সেনাপ্রধান চাইলে তাদের সঙ্গে পারস্পরিক বিষয়াদি আলোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন—যুদ্ধাবস্থায় ও সৈন্যদের বেতন বণ্টনের সময়।^{৭৯৬}

এ ছাড়া শত্রুর পরিত্যক্ত ক্যাম্প ও দুর্গকেও মুসলমানগণ দখল করে সামরিক ঘাঁটিতে রূপান্তরিত করেন। সেখান পর্যাপ্ত সৈন্য মোতায়েন করা

^{৭৯৩} তারিখ আল-ইয়াকুবি, ২/১৫৫।

^{৭৯৪} তারিখ আত-তাবারি; আল-ইদারাতুল আসকারিয়া, ১/৩৫২ থেকে উদ্ধৃত।

^{৭৯৫} আল-ইদারাতুল আসকারিয়া, ১/৪৫২।

^{৭৯৬} ফুতুহুল বুলদান, ১/১৫৬।

হতো এবং বিজিত অঞ্চলসমূহের সীমান্ত রক্ষায় প্রহরী প্রেরণ করা হতো।^{৭৯৭}

মুসলিম বাহিনী শত্রু-এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার পরই সর্বোচ্চ দূরত্বে সীমান্ত নির্ধারণ করতেন এবং তা রক্ষায় সেখানে সামরিক চৌকি স্থাপন করতেন। এসব স্থাপনায় একজন যোগ্য কমান্ডারের অধীনে পর্যাপ্ত চৌকশ সেনা নিযুক্ত করা হতো।^{৭৯৮}

সীমান্ত রক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল, সীমান্ত বরাবর চেকপোস্ট স্থাপন। ইসলামী রাষ্ট্র ও পারসিক সাম্রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় এ রকম অনেক চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছিল। ইয়াযদগিরদের নেতৃত্বে পারসিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পুনরায় লড়াই করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করলে মুসান্না ইবনে হারিসা খলীফাকে তা অবহিত করেন। তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বলেন, ‘পারসিকদের ভূখণ্ড থেকে বের হয়ে আসো। তোমাদের ও তাদের সীমান্তে মরুদ্যানে এসে আশ্রয় নাও।’ মুসান্না রাযিয়াল্লাহু আনহু তা-ই করেন।^{৭৯৯}

কাদিসিয়া যুদ্ধের পূর্বে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উপদেশ দেন : কাদিসিয়া পৌঁছে এর প্রান্তসীমায় সীমান্ত-চৌকি স্থাপন করবেন।’ জালুলাতে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট লেখেন : আল্লাহ যদি দুটি বাহিনী—মাহরান বাহিনী ও আনতাক বাহিনীকে পরাজিত করেন, তাহলে কাকা ইবনে আমরকে মুসলিম বাহিনী নিয়ে হালওয়ানের সীমান্ত-চৌকির দিকে অগ্রসর হতে বলবেন যাতে শত্রুদের অগ্রগতি রোধ করা যায় এবং মুসলিম বাহিনীর—ক্যাম্পে অবস্থান করুক অথবা টহলরত থাকুক—নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব হয়।^{৮০০}

এ জন্য ইরাকে মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সেনাদের পারস্যের দিকে অগ্রসর হতে উৎসাহিত

^{৭৯৭} তারিখ আত-তামাদুন, যরযি জাইদান, ১/১৭৯।

^{৭৯৮} আল-ইদারাতুল আসকারিয়া, ১/৪৫২।

^{৭৯৯} প্রাপ্ত।

^{৮০০} প্রাপ্ত।

করেন এবং তাদের বলেন, সীমান্ত এলাকা এবং গিরিপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণের ভয় নেই।^{৮০১}

উল্লেখ্য, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আমলে সীমান্ত এলাকার চৌকিগুলো মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়কের নির্দেশক্রমেই স্থাপন করা হয়েছিল। তিনি তার সেনাপতিদের বলেছেন : পারসিকদের তোমাদের ভাইদের থেকে বিভ্রান্ত করো, তোমাদের উম্মত ও দেশকে রক্ষা করো এবং পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত পারস্য ও আহওয়াযের মধ্যবর্তী সীমান্তে প্রহরী নিযুক্ত করো।^{৮০২}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আমলে কুফায় সীমান্ত-চৌকির সংখ্যা ছিল চারটি; হালওয়ান পোস্ট, যার সেনাপতি ছিলেন কাকা ইবনে আমর আত-তামিমি, মাসবায়ান পোস্ট, যার সেনাপতি ছিলেন দিরার ইবনুল খাত্তাব আল-ফাহরি, কারকিসিয়া পোস্ট, যার সেনাপতি ছিলেন উমর ইবনে মালিক আজ-জুহরি এবং মুসল পোস্ট, যার সেনাপতি ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুতিম আবসি। প্রত্যেক সেনাপতির একজন ডেপুটি ছিল, যারা সেনাপতির অনুপস্থিতিতে চৌকির দায়িত্ব পালন করত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুসলিম বাহিনী যখনই কোনো সুরক্ষিত পোস্ট অথবা নতুন কোনো শহরের গোড়াপত্তন করেছে, প্রথম তারা সেখানে যে কাজটি করেছে, সেটি হলো মসজিদ নির্মাণ। কারণ, তখন মসজিদই সব কাজ-কর্মের কেন্দ্র ছিল; দাওয়াহ, তালীম এবং জিহাদ।^{৮০৩}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে সিরিয়ার একের পর এক শহর মুসলমানদের অধীনে আসতে থাকে। এ-সময় তিনি বাইজেন্টাইন ও সিরিয়ায় মুসলিম ফ্রন্টের মধ্যে সীমান্ত রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। এ জন্য তিনি অনেক রক্ষণাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন; পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ, সীমান্ত টহল দল গঠন, সীমান্ত-চৌকি স্থাপন এবং উপকূলবর্তী এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করা ইত্যাদি। তিনি সিরিয়ার সম্পূর্ণ উপকূলবর্তী

^{৮০১} প্রাপ্ত।

^{৮০২} প্রাপ্ত।

^{৮০৩} আল-ইদারাতুল আসকারিয়া, ১/৪৫৫।

এলাকাকে একক সামরিক কমান্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন করেন। জেরুযালেমের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়া গমন করলে তিনি এসব সীমান্ত-চৌকির কয়েকটি পরিদর্শন করেন। তিনি প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটে যান।^{৮০৪} তারপর তিনি মদীনা ফিরে যান। তবে ফিরে যাওয়ার পূর্বে লোকজনের উদ্দেশে বলেন : আমাকে তোমাদের ওপর নিযুক্ত করা হয়েছে এবং আল্লাহ আমাকে তোমাদের জন্য যা কিছু করতে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি তা করেছি। ইনশাআল্লাহ আমরা তোমাদের মধ্যে ফাই সমভাবে বণ্টন করেছি। আমি তোমাদের জন্য সেনাদল নিযুক্ত করেছি এবং গনীমতের মালে তোমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে আমরা তোমাদের জীবনকে সহজ করে দিয়েছি।^{৮০৫}

আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ার উত্তর সীমান্তে আনতাকিয়া বিজয় করেন। তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে লেখেন : ‘একটি চৌকশ মুসলিম বাহিনী গঠন করে আনতাকিয়া রক্ষায় নিয়োজিত করবে এবং তাদের নিকট থেকে রসদ সরবরাহ অব্যাহত রাখবে।’

আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হিমস এবং বালবেক থেকে কিছু সৈন্য বদলি করে আনতাকিয়ার সীমান্ত রক্ষায় নিয়োগ করেন। আর এ বাহিনীর সেনাপতি হিসাবে হাবিব ইবনে মাসলামাহ আল-ফাহরিকে দায়িত্ব দেন। আর তিনি নিজে আনতাকিয়ার ঘাঁটিতে অবস্থান করে সীমান্তের বাইরে অভিযান পরিচালনায় মনোনিবেশ করেন। এখান থেকেই বাজেন্টাইনদের সঙ্গে যুদ্ধরত মুসলিম বাহিনীকে রসদ সরবরাহ করা হতো। এখান থেকেই জারযুমাহ এলাকা আক্রমণে সেনাদল প্রেরণ করা হয়। সেখানকার লোকজন মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে শান্তিচুক্তি করে এবং তারা বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে সহযোগিতা, মুসলমানদের জন্য গুপ্তচরবৃত্তি ও লিকাম পাহাড়ে সীমান্ত-চৌকি স্থাপনে রাজি হয়।

একই ভাবে আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বালিস-এর সীমান্ত-চৌকির দিকে অগ্রসর হন। তিনি সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনীর আগমনের পর যারা

^{৮০৪} প্রাগুক্ত, ১/৪৫৭।

^{৮০৫} তারিখ আত-তাবারি, ৪/৪০।

মুসলমান হয়েছিল, তাদের মধ্য থেকে একদল যোদ্ধাকে বাছাই করেন। তাদের সুসংগঠিত করে বাইজেন্টাইন আক্রমণ থেকে সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত করেন।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের শেষ দিক এবং উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের শুরুতে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ার উপকূলবর্তী এলাকায় প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। তিনি অনেকগুলো সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন; আতারসুস, মারকিয়াহ, বালনিয়াস এবং বাইত সালিমাহ। সিরিয়ার উপকূলবর্তী এলাকায় বাইজেন্টাইনদের পরিত্যক্ত দুর্গগুলোও তিনি মেরামত করেন এবং সেখানে সৈন্যদের নিযুক্ত করেন। এসব সৈন্যদের জন্য জমিও বরাদ্দ দেন। উঁচু উঁচু পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ করে পাহারাকে জোরদার করেন। প্রতিটি টাওয়ারেই একটি করে বেকন থাকত, যা দিয়ে নিকটস্থ লোকজনকে তথ্য সরবরাহ করা হতো, যতক্ষণ-না এটি শহরে ও অন্যান্য সামরিক পোস্টে পৌঁছে। এতে লোকজন দ্রুত শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে সক্ষম হতো।^{৮০৬}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মিসর ও মুসলিম রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষায় অন্যান্য ফ্রন্টের মতোই প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। তিনি আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ফুসতাতে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের নির্দেশ দেন এবং এটিকে এ অঞ্চলের মুসলিম সেনাদের জন্য মিলনকেন্দ্রে পরিণত করেন। তিনি প্রতিটি গোত্রকে একজন সেনাপতির দায়িত্বে অর্পণ করেন। এটি ছিল উত্তর আফ্রিকা বিজয়ে মুসলমানদের প্রাথমিক প্রস্তুতি। এ ছাড়া মিসরে সামরিক অভিযান পরিচালনায় এটি ছিল অন্যতম ঘাঁটি, যেখান থেকে অন্যান্য অভিযানেও সাহায্য-সহযোগিতা করা হতো। এর অবস্থানগত কারণে এবং পূর্ববর্তী ঘাঁটিসমূহের অভিজ্ঞতার আলোকে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর ও এ ঘাঁটির মধ্যবর্তী স্থানে কোনো লেক বা জলাশয় নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন, যাতে যোগাযোগ-ব্যবস্থায় সমস্যা সৃষ্টি না হয়।^{৮০৭}

^{৮০৬} ফুতুহুল বুলদান, ১/১৫০-১৫৮।

^{৮০৭} ফুতুহ মিসর, ইবনে আব্দুল হাকাম; আল-ইদারাতুল আসকারিয়া, ১/৪৬২।

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সৈন্যদের এ কথা মনে করিয়ে দিতেন যে, তাদের মিসরে অবস্থান মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা। তিনি বলেন, ‘মনে রেখো, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সীমান্ত রক্ষা করাই তোমাদের অন্যতম দায়িত্ব। কারণ, চারিদিকে শত্রুরা তোমাদের শেষ করে দেওয়ার জন্য ওত পেতে আছে এবং তারা এটি চাষাবাদ, সম্পদ ও অন্যান্য কল্যাণ লাভের আশায় দখল করে নিতে উদগ্রীব হয়ে আছে।’ এ সময়ের মধ্যে মুসলিম বাহিনী শত্রুর পরিত্যক্ত যেসব দুর্গ ও অন্যান্য সামরিক চৌকি দখল করতে সমর্থ হয়েছিল, তারা সেগুলোর মেরামত ও উন্নতি সাধন করে এবং সেখানে সৈন্য নিয়োগ করে সীমান্ত পাহারা আরও জোরদার করে। মিসরের প্রথম সামরিক চৌকি ছিল আল-আরিশ।^{৮০৮} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মিসরের পুরো উপকূলবর্তী এলাকায় সামরিক চৌকি নির্মাণ করার নির্দেশ দেন।^{৮০৯} আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের পর সেখানে এক হাজার সশস্ত্র সেনাকে শহরের নিরাপত্তায় নিয়োগ করেন। তাদের এই সংখ্যা বাইজেন্টাইনদের নিকট অপ্রতুল মনে হয়। তারা সমুদ্র-পথে আক্রমণ করে অনেক সশস্ত্র মুজাহিদকে শহীদ করে এবং বাকিরা পালিয়ে যায়। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ফিরে এসে পুনরায় শহরটি দখল করেন এবং এবার তিনি তার বাহিনীর এক-চতুর্থাংশকে শহর রক্ষায় নিয়োজিত করেন। তিনি উপকূল এলাকা রক্ষায় আরেকটি সামরিক চৌকি স্থাপন করেন এবং সেখানে আরেক চতুর্থাংশ সৈন্য নিযুক্ত করেন। বাকি অর্ধেক সৈন্য নিয়ে তিনি ফুসতাতে অবস্থান করেন।^{৮১০}

প্রতিবছরই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনা থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় যোদ্ধাদের প্রেরণ করতেন। তিনি সেখানকার গভর্নরদের বলতেন, তারা যেন শহরটিকে অবহেলা না করে এবং আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিয়োগকৃত সৈন্যদের সঙ্গে আরও অতিরিক্ত সৈন্য জমা করে।^{৮১১} এভাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু পরিকল্পনা অনুযায়ী ইরাক, সিরিয়া এবং মিসরে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষায় দৃঢ় প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হন। তার কার্যক্রম শুধু এই প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলার মধ্যেই

^{৮০৮} তারিখ আল-ইয়াকুবি, পৃ. ৩৩০।

^{৮০৯} আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/১০৩।

^{৮১০} আল-বাহরিয়া ফি মিসর আল-ইসলামিয়া ওয়া আসারুতুল বাকিয়াহ, সুআদ মাহির, পৃ. ৭৭।

^{৮১১} ফুতুহ মিসর, পৃ. ১৯২; আল-খুতাত, আল-মাকরিজি, ১/১৬৭।

সীমবদ্ধ ছিল না; বরং তিনি শীত ও গ্রীষ্মকালীন সামরিক মহড়ারও আয়োজন করেছিলেন। সৈন্যরা শীত ও গ্রীষ্মে ইসলামী রাষ্ট্রের সকল সীমান্ত এলাকায় নিয়মিত টহল দিত। কিছু মহান সামরিক নেতা এসব মহড়ার দায়িত্ব পালন করতেন; আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু, মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু, নুমান ইবনে মুকরিন এবং আরও অনেকে।^{৮১২}

দূরবর্তী অঞ্চলে সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত থাকায় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের জন্য বর্ধিত বেতন-ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন এবং তাদের জন্য জমিও বরাদ্দ দিয়েছিলেন।^{৮১৩} ওই অঞ্চলের সেনাপতিরা সীমান্তে নিয়োজিত সৈন্যদের গণীমতের অংশ দিতেন, যেমন তারা জিহাদের অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের দিতেন। কারণ, এসব সীমান্ত-প্রহরীরা মুসলমানদের জন্য প্রতিরক্ষা ব্যূহ হিসাবে কাজ করত এবং ওই দিক থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করত।^{৮১৪} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন মৃত্যুসজ্জায়, তখন তিনি পরবর্তী খলীফার উদ্দেশে পরামর্শ দেন : ‘আমার পরে যিনি খলীফা হবেন, তার জন্য আমার একটি উপদেশ হচ্ছে, সীমান্ত-প্রহরীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করবেন; কারণ, তারা ইসলামের ঢালস্বরূপ; তারা অর্থ সংগ্রহ করে এবং শত্রুদের উত্ত্যক্ত করে। তাদের প্রাপ্য থেকে কোনো কিছুই হ্রাস করবেন না। তবে তাদের সম্মতিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ নেওয়া যেতে পারে।’^{৮১৫}

৪.৫। উমর রা. এবং রাজা-বাদশাদের মধ্যে সম্পর্ক

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং পারসিক সম্রাটের মধ্যে ছিল যুদ্ধের সম্পর্ক। তার মৃত্যুর পরও মুসলিম বাহিনী ইয়াযদগিরদকে নিজ ভূখণ্ডে ধাওয়া করছিল এবং তার সাম্রাজ্য ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছিল। বাইজেন্টাইন সম্রাটের সঙ্গে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্কের ব্যাপারে জানা যায় যে, এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিচুক্তি ছিল, যা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক

^{৮১২} ফুতুহুল বুলদান, আল-বালায়ুরি, ১/১৯৪-১৯৫।

^{৮১৩} আল-ফানুল হারবি ফি সদরুল ইসলাম, আব্দুর রওফ আউন, পৃ. ২০১; আল-ইদারাতুল আসকারিয়া, ১/৪৬৫।

^{৮১৪} আল-ইদারাতুল আসকারিয়া, ২/৪৬৫; তারিখ আত-তাবারি, ৪/১৩৪।

^{৮১৫} মানাকিব আমীরুল মুমিনীন, ইবনে আল-জাওযি, পৃ. ২১৯-২২০।

সিরিয়া ও আল-জাজিরা বিজয়ের পর শেষ হয়ে যায়। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং বাইজেন্টাইন সম্রাটের মধ্যে চিঠিপত্র লেনদেন হয়েছিল। আরব ঐতিহাসিকদের মতে এই চিঠিপত্র আদান-প্রদান হিরাক্লিয়াসের সঙ্গে সংঘটিত হয়েছিল। তবে তারা এটি হিরাক্লিয়াস-১ অথবা হিরাক্লিয়াস-২ এর সঙ্গে হয়েছিল, তা স্পষ্ট করে বলেননি। হিরাক্লিয়াস-১ এর নিকট থেকে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ার ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছিলেন। আর হিরাক্লিয়াস-২ হিরাক্লিয়াস কনস্টান্টাইন নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে (২১ হি.) মৃত্যুবরণ করেন এবং তার ছেলে একই বছর তার স্থলাভিষিক্ত হন; উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের দুই বছর আগে। যার সঙ্গেই চিঠি লেনদেন হোক না কেন, তাদের মধ্যে পত্রবাহকের আসা-যাওয়া ছিল। উম্মে কুলসুম বিনতে আলী ইবনে আবি তালিব, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী, একবার হিরাক্লিয়াসের স্ত্রীর নিকট একটি উপহার পাঠিয়েছিলেন। উক্ত উপহারটি বাইজেন্টাইন সম্রাটের পক্ষ থেকে আগত পত্রবাহকের মাধ্যমেই প্রেরণ করা হয়েছিল। আর বাইজেন্টাইন সম্রাটের স্ত্রীও এর বিনিময়ে মূলবান অলঙ্কারাদি উপহার হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেগুলো বাইতুল মালে জমা করে দিয়েছিলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর চিঠির সঙ্গে উম্মে কুলসুম উপহার প্রেরণ করেছিলেন বলে ইতিহাসের বইতে পাওয়া যায়।^{৮১৬}

৪.৬। উমর রা.-এর বিজয়ের প্রভাব

■ ১। মুসলিম বাহিনী কর্তৃক পারসিক ও বাইজেন্টাইন রোমান সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ফলে এই দুই পরাশক্তির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অহেতুক সংঘর্ষের পরাসমাপ্তি ঘটে। এই দুই অঞ্চলের অধিবাসীরা অনবরত যুদ্ধে বিপর্যস্ত ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এসব সংঘর্ষে শাসকদের ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটানো ছাড়া অন্য কোনো কারণ ছিল না।

■ ২। এই অঞ্চলে একক নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে, যার অবস্থান ছিল পৃথিবীর মধ্যস্থল এবং পূর্বদিকে চীনের সীমান্ত থেকে বর্ধিত হয়ে পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত, দক্ষিণে আরব উপসাগর থেকে উত্তরে এশিয়া

^{৮১৬} তারিখ আত-তাবারি, ৫/২৫৯; আশহার মাশাহির আল-ইসলাম, ২/৩৫৯।

মাইনর পর্যন্ত। মানবজাতি এ রকম নেতৃত্ব ইতিপূর্বে আর দেখেনি। পুরো রাজ্যে একই আইন, সামাজিক ব্যবস্থা ও কৃষ্টি-কালচারের বিকাশ ঘটেছিল।

■ ৩। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীরাই ঐশী ব্যবস্থার আওতায় বসবাস শুরু করে। এখানে সকলের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা ছিল। সমাজের কালো, লাল, সাদা কিংবা হলুদ বর্ণের মানুষদের মধ্যে নীতি ও আদর্শে কোনো পার্থক্য ছিল না; বরং সবাই ছিল আল্লাহর আইনে সমান এবং শ্রেষ্ঠত্বে মাপকাঠি ছিল কেবল তাকওয়া-পরহেজগারী। আল্লাহর আইনের বাস্তব প্রয়োগ ও সুফল মানুষ অনুধাবন করতে পেরেছিল, যা তাদের নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব, বরকত ও অনিঃশেষ রসদ সরবরাহ নিশ্চিত করেছিল।

■ ৪। বিশ্বে এক নতুন উম্মতের আবির্ভাব ঘটে, যারা তাওহীদ ও আল্লাহর বিধানের অধীনে একত্র হয়েছিল। গোত্র, বংশ ও অন্যান্য জাগতিক বন্ধনের লেশমাত্র ছিল না। সকল গোত্র থেকেই এ উম্মতের নেতারা উচ্চমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল, যা থেকে তাদের অবনমিত করার কোনো সুযোগ ছিল না। এ জন্য তারা যাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতো, তাদের বলত : যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, তাহলে তোমাদের জীবন পরিচালনায় আল্লাহর কিতাব প্রদান করব এবং যদি তোমরা এর বিধি-বিধান মেনে চলো, তাহলে আমরা ফিরে যাব এবং তোমাদের দেশ তোমাদের কাছে ছেড়ে যাব।^{৮১৭}

■ ৫। সেখানে একটি সুসংহত, ভারসাম্যপূর্ণ ও সুসাদৃশ্য সভ্যতার বিকাশ ঘটে। একই সীমানার ভেতর বিভিন্ন জাতি ও মানুষের বন্ধন গড়ে উঠেছিল এবং সবাই আল্লাহর আইনের অধীন ছিল। ঐশী শাসনব্যবস্থা ও নীতির আলোকে সকল মানুষকেই এই সভ্যতার অংশ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল—কালো, হলুদ কিংবা সাদা। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তার সময়ের শ্রেষ্ঠ নেতৃত্বের অনির্বচনীয় দৃষ্টান্ত, যিনি তার মেধা ও প্রজ্ঞা, শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাস ও কর্মে ছিলেন পরবর্তীদের জন্য অনুসরণীয়

আদর্শ। তিনি তার রাষ্ট্রের সকল সম্পদ, তার সৈন্য, তার অনুসারী ও তার জ্ঞানকে আল্লাহর দীন ও মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছিলেন, যাতে আল্লাহর কালামকে সুউচ্চ করা যায়, মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনা যায়, বস্তু ও ব্যক্তির পূজা থেকে এক আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন করা সম্ভব হয়। এভাবে তিনি আল্লাহর বাণীতে সত্যে পরিণত করেন :

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ①

আমি তাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কার্য হতে নিষেধ করবে। সকল কাজের শেষ পরিণাম (ও সিদ্ধান্ত) আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ।^{৮১৮}

ইসলামী বিজয়সমূহ ইসলামের অধীনেই একটি গৌরবময় মানবসভ্যতার জন্ম দিয়েছিল। সুতরাং আমরা অনুধাবন করতে পারি, ঐশ্বরিকভাবে পরিচালিত সভ্যতা এমন একটি জাতিসত্তার পরিচয় বহন করে, যারা ইসলামী জীবনব্যবস্থায় সমগ্র পৃথিবী ও মানবজাতির জন্য কল্যাণকর নেতৃত্বের ধারক ও বাহক।^{৮১৯}

^{৮১৮} সূরা হজ, ২২ : ৪১।

^{৮১৯} আল-ইসলাম ওয়াল হাদারাহ, ওয়ামি, ১/৯০।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উমর রা.-এর জীবনের শেষ দিনগুলো

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন আদর্শ ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত খলীফা; ধার্মিক, খাঁটি, মজবুত ও সৎ মুজাহিদ এবং মুসলিম উম্মাহ ও ঈমানের জন্য শক্তিশালী দুর্গ। তিনি মুসলিম জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং ইসলাম ও উম্মাহের জন্য খেলাফতের পুরো সময়ই ব্যয় করেছেন। তিনি ছিলেন মুসলিম সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, ফকীহ ও মুজতাহিদ—যার সিদ্ধান্ত সকলের নিকটই গ্রহণযোগ্য ছিল। তিনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারক এবং ছোট-বড়, দুর্বল-শক্তিশালী এবং ধনী-দরিদ্র—সকল শ্রেণির প্রজাদের নিকট ছিলেন অনুগ্রহশীল পিতার মতো।

আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ছিল তার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান এবং দৃঢ় সংকল্পকারী একজন রাজনীতিক। তিনি পুরো মুসলিম জাতিকে শাসন করেছেন। তার শাসনামলে ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী কাদেসিয়া, মাদাইন, জালুলা ও নাহাওয়ান্দে পারসিক বাহিনীকে পরাজিত করেন। সিরিয়া ও মিসর বিজয় করে তা রোমানদের শাসন থেকে মুক্ত করেন।^{৮২০} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে আরব উপদ্বীপের আশপাশে অধিকাংশ এলাকায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি কঠিনভাবে সকল ধরনের ফেতনা ও বিদ্রোহ দমন করেন। ফেতনা সৃষ্টিকারীরা তার জীবদ্দশায় মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সাহস করেনি। এ কারণে তার শাসনামলে বড় কোনো ফেতনার আবির্ভাবও হয়নি।^{৮২১}

^{৮২০} আল-খলীফা আল-ফারুক উমর ইবনুল খাত্তাব, আল-আনি, পৃ. ১৫১।

^{৮২১} আল-খুলাফা আর-রাশিদিন, আল-খালিদি, পৃ. ৭৭।

৫.১। ফেতনা ও এর ভয়াবহতা উমর রা. এবং হুযাইফাহ রা.-এর মধ্যে নিয়ে আলোচনা

হুযাইফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে তিনি বলেন, একবার আমরা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ তিনি বললেন, ফেতনা সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য তোমাদের মধ্যে কে স্মরণ রেখেছে? হুযাইফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন) মানুষ নিজের পরিবার, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশীর ব্যাপারে যে ফেতনায় পতিত হয়, সালাত, সদাকাহ, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ তার সে পাপকে মুছে ফেলে। তিনি বললেন, আমি তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনি এবং সে ফিতনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি, যা সাগর লহরির মতো ঢেউ খেলবে। হুযাইফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, সে ফেতনায় আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। কেননা, সে ফেতনা ও আপনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা আছে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, দরজাটি কি ভেঙে ফেলা হবে, না খুলে দেওয়া হবে? তিনি বললেন, না বরং ভেঙে ফেলা হবে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তাহলে তো সেটা আর কখনো বন্ধ করা যাবে না। (হুযাইফাহ বলেন) আমি বললাম, হ্যাঁ। (শাকীক বলেন) আমরা হুযাইফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলাম, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কি দরজাটি সম্পর্কে জানতেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। যেমন আমি সুনিশ্চিতভাবে জানি যে আগামী দিনের পর রাত আসবে। কেননা, আমি তাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছিলাম, যা ক্রটিমুক্ত। (শাকীক বলেন) দরজাটি কে সে সম্পর্কে হুযাইফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করতে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম, তাই আমরা মাসরুককে জিজ্ঞাসা করতে বললাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, দরজাটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু (নিজেই)।^{৮২২}

হুযাইফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জানান যে, তিনি ছিলেন একটি শক্তিশালী দরজা, যা মুসলিম জাতিকে ফেতনা ও গৃহযুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছে। কিন্তু এই দরজাটি ভেঙে ফেলা হবে, মানে তারপর

কিয়ামত পর্যন্ত এ দরজা আর বন্ধ হবে না। এটাই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বুঝেছিলেন; মুসলমানদের মধ্যে ফেতনা ছড়িয়ে যাবে এবং তারা কখনোই আর সেটি দমাতে বা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না। এ ক্ষেত্রে হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের ভাষ্য বা ব্যক্তিগত চাওয়ার কথা বলেননি। কারণ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না; বরং তিনি এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট শুনেছিলেন, তা অনুধাবন করেছিলেন এবং অন্তরে ধারণ করেছিলেন। এটিই তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এভাবে বর্ণনা করেছিলেন : আমি একটি হাদীস বর্ণনা করেছি এবং আমি তাতে ভুল করিনি—মানে এটি সহীহ এবং তা বানানো বা মিথ্যা নয়—কারণ, আমি এটি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে শুনেছি। অধিকন্তু হুযাইফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু যা বলেছেন, এ ব্যাপারে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সজাগ ছিলেন। তিনি ভালো করেই জানতেন, তার শাসনামল মুসলমানদের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টির বড় বাধা এবং তার জীবদ্দশায় কখনো ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না।^{৮২৩} তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে শুনেছিলেন যে, তাকে হত্যা করা হবে এবং তিনি শহীদ হিসাবেই আল্লাহর নিকট হাজির হবেন। আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, (একবার) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, উমর, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করেন। পাহাড়টি নড়ে উঠল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উহুদ, থামো। তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দুজন শহীদ রয়েছে।^{৮২৪}

৫.১.১। শেষ হজে উমর রা.-এর দুআ (২৩ হি.)

সাইদ ইবনে মুসাইয়াব থেকে বর্ণিত, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মিনা থেকে ফেরার পথে আবতাহ নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে সমতলভূমিতে একটি বালুর একটি স্তূপ তৈরি করেন এবং তার ওপর কাপড় বিছিয়ে হেলান দিয়ে বসেন। তারপর দু-হাত তুলে এই দুআ করেন : ‘হে আল্লাহ, আমি বয়োবৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি। আমার শক্তি-সামর্থ্য দুর্বল

^{৮২৩} আল-খুলাফা আর-রাশিদিন, আল-খালিদি, পৃ. ৭৯।

^{৮২৪} সহীহ, বুখারী, হাদীস নং ৩৬৭৫।

হয়ে পড়েছে। আমার অধীন প্রজারা বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে। আমাকে এমতাবস্থায় আপনার কাছে নিয়ে যান (মৃত্যুর মাধ্যমে)—কারও হকের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কিংবা ছাড়াছাড়ি করার আগেই।’ তারপর তিনি মদীনার উদ্দেশে রওনা হন।^{৮২৫}

৫.১.২। উমর রা.-এর শাহাদাত কামনা

যায়েদ বিন আসলাম তার পিতা থেকে তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই দুআ করতেন : হে আল্লাহ, আমাকে আপনার পথে শাহাদাতের মৃত্যু দান করুন এবং আমার মৃত্যু যেন আপনার নবীর শহরে হয়। অন্যান্য বর্ণনায় ভিন্ন শব্দে রয়েছে : হে আল্লাহ, আপনার সন্তুষ্টির পথে আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করুন এবং আমি যেন আপনার নবীর শহরেই মৃত্যুবরণ করি।’ কেউ একজন জিজ্ঞাসা করল, ‘এটা কীভাবে সম্ভব—মদীনায় অবস্থান করে আল্লাহর পথে শাহাদাতের মৃত্যু?’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, ‘আল্লাহ চাইলে সবই সম্ভব।’ শায়েখ ইউসূফ বিন হাসান উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত কামনার কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘শাহাদাত কামনা করা মুস্তাহাব। শাহাদাত কামনার অর্থ মৃত্যু কামনা নয়। এর মধ্যে পার্থক্য হলো, মৃত্যু কামনার অর্থ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই মৃত্যু চাওয়া, অথচ মানুষ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার নেক আমলও বাড়তে থাকে। আর শাহাদাত কামনা মানে শহীদ অবস্থায় নির্ধারিত সময়েই মৃত্যু কামনা করা; এটা নির্ধারিত সময়ের আগে মৃত্যু চাওয়া নয়; বরং গৌরবময় মৃত্যুর আশা করা।’^{৮২৬}

৫.১.৩। আউফ ইবনে মালিক আল-আশাযির স্বপ্ন

আউফ ইবনে মালিক বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আকাশ থেকে একটি রশি ঝুলে আছে এবং মানুষ সেটি ধরার জন্য চেষ্টা করছে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখা গেল তিনি অন্যান্যদের চেয়ে তিন হাত পরিমাণ উঁচু। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ রকম কেন? তিনি বললেন,

^{৮২৫} তারিখুল মদীনা, ৩/৮৭২।

^{৮২৬} আত-তাবাকাত, ইবনে সাদ, ৩/৩৩১।

তিনি যমীনে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং কোনো নিন্দুকের পরোয়া করবেন না। আর তাকে শহীদ করা হবে।’ পরদিন সকালে আমি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গিয়ে স্বপ্নের কথা জানালাম এবং তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহর বান্দা, আবু হাফসকে ডেকে আনো।’ যখন তিনি এলেন, তখন বললেন, ‘হে আউফ, স্বপ্নে যা দেখেছ, তা তাকে বলো।’ আমি যখন তাকে বললাম যে, তিনি আল্লাহর খলীফাদের একজন হবেন, তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘এসবই কি একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি দেখেছে?’ তারপর তাকে পুরো স্বপ্ন শোনানো হয়।^{৮২৭}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হওয়ার পর একবার জাবিয়া নামক স্থানে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি যখন খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন আমাকে ডেকে কাছে বসতে বলেন। তিনি খুতবা শেষ করে বললেন, ‘আমাকে তোমার স্বপ্নের কথা বলো।’ আমি বললাম, ‘আপনি কি আমাকে তা বলতে নিষেধ করেননি?’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমি তা বোঝাইনি।’^{৮২৮} আরেক বর্ণনামতে, তিনি বলেন, ‘আপনি কি এগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেননি?’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, ‘আমি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সম্মুখে নিজের প্রশংসা শুনে লজ্জা পাচ্ছিলাম।’^{৮২৯} তারপর যখন আমি তাকে আমার পুরো স্বপ্নের কথা বললাম, তখন তিনি বললেন, ‘আমার খলীফা হওয়ার কথা ছিল, খলীফা হয়েছি। আর কোনো নিন্দুকের পরোয়া করার ব্যাপারে কথা হলো, আমি কেবল আল্লাহকে ভয় করি। কোনো নিন্দুকের পরোয়া করি না। আমি আশা করি এটিও সত্য। কিন্তু আমার শাহাদাতের ব্যাপারে যা দেখেছ, তা কী করে সম্ভব, যেখানে আমি আরবেই বসবাস করছি (মানে এখানে তো কোনো জিহাদ করার সুযোগ নেই)?’^{৮৩০}

৫.১.৪। উমর রা.-এর মৃত্যু সম্পর্কে আবু মুসা আশআরী রা.-এর স্বপ্ন

আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম অনেকগুলো দ্রুতগামী ঘোড়া এবং সেগুলো এক এক করে অদৃশ্য হয়ে

^{৮২৭} মায়ুস সাওয়াব, ৩/৮৬৯।

^{৮২৮} তারিখুল মদীনা, ৩/৮৬৮-৮৬৯।

^{৮২৯} আত-তাবাকাত, ৩/৩৩১; মাহযুস সাওয়াব, ৩/৮৬৮।

^{৮৩০} মাহযুস সাওয়াব, ৩/৮৬৯।

যাচ্ছে। অবশেষে আমি একটি ঘোড়ায় চড়ে যালাক পাহাড়ে পৌঁছি। সেখানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার পাশে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে পাই। তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আসার অপেক্ষায় ছিলেন। আমি বললাম, ‘আপনি কেন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট চিঠি প্রেরণ করছেন না?’ তিনি বললেন, ‘আমি তাকে তার মৃত্যুর সংবাদ বলতে চাচ্ছি না।’^{৮৩১}

৫.১.৪। মদীনায় উমর রা.-এর শেষ খুতবা

২১ যিলহজ, ২৩ হি.। শুক্রবার। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এদিন জুমুআর শেষ খুতবা প্রদান করেন। এ খুতবার কিছু অংশ আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, যা আমি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনীতে উল্লেখ করেছি। এ খুতবায় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার নিজের দেখা একটি স্বপ্নের কথা বলেন এবং সেটি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, ‘আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। আমি মনে করি তা ছিল আমার মৃত্যুর সংবাদ। আমি দেখেছি, একটি মোরগ আমাকে দু-বার ঠোকর মেরেছে এবং লোকে আমাকে আমার পরবর্তী খলীফা নির্বাচন করার জন্য তাগিদ দিচ্ছে। আল্লাহ তার এই দীন অথবা খেলাফতের ধারাকে কখনো ধ্বংস করবেন না অথবা আল্লাহ তার রাসূলকে যে সত্যসহ প্রেরণ করেছিলেন, তা হারিয়ে যেতে দেবেন না। আমি যদি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে ছয় সদস্য-বিশিষ্ট একটি শূরা কমিটি আমার পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত করবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমৃত্যু এই ছয় সদস্যের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।’^{৮৩২}

৫.১.৬। ছুরিকাহত হওয়ার পূর্বে উমর রা.-এর হুয়াইফাহ রা.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হওয়ার চার দিন পূর্বে ২৩ যিলহজ ২৩ হি. রোজ রবিবার হুয়াইফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং সাহল বিন হুনাইফ

^{৮৩১} আত-তাবাকাত, ইবনে সাদ, ৩/৩৩২। এর সনদ সহীহ।

^{৮৩২} আল-মাউসুয়াতুল হাদিসিয়া মুসনাদ আল-ইমাম আহমাদ, হাদীস নং ৮৯। এর সনদ সহীহ।

রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি হুযাইফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দাজলা নদীর পানি দ্বারা সিঞ্চিত যমীনের খারায় নির্ধারণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আর সাহল বিন হুরাইফ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ফোৱাত নদীর পানির দ্বারা সিঞ্চিত যমীনের খারায় নির্ধারণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তাদের বলেন, ‘তোমরা কীভাবে কাজ করছ? আমার তো ভয় হয়, তোমরা কৃষকদের ওপর এমন বোঝা চাপিয়ে দেবে যা বহন করার সাধ্য তাদের নেই।’ তারা দুজনেই বললেন, ‘আমরা সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দিইনি।’ তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘যদি আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন, তাহলে আমি ইরাকের বিধবাদের ডেকে তাদের প্রয়োজন পূরণ করব এবং তারপর তাদের আর কারও মুখাপেক্ষী হতে হবে না।’ কিন্তু এ কথা বলার চার দিন পরেই তিনি শহীদ হয়ে যান।^{৮৩৩}

৫.১.৭। বন্দীদের মদীনায় বসবাসের নিষেধাজ্ঞা

মুসলমানদের বিজিত এলকায় যেসব বন্দী বসবাস করত, তাদের তিনি ইসলামী খেলাফতের রাজধানী মদীনায় প্রবেশের অনুমতি দেননি। তিনি ইরাক ও পারস্যের অগ্নিপূজকদের এবং সিরিয়া ও মিসরের খ্রিস্টানদের মদীনায় বসবাসে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। তবে তারা মুসলমান হলে অনুমতি দিতেন। এ সিদ্ধান্ত থেকে তার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা, তারা ছিল ইসলামের চরম দুশমন। সর্বদা মুসলমানদের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টির পায়তারা করত। এ কারণে তাদের অনিষ্ট থেকে মুসলিম জাতিকে বাঁচানোর লক্ষ্যে মদীনায় তাদের থাকার অনুমতি দেননি। কিন্তু কতক সাহাবীদের সাবায়ী গোলাম থাকায় তারা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট তাদের থাকার ব্যাপারে সুপারিশ করেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু অনিচ্ছা সত্ত্বেও এর অনুমতি প্রদান করেন। ফলে তা-ই ঘটে, যার আশঙ্কা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু করেছিলেন।^{৮৩৪}

^{৮৩৩} আল-খুলাফা আর-রাশিদুন, আল-খালিদি, পৃ. ৮২; সহীহ, বুখারী, হাদীস নং ৩৭০০।

^{৮৩৪} আল-খুলাফা আর-রাশিদুন, আল-খালিদি, পৃ. ৮৩।

৫.২। উমর রা.-এর হত্যাকাণ্ড এবং শূরা কমিটি গঠন

৫.২.১। উমর রা.-এর হত্যাকাণ্ড

আমর ইবনে মায়মুন রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং তার ও আমার মাঝে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু দু-কাতারের মধ্য দিয়ে চলার সময় বলতেন, কাতার সোজা করে নাও। যখন দেখতেন কাতারে কোনো ক্রটি নেই, তখন তাকবীর বলতেন। তিনি অধিকাংশ সময় সূরা ইউসুফ, সূরা নাহল অথবা এ ধরনের সূরা প্রথম রাকাতে তিলাওয়াত করতেন, যেন অধিক পরিমাণে লোক প্রথম রাকাতে শরীক হতে পারেন। তাকবীর বলার পরেই আমি তাকে বলতে শুনলাম, একটি কুকুর আমাকে আঘাত করেছে অথবা বলেন, আমাকে আক্রমণ করেছে। ঘাতক 'ইলজ' দ্রুত পলায়নের সময় দু-ধারি খঞ্জর দিয়ে ডানে বামে আঘাত করে চলেছে। এভাবে তেরো জনকে আহত করল। এদের মধ্যে সাত জন শহীদ হলেন।

এ অবস্থা দেখে এক মুসলিম তার লম্বা চাদরটি ঘাতকের ওপর ফেলে দিলেন। ঘাতক যখন বুঝতে পারল সে ধরা পড়ে যাবে তখন সে আত্মহত্যা করল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাত ধরে সামনে এগিয়ে দিলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকটে যারা ছিল শুধু তারাই ব্যাপারটি দেখতে পেল। আর মসজিদের শেষে যারা ছিল তারা ব্যাপারটি এর অধিক বুঝতে পারল না যে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে না। তাই তারা 'সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ' বলতে লাগলেন। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের নিয়ে সংক্ষেপে সালাত আদায় করলেন। যখন মুসল্লীগণ চলে গেলেন, তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হে ইবনে আব্বাস, দেখো তো, কে আমাকে আঘাত করল?' তিনি কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করে এসে বললেন, 'মুগীরাহ ইবনে শুবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর গোলাম (আবু লুলু)।' উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই কারিগর গোলামটি?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আল্লাহ তার সর্বনাশ করুন। আমি তার সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত

দিয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমার মৃত্যু ইসলামের দাবিদার কোনো ব্যক্তির হাতে ঘটাননি। হে ইবনে আব্বাস, তুমি এবং তোমার পিতা মদীনায কাফির গোলামের সংখ্যা বৃদ্ধি পছন্দ করতে। আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট অনেক অমুসলিম গোলাম ছিল। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘যদি আপনি চান তবে আমি কাজ করে ফেলি অর্থাৎ আমি তাদের হত্যা করে ফেলি।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তুমি ভুল বলছ। কেননা, তারা তোমাদের ভাষায় কথা বলে, তোমাদের কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করে, তোমাদের মতো হজ করে।’ অতঃপর তাকে তার ঘরে নেওয়া হলো। আমরা তাঁর সঙ্গে চললাম। মানুষের অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, ইতিপূর্বে তাদের ওপর এত বড় মুসিবত আর আসেনি। কেউ কেউ বলছিলেন, ভয়ের কিছু নেই। আবার কেউ বলছিলেন, আমি তাঁর সম্পর্কে আশঙ্কাবোধ করছি। অতঃপর খেজুরের শরবত আনা হলো, তিনি তা পান করলেন। কিন্তু তা তার পেট হতে বেরিয়ে পড়ল। অতঃপর দুধ আনা হলো, তিনি তা পান করলেন; তাও তার পেট হতে বেরিয়ে পড়ল। তখন সকলেই বুঝতে পারলেন, মৃত্যু তার অবশ্যম্ভাবী। আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। অন্যান্য লোকজনও আসতে শুরু করল। সকলেই তার প্রশংসা করতে লাগল। তখন যুবক বয়সী একটি লোক এসে বলল, ‘হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার জন্য আল্লাহর সু-সংবাদ রয়েছে; আপনি তা গ্রহণ করুন। আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য গ্রহণ করেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগেই আপনি তা গ্রহণ করেছেন, যে সম্পর্কে আপনি নিজেই অবগত আছেন। অতঃপর আপনি খলীফা হয়ে ন্যায় বিচার করেছেন। অতঃপর আপনি শাহাদাত লাভ করেছেন।’

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমি পছন্দ করি যে তা আমার জন্য ক্ষতিকর বা লাভজনক না হয়ে সমান সমান হয়ে যাক।’ যখন যুবকটি চলে যেতে উদ্যত হলো, তখন তার লুঙ্গিটি মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছিল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘যুবকটিকে আমার নিকট ডেকে আনো।’ তিনি বললেন, ‘হে ভাতিজা, তোমার কাপড়টি উঠিয়ে নাও। এটা তোমার কাপড়ের পরিচ্ছন্নতার জন্য এবং তোমার রবের নিকটও পছন্দনীয়। হে আবদুল্লাহ ইবনে উমর, তুমি হিসাব করে দেখো আমার ঋণের পরিমাণ কত।’ তারা হিসাব করে দেখতে পেলেন ছিয়াশি হাজার (দিরহাম) বা এর

কাছাকাছি। তিনি বললেন, ‘যদি উমরের পরিবার-পরিজনের মাল দ্বারা তা পরিশোধ হয়ে যায়, তবে তা দিয়ে পরিশোধ করে দাও। অন্যথায় আদি ইবনু কা‘ব এর বংশধরদের নিকট হতে সাহায্য গ্রহণ করো। তাদের মাল দিয়েও যদি ঋণ পরিশোধ না হয় তবে কুরাইশ কবিলা হতে সাহায্য গ্রহণ করবে, এর বাইরে কারও সাহায্য গ্রহণ করবে না। আমার পক্ষ হতে তাড়াতাড়ি ঋণ আদায় করে দাও। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার খিদমতে তুমি যাও এবং বলো উমর আপনাকে সালাম পাঠিয়েছে। ‘আমীরুল মুমিনীন’ শব্দটি বলবে না। কেননা, এখন আমি মুমিনগণের আমীর নই। তাকে বলো উমর ইবনু খাত্তাব তার সাথিদ্বয়ের পাশে দাফন হবার অনুমতি চাচ্ছেন।’ আব্দুল্লাহ ইবনু উমর আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার খিদমতে গিয়ে সালাম জানিয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, ‘প্রবেশ করো।’ তিনি দেখলেন, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বসে বসে কাঁদছেন। তিনি গিয়ে বললেন, ‘উমর ইবনুল খাত্তাব আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং তার সঙ্গীদ্বয়ের পার্শ্বে দাফন হবার জন্য আপনার অনুমতি চেয়েছেন।’ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ‘তা আমার আকাজক্ষা ছিল। কিন্তু আজ আমি এ ব্যাপারে আমার ওপরে তাকে অগ্রগণ্য করছি।’

আবদুল্লাহ ইবনে উমর যখন ফিরে আসছেন তখন বলা হলো, এই যে আবদুল্লাহ ফিরে আসছে। তিনি বললেন, ‘আমাকে উঠিয়ে বসাও।’ তখন এক ব্যক্তি তাকে ঠেস দিয়ে বসিয়ে ধরে রাখলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কী সংবাদ?’ তিনি বললেন, ‘আমীরুল মুমিনীন, আপনি যা কামনা করেছেন, তাই হয়েছে, তিনি অনুমতি দিয়েছেন।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ। এর চেয়ে বড় কোনো বিষয় আমার নিকট ছিল না। যখন আমার মৃত্যু হয়ে যাবে তখন আমাকে উঠিয়ে নিয়ে, তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, উমর ইবনুল খাত্তাব আপনার অনুমতি চাচ্ছেন। যদি তিনি অনুমতি দেন, তবে আমাকে প্রবেশ করাবে, আর যদি তিনি অনুমতি না দেন তবে আমাকে সাধারণ মুসলিমদের গোরস্থানে নিয়ে যাবে।’ এ সময় উম্মুল মুমিনীন হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে কতিপয় মহিলাসহ আসতে দেখে আমরা উঠে পড়লাম। হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার নিকট গিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। অতঃপর পুরুষরা এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলে, তিনি ঘরের ভেতর

গেলে ঘরের ভেতর হতেও আমরা তার কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। তারা বললেন, ‘হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি অসীয়াত করুন এবং খলীফা মনোনীত করুন।’

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, খেলাফতের জন্য এ কয়েকজন ছাড়া অন্য কাউকে আমি যোগ্যতম পাচ্ছি না, যাদের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ইত্তিকালের সময় রাজি ও খুশি ছিলেন। অতঃপর তিনি তাদের নাম বললেন, আলী, উসমান, যুবায়র, তালহা, সাদ ও আবদুর রহমান ইবনে আউফ এবং বললেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনে উমর তোমাদের সঙ্গে থাকবে। কিন্তু সে খেলাফত লাভ করতে পারবে না। তা ছিল শুধু সন্তানমাত্র। যদি খেলাফতের দায়িত্ব সাদের রাযিয়াল্লাহু আনহু ওপর ন্যস্ত করা হয় তবে তিনি এর জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। আর যদি তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ খলীফা নির্বাচিত হন তবে তিনি যেন সর্ববিষয়ে সাদের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করেন। আমি তাকে অযোগ্যতা বা খিয়ানতের কারণে অপসারণ করিনি। আমার পরের খলীফাকে আমি অসীয়াত করছি, তিনি যেন প্রথম যুগের মুহাজিরগণের হক সম্পর্কে সচেতন থাকেন, তাদের মান-সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন। এবং আমি তাকে আনসার সাহাবীগণের যাঁরা মুহাজিরগণের আসার আগে এই নগরীতে (মদীনায়) বসবাস করে আসছিলেন এবং ঈমান এনেছেন, তাঁদের প্রতি সদ্যবহার করার অসীয়াত করছি যে, তাদের মধ্যে নেককারগণের ওয়র-আপত্তি যেন গ্রহণ করা হয় এবং তাঁদের মধ্যে কারও ভুলক্রটি হলে তা যেন ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আমি তাঁকে এ অসীয়াতও করছি যে, তিনি যেন রাজ্যের বিভিন্ন শহরের অধিবাসীদের প্রতি সদ্যবহার করেন। কেননা, তারাও ইসলামের হিফায়তকারী এবং তারাই ধন-সম্পদের জোগানদাতা। তারাই শত্রুদের চোখের কাঁটা। তাদের হতে তাদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে কেবল তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যেন যাকাত আদায় করা হয়। আমি তাকে পল্লিবাসীদের প্রতি সদ্যবহার করারও অসীয়াত করছি। কেননা, তারাই আরবের ভিত্তি এবং ইসলামের মূল শক্তি। তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ এনে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে যেন বিলিয়ে দেওয়া হয়। আমি তাকে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিম্মিদের (অর্থাৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়) বিষয়ে অসীয়াত করছি যে, তাদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার যেন পূরা করা হয়।

তাদের পক্ষাবলম্বনে যেন যুদ্ধ করা হয়, তাদের শক্তি-সামর্থ্যের অধিক জিযিয়া যেন চাপানো না হয়।’

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইত্তিকাল হয়ে গেলে আমরা তার লাশ নিয়ে পায়ে হেঁটে চললাম। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে সালাম করলেন এবং বললেন, ‘উমর ইবনুল খাত্তাব অনুমতি চাচ্ছেন।’ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ‘তাকে প্রবেশ করাও।’ অতঃপর তাকে প্রবেশ করানো হলো এবং তার সঙ্গীদের পার্শ্বে দাফন করা হলো।^{৮৩৫}

অন্য বর্ণনায় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সম্পর্কে আরও কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যা আমরা ইবনু মায়মুন রহ.-এর বর্ণনায় নেই। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ভোরবেলা আঘাত করা হয়। তাকে মুগীরাহ ইবনে শুবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর গোলাম আবু লুলু আঘাত করে। সে একজন অগ্নিপূজক ছিল।’ আবু রাফে বলেন, ‘মুগীরাহ ইবনে শুবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর গোলাম আবু লুলু পেষণযন্ত্র বানাত। এর বিনিময়ে মুগীরাহ ইবনে শুবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার নিকট থেকে চার দিরহাম কেটে রাখত। আবু লুলু একদিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে দেখা করে বলে, ‘হে আমীরুল মুমিনীন, মুগীরাহ ইবনে শুবাহ আমার নিকট থেকে বেশি পরিমাণে কেটে রাখছে। তাকে এর পরিমাণ কমাতে বলুন।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘তুমি আল্লাহকে ভয় করো এবং মনিবকে সন্তুষ্ট রাখো।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুগীরাহ ইবনে শুবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর দেখা করে গোলামের বোঝা হালকা করার কথা বলবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু আবু লুলু খ্যাপে গিয়ে বলে ওঠে, ‘হায়, তার ইনসাফ আমার বেলায় এসে হারিয়ে গেল!’ এ জন্য সে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার পরিকল্পনা করে। তারপর সে একটি দু-ধারি খঞ্জর বানায় এবং সেটি ধারালো করে তাতে বিষ মিশিয়ে রাখে। তারপর এটি নিয়ে হরমুয়ের কাছে যায়। তাকে জিজ্ঞাসা করে, ‘খঞ্জরটি কেমন হলো?’ সে জবাবে বলল, ‘এটি দিয়ে যাকেই আঘাত করা হবে, সে-ই মারা যাবে।’ রাবী বলেন, ‘তারপর সে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশে গমন করে এবং ফজরের নামাযে তার

ঠিক পেছনে দাঁড়ায়। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকবীর বলার আগে লোকজনকে নামাযের কাতার সোজা করতে বলতেন। তারপর তাকবীর বলতেন। তিনি স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য দিনের মতোই কাতার সোজা করতে বলে তাকবীর দেন। আর তখনই আবু লুলু তার কাঁধে ও কোমরে খঞ্জরটি দিয়ে আঘাত করে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে যান।^{৮৩৬} আমরা ইবনে মাইমুন রহ. বলেন, ‘আমি তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি,

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا

আল্লাহর আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত।^{৮৩৭}

৫.২.২। উমর রা.-এর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনে অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু গুপ্তঘাতকের হাতে ছুরিকাহত হয়ে প্রচণ্ড কষ্ট ভোগ করছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মুসলিম জাতির ঐক্য এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। নিঃসন্দেহে এটি ছিল ইতিহাসের একটি সংকটময় মুহূর্ত, যখন তার ঈমানের দৃঢ়তা, একনিষ্ঠতা এবং আত্মোৎসর্গের অনুপম দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে।^{৮৩৮} ওই দুঃসময়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তী খলীফা নির্বাচনে সম্পূর্ণ নজিরবিহীন নতুন এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন। এ ঘটনা থেকে উম্মতের মানসিকতাকে অনুধাবন এবং তাদের যাবতীয় বিষয়াদি দক্ষভাবে পরিচালনা করার জন্য তার যে অসাধারণ যোগ্যতা ছিল, তা পরিস্কারভাবে উপলব্ধি করা যায়। তার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কোনো উত্তরসূরি নির্বাচন না করেই ইন্তেকাল করেছেন। আর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকালের আগে প্রবীণ সাহাবীদের সঙ্গে আলোচনা করে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা নির্বাচন করে গিয়েছেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুসজ্জায়ও যখন তাকে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে বলা হলো, তখন তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। তারপর এমন এক পদ্ধতি নির্ধারণ করলেন, যা ওই সময়ের জন্য ছিল সবচেয়ে বেশি উপযোগী।

^{৮৩৬} সহীহ আত-তাওসিক ফি সিরাহ ওয়া হায়াত আল-ফারুক, পৃ. ৩৬৯।

^{৮৩৭} সূরা আহযাব, ৩৩:৩৮।

^{৮৩৮} আল-খলীফা আল-ফারুক উমর ইবনে আল-খাত্তাব, আল-আনি, পৃ. ১৬১।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল। সুতরাং তাকে খলীফা নির্বাচন করার ব্যাপারে কোনো ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কা ছিল না। অধিকন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা ও কাজে এই উম্মতকে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন যে, তার মৃত্যুর পর এ উম্মতকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই সবচেয়ে বেশি যোগ্য। আর যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হিসাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নির্বাচন করেন, তখন তিনি জানতেন, সাহাবায়ে কেরাম সবাই এ বিষয়ে একমত যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরে দৃঢ়তা এবং দায়িত্ববোধের কারণে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই রাষ্ট্র পরিচালনায় অধিক যোগ্য। সুতরাং প্রবীণ সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা মনোনীত করেন এবং এতে কেউই দ্বিমত পোষণ করেননি। এভাবে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতেই লোকজন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বাইআত গ্রহণ করে।^{৮৩৯}

পরবর্তী খলীফা মনোনয়নের ক্ষেত্রে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নির্বাচন পদ্ধতিকেই বেছে নেন। তবে এ নির্বাচন সীমিতসংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি শূরা কমিটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছয় জন সাহাবীকে নির্বাচন করেন, যারা প্রত্যেকেই খলীফা হওয়ার জন্য উপযুক্ত ছিলেন। তবে তাদের যোগ্যতার মধ্যে পার্থক্য ছিল। কীভাবে এবং কত দিনে খলীফা নির্বাচন করতে হবে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তা নির্দিষ্ট করে দেন। নতুন খলীফা নির্বাচনে কী পরিমাণ ভোটের প্রয়োজন হবে, তিনি তাও উল্লেখ করেন। তিনি একটি সৈন্যদল নিয়োগ দেন, যারা এ নির্বাচন-প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবে এবং যদি কেউ গণ্ডগোল সৃষ্টির পায়তারা করে, তাহলে তাকে সমুচিত শাস্তি দেবে। মজলিসে শূরার বৈঠকের নিরাপত্তা বিধান এবং তাতে যা আলোচিত হবে, তা যেন কেউ না শোনে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এটা নিশ্চিত করতে চেয়েছেন।^{৮৪০}

^{৮৩৯} আউয়ালিয়াতুল ফারুক, পৃ. ১২৪; ফাতহুল বারি, ১৩/২০৮।

^{৮৪০} প্রাগুক্ত।

মজলিসে শূরার সদস্যগণ

মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন ছয় জন। তারা হলেন :

- ✓ আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু,
- ✓ উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু,
- ✓ আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু,
- ✓ সাঈদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু,
- ✓ যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং
- ✓ তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু শূরার সদস্য হিসাবে সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে নুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রাখেননি যদিও তিনি বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন সাহাবীদের একজন ছিলেন। সম্ভবত এর কারণ ছিল যে, তিনি ছিলেন বনু আদি গোত্রের (যা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গোত্র)।^{৮৪১}

নির্বাচন পদ্ধতি

তিনি মজলিসে শূরার সদস্যদের তাদের একজনের বাড়িতে জমা হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলেন। উপদেষ্টা হিসাবে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মজলিসে উপস্থিত থাকবেন, তবে কোনো মন্তব্য করতে পারবেন না। এই আলোচনা চলাকালীন ইমামতির দায়িত্ব পালন করবেন সুহাইব আল-রুমি। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন, ‘এই তিন দিনের জন্য আপনি নামাজের ইমাম। মজলিসে শূরার কোনো সদস্যকে তিনি নামাজের ইমামতির দায়িত্ব দেননি যাতে তাকে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্বাচিত খলীফা হিসাবে কেউ ভুল না বোঝে। আল-মিসদাদ ইবনে আল-আসওয়াদ এবং আবু তালহা আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সভা পর্যবেক্ষণ করার আদেশ দেন।^{৮৪২}

^{৮৪১} আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/১৪২।

^{৮৪২} আশহার মাশাহির আল-ইসলাম ফিল হারব ওয়াল-সিয়ারাহ, পৃ. ৬৪৮।

নির্বাচন-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সময় নির্ধারণ

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নির্বাচন-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য তিন দিন সময় নির্ধারণ করেছিলেন, যা এ কাজের জন্য ছিল যথেষ্ট। যদি তারা এর চেয়ে বেশি সময় নেন, তাহলে ফিতনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। এ জন্য তিনি তাদের বলেন, ‘খলীফা নির্বাচন ব্যতিরেকে যেন তোমাদের জন্য চতুর্থ দিন না আসে।’^{৮৪৩}

খলীফা নির্বাচনে নির্ধারিত ভোট-সংখ্যা

ইতিহাসের কিছু কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে,

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মজলিসে শূরার সদস্যদের একত্র হয়ে আলোচনা করতে বলেছেন। তাদের মধ্যে পাঁচ জন যদি কারও ব্যাপারে একমত হয় এবং একজন তার বিপক্ষে থাকে, তাহলে তরবারি দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দিতে হবে। আর চার জন যদি একমত হয় এবং বাকি দুজন বিপক্ষে থাকে, তাহলে সেই দুজনের গর্দান উড়িয়ে দিতে হবে।^{৮৪৪}

এটা জঘন্য একটি বর্ণনা, যার কোনো ভিত্তি নেই। এটা রাফিযি শিয়া আবু মাখনাফের বানানো হাদীস, যা সহীহ বর্ণনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এটি সাহাবায়ে কেরামের আদর্শিক আচরণগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেও বেমানান। আবু মাখনাফ বর্ণিত, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন : তাদের (মজলিসে শূরার লোকজনের) দিকে নযর রাখো। তাদের মধ্যে পাঁচ জন যদি কারও ব্যাপারে একমত হয় এবং একজন তার বিপক্ষে থাকে, তাহলে তরবারি দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দিতে হবে। আর চার জন যদি একমত হয় এবং বাকি দুজন বিপক্ষে থাকে তাহলে সেই দুজনের গর্দান উড়িয়ে দিতে হবে।^{৮৪৫} কিন্তু এটি একটি মিথ্যা বর্ণনা। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কেমন করে এ রকম একটি জঘন্য আদেশ জারি করতে পারেন, যেখানে তিনি জানেন শূরার সদস্যগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত সাহাবী এবং তিনি নিজেই তাদের উন্নত গুণাবলি

^{৮৪৩} আত-তাবাকাত ইবনে সা'দ, ৩/৩৬৪।

^{৮৪৪} তারিখ আত-তাবারি, ৫/২২৬।

^{৮৪৫} তারিখ আত-তাবারি, ৫/২২৬।

ও মর্যাদার কারণে এ কাজের জন্য নির্বাচন করেছেন? ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আনসারদের উদ্দেশে বলেন : তাদের তিন দিন এক ঘরে অবস্থান করার সুযোগ দাও। যদি তারা ভালো কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে বের হয়ে আসে, তাহলে তো ভালো। আর নতুবা তাদের সকলের গর্দান উড়িয়ে দাও।’ এটি একটি মুনকাতি বর্ণনা এবং এর সনদে সাম্মাক ইবনে হারব রয়েছে, যিনি যঈফ।

বিশুদ্ধ সূত্রে ইবনে সা’দ বর্ণনা করেন, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, ‘আগামী তিন দিন নামাযে ইমামতি করুন এবং মজলিসে শূরার সদস্যদের আলোচনার জন্য অবকাশ দেন। যখন তারা কারও ব্যাপারে একমত হবে, তখন যদি কেউ দ্বিমত পোষণ করে, তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দেবেন (হত্যা করবেন)।’^{৮৪৬} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ আদেশ জারি করেন যে, যদি কেউ এই শূরার বিপক্ষে যায়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। আর এ আদেশ জারিতে রাসূলের নির্দেশকেই অনুসরণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ
أَوْ يَفْرِقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ

এক ব্যক্তির বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় (একজন রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে থাকা অবস্থায়) কোনো ব্যক্তি যদি এসে তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে বা ‘জামাআত’ বিভক্ত করতে চায়, তবে তাকে হত্যা করবে।^{৮৪৭}

মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে নির্দেশ

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের পরামর্শ দিয়েছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা মজলিসে উপস্থিত থাকবেন। তবে সেখানে তার কিছু বলার থাকবে না। কিন্তু তিনি তাদের বলেছেন : যদি তাদের তিন জন কাউকে মনোনীত করে এবং বাকি তিন জন অন্য কাউকে পছন্দ করে, তাহলে বিষয়টি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা ওপর

^{৮৪৬} প্রামাণ্য।

^{৮৪৭} সহীহ, মুসলিম, নং ১৮৫২, ৩/১৪৮০।

বর্তাবে। তিনি যে দলকে বিজয়ী ঘোষণা করবেন, সেখান থেকেই খলীফা নির্বাচন করবে। আর যদি তারা আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের সিদ্ধান্ত মানতে অপারগ হয়, তাহলে যে দলে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু থাকবেন, সে দল থেকেই খলীফা নির্বাচিত হবে।’ তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ হিসাবে বর্ণনা করে বলেন, ‘কী বিজ্ঞ লোকই-না আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, কতই-না অভিজ্ঞ! আল্লাহ তা‘আলা তাকে হেদায়েত ও নিরাপত্তা দিয়েছেন। সুতরাং তার কথা শোনো।’^{৮৪৮}

নির্বাচন-প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ এবং অরাজকতা নির্মূলে একদল মুসলমান সৈন্য নিয়োগ

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু তালহা আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, ‘হে আবু তালহা, মহান আল্লাহ তা‘আলা তোমার মাধ্যমে ইসলামকে সাহায্য করেছেন। আনসারদের মধ্যে পঞ্চাশ জন সৈন্য নিয়ে শূরা কমিটির নিরাপত্তায় নিয়োজিত করুন, যতক্ষণ-না তারা তাদের মধ্যে কাউকে নির্বাচিত করতে সক্ষম হয়।’^{৮৪৯} আর তিনি আল-মিসদাদ ইবনে আল-আসওয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, ‘আমাকে দাফন করার পর এই সেনাদের দলটিকে একসঙ্গে ওই ঘরের পাহারায় নিয়োজিত করো যতক্ষণ-না তারা তাদের সংখ্যা থেকে এক জনকে নির্বাচিত করে।’^{৮৫০}

তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের সমাপ্তি ঘটে। তার ওপর যে বিপদ আপত্তি হয়েছিল তা তিনি মুসলিম উম্মাহকে বুঝতে দেননি অথবা মৃত্যুর কঠিন যন্ত্রণাও তাকে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণচিন্তা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তিনি অভিনব এক শূরা-কমিটি গঠন করেন যদিও এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, কুরআন ও সুন্নাহতে পূর্ব থেকেই শূরার মূলনীতি বর্ণিত রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইতিমধ্যে এসব মূলনীতি প্রয়োগ করেছেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পূর্ণ নতুন কিংবা স্বচিন্তাপ্রসূত কোনো কিছুর প্রচলন করেননি; বরং তিনি খলীফা নির্বাচনে নতুন একটি পদ্ধতি বের করেছেন

^{৮৪৮} তারিখ আত-তাবারি, ৫/২২৫।

^{৮৪৯} প্রাপ্ত।

^{৮৫০} প্রাপ্ত।

এবং কমিটির সদস্যদের একটি সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন যেখান থেকে একজনকেই নির্বাচন করা হবে। এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু করেননি; উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই প্রথম এটির প্রচলন করেছেন এবং এটি উম্মতের জন্য কল্যাণকর সাব্যস্ত হয়েছে। তখনকার সাহাবায়ে কেরামের জন্য এ পদ্ধতিই ছিল সবচেয়ে উপযোগী ও গ্রহণীয়।^{৮৫১}

৫.৩। পরবর্তী খলীফার প্রতি উমর রা.-এর উপদেশ

পরবর্তী খলীফার প্রতি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দেন। তিনি বলেন,

আমি আপনাকে এক আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি, যার কোনো শরীক নেই। মুহাজিরদের প্রতি সদাচরণ করবেন এবং তাদের অগ্রগামিতাকে প্রাধান্য দেবেন। আনসারদের সঙ্গেও সদাচরণ করবেন। তাদের মধ্যে যারা ভালো করবে, তাদের মূল্যায়ন করবেন এবং যারা ভুল করবে, তাদের ক্ষমা করবেন। রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত লোকজনের সঙ্গেও ভালো আচরণ করবেন। কারণ, শত্রুর বিরুদ্ধে তালস্বরূপ এবং গনীমতের উৎস। তাদের নিকট থেকে তাদের প্রয়োজন না মেটা পর্যন্ত কোনো কিছু গ্রহণ করবেন না। গ্রামবাসীদের প্রতিও ভালো আচরণ করবেন। কারণ, তারাই আদি আরব এবং ইসলামের রক্ষক। তাদের সম্পদ থেকে অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করবেন এবং সেগুলো গরিবদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন। আমি আপনাকে মুসলমানদের অধীনে বসবাসরত ইহুদী-খ্রিস্টানদের সঙ্গে ন্যায়সংগত আচরণ করার উপদেশ দিচ্ছি। তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন এবং তাদের ওপর অতিরিক্ত করে বোঝা চাপাবেন না যদি তারা মুসলমানদের প্রতি তাদের দায়িত্ব ঠিকমতো আদায় করে অথবা স্বেচ্ছায় জিযিয়া প্রদান করে এবং নিজেদের পদানত মনে করে।

আমি আপনাকে আল্লাহ এবং তার শাস্তিকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি যেন আপনি আবার অবিশ্বস্ত না হয়ে ওঠেন। আমি আপনাকে মানুষের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে মানুষকে ভয় করতে নিষেধ করছি। আমি মানুষের সঙ্গে ন্যায়সংগত

আচরণ করার আহ্বান জানাচ্ছি। তাদের সুবিধা-অসুবিধা দেখভাল করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। গরিবদের ওপর ধনীদের প্রাধান্য দেবেন না। এটা আপনার আত্মিক প্রশান্তির পথ সুগম করবে এবং আপনার গোনাহর সম্ভাবনা কমিয়ে দেবে। আর এটা আখেরাতের জন্য মঙ্গলময় হবে যতক্ষণ না আপনি ওই সত্তার মুখোমুখি হন, যে আপনার হৃদয়ের কথা জানেন। আল্লাহর আদেশ, আত্মীয়-অনাত্মীয়সহ সকল মানুষের আচরণের নির্ধারিত সীমা এবং তাদের অবাধ্যতার ব্যাপারে দৃঢ় থাকবেন। কারও অবাধ্যতার মাত্রা নির্ধারণ না করে তার প্রতি কোনো রকম দয়া প্রদর্শন করবেন না। সব মানুষকে সমানভাবে বিবেচনা করবেন। দোষী ব্যক্তির মর্যাদা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না অথবা সমালোচকদের সমালোচনার ভয় পাবেন না। আপনার দায়িত্বে থাকা গনীমতের মালের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব করবেন না, যা কিনা আপনাকে অন্যায়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এটা থেকে দূরে থাকবেন।

আপনি এমন এক অবস্থানে পৌঁছেছেন, যা এই দুনিয়া এবং আখেরাতের সঙ্গে সম্পর্কিত। আপনি যদি দুনিয়াবি ব্যাপারাদিতে ন্যায়সংগত আচরণ করেন এবং পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত থাকতে পারেন, তাহলে সেটা আপনার ঈমান বৃদ্ধি ও আখেরাতে আনন্দের কারণ হবে। আর যদি নফসের তাড়নায় পড়ে যান, তাহলে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হবেন।

আমি আপনাকেসহ সবাইকে আহলে যিম্মি (মুসলমানদের অধীনে বসবাসরত ইহুদী-খ্রিস্টান)-দের সঙ্গে মন্দ আচরণ করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিচ্ছি।

আমি আপনাকে নিষ্ঠার সঙ্গে সৎ উপদেশ দিচ্ছি। সুতরাং এটা গ্রহণ করুন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের সফলতা তালাশ করুন। আমি আপনাকে যে উপদেশ দিচ্ছি তা আমার এবং আমার সন্তানদের বেলায়ও প্রযোজ্য। আপনাকে যা বলেছি, আপনি যদি তা পালন করেন এবং আমার নসীহত অনুসরণ করেন, তাহলে আপনি অনেক লাভবান হবেন। আর যদি এসব নসীহত গ্রহণ না করেন অথবা গুরুত্ব না দেন এবং আল্লাহ সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে যাবতীয় কাজ-কারবার না করেন, তাহলে সেটা আপনার দুর্বলতা এবং আপনি নিষ্ঠাবান হতে ব্যর্থ হবেন। কারণ, স্বেচ্ছাচার এবং কামনা-বাসনা একই। আর শয়তানই মানুষকে গোনাহে লিপ্ত করে। সে তাদের ধ্বংসের দিকেই আহ্বান করে। আপনার

আগে অনেক জাতিকে সে ধ্বংস করেছে এবং তাদের জাহান্নামে নিয়ে গেছে। আর জাহান্নাম কী ভয়াবহ আবাসস্থল! আল্লাহর শত্রুকে বন্ধু হিসাবে নেওয়া কতই-না মন্দ কাজ, যে কিনা আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আহ্বান করে। সত্যকে আঁকড়ে থাকবেন এবং তা প্রতিষ্ঠায় প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। নিজেকে নিজে তিরস্কার করবেন।

আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি মুসলমানদের প্রতি দয়ালু হবেন, বড়দের সম্মান করবেন, ছোটদের স্নেহ করবেন এবং আলেমদের মূল্যায়ন করবেন। তাদের কোনো ক্ষতি করবেন না অথবা অসম্মান করবেন না এবং গনীমতের মাল কুক্ষিগত করবেন না, যা তাদের উত্তেজিত করবে। তারা ভাতা প্রাপ্য হলে তাদের বঞ্চিত করবেন না, যাতে তারা দরিদ্র হয়ে পড়ে। তাদের এত দীর্ঘ সময় ধরে অভিযানে ব্যস্ত রাখবেন না, যাতে তারা সন্তানশূন্য হয়ে যায়। কেবল ধনীদের মধ্যেই সম্পদের প্রসার ঘটাবেন না। আপনার দরজা যেন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে এবং অসহায়দের ওপর ক্ষমতাশীলদের চড়াও হতে দেবেন না। এগুলো আমার পক্ষ থেকে আপনার জন্য উপদেশ। আল্লাহ আমার সাক্ষী। মাআসসালাম।^{৮৫২}

ওপরের উপদেশ-বাণী থেকে শাসনকার্য এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে তার রাষ্ট্র পরিচালনায় যুগপৎভাবে একটি নির্দিষ্ট ক্রমঃপদ্ধতি ও ধারার সমন্বয় ঘটেছে।^{৮৫৩} অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি এতে স্থান পেয়েছে। এটাকে একটি দুর্লভ নথি হিসাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কারণ, এর মাধ্যমে শাসনকার্যের মূলনীতি জানা সম্ভব, যেখানে ধর্ম, রাজনীতি, সামরিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে।

৫.৩.১। ধর্মীয় দিক

■ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তী খলীফাকে কথায় ও কাজে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে পূর্ণ ভয় করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহই তাকে হেফাজত করবেন। তিনি খুব গুরুত্বের সঙ্গে

^{৮৫২} আত-তাবাকাত, ইবনে সা'দ, ৩/৩৩৯।

^{৮৫৩} আল-ইদারাতুল ইসলামিয়া ফি আসর উমর ইবনুল খাত্তাব, পৃ. ৩৮১।

বলেন, ‘আমি আপনাকে এক আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি, যার কোনো শরীক নেই।’ ‘আমি আপনাকে আল্লাহকে এবং তার শাস্তিকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি।’

■ পরিচিত-অপরিচিত সকলের ওপর আল্লাহর বিধান সমভাবে কার্যকর করার জন্য অসীয়াত করেন : ‘দোষী ব্যক্তির মর্যাদা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না অথবা সমালোচকদের সমালোচনার ভয় পাবেন না।’ কেননা, এ সকল বিধি-বিধান শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত এবং তা আমাদের দ্বীনেরই অংশ। মানুষের জন্য এগুলো মেনে নেওয়া আবশ্যিক। তাদের সকল কাজকর্মের মাপকাঠি হলো শরীয়ত। এ ক্ষেত্রে শিথিলতা দীন ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর।

■ দৃঢ়ভাবে ইসলাম আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে বলেন,

فَاسْتَقِمُّ كَمَا أُمِرْتَ

অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ, দৃঢ় থাকো।^{৮৫৪}

দৃঢ়তা দীন ও দুনিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা প্রত্যেক নেতা ও সাধারণের জন্য কথায় ও কাজে আঁকড়ে ধরা আবশ্যিক। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আরও বলেন, ‘নিজেকে নিজে তিরস্কার করবেন।’ ‘আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের সফলতা তালাশ করুন।’

৫.০.২। রাজনৈতিক দিক

■ তিনি সুষ্ঠু রাজনীতির প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলেন, ‘আমি মানুষের সঙ্গে ন্যায়সংগত আচরণ করার আহ্বান জানাচ্ছি।’ ‘সব মানুষকে সমানভাবে বিবেচনা করবেন।’ কেননা, ন্যায়-পরায়ণতাই হলো সুষ্ঠু বিচার-ব্যবস্থাপনার মূলমন্ত্র। এর মাধ্যমে নেতার প্রতি জনসাধারণের ভক্তি-শ্রদ্ধা বাড়ে এবং তার স্থায়িত্ব সুদৃঢ় হয়।

■ ইসলামের প্রথম সারির মুসলমানদের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখার অসীয়াত করেন। কেননা, ইসলামী রাজনীতি তাদের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তারা এ জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘মুহাজিরদের প্রতি সদাচরণ করবেন এবং তাদের অগ্রগামিতাকে প্রাধান্য দেবেন। আনসারদের সঙ্গেও সদাচরণ করবেন। তাদের মধ্যে যারা ভালো করবে, তাদের মূল্যায়ন করবেন এবং যারা ভুল করবে, তাদের ক্ষমা করবেন।’

৫.৩.৩। সামরিক দিক

■ সামরিক বাহিনীকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার উপদেশ দেন। কারণ, তাদের ওপরই ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কঠিন দায়িত্ব। তিনি সামরিক সদস্যদের সকল প্রয়োজন পূরণ করার জন্য সচেষ্টি ছিলেন।

■ সৈন্যদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে সীমান্ত প্রহরায় দীর্ঘদিন না রাখা তার বিশেষ নির্দেশনা ছিল। কারণ, এতে তাদের মধ্যে দায়িত্ব পালনে অনীহা সৃষ্টি হতে পারে। তাই তাদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর ছুটি দেওয়ার আদেশ দেন যাতে তারা নতুন উদ্যম নিয়ে কাজে ফিরে আসতে পারে। আর এতে তাদের বংশক্রমও অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, ‘তাদের এত দীর্ঘ সময় ধরে অভিযানে ব্যস্ত রাখবেন না যাতে তারা সন্তানশূন্য হয়ে যায়।’ ‘রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত লোকজনের সঙ্গেও ভালো আচরণ করবেন। কারণ, তারা শত্রুর বিরুদ্ধে ঢালস্বরূপ এবং গনীমতের উৎস।’

■ সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকে তার প্রাপ্য বেতন-ভাতা বুঝিয়ে দিতে আদেশ করেন যাতে তারা সর্বাবস্থায় যুদ্ধে গমন করার জন্য প্রস্তুত থাকেন এবং পরিবার-পরিজনের আর্থিক অসচ্ছলতা তার জন্য বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। এ সম্পর্কে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘গনীমতের মাল কুক্ষিগত করবেন না, যা তাদের উত্তেজিত করবে। তারা ভাতা প্রাপ্য হলে তাদের বঞ্চিত করবেন না, যাতে তারা দরিদ্র হয়ে পড়ে।’

৫.৩.৪। অর্থনৈতিক দিক

■ তিনি ন্যায় ও সুষ্ঠুভাবে সম্পদ বণ্টন করার আদেশ দেন এবং এক শ্রেণিকে বঞ্চিত করে আরেক শ্রেণির ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করার ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন, ‘কেবল ধনীদের মধ্যেই সম্পদের প্রসার ঘটাবেন না।’

■ রাষ্ট্রের নির্ধারিত কর আদায় করলে যিহ্মিদের ওপর অতিরিক্ত কোনো বোঝা চাপানো যাবে না, যা তারা বহনে অক্ষম। তিনি বলেন, ‘তাদের ওপর অতিরিক্ত করে বোঝা চাপাবেন না, যদি তারা মুসলমানদের প্রতি তাদের দায়িত্ব ঠিকমতো আদায় করে।’

■ জনসাধারণের আর্থিক সুবিধার প্রতি লক্ষ রাখা এবং তাতে অবহেলা না করা; সাধ্যের অতীত কোনো বোঝা না চাপানো। তিনি বলেন, ‘তাদের নিকট থেকে তাদের প্রয়োজন না মেটা পর্যন্ত কোনো কিছু গ্রহণ করবেন না।’ ‘তাদের সম্পদ থেকে অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করবেন এবং সেগুলো গরিবদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন।’^{৮৫৫}

৫.৩.৫। সামাজিক দিক

■ জনগণের প্রতি লক্ষ রাখা, তাদের খোঁজখবর নেওয়া, তাদের প্রয়োজন পূরণ করা এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, ‘তারা ভাতা প্রাপ্য হলে তাদের বঞ্চিত করবেন না।’

■ স্বার্থপরতা, স্বজনপ্রীতি এবং নফসের অনুসরণ থেকে বিরত থাকা; কারণ, এগুলো নেতাকে বিপথে নিয়ে যায়, সমাজে দুর্নীতি সৃষ্টি করে এবং পারস্পরিক সম্পর্কে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে। তিনি বলেন, ‘আপনার দায়িত্বে থাকা গনীয়তের মালের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব করবেন না।’ ‘গরিবদের ওপর ধনীদের প্রাধান্য দেবেন না।’

■ সর্বসাধারণকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। এত সামাজিক বন্ধন অটুট থাকবে এবং নেতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মাবে। এ ক্ষেত্রে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি মুসলমানদের প্রতি দয়ালু হবেন, বড়দের সম্মান করবেন, ছোটদের স্নেহ করবেন এবং আলেমদের মূল্যায়ন করবেন।’

^{৮৫৫} আল-খলীফা আল-ফারুক উমর ইবনুল খাতাব, আল-আনি, পৃ. ১৭৪-১৭৫।

■ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছার চেষ্টা করা, তাদের অভিযোগ শোনা, তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে তাদের মনোবল বৃদ্ধি করা; আর তা না হলে জনগণের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কে বিরূপ প্রভাব পড়বে এবং সামাজিক অবক্ষয় দেখা দেবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, ‘আপনার দরজা যেন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে এবং অসহায়দের ওপর ক্ষমতাশীলদের চড়াও হতে দেবেন না।’

■ সত্য অনুসরণ এবং তা যেকোনো পরিস্থিতিতে সমাজের সর্বত্র বাস্তবায়ন করার জন্য সচেতন থাকা; কারণ, তা আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সত্যকে আঁকড়ে থাকবেন এবং তা প্রতিষ্ঠায় প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। ‘সব মানুষকে সমানভাবে বিবেচনা করবেন। দোষী ব্যক্তির মর্যাদা নিয়ে দুষ্টিতাগ্রস্ত হবেন না।’

■ অন্যায়-অবিচার থেকে বেঁচে থাকা, বিশেষ করে যিম্মিদের থেকে; কেননা, ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত সকল নাগরিকের সঙ্গেই ন্যায় বিচার করা আবশ্যিক এবং এর মাধ্যমে সবাই ইসলামের সৌন্দর্য বুঝতে পারবে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমি আপনাকেসহ সবাইকে আহলে যিম্মি (মুসলমানদের অধীনে বসবাসরত ইহুদী-খ্রিস্টান)-দের সঙ্গে মন্দ আচরণ করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিচ্ছি।’

■ গ্রামবাসীদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা এবং তাদের খোঁজখবর নেওয়া। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, ‘গ্রামবাসীদের প্রতিও ভালো আচরণ করবেন। কারণ, তারাই আদি আরব এবং ইসলামের রক্ষক।’^{৮৫৬}

■ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু অসীযত করতে গিয়ে আরও বলেন, আমি যাদের নিয়োগ দিয়েছি, তাদের কাউকে এক বছরের বেশি বহাল রাখবেন না। তবে আশআরীকে চার বছরের জন্য বহাল রাখবেন।^{৮৫৭}

^{৮৫৬} প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৫।

^{৮৫৭} আসর আল-খিলাফা আর-রাশিদ, পৃ. ১০২।

৫.৪। শেষ মুহূর্তগুলো

আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের শেষ মুহূর্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন : আমি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে গেলাম। তখন তিনি তীব্র ব্যথায় কাতরাচ্ছিলেন। আমি তাকে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনি তো এমন সময় ঈমান এনেছিলেন যখন সবাই কুফুরীতে ডুবে ছিল। আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে আপনি জিহাদ করেছেন, যখন মানুষ তাকে অপমান করতে উঠে-পড়ে লেগেছিল। আপনার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তুষ্ট ছিলেন। আপনার নেতৃত্ব মেনে নিতে কেউ দ্বিমত করেনি। তা ছাড়া, আপনার এটিও বড় সৌভাগ্য যে, আপনি শাহাদাতের মৃত্যু বরণ করেছেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন আমাকে বললেন, ‘তুমি যা বলেছ, তা আবার বলো।’ সুতরাং আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে আবার কথাগুলো বললাম। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, যদি দুনিয়াভরা আমার স্বর্ণ-রূপা থাকত, তাহলে তা দিয়ে হলেও মৃত্যুর পর জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহতা থেকে বাঁচার চেষ্টা করতাম।^{৮৫৮} বুখারীর বর্ণনামতে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘তুমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ ও সন্তুষ্টির ব্যাপারে যা বলেছ, তা তো আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ—যা তিনি আমার প্রতি করেছেন। আর আমার যে অস্থিরতা তুমি দেখছ, তা তোমার এবং তোমার সাথীদের কারণেই। আল্লাহর কসম, আমার নিকট যদি দুনিয়াভরা সোনা থাকত, তবে আল্লাহর আযাব দেখার আগেই তা হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য ফিদিয়া হিসাবে বিলিয়ে দিতাম।’^{৮৫৯}

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন; ন্যায়পরায়ণতা, দুনিয়াবিমুখতা এবং আল্লাহর পথে জিহাদসহ অনেক নেক আমল থাকার পরও মৃত্যুসজ্জায় তিনি আল্লাহর আযাবের ভয়ে অস্থির হয়ে পড়েছেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো উম্মতের জন্য এই শিক্ষা রেখে গিয়েছে যে, চূড়ান্ত ফায়সালা না হওয়া

^{৮৫৮} সহীহ আত-তাওসিক ফি সিরাত ওয়া হায়াত আল-ফারুক, পৃ. ৩৮৩।

^{৮৫৯} সহীহ, বুখারী, হাদীস নং ৩৬৯২।

পর্যন্ত কেয়ামত দিবসের ভয়াবহতা ও আল্লাহর আযাব থেকে কেউ নিরাপদ নয়।^{৮৬০}

উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোর স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি বলেন, আমি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে গেলাম। তখন তিনি তার ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কোলে মাথা রেখে শুয়ে ছিলেন। তিনি ছেলেকে বললেন, ‘আমার মাথা মাটিতে রাখো।’ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমার কোল আর মাটির মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে?’ তিনি বললেন, ‘আমার মাথা মাটিতে রাখো।’ কথাটি দুই বা তিনবার বলেছিলেন। তারপর তিনি পা দুটো আড়াআড়ি রাখলেন। আমি শুনতে পেলাম তিনি বলছেন, ‘আমার ধ্বংস হোক, আল্লাহ যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, তখন কী হবে!’ এ কথা বলতে বলতেই তার ইন্তেকাল হয়ে যায়।^{৮৬১}

আল্লাহর ভয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কেমন অস্থির থাকতেন, মৃত্যুর সময়ও তিনি তার দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। তাকে এ বিষয় কখনো ধোঁকায় ফেলতে পারেনি যে, তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জনের একজন। বস্তুত আল্লাহকে যে বেশি চেনে, সে-ই তাকে ভয় পায় বেশি। আল্লাহর বড়ত্বের সামনে নিজের অস্তিত্বকে মিটিয়ে দিতে বারবার তার ছেলেকে বলছিলেন যেন তার মাথা মাটিতে রাখা হয়। যাতে এই বিন্দ্র অবস্থা তার দুআ কবুলের জন্য বেশি সহায়ক হয়। মৃত্যুপূর্ব এই দৃশ্য এ কথাই প্রমাণ করে যে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অন্তর সর্বদা আল্লাহর দিকে গভীরভাবে নিমগ্ন ছিল।^{৮৬২}

৫.৪.১। মৃত্যু-তারিখ ও বয়স

ইমাম যাহাবি রহ. বলেন, ৩৩ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের তিন-চার দিন বাকি থাকতে তিনি শহীদ হন। ওই দিন ছিল বুধবার। বিশুদ্ধ মতে তার

^{৮৬০} আত-তারিখুল ইসলামি, ১৯/৩৩।

^{৮৬১} সহীহ আত-তাওসিক ফি সিরাত ওয়া হায়াত আল-ফারুক, পৃ. ৩৮৩।

^{৮৬২} আত-তারিখুল ইসলামি, ১৯/৪৪-৪৫।

বয়স হয়েছিল তেষটি বছর।^{৮৬৩} তার খেলাফতকাল ছিল দশ বছর ছয় মাসের কিছু বেশি। আবু যারআ তার গন্থ তারিখ আবি যারআ-এ যারির আল-বাজালির সূত্রে বলেন, ‘আমি মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট ছিলাম। আমি তাকে এ কথা বলতে শুনেছি, ‘আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের সময় বয়স ছিল তেষটি এবং আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু—উভয়ের মৃত্যুকালে বয়সও ছিল তেষটি।^{৮৬৪}

৫.৪.২। গোসল ও জানাযার নামায

ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে গোসল করানো হয়, কাফন পরানো হয় এবং তার জানাযার নামাযও পড়া হয়, অথচ তিনি শহীদ ছিলেন।^{৮৬৫} যে ব্যক্তি নির্যাতিত অবস্থায় মারা গেল তাকে শহীদ ব্যক্তির ন্যায় গোসল দেওয়া হবে কি না—এ ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে।

১। উক্ত ব্যক্তিকে গোসল করানো হবে। এই সিদ্ধান্তের অনুসারীরা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা দ্বারা দলীল দিয়ে থাকেন।^{৮৬৬}

২। উক্ত ব্যক্তিকে গোসল করানো হবে না এবং তার জানাযাও পড়া হবে না। এই মতের অনুসারীরা বলেন, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা প্রথম মতের জন্য দলীল হতে পারে না। কেননা, তিনি আহত হওয়ার পর বেশ কিছু সময় বেঁচে ছিলেন। আর মাসআলা হলো, শহীদ ব্যক্তি যদি আঘাত পাওয়ার পর পানাহার করে অথবা নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকে, তাহলে তাকে গোসল করাতে হবে এবং তার জানাযাও পড়তে হবে। পক্ষান্তরে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আহত হওয়ার পর বেশি কিছু সময় বেঁচে ছিলেন, এমনকি পানাহার করেছিলেন এবং ওষুধও সেবন করেছিলেন। আর এ কারণেই তাকে গোসল করানো হয় এবং তার জানাযা আদায় করা হয়।

^{৮৬৩} আত-তাহযিব, হাদীস নং ১৭৭।

^{৮৬৪} সহীহ, মুসলিম, হাদীস নং ২৩৫২; মাহযুস সাওয়াব, ৩/৮৪৩।

^{৮৬৫} আত-তাবাকাত, ৩/৩৬৬; এর সনদ সহীহ।

^{৮৬৬} আল-ইনসায়ফ, আল-মাওয়াযিদ, ২/৫০৩; মাহযুস সাওয়াব, ৩/৮৪৪।

৫.৪.৩। জানাযার ইমাম কে ছিলেন?

ইমাম যাহাবি রহ. বলেন, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জানাযার নামাযে ইমাম ছিলেন সুহাইব ইবনে সিনান রাযিয়াল্লাহু আনহু। আলী ইবনে হুসাইন রহ. সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জানাযা কে পড়িয়েছিলেন?’ তিনি বলেন, ‘সুহাইব।’

- কয়টা তাকবীর দেওয়া হয়েছিল?

- চার তাকবীর।

- কোথায় জানাযা পড়ানো হয়েছিল?

- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা ও মিম্বরের মাঝামাঝি স্থানে।^{৮৬৭}

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব আরও বলেন, ‘উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আদেশে সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু ওয়াক্ফিয়া নামায পড়াতেন। তাই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জানাযা পড়ানোর জন্য তাকেই নির্বাচন করা হয়।’^{৮৬৮}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কখনো শূরা কমিটির কাউকে নামায পড়াতে বলেননি, যাতে লোকেরা ভুল না বোঝে যে, উক্ত ব্যক্তিকে ইমাম বানিয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে খলীফা পদের জন্য অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। তা ছাড়া উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুসহ সাহাবায়ে কেরামের নিকট সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিশেষ মর্যাদা ছিল। তার ব্যাপারে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘কতই-না উত্তম মানুষ সুহাইব! সে যদি আল্লাহকে ভয় নাও পেত, তবু তার অবাধ্য হতো না।’^{৮৬৯}

৫.৪.৪। দাফন

ইমাম যাহাবি রহ. বলেন, ‘উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরেই দাফন করা হয়।’^{৮৭০} ইবনুল জাওযী রহ. জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : উসমান ইবনে আফফান, সাঈদ ইবনে যায়েদ, সুহাইব এবং আব্দুল্লাহ

^{৮৬৭} মাহযুস সাওয়াব, ৩/৮৪৫।

^{৮৬৮} আত-তাবাকাত, ৩/৩৬৭; মাহযুস সাওয়াব, ৩/৮৪৫।

^{৮৬৯} আল-ফাতওয়া, ১৫/১৪০।

^{৮৭০} মাহযুস সাওয়াব, ৩/৮৪৬।

ইবনে উমর—তারা সকলেই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কবরে নেমেছিলেন। হিশাম ইবনে উরওয়া হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কবর ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেকের^{৮৭১} যুগে ভেঙে পড়ে, তখন লোকেরা এর সংস্কার-কাজ করে। কাজ চলাকালীন একটি পা দেখে সবাই ভয় পেয়ে যায়। তারা ধারণা করেছিলেন, এটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পা মোবারক। কিন্তু তারা কারও নিকট থেকে এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য পায়নি। তখন উরওয়া তাদের বলেন, তোমাদের ধারণা সঠিক নয়। আল্লাহর কসম, এটি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পা দেখা যাচ্ছে।^{৮৭২}

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উমর রা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন, যাতে তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে দাফন করা হয়। তখন আয়েশার রাযিয়াল্লাহু আনহা অনুমতি দেন এবং বলেন, ‘অবশ্যই।’ অথচ অন্য সাহাবীরা এই ব্যাপারে পত্র লিখলে তিনি বলতেন, ‘আমি এ ক্ষেত্রে আমার ওপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দেব না।’ হিশাম ইবনে উরওয়া এমনি বর্ণনা করেছেন।^{৮৭৩} আলেমদের মধ্যে এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু—সকলের দাফন মসজিদে নববীতে হয়েছিল।^{৮৭৪}

৫.৪.৫। আলী রা.-এর অভিব্যক্তি

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খাটলার ওপর রাখার পর লোকেরা চারপাশে দাঁড়িয়ে তার জন্য দুআ করতে থাকে। আমি সেখানে ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার কাঁধে হাত রাখে। আমি তাকিয়ে দেখি তিনি আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর। তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাগফেরাতের জন্য জন্য দুআ করছেন এবং বলছেন : ‘আমার নিকট আপনার চেয়ে কোনো ব্যক্তি এত

^{৮৭১} সহীহ, বুখারী, হাদীস নং ১৩২৬।

^{৮৭২} সহীহ, বুখারী, হাদীস নং ২৬৭১ এবং ৬৮৯৭।

^{৮৭৩} মাহযুস সাওয়াব, ৩/৮৪৮।

^{৮৭৪} প্রাগুক্ত।

প্রিয় নয়, যার আমল নিয়ে আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে আগ্রহী। আল্লাহর কসম, আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহ আপনাকে আপনার দুই সাথির সঙ্গেই রাখবেন। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : ‘আবু বকর, উমর এবং আমি গেলাম; আবু বকর, উমর এবং আমি প্রবেশ করলাম; আবু বকর, উমর এবং আমি বের হলাম।’^{৮৭৫}

৫.৪.৬। উমর রা.-এর ইনতেকালে মুসলমানদের ওপর প্রভাব

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুতে মুসলিমবিশ্ব শোকে ছেঁয়ে গিয়েছিল। তাদের অন্তরে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুসংবাদ গভীরভাবে রেখাপাত করে। তারা বিমর্ষ হয়ে পড়ে। আমরা ইবনে মায়মুন বলেন, ‘ইতিপূর্বে মানুষ কখনো এত বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করেনি।’ ইবনে আক্বাস বলেন, ‘(উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুতে) তিনি মানুষকে এমনভাবে কাঁদতে দেখেছেন যেভাবে কেউ তার সন্তানের বিয়োগব্যথায় কাঁদে।’^{৮৭৬}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সরল পথের উজ্জ্বল প্রতীক, সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। স্বাভাবিকভাবেই এমন মানুষের মৃত্যুতে লোকজন শোকাহত হবে, প্রচণ্ড দুঃখ-বেদনায় আচ্ছন্ন হবে।^{৮৭৭} লোকজনের এই শোকাহত অবস্থা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, মানুষ তাকে কত গভীরভাবে ভালোবাসত।

আহনাফ ইবনে কাইস বলেন, ‘উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আহত হওয়ার পর সুহাইবকে আদেশ করেন, যেন তিনি নামাযে ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন এবং লোকদের জন্য তিন দিন খাবার-দাবারের আয়োজন করেন, যতক্ষণ না তারা পরবর্তী খলীফা নির্বাচনে একমত হয়। তখন কিছু লোক খাবারের দস্তরখানে বসেও খাবারের দিকে হাত বাড়চ্ছিল না। ওই সময় ইবনে আক্বাস সবাইকে লক্ষ করে বলেন, ‘আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইনতেকাল করেছেন। তারপরও আমরা পানাহার করেছি। সুতরাং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুশোকে পানাহার বন্ধ করো না। তোমরা পানাহার করো।’ তার এই কথা শুনে লোকেরা খেতে শুরু করল।’^{৮৭৮}

^{৮৭৫} সহীহ, বুখারী, হাদীস নং ৩৬৮৫।

^{৮৭৬} আল-আশারাতুল মুবশশিরুনা বিল জালাহ, মুহাম্মাদ সালিহ আউদ, পৃ. ৪৪।

^{৮৭৭} প্রাপ্ত।

^{৮৭৮} মাহযুস সাওয়াব, ৩/৮৫৫।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা স্মরণ হলেই খুব কেঁদে উঠতেন। তিনি বলতেন, ‘উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের দুর্গ ছিলেন। লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করত, কিন্তু কেউ মুরতাদ হতো না। কিন্তু তার মৃত্যুর পর এই দুর্গ ধসে পড়ে এবং মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরে পড়তে থাকে।’^{৮৭৯}

আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবদ্দশায় বলেছিলেন, ‘উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মারা গেলে ইসলামের মধ্যে শিথিলতা নেমে আসবে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পর আমার বেঁচে থাকার কোনো ইচ্ছা নেই। কারণ, তারপর যে ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে, সে যদি উমরের মতো কঠোরতা করে, তাহলে লোকেরা তাকে মানবে না। আর যদি শিথিলতা করে, তাহলে লোকেরা তাকে হত্যা করে ফেলবে।’^{৮৮০}

৫.৫। গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

৫.৫.১। কাফেরদের অন্তরে মুসলমানদের প্রতি গোপন বিদ্বেষ

মুশরিক আবু লুলু কর্তৃক উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি কাফেরদের অন্তরে মুসলমানদের প্রতি গোপন বিদ্বেষ পোষণ করার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। মুসলিমদের প্রতি কাফের-মুশরিকরা সব স্থানেই সর্বাবস্থায় তাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে। তারা কখনো মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করে না। মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করতে তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা-সাধনা করে। তারা চায়, মুসলমানরা যেন ইসলাম ত্যাগ করে আবার পৌত্তলিকতায় ফিরে যায়।^{৮৮১} উক্ত ঘটনা নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করলে দুটি বিষয় পাঠকের মনে রেখাপাত করবে, যা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠবে এই হত্যাকারী উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং মুসলমানদের প্রতি কতটা হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করত। বিষয় দুটি হলো :

^{৮৭৯} প্রাপ্ত।

^{৮৮০} আত-তাবাকাত আল-কুবরা, ৩/২৮৪; আল-আশারাতুল মুবশশিরুনা বিল জান্নাহ, পৃ. ৪৪।

^{৮৮১} সিয়র আশ-শুহাদা দুরুস ওয়া ইবার, আব্দুল হামীদ আস-সুহাইবানি, পৃ. ৩৬।

✓ ১। ইবনে সাদের গ্রন্থ তাবাকতে কুবরা-এ বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত রেওয়ায়াত অনুযায়ী ইমাম যুহরি রহ. বলেন : উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু একদিন এই অগ্নিপূজককে বলেছিলেন, ‘তুমি কি এ কথা বলোনি, ‘আমি চাইলে এমন জাঁতাকল তৈরি করতে পারি, যা বাতাসের মাধ্যমে কাজ করবে?’ তখন সে ভ্রু কুঞ্চিত করে জবাব দেয়, ‘আমি আপনার জন্য এমন জাঁতাকল তৈরি করব, যা নিয়ে মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হবে।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললেন, ‘এই দাস তো আমাকে মৃত্যুর হুমকি দিয়ে গেল।’

✓ ২। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, এই মুশরিক যখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খঞ্জর দিয়ে আঘাত করে, তখন সে আরও সাত জনকে এটি দিয়ে আঘাত করে, যারা সবাই শাহাদাত বরণ করেন। বুখারীর বর্ণনামতে, ‘ঘাতক ‘ইলজ’ দ্রুত পলায়নের সময় দু-ধারি খঞ্জর দিয়ে ডানে বামে আঘাত করতে থাকে। এভাবে সে তেরো জনকে আহত করে। এদের মধ্যে সাত জন শহীদ হন।’^{৮৮২} উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যদি তার সঙ্গে বিরূপ আচরণ করেও থাকে, তাহলে বাকিরা কী অন্যায় করেছিল? আল্লাহর অনুগ্রহে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কখনো তার সঙ্গে বিরূপ আচরণ করেননি। বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে ইবনু আববাস, দেখো তো কে আমাকে আঘাত করল। তিনি কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করে এসে বললেন, মুগীরাহ ইবনে শু‘বাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর গোলাম (আবু লুলু)। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ওই কারিগর গোলামটি?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহ তার সর্বনাশ করুন। আমি তার সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমার মৃত্যু ইসলামের দাবিদার কোনো ব্যক্তির হাতে ঘটাননি।’^{৮৮৩}

ইসলামের শত্রুরা, যারা মুশরিক আবু লুলুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তারা তার জন্য ইরানে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছে, যা কিনা ‘অজ্ঞাত সৈন্য’-এর ধারণার অনুরূপ। আস-সাদ্দ হুসাইন আল-মুসাবি, নাযাফের একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত, বলেন : ইরানের বাগি ফেন এলাকায় কাশান শহরে একটি স্মৃতিসৌধ রয়েছে। এটি একজন অজ্ঞাত সৈন্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত।

^{৮৮২} সহীহ, বুখারী, হাদীস নং ৩৭০০।

^{৮৮৩} প্রাপ্ত।

সেখানে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারী মুশরিক আবু লুলুর জন্য একটি বানোয়াট কবর রয়েছে। তারা এটিকে বলে, বাবা সুজাউদ্দীনের বিশ্রামাঘার। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করার জন্য তারা আবু লুলুকে সুজাউদ্দীন নামে অভিহিত করে। ওই কবরের দেয়ালে ফারসি ভাষায় লেখা রয়েছে : আবু বকরের মৃত্যু, উমরের মৃত্যু এবং উসমানের মৃত্যু। ইরানের শিয়ারা এ কবর যিয়ারত করতে যায় এবং এতে টাকা-পয়সা দান করে। আমি নিজে এই কবর দেখেছি। ইরানের পর্যটন মন্ত্রী এটিকে মেরামত করে আরও দীর্ঘ পরিসরে এর সৌন্দর্য বাড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং তারা সাধারণ লোকদের জন্য শুভেচ্ছা-কার্ডে এর ছবি ছাপিয়েছে।^{৮৮৪}

৫.৫.২। আল্লাহর ভয়—যা উমর রা.-এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অন্তরে আল্লাহর প্রতি প্রচণ্ড ভয় বিদ্যমান ছিল। এর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো, যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে, তাকে একজন মুশরিক আঘাত করেছে, তখন বলে উঠলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমার মৃত্যু ইসলামের দাবিদার কোনো ব্যক্তির হাতে ঘটাননি।’^{৮৮৫} আরব-অনারব, নিকট কিংবা দূরের সকলের কাছেই তিনি ন্যায়-বিচারক হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তারপরেও তিনি এ ভয় করতেন যে, হয়তো কারও সঙ্গে কোনো অবিচার করা হয়েছে, যে কিনা তাকে হত্যার মাধ্যমে এর প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হবে এবং আখেরাতে আল্লাহর সামনে দাবি পেশ করবে। ইবনে শিহাবের এক বর্ণনামতে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : আলহামদুলিল্লাহ, আমাকে এমন একজন হত্যা করেছে, যে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পেশ করে আল্লাহর দরবারে একটি সেজদা দিতে পারবে।’ মুবারক ইবনে ফাদালা থেকে বর্ণিত, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : ‘কালিমা পড়নেওয়ালা কোনো ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেনি, যে আমার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করতে পারবে।’ ঐশী অনুকম্পায় বেড়ে ওঠা এই মুসলিম নেতার অনেক আশ্চর্যজনক ব্যাপারের মধ্যে এটি একটি, যা সকল দাঈ ও সমাজ-

^{৮৮৪} লিল্লাহ সুম্মা লিত-তারিখ, কাশফুল আসরার ওয়া তাবারকুআতুল আইম্মাতিল আতহার, পৃ. ৯৪।

^{৮৮৫} সহীহ, বুখারী, হাদীস নং ৩৭০০।

সংস্কারকদের শেখা উচিত; তাদের চরিত্রের সর্বোত্তম দিক হওয়া উচিত
বিনয়—যাতে অন্যরা তাদের থেকে উপকৃত হতে পারে, যেমন কিনা
তাদের পূর্বপুরুষরা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে উপকৃত হয়েছিলেন।

واحسرتي واشقوتي من يوم نشر كتابيه
واطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي
وإذا سؤلت عن الخطأ ماذا يكون جوابيه
واحر قلبي إن يكون مع القلوب القاسيه
كلا ولا قدمت لي عملا ليوم حسابيه
بل إنني لشقاوتي وقساوتي وعذابيه
بارزت بالزلات في أيام دهر خاليه
من ليس يخفى عنه من قبح المعاصي خافيه

হায় আফসোস, যেদিন আমলনামা প্রকাশিত হবে
ডান হাতে না পেলে দুঃখ আরও দীর্ঘ হবে
আমার জানা নেই কৃতকর্মের কী জবাব দেব
প্রশ্নেই তো আমি আটকে যাব
সেদিন আমার হৃদয় যদি হয়ে যায় পাষণ
তবে দুঃখে পুড়ে ছাই হোক আমার মন-প্রাণ
আমি নিষ্ফল, শাস্তিযোগ্য—হিসাব দিবসে পাথেয়হীন
আমি শত পাপ নিয়ে দাঁড়িয়েছি দরবারে তার
যার কাছে সবকিছুই দৃশ্যমান।

৫.৫.৩। উমর রা.-এর বিনয়তা

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন বিনয়ের মূর্ত প্রতীক। তিনি শাহাদাত
বরণের পূর্বে তার ছেলে আব্দুল্লাহর উদ্দেশে বলেন, ‘তুমি উম্মুল মুমিনীন
আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার নিকট যাও এবং তাকে বলবে, উমর
আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। সাবধান, আমীরুল মুমিনীন বলবে না।
কেননা, আমি এখন আর মুসলিম জাতির খলীফা নই।’^{৮৮৬}

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার ঘরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দাফন করার অনুমতি দেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ অনুমতি লাভ করার পরও তার ছেলেকে আবার বললেন, ‘আমি মারা গেলে আমার লাশ নিয়ে উম্মুল মুমিনীন আয়েশার ঘরের দরজায় রেখে বলবে, খাতাবের ছেলে উমর প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। যদি তিনি আবার অনুমতি দেন, তাহলেই কেবল আমাকে সেখানে দাফন করবে। আর যদি তিনি নিষেধ করেন, তাহলে আমাকে মুসলমানদের সাধারণ কবরস্থানে দাফন করবে।’^{৮৮৭}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আল্লাহ তা‘আলা তাকে বিনয়-নম্রতার উত্তম প্রতিদান দান করুন। আর এর পাশাপাশি আমরাও যেন তার উত্তম চরিত্রে আদর্শবান হতে পারি। নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা খুব কাছে এবং দুআ কবুলকারী।^{৮৮৮}

আয়েশা রা.-এর পরার্থপরতা

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর পর তাকে তার স্বামী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং পিতা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পাশে দাফন করা হবে। কিন্তু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিয়ে বলেন, ‘যদিও আমি ওই স্থানটি নিজের জন্য রেখেছিলাম, তবে আমি সন্তুষ্টচিত্তে উমরকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছি।’^{৮৮৯}

৫.৫.৪। মৃত্যুসম্ভ্রাম উমর রা.-এর সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সর্বদা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করেছেন এবং মৃত্যুসম্ভ্রামও তিনি এ থেকে বিরত থাকেননি। এক যুবক তার নিকট এসে এই বলে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল : ‘হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার জন্য আল্লাহর সুসংবাদ রয়েছে; আপনি তা গ্রহণ

^{৮৮৭} প্রাণ্ডক্ত।

^{৮৮৮} সিয়র আশ-গুহাদা, পৃ. ৪১।

^{৮৮৯} সহীহ, বুখারী, হাদীস নং ৩৭০০।

করুন। আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য গ্রহণ করেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগেই আপনি তা গ্রহণ করেছেন, যে সম্পর্কে আপনি নিজেই অবগত আছেন অতঃপর আপনি খলীফা হয়ে ন্যায় বিচার করেছেন। অতঃপর আপনি শাহাদাত লাভ করেছেন।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমি পছন্দ করি যে তা আমার জন্য ক্ষতিকর বা লাভজনক না হয়ে সমান সমান হয়ে যাক।’ যখন যুবকটি চলে যেতে উদ্যত হলো তখন তার লুঙ্গিটি মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছিল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘যুবকটিকে আমার নিকট ডেকে আনো।’ তিনি বললেন, ‘হে ভাতিজা, তোমার কাপড়টি উঠিয়ে নাও। এটা তোমার কাপড়ের পরিচ্ছন্নতার জন্য এবং তোমার রবের নিকটও পছন্দনীয়।’^{৮৯০}

এভাবেই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমৃত্যু সৎ কাজের আদেশ দিয়ে গিয়েছেন। ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, তীব্র কষ্টের মধ্যেও তিনি সত্য বলা থেকে পিছু হটেননি।’^{৮৯১}

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধের আরেকটি বড় দৃষ্টান্ত হলো, যখন হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহা বিলাপ করে বলতে থাকেন, ‘হায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী, হায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্বশুর, হায় আমীরুল মুমিনীন!’ তখন তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘আমাকে ধরে বসাও। আমি তার বিলাপ সহ্য করতে পারছি না।’ তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর তাকে বুকের সঙ্গে ঠেস দিয়ে বসালে তিনি হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহার উদ্দেশে বলেন, ‘তোমার ওপর আমার অধিকার থেকে বলছি, এরপর থেকে আর কখনো আমার জন্য বিলাপ করবে না। তবে তোমার চোখের (অশ্রু প্রবাহের) ওপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।’^{৮৯২}

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আহত হয়ে মৃত্যুসজ্জায়, তখন হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহা এসে

^{৮৯০} প্রাপ্ত।

^{৮৯১} ফাতহুল বারি, ৭/৬৫; সিয়র আশ-শুহাদা, পৃ. ৪২।

^{৮৯২} মানাকিব আমীরুল মুমিনীন, পৃ. ২৩০; আল-হিসবাহ, ড. ফযল ইলাহি, পৃ. ২৭।

উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে থাকেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তা শুনতে পেয়ে বলেন, ‘হাফসা, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শোনোনি, যার ওপর বিলাপ করা হয়, তাকে শান্তি দেওয়া হয়। তারপরেও কেন তুমি এমন করছ?’ সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু এসে বলতে থাকেন, ‘হায় উমর! হায় উমর!’ তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকেও বলেন, ‘হে সুহাইব, তুমি কি জানো না, যার জন্য বিলাপ করা হয়, তাকে শান্তি দেওয়া হয়?’^{৮৯৩}

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এতটাই সত্যপ্রিয় ছিলেন যে, যখন খঞ্জরের আঘাতে তার শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, তখন এক ব্যক্তি এসে বলল, ‘ইবনে উমরকে খলীফা পদে অধিষ্ঠিত করুন।’ তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বলেন, ‘আল্লাহর কসম, তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এ কথা বলোনি।’^{৮৯৪}

৫.৫.৫। ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে ব্যক্তির গুণবালির প্রশংসা করা বৈধ

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটেছিল। কিছু সাহাবী তার প্রশংসা করেন; কারণ, তারা জানতেন, এ প্রশংসার দ্বারা তিনি ফিতনায় পতিত হবেন না। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অন্যতম ফকীহ আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : ‘আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আপনার ইসলাম গ্রহণে মুসলমান ও ইসলামের সাহায্য হবে বলে দুআ করেননি, যখন তারা চরম ভয়ংকর অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন পার করছিলেন? আপনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তখন তা ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। প্রতিটি গৃহের লোকজন আপনার নিকট থেকে দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ লাভ করেছে। এখন আপনি শাহাদাত বরণ করতে যাচ্ছেন, এ জন্য আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।’ এ কথায় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হননি এবং তিনি আত্মগর্বও অনুভব করেননি; বরং তিনি এর জবাবে বলেন, ‘আল্লাহ কসম, যে তোমার এ কথা বিশ্বাস করবে, সে ধোঁকায় পড়ে যাবে।’^{৮৯৫}

^{৮৯৩} ফাযায়েল আস-সাহাবা, আহমাদ ইবনে হাম্বল, ১/৮১৪; এর সনদ সহীহ।

^{৮৯৪} সিয়াকুশ গুহাদা, পৃ. ৪৩।

^{৮৯৫} সিয়াকুশ গুহাদা দুরুস ওয়া ইবার, পৃ. ৪৫।

৫.৫.৬। উমর রা.-এর হত্যাকাণ্ডে কাব আল-আহবারের ভূমিকার আসল ঘটনা

কাব আল-আহবার ছিলেন কাব ইবনে মানি আল-হিমইয়ারি, যার কুনিয়াত ছিল আবু ইসহাক। তবে তিনি কাব আল-আহবার নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় যুবক বয়সের ছিলেন। পরে ১২ হিজরীতে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে ইসলাম গ্রহণ করেন।^{৮৯৬} ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি ইয়েমেনের ইহুদী পণ্ডিত হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তারপর ইসলাম গ্রহণ করে তিনি সাহাবায়ে কেরামের নিকট কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করেন। আর সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্যরা তার নিকট থেকে প্রাচীন জাতির ইতিহাস শিক্ষা করেন। তিনি সিরিয়ায় চলে যান এবং হিমসে বসবাস করতেন। সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন।^{৮৯৭}

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করার ব্যাপারে কাব আল-আহবারের চক্রান্ত রয়েছে বলে দাবি করা হয়। আল-মুসাওয়ার ইবনে মাখরামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে আত-তাবারির একটি বর্ণনায় তাকে এ জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ বর্ণনায় রয়েছে, ...তারপর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বাড়িতে গেলেন। পরের দিন কাব আল-আহবার তার নিকট এলেন এবং তাকে বলেন, ‘হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার একজন উত্তরসূরি নিয়োগ করুন। কারণ, তিন দিনের মধ্যেই আপনি মৃত্যুবরণ করবেন।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি কীভাবে জানো?’ তিনি বললেন, ‘আমি তাওরাতে পড়েছি।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আল্লাহর কসম, তুমি তাওরাতে উমরের নাম দেখেছ?’ তিনি বলেন, ‘না। আল্লাহর কসম। কিন্তু আমি আপনার মতো ব্যক্তিত্বের গুণাবলির বর্ণনা পড়েছি। আর এর বর্ণনা অনুযায়ী আপনার সময় শেষ হয়ে এসেছে।’ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এতে কোনো ব্যথা-বেদনা অনুভব করলেন না। পরের দিন কাব আবার তার নিকট আসেন এবং বলেন, ‘হে আমীরুল মুমিনীন, একদিন চলে গেল। আর এক দিন

^{৮৯৬} জাওলাতু তারিখিয়া ফি আসরিল খুলাফাইর রাশিদিন, মুহাম্মাদ আস-সাইয়্যিদ ওয়াকিল, পৃ. ২৯৪।

^{৮৯৭} সিরারু আলামিন নুবালা, ৩/৪৮৯-৪৯৪।

এবং এক রাত আছে; রাত তো আপনার সকাল আসার পূর্ব পর্যন্ত।’ পরের দিন সকালে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে নামায পড়তে গেলেন। তিনি কাউকে কাতার সোজা করার দায়িত্ব দিতেন এবং কাতার সোজা হয়ে গেলে তিনি তাকবীর বলতেন। আবু লুলু হাতে দু-ধারি খঞ্জর নিয়ে অন্যদের সঙ্গে মসজিদে প্রবেশ করে। সে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ছয়বার খঞ্জর দিয়ে আঘাত করে। এর মধ্যে একটি আঘাত ছিল নাভির নিচে এবং এই আঘাতেই তিনি শহীদ হন।^{৮৯৮}

এই ঘটনা থেকে অনেক আধুনিক চিন্তাবিদ মন্তব্য করেন যে, কাব আল-আহবার উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই হত্যাকাণ্ডের চক্রান্তে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ড. জামিল আব্দুল্লাহ আল-মাসরি (তার গ্রন্থ : আতহার আহল আল-কিতাব ফি আল-ফিতান ওয়া আল-হুরুব আল-আহলিয়া ফি আল-কারন আল-আওয়াল আল-হিজরি) এবং আব্দুল ওয়াহাব আন-নাযযার (তার গ্রন্থ : আল-খুলাফা আর-রাশিদুন) এবং প্রফেসর গাজি মুহাম্মাদ ফারিয় (তার গ্রন্থ : আন-নিশাত আস-সিররি আল-ইয়াহুদ ফি আল-ফিকর ওয়া আল-মুমারিসাহ)।^{৮৯৯} কাব আল-আহবারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ড. আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ইবরাহিম আয-যুগাইবি খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন :

এই জটিল বিষয়ে ইমাম আত-তাবারি রহ. যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা অনেক কারণেই সহীহ নয়। এর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে :

১। এ ঘটনা যদি সত্য হতো, তাহলে এটা বলা যায় যে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ ক্ষেত্রে কাব আল-আহবারের কথায় আশ্বস্ত হতেন না; বরং তিনি ইহুদীদের মধ্যে যারা ইতিমধ্যে মুসলমান হয়েছিলেন এবং যাদের তাওরাতের জ্ঞান ছিল (যেমন : আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম), তিনি তাদের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। যদি এটা করা হতো, তাহলে কাব আল-আহবারের কপটতা ধরা পড়ে যেত এবং লোকদের নিকট সত্য প্রকাশিত হতো। আর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও বুঝতে পারতেন যে, তিনি তার হত্যার চক্রান্ত করছেন অথবা তিনি এ চক্রান্তের ব্যাপারে জানেন। সে ক্ষেত্রে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু অবশ্যই এ চক্রান্তের মূল উদ্ঘাটন

^{৮৯৮} তারিখ আত-তাবারি, ৫/১৮২-১৮৩।

^{৮৯৯} আল-আনসারিয়াতুল ইয়াহুদিয়া ওয়া আসারুহু ফিল মুজতামায়িল ইসলামি, ২/৫১৮-৫১৯।

করতেন এবং কাব আল-আহবারসহ জড়িতদের শাস্তি দিতেন। যেকোনো শাসকের নিকট থেকে মানুষ এমনই প্রত্যাশা করবে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা বাদই দিলাম, যিনি ছিলেন প্রখর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী এবং যেকোনো সংবাদ জটিলভাবে বিশ্লেষণকারী। কিন্তু এ রকম কিছুই ঘটেনি। সুতরাং এটি একটি বানোয়াট ঘটনা।^{৯০০}

২। আর যদি এটি তাওরাতে থাকত, তাহলে কাব আল-আহবার রাযিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া আরও অনেকে তা জানত। তাওরাতে যাদের গভীর জ্ঞান ছিল, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি নিশ্চয়ই জানতেন।^{৯০১}

৩। চক্রান্তের বিষয়টি সত্য হওয়ার মানে কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেই এ চক্রান্তের বিষয়টি ফাঁস করে দিচ্ছেন এবং এটি খলীফার নিকট বলার দ্বারা নিজের জড়িত থাকার ব্যাপারটিও বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এটি হতে পারে না। কোনো মানুষের দ্বারা এমনটি হওয়া অসম্ভব। যারা এ ধরনের চক্রান্ত করে থাকে, তারা কখনো তা প্রকাশ করতে চায় না; বরং কঠিন গোপনীয়তা অবলম্বন করে, যাতে ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর এর পরিণতি থেকে নিজেদের বাঁচানো যায়। আর তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ফাঁস করে দেওয়া চরম মূর্খতারই পরিচয়। এটি কাব আল-আহবার রাযিয়াল্লাহু আনহুর বেলায় চিন্তা করা যায় না। কারণ, তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান এবং প্রখর জ্ঞানের অধিকারী।^{৯০২}

৪। অধিকন্তু তাওরাতে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির জীবনের ব্যাপ্তিকাল বর্ণনা করার কী প্রয়োজন? আল্লাহ আসমানী কিতাবসমূহ মানুষের হেদায়েতের জন্য নাযিল করেছেন, কখনো এসব কাজের জন্য নয়।

৫। বর্তমানে তাওরাতে যে কপি পাওয়া যায়, তাতে এ ধরনের কোনো কিছু নেই। প্রথম চারটি অভিযোগ উল্লেখ করে শায়েখ মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আবু জাহু মন্তব্য করেন : ওপরে উল্লেখিত বিষয়াদি থেকে এটি

^{৯০০} আল-হাদীসু ওয়াল মুহাদ্দিসুন, আও ইনায়াতুল উম্মাতিল ইসলামিয়া বিসসুন্লাহ, মুহাম্মাদ আবু জাহু, পৃ. ১৮২।

^{৯০১} প্রাপ্ত।

^{৯০২} প্রাপ্ত।

সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত সত্য যে, এ ঘটনা সম্পূর্ণ বানোয়াট। আর কাব আল-আহবার রাযিয়াল্লাহু আনহুর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে ইসলামের বিরুদ্ধেই চক্রান্তের যে অভিযোগ এবং তাওরাত কিতাবের উদ্ধৃতি—সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ এবং এ ব্যাপারে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই।^{৯০৩}

ড. মুহাম্মাদ আস-সাইয়্যিদ হুসাইন আয-যাহাবি রহ. বলেন : ‘ইবনে জারির আত-তাবারি এই ঘটনা বর্ণনা করার কারণে এটি সহীহ হবে, বিষয়টি এমন নয়। কারণ, এটি প্রসিদ্ধ যে, তিনি কেবল সহীহ বর্ণনা সংকলন করার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। কেউ যদি তার তাফসীরগ্রন্থ বিশ্লেষণ করে, তাহলে সেখানে অনেক বর্ণনা এমন পাওয়া যাবে, যা সহীহ নয়। তেমনিভাবে তার তারিখ গ্রন্থটিতেও অনেক ঘটনা এমন রয়েছে, যা সত্য অথবা মিথ্যা। কেউই এ দাবি করেনি যে, ইতিহাসগ্রন্থে যা কিছু লেখা হয়েছে, তা সবই নির্ভরযোগ্য এবং সহীহ।’ তারপর তিনি আরও বলেন, ‘অধিকন্তু কাব আল-আহবার এবং তার ধর্মীয় একনিষ্ঠতা, সৎচরিত্র ও সততা সম্পর্কে আমরা যা জানি—যেখানে বেশির ভাগ সহীহ হাদীস বর্ণনাকারীরা তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, তাতে আমরা এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারি যে, এ ঘটনা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মিথ্যা। আমরা মনে করি, তিনি কিছুতেই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডের ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত ছিলেন না এবং কে তাকে হত্যার চেষ্টায় জড়িত ছিল, তাও তিনি জানতেন না। এ কারণে তিনি তা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জানাতেও পারেননি। আমরা আরও মনে করি, তিনি মিথ্যাবাদী হওয়া থেকে অনেক উর্ধ্বে। আর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ড-সংক্রান্ত ঘটনাকে তাওরাত ও বানোয়াট ইসরাইলী তথ্য-সূত্রে বর্ণনা করার অভিযোগ থেকেও তিনি মুক্ত।^{৯০৪} আল্লাহর কসম, কাব আল-আহবারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে তিনি সৎ ও বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন এক বিজ্ঞ পণ্ডিত, যার সুনামকে খর্ব করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং অনেক মিথ্যা বর্ণনা তার নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে অজ্ঞরা তা সত্য বলে মেনে নেয়।^{৯০৫}

^{৯০৩} প্রাগুক্ত, ২/৫২৪।

^{৯০৪} আল-হাদীসু ওয়াল মুহাদ্দিসুন, পৃ. ১৮৩।

^{৯০৫} আল-ইসরাইলিয়াতু ফিত তাফসির ওয়াল হাদীস, পৃ. ৯৯।

ড. মুহাম্মাদ আস-সাইয়্যিদ আল-ওয়াকিল বলেন :

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পরপর উবাইদুল্লাহ ইবনে উমরের আচরণকে গবেষকরা কাব আল-আহবারের বিরুদ্ধে অভিযোগের ঘটনাটি বানোয়াট সাব্যস্ত করার ব্যাপারে গবেষকরা প্রথম কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। পিতার হত্যাকাণ্ডের ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তিনি হরমুয, জুফাইনাহ এবং আবু লুলুর বোনকে হত্যার জন্য ছুটে যান। আপনি কি মনে করেন, কাব আল-আহবার যদি এতে জড়িত থাকতেন, তাহলে উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর তাকে বাদ দিয়ে আবু লুলুর মেয়েকে হত্যা করত? সঠিকভাবে সত্য অনুসন্ধানে সচেষ্ট গবেষকরা এ বিষয়টি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। অধিকন্তু বেশির ভাগ ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনা বর্ণনা করেননি বা এদিকে ইশারাও করেননি। আত-তাবাকাত গ্রন্থে ইবনে সাদ এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন, কিন্তু এ ঘটনা উল্লেখ করেননি। তিনি যা লিখেছেন, তাতে এটাই পাওয়া যায়, কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দরজায় দাঁড়িয়ে কেঁদেছেন এবং বলেছেন : আল্লাহর কসম, খলীফা যদি আল্লাহর নিকট তার হায়াত বৃদ্ধির জন্য দুআ করতেন, তাহলে আল্লাহ সেটি হয়তো কবুল করতেন।^{৯০৬} যখন ডাক্তার তাকে নিকট-মৃত্যুর কথা জানান, কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে প্রবেশ করে বলেন, ‘আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করবেন এবং আপনি বলেছিলেন, ‘আমি কেমন করে শহীদ হব, যেখানে আমি আরবে বসবাস করছি?’^{৯০৭}

ইবনে সাদের পর ইবনে আব্দুল বার তার বিখ্যাত আল-ইসতিআব গ্রন্থেও এ ঘটনার কোনো উল্লেখ করেননি।^{৯০৮}

ইবনে কাসির রহ. বলেন : আবু লুলু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এবং সে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পরদিন বুধবার (২৬ যিলহজ) সকালে খঞ্জর দিয়ে আঘাত করে।^{৯০৯}

^{৯০৬} আত-তাবাকাত, ৩/৩৬১।

^{৯০৭} প্রাগুক্ত, ৩/৩৪০।

^{৯০৮} জাওলাতু আসরিফ খুলাফাইর রাশিদিন, পৃ. ২৯৬।

^{৯০৯} আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/১৩৭।

সুতরাং হত্যার হুমকি এবং তা বাস্তবায়নের মধ্যে মাত্র কয়েক ঘণ্টার সময়ের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাহলে কেমন করে কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এ কথা বললেন যে, ‘আপনার একজন উত্তরসূরি নিয়োগ করুন। কারণ, তিন দিনের মধ্যেই আপনি মৃত্যুবরণ করবেন;’ তারপর ‘এক দিন চলে গেছে এবং দু-দিন বাকি আছে;’ তারপর ‘দু-দিন চলে গেছে এবং আর একদিন বাকি আছে?’ যদি রাতে হত্যার হুমকি দিয়ে পরদিন সকালে তা বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে কাব আল-আহবার রাযিয়াল্লাহু আনহু তিন দিন কীভাবে পেলেন? একের এর এক ইতিহাসবিদ এসেছেন—আস-সুযুতি, তারিখ আল-খুলাফা; আল-ইসামি, সামত আন-নুযুম আল-আওয়ালি; শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব এবং তার ছেলে আব্দুল্লাহ, মুখতাসার সিরাত আর-রাসূল; হাসান ইবরাহিম হাসান, তারিখ আল-ইসলাম আস-সিয়াসি এবং অন্যান্যরা—কেউই এই ঘটনার বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেননি। এ থেকে কি এটা বোঝা যায় না যে, ঘটনাটি কোনোভাবেই সহীহ হিসাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি বলেই তারা তা উল্লেখ করা থেকে স্বজ্ঞানে বিরত থেকেছেন? এটা কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা কাব আল-আহবার রাযিয়াল্লাহু আনহুর সুনামকে কালিমায়ুক্ত করতে চান এবং তার থেকে মুসলমানদের বীতশ্রদ্ধ করে তুলতে চান। কারণ, আমরা জানি, কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন এবং অনেক সাহাবায়ে কেলাম তার ওপর আস্থা রেখেছেন, যারা তার নিকট থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেছেন।^{৯১০}

৫.৫.৭। সাহাবী ও তাবেরীদের প্রশংসাবাণী

দাফনের পর আয়েশা রা.-এর সম্মান প্রদর্শন

হাদীসে বর্ণিত আছে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘আমার ঘরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কবর ছিল। আমি সেখানে স্বাভাবিকভাবেই (পর্দা ব্যতীত) প্রবেশ করতাম। কিন্তু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দাফন করার পর আমি তার প্রতি লজ্জার কারণে পরিপূর্ণ পর্দা ব্যতীত সেখানে প্রবেশ করিনি। আল-কাসিম ইবনে

^{৯১০} জাওলাতু আসরিল খুলাফাইর রাশিদিন, পৃ. ২৯৬।

মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘আমি যখনই উমরকে দেখতাম, আমার মনে হতো তাকে ইসলামের সাহায্যের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহর কসম, তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, বিনয়ী এবং একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী।’^{৯১১} উরওয়া থেকে বর্ণিত, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘উমরের নাম নিলেই মজলিসের পরিবেশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠত।’^{৯১২}

সাইদ ইবনে যায়েদ রা.

সাইদ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত, তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুতে কাঁদছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘আপনি কেন কাঁদছেন?’ তিনি বললেন, ‘ইসলামের জন্য। উমরের মৃত্যুতে ইসলামের দেয়ালে একটি ফাটল সৃষ্টি হয়েছে, যা কেয়ামত পর্যন্ত আর মেরামত করা সম্ভব হবে না।’^{৯১৩}

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘যদি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইলম পাল্লার একদিকে, আর অন্যদিকে সারা বিশ্বের মানুষের ইলম রাখা হয়, তাহলে উমরের পাল্লাই ভারী হবে।’^{৯১৪}

তিনি আরও বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইলমের দশ ভাগের নয় ভাগই সঙ্গে নিয়ে গেছেন।’^{৯১৫} তিনি বলেন, ‘উমরের ইসলাম গ্রহণ ছিল (ইসলামের জন্য) একটি বিজয়, তার হিজরত ছিল (ইসলামের জন্য) সাহায্য এবং তার শাসন ছিল (ইসলামের জন্য) রহমত।’^{৯১৬}

^{৯১১} মাহযুস সাওয়াব, ৩/৮৫৩।

^{৯১২} প্রাগুক্ত।

^{৯১৩} আত-তাবাকাত, ৩/৩৭২; আনসাব আল-আশরাফ আশ-শাইখান, পৃ. ৩৮৭।

^{৯১৪} মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবান, ১২/৩২; এর সনদ সহীহ।

^{৯১৫} আল-মুজামুল কাবির, আত-তাবারানি, ৯/১৭৮; এর সনদ সহীহ।

^{৯১৬} প্রাগুক্ত, আত-তাবারানি, ৯/১৭৮; এর সনদ যঈফ।

আবু তালহা আল-আনসারী রা.

আবু তালহা আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আল্লাহর কসম, মুসলমানদের এমন কোনো পরিবার ছিল না, যারা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুতে দীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হননি।’^{৯১৭}

হুযাইফা ইবনে আল-ইয়েমেনী রা.

হুযাইফা ইবনে আল-ইয়েমেনী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে ইসলামের শক্তি ও প্রবৃদ্ধি ছিল উর্ধ্বগামী। আর তার ইন্তেকালের পর তা কমতে শুরু করে।’^{৯১৮}

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা.

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জানাযার পর তিনি এসে পৌঁছেন। তখন তিনি বলেন, ‘তোমরা যদিও আমার আগে তার জানযা পড়ে ফেলেছ, কিন্তু তার প্রশংসায় তোমরা আমাকে পেছনে ফেলতে পারবে না।’ তারপর তিনি বলেন, ‘হে উমর, তুমি মুসলমানদের কতই-না উত্তম ভাই ছিলে! তুমি সত্যের সহায়ক এবং মিথ্যার প্রতিবন্ধক। তুমি খুশির বিষয়ে খুশি হতে এবং রাগের বিষয়ে রাগ করতে। তুমি অধিক প্রশংসা কিংবা সমালোচনা করোনি; তোমার চরিত্র ছিল সৎ ও পবিত্র।’^{৯১৯}

আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা.

তিনি বলেন, ‘আমি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিবেশী ছিলাম। আমি তার থেকে উত্তম কাউকে দেখিনি। তার রাতে ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। আর দিনের বেলায় রোযা রাখতেন ও লোকদের প্রয়োজন পূরণ করতেন। যখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হন, আমি আল্লাহর নিকট তাকে স্বপ্নে দেখতে চাইলাম। আমি স্বপ্নে তাকে মদীনার বাজার থেকে আসতে

^{৯১৭} আত-তাবাকাত, ৩/৩৭৪।

^{৯১৮} প্রাগুক্ত, ৩/৩৭৩; এর সনদ সহীহ।

^{৯১৯} প্রাগুক্ত, ৩/৩৬৯।

দেখলাম। আমি তাকে সালাম দিলাম এবং তিনি সালামের জবাব দিলেন। তারপর আমি তাকে বললাম, ‘আপনি কেমন আছেন?’ তিনি বললেন, ‘ভালো।’ আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আল্লাহ আপনার সঙ্গে কীরূপ আচরণ করলেন?’ তিনি বললেন, ‘আমার হিসাব এই একটু আগে শেষ হয়েছে। আমি তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েই গিয়েছিলাম, যদি আল্লাহ আমার প্রতি রহমত না করতেন।’^{৯২০}

মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান রা.

মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দুনিয়ার প্রাচুর্য চাননি এবং তার নিকট তা আসেওনি। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট দুনিয়ার প্রাচুর্য এসেছিল, কিন্তু তিনি সেটি চাননি। আর আমরা তাতে পুরোপুরি ডুবে আছি।’^{৯২১}

আলী ইবনে আল-হুসাইন রহ.

ইবনে আবি হাযিম থেকে বর্ণিত, তার পিতা বলেন, আলী ইবনে হুসাইনের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আবু বকর এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। তিনি বলেন, ‘তাদের মর্যাদা এমনই ছিল যেমন তারা এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে একের পর এক শায়িত আছেন।’^{৯২২}

কুবাইসা ইবনে জাবির রহ.

আশ-শা‘বি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি কুবাইসা ইবনে জাবিরকে বলতে শুনেছি, ‘আমি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ছিলাম। তার মতো কুরআনে পারদর্শী কাউকে আমি দেখিনি অথবা দীন বোঝার ক্ষেত্রেও তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। আর এর ব্যাখ্যায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়।’^{৯২৩}

^{৯২০} তারিখুল মদীনা, ৩/৩৪৫ (বিচ্ছিন্ন বর্ণনা); আল-হিলইয়া, ১/৫৪।

^{৯২১} তারিখুল ইসলাম ফি আহদিদ খুলাফাইর রাশিদিন, পৃ. ২৬৭।

^{৯২২} মাহযুস সাওয়াব, ৩/৯০৮।

^{৯২৩} আল-মারিফাতু ওয়াত তারিখ, আল-ফাসাবি, ১.৪৫৭।

হাসান বসরী রহ.

তিনি বলেন, ‘যদি তুমি কোনো মজলিসকে প্রাণবন্ত করতে চাও, তাহলে বেশি বেশি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আলোচনা করো।’ তিনি আরও বলেন, ‘যারা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শূন্যতা অনুভব করে না, তারা মন্দ লোক।’^{৯২৪}

আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রহ.

আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রহ. বলেন, ‘আমি প্রচণ্ড শীতে একদিন আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের কাছে যাই। তখন তিনি শানদার এক গম্বুজে অবস্থান করছিলেন। তিনি আমাকে শীতে কাঁপতে দেখে বললেন, ‘আজ প্রচণ্ড শীত পড়েছে, তাই না?’ আমি বললাম, ‘শামবাসীরা আজকের দিন থেকে অধিক শীত কখনো দেখেনি।’ তারপর আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান দুনিয়ার বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করেন এবং তার প্রাচুর্যের নিন্দা করেন। পরিশেষে বলেন, ‘আল্লাহ ইবনে হানতামার ওপর রহম করুন। আমি জানি না, তিনি কখনো দুনিয়ার প্রতি বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট হয়েছিলেন কি না।’ ইবনে হানতামা বলে তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বুঝিয়েছিলেন।

৫.৫.৮। সমসাময়িক পণ্ডিত ও লেখকদের মন্তব্য

১। ড. মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আল-ফাহহাম, আল-আযহারের সাবেক শায়েখ, বলেন, ‘উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার শাসনামলে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতাসহ অনেক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। তার দর্শন ও চিন্তা এখনো জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই আদর্শ হয়ে আছে। সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতি ও উদ্ভূত জটিল সমস্যা মোকাবিলায় তিনি যেভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেছেন, তার দৃষ্টান্ত বিরল।’^{৯২৫}

২। আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ বলেন, ‘আমি এ পর্যন্ত অনেকের জীবনী নিয়ে গবেষণা করেছি। তবে এই মানুষটির (উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর)

^{৯২৪} আত-তাবাকাত, ৩/৩৭২।

^{৯২৫} আল-ইদারাতুল ফিল ইসলামি ফি আহদি উমর ইবনুল খাত্তাব, পৃ. ৩৯২।

সমালোচনা কিংবা দোষ বের করা খুবই কঠিন। আবকারিয়াত উমর—উমরের বিচক্ষণতা—উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনীগ্রন্থ নয় অথবা তার সমসাময়িক কোনো ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ বই নয়; বরং এটি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা এবং তার ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি অধ্যয়ন, যা তার চরিত্রের মহান বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির দিকে ইশারা করে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সময়কাল ছিল বর্তমান যুগের মতোই। কারণ, এখন আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছি, যখন ক্ষমতা ও শক্তির প্রদর্শনী চলছে। আর এ ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারীরা বিশ্বাস করে, ক্ষমতা ও সত্যের অবস্থান পরস্পর বিপরীত। কিন্তু যখন আমরা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো ব্যক্তিত্বকে বোঝার চেষ্টা করি, তখন দেখি যে, ক্ষমতা ও শক্তির দাপট সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন একটি বিষয়। কারণ, তিনি ছিলেন একই সাথে ক্ষমতাশীল, ন্যায়পরায়ণ এবং দয়ালু...। তার চরিত্রের এ বোধ থেকে ধ্বংসাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা সহজেই আরোগ্যের মহৌষধ লাভ করতে পারে।

৩। ড. আহমাদ শালাবি বলেন, ‘...ঘটনাবহুল শাসনামলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল সমস্যা সমাধানে তার সর্বাত্মক চেষ্টা ও সংগ্রাম। তিনি ইসলামের ধারক ছিলেন, জিহাদের পতাকা উড্ডীন রেখেছেন, শত্রুভূমি বিজয় করেছেন, মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন, ইসলামী রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম অর্থ মন্ত্রণালয়ের সূচনা করেছেন, সীমান্ত রক্ষায় নিয়মিত বাহিনী নিয়োগ করেছেন, সৈন্যদের সুনির্দিষ্ট বেতন-ভাতার প্রচলন করেছেন, বিভিন্ন বিভাগ ও অধিদপ্তর গঠন করেছেন, গভর্নর, বিচারক ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করেছেন, প্রতিনিয়ত আর্থিক লেনদেনে মুদ্রার প্রচলন করেছেন, ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছেন, বাজার তদারকি সিস্টেম চালু করেছেন, হিজরী ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেছেন, বিজিত ভূমি অবিভক্ত রেখেছেন এবং নতুন নতুন ইসলামী শহর প্রতিষ্ঠা করেছেন।’^{৯২৬}

৪। কাউন্সিলর আলী আলী মনসুর বলেন, ‘বিচারকার্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট যে চিঠি প্রেরণ করেছিলেন, সেটি মূলত বিচারক ও এ কাজে

সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সংবিধানস্বরূপ। বিচারকের স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রচলিত কোনো আইনে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় না।^{৯২৭}

৫। ব্রিগেডিয়ার মাহমুদ সিত মাহমুদ বলেন, ‘ইসলামী বিজয়ের যদিও অনেক কারণ রয়েছে, এসব কারণের মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রাধান্যযোগ্য। আর এটি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে পুরো মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তার মতো চৌকশ নেতৃত্ব ইতিহাসে দ্বিতীয়বার আসেনি।’

৬। ড. সুবহি আল-মাহমাসানি বলেন, ‘উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত শেষে ইসলামী রাষ্ট্রের স্থপতিদের যুগও শেষ হয়ে যায়। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ রাষ্ট্রের পরিধি বৃদ্ধি করেছিলেন এবং এর ভিত্তিকে মজবুত করেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞ ও দৃঢ় সেনাপতি, একজন দায়িত্ববান রাখাল, একজন ন্যায়পরায়ণ, শক্তিশালী, দয়ালু এবং ন্যায়নিষ্ঠ সেনাপতি। তারপর তিনি ইনতেকাল করেন; দায়িত্ব পালনে অবিচল, সত্য প্রতিষ্ঠায় শহীদ এবং নেককার হিসাবে। সুতরাং তিনি স্থান পেয়েছেন আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা সিদ্দীক ও সালেহীনদের সঙ্গে। সভ্যতা ও ফিকহী ইতিহাসে একজন আইকন হিসাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম চিরকাল ভাস্বর থাকবে।^{৯২৮}

৭। শায়েখ আলী আত-তানতাভি বলেন, ‘আমি যতই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী পড়ি, ততই মুগ্ধ হই। আমি হাজারেরও বেশি প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী পড়েছি; মুসলিম ও অমুসলিমদের। আমি তাদের মধ্যে বিখ্যাত চিন্তাবিদ যেমন পেয়েছি, তেমনি বিখ্যাত বক্তাও পেয়েছি। চরিত্র বা অবদানের জন্য বিখ্যাত ব্যক্তিদেরও জীবনী পড়েছি। কিন্তু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর চরিত্রে এ সবকিছুরই সম্মিলন ঘটেছে। তিনি একই সাথে চিন্তা, আচরণ ও বাগ্মিতায় বিখ্যাত ছিলেন। আমরা যদি বিখ্যাত ফুকাহা ও উলামায়ে কেরামের তালিকা করতে গিয়েছি, তখনো উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম তালিকার প্রথমে স্থান পেয়েছে। তিনি যদি ফিকহী বিষয়াদিতে অবদান ছাড়া আর কোনো কিছুই না করতেন, তবুও তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হতে পারতেন। আর যদি বিখ্যাত বক্তা ও বাগ্মীদের তালিকা তৈরি করা হয়, সেখানেও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম

^{৯২৭} প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩।

^{৯২৮} তুরাসুল খুলাফাইর রাশিদিন ফিল ফিকহী ওয়াল কাযা, পৃ. ৪৬-৪৭।

উমর ইবনুল খাত্তাবের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি সুবিশেষ মেধার অধিকারী ছিলেন, যিনি ভালো কাজ এবং ন্যায়বিচারের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করেছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সংক্ষিপ্ত শাসনামলে তিনি তাকে সদুপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন এবং তিনি সকল বিজিত ভূমিতে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন ও রক্ষায় প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন। দূরবর্তী অঞ্চলে তার নির্বাচিত সেনাপতিদের সাহায্যে এমন-সব ভূমিকা রেখেছেন, যা থেকে তার শাসনক্ষমতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অতি সাধারণ জীবনযাপন ও দুনিয়াবিমুখতায় তিনি মুহাম্মাদ ও আবু বকরের দৃষ্টান্তকেই অনুসরণ করেছেন। তিনি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই প্রশাসনিক ফরমান ও আদেশ জারি করেছেন।^{৯৩২}

৪। ড. মাইকেল হার্ট বলেন : উমরের শাসনামল সমাজে বিশাল প্রভাব ফেলেছিল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে ইসলাম প্রচার-প্রসারে তিনি সবচেয়ে বেশি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন।^{৯৩৩} তার দ্রুত বিজয় লাভ ব্যতীত ইসলামকে আজকের পর্যায়ে কল্পনা করাও মুশকিল হয়ে উঠত। অধিকন্তু তিনি যেসব অঞ্চল বিজয় করেছিলেন, তার সবগুলো এখনো আরবদের দখলেই রয়েছে। এটি পরিষ্কার যে, মুহাম্মাদ এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিলেন, তবে উমর এবং তার নেতৃত্বকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই।^{৯৩৪}

^{৯৩২} প্রাপ্ত।

^{৯৩৩} এখানে প্রতীয়মান হয়, মাইকেল হার্ট আবু বকর রা.-এর জীবনী সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না।

^{৯৩৪} রাসূল সা.-এর ইন্তেকালের পর আবু বকর রা.-এর ভূমিকা ও তার নেতৃত্ব অবজ্ঞা করা স্পষ্টত চরম ভুল।



উপসংহার

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর সাথে ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হলো। ইতিহাসে তিনি জ্ঞান ও দূরদর্শিতায় একজন একক ব্যক্তিত্ব হিসাবেই পরিচিত। সম্পদ সঞ্চয় কিংবা দুনিয়ার ক্ষমতা অর্জন তার জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল না; তার পদমর্যাদা তাকে সত্য থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি এবং তিনি তার ছেলে বা নিকটাত্মীয়দের কোনো অন্যায় কাজে প্রশ্রয় দেননি; বরং তার মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামকে সাহায্য করা। আর তার সবচেয়ে বড় ইচ্ছা ছিল দুনিয়ার বুকে শরয়ী আইনকে প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি তার অধীন সকল মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। একটি জাতির সুদীর্ঘকালের তুলনায় তার শাসনামল ছিল অতি সামান্য। এর মধ্যেই তিনি আল্লাহর অনুগ্রহে এসব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।^{৯৩৫}

তার জীবনী অধ্যয়নে নতুন প্রজন্ম ইসলামের প্রথম যুগের গৌরব ও ঐতিহ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবে। আর এটি তাদের এ শিক্ষা দেবে যে, সর্বশেষ প্রজন্মের হেদায়েত লাভে এমন নীতির অনুসরণই প্রয়োজন, যা প্রথম প্রজন্ম অনুসরণ করেছিলেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ, তাদের সময়কে যথাযথ অনুধাবন এবং ওই সময়কার মানুষজন যেভাবে দ্বীনের দিকে অগ্রসর হয়েছিল—তা অনুসরণ করেই দাঁড়ি এবং উলামায়ে কেরামকে বিশ্বমানবতাকে সর্বোত্তমভাবে সাহায্য করতে পারবে। ইসলামের সভ্যতা-সংস্কৃতির অতীত গৌরব ও মর্যাদায় আসীন হওয়ার জন্য এর বিকল্প কিছু নেই।

আল্লাহ এ কাজকে কবুল করুন, এতে বরকত দেন এবং মানুষের উপকারে নিয়োজিত করুন। আল্লাহ বলেন,

^{৯৩৫} জাওলাতু আসরিল খুলাফাইর রাশিদিন, পৃ. ২৯৭।

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①

আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করে দেন তা আটকে রাখার কেউ নেই। আর তিনি যা আটকে রাখেন, তারপর তা ছাড়াবার কেউ নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।^{৯৩৬}

আমি আশা করি, এ বইয়ের পাঠকগণ লেখকের জন্য দুআ করতে ভুলবেন না যে আপনাদের দুআ এবং আল্লাহর রহমতের খুবই মুহতাজ। মহান আল্লাহ বলেন,

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

হে আমার রব, তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য আমাকে তোমার শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দাও। আর আমি যাতে এমন সৎকাজ করতে পারি যা তুমি পছন্দ করো। আর তোমার অনুগ্রহে তুমি আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো।^{৯৩৭}

কতই-না পরিপূর্ণ তুমি, হে আল্লাহ, সব প্রশংসা কেবল তোমার জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই এবং সব গোনাহ থেকে তোমার কাছে তওবা করছি।

وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

তাদের শেষ কথা হবে, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য)।^{৯৩৮}

একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ক্ষমা এবং সন্তুষ্টির ভিখারি
আলী মুহাম্মাদ আস-সাল্লাবী

^{৯৩৬} সূরা ফাতির, ৩৫ : ২।

^{৯৩৭} সূরা নমল, ২৭ : ১৯।

^{৯৩৮} সূরা ইউনুস, ১০ : ১০।